বাংলা বিহার প্রান্তরে

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম. সাখাওয়াত হোসেন (অব.)

বাংলা বিহার প্রান্তরে

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম. সাখাওয়াত হোসেন (অব.)

পালক পাবলিশার্স

প্রকাশক

ফোরকান আহমদ *বিএ অনার্স, এম এ*

স্বত্বাধিকারী - পালক পাবলিশার্স

১৭৯/৩, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০

ফোন : ০২-৭১৯৫৫৩৯, ০১৭২০৩০৮৮৬১

ই-মেইল : palokpublishers2011@gmail.com
palokpublishers@yahoo.com

দ্বিতীয় প্রকাশ

ভাদ্র ১৪২০

সেপ্টেম্বর ২০১৩

প্রথম প্রকাশ

জানুয়ারি ২০১২

প্রচ্ছদ

এম. সাফাক হোসেন

প্রচ্ছদের ছবি পরিচিতি

সম্মুখ : সম্রাট শাহ্ আলমের হাত হতে লর্ড ক্লাইভের সুবে বাংলার দিওয়ানী প্রাপ্তি।

পেছনের প্রচ্ছদ : পলাশীর রণক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সেনা বিন্যাসের স্কেচ ম্যাপ।

গ্রন্থস্বত্ব

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ

মাটি আর মানুষ

১৭৯/৩, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০

মূল্য : চারশত সত্তর টাকা

BANGLA BEHAR PRANTARE : By Brigadier General M. Sakhawat Hussain ndc, psc (retd.). Published by Forkan Ahmad, Proprietor-Palok Publishers, 179/3, Fakirerpool, Dhaka-1000, Bangladesh. Cover designed by M. Shafaq Hussain. 2nd Edition in September 2013, Price Taka : 470.00 US $ 20.

ISBN 978 984 90692 2 5

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার প্রয়াত বাবা **ডা: বেলায়েত হোসেন**
এবং
মাতা **ওয়াজিফা খাতুন**-কে
এই বই উৎসর্গ করলাম।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমার কথা

ভ্রমণ কাহিনী হিসাবে লেখা আমার পূর্বের দু'টি বই *কত জনপদ কত ইতিহাস* আর *যমুনা গোমতীর তীরে : একটি ভ্রমণ কথা* পাঠকদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। এই বই দু'টি নিছক ভ্রমণ কাহিনী ছিল না, ছিল ইতিহাসের সরল পাঠও। ইতিহাস এসেছে প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসাবে। আমার এই বইটি সেই ধারাবাহিকতায় তৃতীয় ভ্রমণকাহিনী। দেশ এবারও ভারত হলেও এবারের ভ্রমণ কথা আমাদের অত্যন্ত পরিচিত এলাকার, বিশেষ করে বাংলার ইতিহাসের সাথে যুক্ত কিছু অঞ্চল ঘিরে।

এই বইটি লিখতে আমাকে ভ্রমণ করতে হয়েছে পাটনা, বৌদ্ধগয়া, রাজগীর এবং পশ্চিমবঙ্গ। তবে ভ্রমণের সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থানগুলো ছিল বাংলার প্রান্তর, কলকাতা, পলাশী, কাশিমবাজার আর মুর্শিদাবাদ। আমাকে দু'বার যেতে হয়েছে কলকাতা হয়ে মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদ ছিল স্বাধীন বাংলার শেষ রাজধানী। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ছিল ষড়যন্ত্র, হত্যা, হঠকারিতা, বিশ্বাসঘাতকতা আর স্বাধীনতা হরণের ইতিহাস। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের শেষ স্থান মুর্শিদাবাদ আর ভাগিরথী নদীর অপরপারে খোশবাগ যেখানে আলীবর্দী খাঁসহ সিরাজের পরিবারের সমাধি।

এবারের ভ্রমণ আমাকে সুযোগ এনে দিয়েছিল এই উপমহাদেশের ইতিহাসে প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপনকারী সম্রাট বিম্বিসারের রাজধানী রাজগীর আর তারই পুত্র অজাতশত্রুর রাজধানী 'পাটালিপুত্রা' ভ্রমণের। আজকের পাটনাই পাটালিপুত্রার ধারক। পাটনার একাংশে এখনও রয়েছে পাটালিপুত্রার ধ্বংসাবশেষ। সময়কাল গৌতম বুদ্ধের জীবদ্দশায়, খ্রিস্টপূর্ব চারশত বছর পূর্বের কথা। গিয়েছিলাম জগৎখ্যাত বৌদ্ধ বিহার নালন্দায় আর গৌতম বুদ্ধের নির্বান প্রাপ্তির স্থান বৌদ্ধগয়াতে। এই ভ্রমণের ফাঁকে ফাঁকেই শুনেছি বর্তমান বিহারের রাজনীতির আখ্যান।

কলকাতা ভ্রমণে জানবার চেষ্টা করেছি কলকাতা শহরের জন্ম-ইতিহাস। জব চার্নকের ইতিহাস। কলকাতায় নবাব সিরাজের পরাজয়ের পর চক্রান্তকারীদের উত্থানের ইতিহাস। পলাশীর যুদ্ধের পর বাঙালি রাজা, মহারাজা আর জমিদারদের উত্থানের পর্বের সন্ধান করেছি। কলকাতা শহরের ইতিহাসের কিছু কিছু বিচিত্র কাহিনী এবং কিছু অপ্রচলিত দর্শনীয় স্থানের ইতিহাস আর ভ্রমণের বিবরণ তুলে ধরেছি।

ভ্রমণ করেছি পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র। দেখেছি বাংলার ইতিহাসের অন্যতম ষড়যন্ত্রের সূতিকাগৃহ কাশিমবাজার কুঠি। এ সব জায়গার বিশদ বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছি।

www.pathagar.com

আমার ভ্রমণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয় এবং বাংলায় তথা ভারতবর্ষে ইংরেজ প্রভুত্ব কায়েমের ঐতিহাসিক পটভূমির জায়গাগুলো দেখবার। গিয়েছিলাম বাংলার শেষ রাজধানী মুর্শিদাবাদ। গিয়েছিলাম ভাগিরথী নদীর অপরপারে খোশবাগসহ অন্যান্য জায়গাগুলো দেখতে। বর্ণনা করেছি সেই সব অভিজ্ঞতার।

সবশেষে দেখতে গিয়েছিলাম বাংলা সাহিত্য আর ললিতকলা চর্চার বিশ্বখ্যাত বিদ্যাপীঠ শান্তিনিকেতন। বেশ কিছু সময় কাটিয়েছিলাম। তুলে ধরেছি যৎসামান্য বিবরণ।

আমি আমার পূর্বের ভ্রমণকাহিনীর মত এবারও ইতিহাসের অতি পরিচিত, স্বল্প পরিচিত বিষয়গুলো তুলে ধরেছি। কিছু গবেষণা, কিছু ইতিহাসের পাঠ হতে এ সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। চেষ্টা করেছি বস্তুনিষ্ঠ থাকতে। এমন করতে গিয়ে অন্য লেখকদের মতই আমার অন্তরের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, তবুও চেষ্টা করেছি অনুভূতিগুলোকে সীমিত রাখতে। কোথাও কোথাও আমার ব্যক্তিগত মন্তব্য জুড়ে দিয়েছি। এগুলো আমারই মন্তব্য। দু'দফায় আমার এ ভ্রমণে সফরসঙ্গী ছিলেন যারা তাদের কথা লিখেছি। তাদের কথোপকথন, মন্তব্য, ইত্যাদি, যতদূর সম্ভব, অবিকৃত অবস্থায় লিপিবদ্ধ করেছি। আশা করছি, আমার সফরসঙ্গীরা সেগুলো সেভাবেই গ্রহণ করবেন। আমি তাদের প্রত্যেকের কাছে, লেখক হিসাবে কৃতজ্ঞ। এঁরা ছাড়াও বহু চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে। কয়েকজনের নাম পরিবর্তিত হলেও যতদূর সম্ভব তাদের সাথে আমার এবং আমার সফরসঙ্গীদের সাহচর্যের বিষয় হু বহু তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি।

আমার এই ভ্রমণ কথা লিখতে গিয়ে শুধু আমার সফর সঙ্গীদেরই নয়, বহু ব্যক্তিবর্গের সহায়তা পেয়েছি। তাদের সকলকেই আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশেষ করে আমার স্ত্রী ডা. রেহানা খানম যিনি আমাকে সব সময়ই লেখবার অনুপ্রেরণা যোগান এবং আমার কনিষ্ঠ পুত্র সাফাক হোসেনকে, সে এবারও এই বইটির প্রচ্ছদ তৈরি করেছে, তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। আমার পরিবারের অন্য সদস্য কায়সার ও পৃথাও আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি পালক পাবলিশার্সের কর্মবীর জনাব ফোরকান আহমদকে যিনি অতীতের মতই অনেক ধৈর্য এবং যত্নসহকারে এই বইটি প্রকাশ করেছেন। তার নিরলস পরিশ্রম ছাড়া এই বইটি এত সহজ এবং সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যেত না।

পরিশেষে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জানাই আমার পাঠকদের যারা সব সময়েই আমার লেখার সাথে থেকেছেন। আমি আশা করি, এবারও আমার এই ভ্রমণ কাহিনী অতীতের মত পাঠকদের আনন্দ দান করবে। আর তেমনটা হলে লেখক হিসাবে নিজেকে ধন্য মনে করব।

এম. সাখাওয়াত হোসেন

ঢাকা
জানুয়ারি ২০১১

www.pathagar.com

সূচিপত্র

কলকাতার পথে	৯
হুগলীর তীরের জনপদ	২০
রাজা-মহারাজাদের উত্থান	৩৬
গঙ্গার তীরে স্নিগ্ধ সমির	৪৭
১৮৫৭-ব্যারাকপুরের বিদ্রোহ	৫৮
কফি হাউসের সেই আড্ডা	৭০
জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়িতে	৮০
কলকাতার জব চার্নক	১০২
থ্রি-টায়ার-গরিব রথ	১২৬
বিম্বিসারের রাজধানীতে	১৩১
'বুদ্ধাম শরনাম গচ্ছামি'	১৪৮
পাটালিপুত্রা হতে পাটনা	১৬২
আবার গরিব রথে	১৮১
পলাশীর প্রান্তরে	১৯০
ষড়যন্ত্রের শহর কাশিমবাজার	২০৭
বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ	২১৯
ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী ট্রেনে	২৩৬
ফিরে দেখা মুর্শিদাবাদ	২৪৭
নিমকহারাম দেউড়ি	২৫৬
খোশবাগ-সিরাজের সমাধি	২৬৯
বিশ্বভারতী বকুলতলা	২৮৯
Bibliography	৩১২

www.pathagar.com

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ

১। বাংলাদেশ : রক্তাক্ত অধ্যায় ১৯৭৫-৮১
২। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের ইতিকথা : আফগানিস্তান হতে আমেরিকা
৩। অস্থির বিশ্ব ও আমাদের রাজনীতি
৪। তেল-গ্যাস : নব্য উপনিবেশবাদ
৫। দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশের নিরাপত্তা
৬। মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
৭। জনগণের রাজকুমারি ডায়ানা
৮। Terrorism in South Asia : Bangladesh Perspective
৯। South Asian Tangle
১০। Matter Military
১১। Regional Conflicts: Impact on Global Peace
১২। কত জনপদ কত ইতিহাস
১৩। যমুনা গোমতীর তীরে : একটি ভ্রমণ কথা
১৪। বাংলা বিহার প্রান্তরে

www.pathagar.com

এক

কলকাতার পথে

বেশ কিছুদিন থেকে পরিকল্পনা করছিলাম ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক জায়গা ভ্রমণ করবার। এ অঞ্চলের এত বিশাল ব্যাপ্ত ইতিহাস কোথা হতে শুরু করব আর কোথায় শেষ করব তা নির্ধারণ করাও সহজ কাজ মনে হয়নি। কাজেই আমার ভ্রমণ সীমিত রাখলাম পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, মুর্শিদাবাদ আর বিহারের পাটনায়। উড়িষ্যার ভুবেনশ্বর যাবার পরিকল্পনা থাকলেও সময়ের অভাবে এবার যাওয়া হয়নি।

অবশেষে আমরা তিনজন কামরুল, মুকুল শ্রীবাস্তব এবং আমি পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক ডিসেম্বর ১৯, ২০১০-এ জেট এয়ারে কলকাতা রওয়ানা হলাম। ইতোমধ্যেই আমার সহধর্মিণী ডা. রেহানা খানম দিল্লীতে একটি আন্তর্জাতিক মেডিক্যাল সম্মেলনে যোগ দিয়ে সেখানেই অবস্থান করছিলেন। ডিসেম্বর ২০, ২০১০-এ কলকাতায় আমার সাথে দু'দিন কাটিয়ে ঢাকায় ফিরবার কথা ছিল। অপরদিকে কামরুলের সহধর্মিণীও দু'দিনের জন্য কলকাতা যাবার কথা। তিনিও আমার সহধর্মিণীর সাথে ফিরে আসবার কথা। মুকুল একাই আমাদের এ সফরে সঙ্গী হয়ে যোগ দিয়েছিল। আমরা চারজনই একই বিমানে বিকেলের ফ্লাইটে কলকাতার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। ঢাকা-কলকাতা মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পথ। দেখতে দেখতেই কেটে গেল। আমি এর আগেও দু'বার কলকাতা গিয়েছি। একবার ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে। তখন গিয়েছিলাম সেনাবাহিনীর চাকরি হতে অবসর গ্রহণের পর কিছু একটা ব্যবসায় জড়িত হতে। কিন্তু কলকাতা গিয়ে সুবিধা হয়নি। আরেকবার গিয়েছিলাম একদিনের জন্য 'তারা' টেলিভিশনের আমন্ত্রণে। সেটাও ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সফর। বলতে গেলে কলকাতার কিছুই দেখা হয়নি। এবার অবশ্য প্রায় দশদিনের ভ্রমণে বের হয়েছি যার দু'দিন ব্যস্ত থাকতে হবে সহধর্মিণীর সাথে টুকিটাকি কেনাকাটায়। কামরুলেরও প্রথম দু'দিন একই রকম ব্যস্ততা। আর মুকুল দু'দিন কলকাতায় তার অফিসের কাজ শেষ করে আমাদের সাথে বাংলা-বিহার ভ্রমণে সঙ্গী হবে।

কামরুল ইসলাম অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা। বর্তমানে একজন সফল ব্যবসায়ী। আমার সাথে কর্মক্ষেত্রে দেখা হলেও এক সাথে চাকরি করা হয়নি। তবে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে গুলশান লেকপার্কে প্রাতঃভ্রমণের পরে নির্জলা আড্ডার মধ্য দিয়ে। সুঠামদেহী মধ্য

www.pathagar.com

পঞ্চাশে বয়স। অনর্গল কথা বলতে ভালবাসে। বাক্যালাপের কোন নিশ্চিত বিষয় নেই। বিজ্ঞানের ছাত্র, তাই ভ্রমণে রুচি থাকলেও ইতিহাসে রুচি ছিলনা। আমার বই 'কত জনপদ কত ইতিহাস' পড়ে ইদানিং সফরের সাথে ইতিহাসের সংমিশ্রণ ঘটাতে আগ্রহী হয়ে উঠাতে আমার সাথে এ সফরে আসবার আগ্রহ। প্রথম থেকেই এ ভ্রমণের পরিকল্পনার সাথে জড়িত। কামরুল বাংলাদেশের ফেন্সিং ফেডারেশনের সম্পাদক। আর ব্যবসার সাথে জড়িত থাকাতে দেশ-বিদেশ ভ্রমণও এন্তার।

আরেক সফরসঙ্গী মুকুল যার কথা আমার পূর্বের ভ্রমণ বিষয়ক দু'টি বইতেই উল্লেখ করেছিলাম। আমি ইতোপূর্বে দু'বার ভারত সফর করেছিলাম। আর প্রতি সফরেই মুকুল আমাকে মোবাইলে ব্যবহারের জন্য তার SIM দিয়েছে। এবার আমার সহধর্মিণীর ব্যবহারের জন্য মুকুল তার SIM ধার দিয়েছিল। মুকুল প্রায় তিন বছর বাংলাদেশে আছে। চাকরি করে জার্মানীর বিখ্যাত থাইসন লিফট সামগ্রীর কোম্পানিতে। ওই কোম্পানির বাংলাদেশের প্রধান হিসেবে কর্তব্যরত। উত্তর প্রদেশে আদি নিবাস। বৈবাহিক সূত্রে কলকাতা নিবাসী। সুমিতা কলকাতার মহিলা। বাপের বাড়ি রয়েছে কলকাতা শহরে। মুকুলের ছোট একটি ফ্ল্যাট আছে গড়িয়াহাটায়। স্ত্রী সুমিতা, মুকুলের সাথে ঢাকাতেই থাকেন। মুকুল দম্পতির একটি মাত্র পুত্র সন্তান। বিবাহিত, বর্তমানে চাকরির সুবাদে 'পুনা' শহরের বাসিন্দা। মুকুলের সাথে আমার পরিচয় গুলশান লেক পার্কে প্রাতঃভ্রমণের মাধ্যমে।

আমরা জেট এয়ারওয়েজে যখন কলকাতার নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করলাম তখন সূর্য ডুবে গিয়েছিল। শীতের বিকেল তাই তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে আসছিল। বিমান বন্দরটি খুব বড়সড়ো নয় আর আন্তর্জাতিক অংশ তেমন ব্যস্ত বলেও মনে হল না। যথারীতি ইমিগ্রেশন শেষ করে বের হয়ে আসবার পথে আমি আর মুকুল একটি ট্যাক্সির জন্য প্রি-পেইড কাউন্টারে ২৫০ রুপি জমা দিয়ে রসিদ নিলাম। অপরদিকে কামরুল ও তার সহধর্মিণী আলাদা প্রি-পেইড ট্যাক্সির রসিদ নিয়ে এ পর্ব শেষ করে বের হবার পথ ধরলাম। আমাদের কলকাতার আবাস হবে রফি আহমেদ কিদওয়াই এবং রয়েড রোডের উপরে বাটামোড় সংলগ্ন বাংলাদেশিদের অতি পরিচিত হোটেল গুলশানে।

কলকাতার নেতাজী সুভাষ বোস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পূর্ব নাম পরিবর্তন করে বর্তমান নামকরণ করা হয় বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে। ভারত সরকার নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসকে সম্মান প্রদান করেই এ নামকরণ করেন। বাংলা ভাষাভাষী মাত্রই নেতাজী সুভাষ বোসের নাম জানেন। তিনি শেষবারের মত ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে কলকাতা ত্যাগ করেছিলেন। নেতাজীকে নিয়ে আলোচনা করব আরও পরে। এবারের কলকাতা ভ্রমণে গিয়েছিলাম নেতাজীর পৈতৃক

www.pathagar.com

বাড়ি, যা বর্তমানে নেতাজী জাদুঘর দেখতে, তার বিবরণ যথা সময়েই দেবার ইচ্ছা রাখি।

নেতাজী সুভাষ বোস বিমান বন্দরের আদি নাম ছিল দমদম বিমান বন্দর। উপমহাদেশের সবচাইতে প্রাচীন এ বিমান বন্দর স্থাপিত হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে প্রধানত পূর্বভারতের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম যাত্রীবাহী বিমান ডেকোটা-৩ অবতরণ করে এ বিমান বন্দরে। ওই বিমানগুলোই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এখান থেকে ব্যবহার হয়েছিল পূর্ব রণাঙ্গনে জাপানীদের বিরুদ্ধে। পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে বর্তমান বাংলাদেশের প্রায় সকল বিমান বন্দরই ওই সময় অগ্রবর্তী বিমানবন্দর হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে দমদম বিমান বন্দরে ভারতের প্রথম কার্গো টার্মিনাল স্থাপন করা হয়। বর্তমানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলসহ আভ্যন্তরীণ এবং বাংলাদেশের সাথে এ বিমান বন্দর সরাসরি যুক্ত। এখান হতে সীমিত আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনা করা হয়। বর্তমানে প্রায় ৩১০টি ফ্লাইট পরিচালিত হয়। এ বিমান বন্দরে তিনটি টার্মিনাল রয়েছে, আভ্যন্তরীণ, আন্তর্জাতিক এবং কার্গো।

আমরা বিমান বন্দর থেকে বের হয়ে হোটেলের উদ্দেশে রওয়ানা হবার জন্য দু'টি ট্যাক্সি নিলাম। একটিতে কামরুল দম্পতি তার অন্যটিতে আমি আর মুকুল উঠে বসলাম। এখানের সব ট্যাক্সি ভারতের তৈরি এম্বাসেডর গাড়ি। এম্বাসেডর গাড়ির বাইরের আদল মডেল হিসেবে প্রায় অপরিবর্তিতই রয়েছে। আমাদের ট্যাক্সি চালককে গন্তব্যস্থল বলতেই তিনি বললেন যে, তিনি ওই হোটেলটির সাথে পরিচিত। কারণ, তিনি ধারে কাছে, কোথাও থাকেন। আলাপচারিতায় তার নাম জানতে পারলাম। নাম রমেশ। বাড়ি বিহারের মুঙ্গের জেলায়। গত বিশ বছর কলকাতায় ট্যাক্সি চালান। নিজের এবং জ্ঞাতি ভাইদের মিলিয়ে তিনটি ট্যাক্সি রয়েছে। রমেশ পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। পাতলা ছিপছিপে একহারা গড়ন। কাজ চালিয়ে নেবার মত বাংলা বলতে পারেন। পরিবার থাকে দেশে। দু'টি সন্তান– একটি ছেলে একটি মেয়ে।

রমেশ আমাদের জানালেন তার এ গাড়িটির বয়স পাঁচ বছর। কিন্তু আমার কাছে জরাজীর্ণ মনে হল। হয়তবা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এ জরাজীর্ণ হাল।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। হোটেল বিমান বন্দর থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার দূরে। এ সময় প্রচণ্ড ভিড় থাকে। তবে দিনটি রবিবার, ছুটির দিন হওয়ায় তেমন একটা ভিড় নেই। রাস্তার দু'ধারে ল্যাম্প পোস্টে সোডিয়াম বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে। আশপাশের অট্টালিকা আর দোকানপাটের বাতিগুলো রাস্তায় ঠিকরিয়ে পড়ছে। গাড়ি চালাতে চালাতে রমেশ বললেন, 'স্যার আপনারা প্রি-পেইডে টাকা না দিয়ে এর পরে আমার সাথে যোগাযোগ করলে আমি কিছু কমে প্রয়োজনে আপনাদের এখানে নিয়ে আসতে

www.pathagar.com

পারব।'

আমি বললাম, 'ভালই হল। কাল নয়টায় আমাকে বিমান বন্দরে বেগম সাহেবাকে নিতে আসতে হবে। সে ক্ষেত্রে আপনি কত নেবেন?'

'আসতে যেতে এবং অপেক্ষা করতে পাঁচ শত রুপি' রমেশের উত্তর।

আমি বললাম, 'ঠিক আছে, তা হলে আপনার সাথে আমার এ চুক্তিই হল।'

এবার রমেশকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি দিন চুক্তিভিত্তিক আমাদের সাথে থাকতে চাইবেন? রমেশ বললেন, 'আপনাদের ইচ্ছা হলে থাকব। সকাল আটটা হতে রাত আটটা শুধুমাত্র কলকাতা শহরে আটশত রুপি আর শহরের বাইরে গেলে কিলোমিটার অথবা ঘন্টা প্রতি নির্ধারিত হারে ভাড়া দেবেন।'

মুকুল এবার জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যারাকপুর কলকাতার মধ্যে নয়?'

রমেশ বললেন, 'হ্যাঁ'।

'আর চন্দননগর?'

'চন্দন নগর' কলকাতা শহরের বাইরে কাজেই সেখানের হিসাব আলাদা। আমি আর মুকুল রমেশের সাথে একপ্রকার পাকাপোক্ত করে ফেললাম যে ডিসেম্বর ২২, ২০১০ থেকে রমেশকেই আমরা দৈনিক ভিত্তিতে সাথে রাখব। রমেশ আমাদেরকে তার মোবাইল নম্বর দিয়ে বললেন, 'স্যার, যখন প্রয়োজন আমাকে ডাকবেন।'

আমি রমেশকে জানালাম যে, কাল সকাল নয়টায় তিনি যেন হোটেলে চলে আসেন। রমেশের সাথে কথা বলতে বলতে আমরা রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডের মোড়ে হোটেল 'গুলশান'-এর সামনে চলে আসলাম। সামনে ফুটপাত, গাড়ি দাঁড় করাবার কোন জায়গা নেই। রাস্তার উপরে ট্রামলাইন। প্রতি চার মিনিট পর পর কলকাতা ট্রাম কর্পোরেশনের ইতিহাস খ্যাত বৈদ্যুতিক ট্রাম এ রাস্তায় চলাচল করে।

হোটেলটি ছোটখাটো, পাঁচ তলা। এখানে বাংলাদেশিরাই বেশি আসে এবং থাকে। কারণ, হোটেলটি নিউমার্কেটের ধারে কাছে। হেঁটেও যাওয়া যায়। হোটেলের মালিক এবং কর্মচারীরাও বাংলাদেশিদের দেখে অভ্যস্ত। আমরা হোটেলের অভ্যর্থনা কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিকতা সেরে যার যার রুমে চলে গেলাম। মুকুল তার গড়িয়াহাটার ফ্ল্যাটে চলে গেল। মুকুল দু'দিনের অফিসের কাজ সেরে ২২ ডিসেম্বর আমার আর কামরুলের সহধর্মিণীদের কলকাতা ত্যাগের পর যোগ দেবে আমার সাথে বাংলা বিহারের ইতিহাসে ভ্রমণের জন্য। অবশ্য কয়েক ঘন্টা পর আমার সাথে মুকুলের যোগ দেবার কথা। আজকের সূচিতে রয়েছে রাতে বাইরে খাবার। কামরুল তার সহধর্মিণীকে নিয়ে কলকাতা সাউথ সিটি মল-এ কেনাকাটার জন্য আগেই বের হবে এবং আমরা পরে ফুডকোর্টে যোগ দেব। সব সময়ের মত এবারও ঢাকা ছাড়বার পূর্বে

www.pathagar.com

আমি ভারতীয় Airtel এর সিম নিয়ে রেখেছিলাম, কাজেই যোগাযোগের অসুবিধে হবার কথা নয়।

ডিসেম্বরের কলকাতা। ঢাকার চেয়ে শীত কম। বলতে গেলে তেমন শীত নেই। রুমটিতে একটি ডাবল খাট, সোফা আর টিভি আছে। মোটামুটি আকারের। হোটেলটি কোন তারকাবিশিষ্ট নয়। বাথরুমে ঢুকে গরম পানি পেলাম না। দু'বেলা গোসল করা আমার চল্লিশ বছরের অভ্যাস। কাজেই ঠাণ্ডা পানি দিয়েই গোসলটা সেরে নিলাম। পরে জানতে পারলাম যে, পানি গরম হতে সময় লাগে এবং পঞ্চম তলায় বেশ দেরিতে গরম পানি পাওয়া যায়।

গোসল সেরে নামাজ পড়ে তৈরি হয়ে মুকুলের অপেক্ষায় নিচে লবি নামক ছোট একটি বারান্দায় বসে দিল্লীতে আমার সহধর্মিণী ডা. রেহানা খানমকে কলকাতায় আগমন বার্তা জানালাম। আগামীকাল সকালেই তাঁর দিল্লী হতে ঢাকার পথে কলকাতা পৌঁছবার কথা।

হোটেলের সামনেই কিদওয়াই রোড। এ সময়ে সন্ধ্যার পর প্রচুর গাড়ি, বাস আর ট্রামের যাতায়াত। এ অঞ্চলটি মুসলিম প্রধান। মধ্য ও নিম্নমধ্যবিত্তদের বাস। রাস্তার ফুটপাতগুলো বিভিন্ন ধরনের হকারদের দখলে। রাত বাড়লেই ছিন্নমূলদের সমাগম হয় ফুটপাতে রাত কাটাবার জন্য। রাস্তার দু'পাশেই নিম্নবিত্তের উপযোগী রেস্তোরাঁ হতে শুরু করে মুদির দোকান পর্যন্ত রয়েছে। কিদওয়াই রোড হতে দক্ষিণ-পূর্বদিকে কিছু দূরেই এক সময়ের কলকাতার অভিজাত বিপণী বিতান এলাকা বিখ্যাত পার্ক স্ট্রিট। এখানে রয়েছে তিন শতকের পূর্বের বৃহৎ বিপণী বিতানগুলো। যদিও এসব বিপণী বিতান বহুবার হাত বদল হয়েছে।

সামনের রাস্তায় ট্রামের আনাগোনা। অদ্ভুত গড় গড় শব্দ আর টং টং করে বাজানো সতর্কীকরণ সংকেত। এগুলো এখন নিম্নবিত্তদের সবচাইতে সস্তার বাহন। ট্রামগুলোর চেহারাই বলে দেয় এদের বয়স শতবর্ষের। এক সময় ডিজেলে চলতো, বর্তমানে বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলে। উপরে ঝোলানো বৈদ্যুতিক তার। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম বাংলা সরকার ট্রাম ব্যবস্থাকে কোম্পানির আওতায় এনেছে। এখন এগুলোর দায়িত্বে রয়েছে কলকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানি বা কেটিসি (KTC)। এর বৈদ্যুতিকীকরণ করা হয় ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে এবং বলা হয়ে থাকে এটাই এশিয়ার সবচাইতে পুরাতন বৈদ্যুতিক ট্রাম।

কলকাতা বা ক্যালকাটা ট্রামের প্রথম জন্ম হয়েছিল ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে। তখন মাত্র ৩.৯ কিলোমিটার লাইন বসানো হয়েছিল। এ ব্যবস্থা শুরু করা হয়েছিল শিয়ালদা হতে আরমেনিয়া ঘাট স্ট্রিট পর্যন্ত। প্রথমে এ ট্রাম ঘোড়ার সাহায্যে টানা হতো। তবে এটা বেশি দিন টেকেনি। নভেম্বর ২০,১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দেই বন্ধ করে

www.pathagar.com

দেয়া হয়েছিল এ ট্রাম সেকশন। পুনরায় ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে মিটারগেজ লাইন বিস্তৃত করা হয়। শিয়ালদা হতে বৌবাজার হয়ে আরমেনিয়া ঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়। তখনও ঘোড়াই ট্রাম চালানোর শক্তি। এরপরে স্থাপিত হয় ক্যালকাটা ট্রামওয়ে কোম্পানি। কোম্পানিটি ছিল লন্ডনে রেজিস্ট্রিভুক্ত। ট্রাম লাইন বিস্তৃত হয় ১৯ মাইল। ওই সময় কোম্পানির কাছে ছিল ১৬৬টি ট্রাম আর ১০০০ ঘোড়া এবং ১৯টি বাষ্পচালিত ইঞ্জিন। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে স্ট্যান্ডার্ড গেজ লাইন বসানো হয় এবং একই সাথে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা শুরু করা হয়। ভারত স্বাধীন হবার পরেও পূর্ব শতকের ধারাবাহিকতায় আরো বিস্তৃত হয় ট্রাম লাইন। তবে নগর ব্যবস্থা এবং একই সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো আধুনিকায়নের সাথে সাথে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অনেক রুট বন্ধ করা হয়। বর্তমানে কিছু কিছু রুটে উন্নতমানের ট্রাম চালু করা হয়েছে।

এখনো সাড়ে চার রুপি ভাড়ায় চলছে ট্রাম। অফিস ছুটির পর কলকাতার ট্রাফিক জ্যামের মধ্যে যাত্রীতে ঠাঁসা ট্রাম চলে ধুঁকে ধুঁকে। আমি হোটেলের লবির কাচের দরওয়াজা দিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম ট্রামের আনাগোনা। শুনছিলাম লাইনের উপর চলবার সময়ে ঘড়ঘড়ানি আওয়াজ। মনে মনে স্থির করলাম একদিন প্রাতঃভ্রমণে বের হলে ট্রামে চড়ব, কারণ তখন খালি পাওয়া যাবে। একথা আমার সহধর্মিণীকে বললে তিনি অতি উৎসাহে সায় দিলেন। এখনো ট্রাম ঘুরাবার জন্য এসপ্লানেড বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। ভাবছিলাম ইংরেজদের শহর কলকাতায় বহু ব্রিটিশ কিংবদন্তির মধ্যে রয়ে গেছে কলকাতার ট্রাম, যার উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড রিপন একশ' তিরিশ বছর পূর্বে ১ নভেম্বর ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে। এখানেই ধারে কাছে রয়েছে রিপন স্ট্রিট।

আমি অনেকক্ষণ বসে ট্রামের আনাগোনা দেখছিলাম। ইতিমধ্যেই কামরুল আর মিসেস শেলী কামরুল বের হয়ে গেছেন। কামরুলের শ্বশুর সেনাবাহিনীর মেডিক্যাল কোরে কর্নেল ছিলেন। সে সূত্রে সহজেই আমার সহধর্মিণী লে. কর্নেল রেহানা খানম (অব.) সাথে একটু বেশি ঘনিষ্ঠতা। ইতিমধ্যেই মুকুল আমাকে জানালো আর অল্প সময়ের মধ্যে সে হোটেলে এসে পৌছবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুকুল এসে উপস্থিত। আমরা বের হয়ে ট্যাক্সি ক্যাব নিয়ে কামরুলের অবস্থান কলকাতা সাউথ সিটি মল-এর উদ্দেশে কিদওয়াই রোড থেকে পার্কস্ট্রিট হয়ে রওনা দিলাম। আমি ট্যাক্সিচালক রমেশ, যিনি আমাদেরকে বিমান বন্দর থেকে নিয়ে এসেছিলেন মোবাইলে যোগাযোগ করে কাল সকালে বিমান বন্দরে যাবার কথা জানালে তিনি বললেন যে, সকালে তিনি আসবার পথে আমাদেরকে নিয়ে আসতে পারবেন। আমি তাকে জানালাম যে কাল দুপুর নাগাদ আমার সহধর্মিণী দিল্লী হতে আভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে আসবেন। সে কারণে আমাকে আভ্যন্তরীণ উইং-এ যেতে হবে। রমেশ জানালেন যে, তিনি সকালে

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক টার্মিনালের বাইরে থাকবেন। আমি তার সাথে যোগাযোগ করলে তিনি আমাদের নিয়ে আসবেন। সাথে জানাতে ভুল করলেন না যে, আভ্যন্তরীণ উইং-এ ট্যাক্সি স্ট্যান্ড নেই।

আমরা পার্কস্ট্রিট ছেড়ে কয়েকটি রাস্তা ঘুরে সাউথ মল প্লাজায় পৌঁছলাম। ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও কলকাতার রাস্তায় ভিড় কম ছিল না, তবে ঢাকার মত অসহনীয় পর্যায়ে নয়। প্রায় ত্রিশ মিনিট পর আমরা মলে পৌঁছলাম। কলকাতার অন্যতম আধুনিকতম প্লাজা সাউথ সিটিমল। ঢাকার বসুন্ধরা সিটি মলের মত। একই ধাঁচে তৈরি। এখানে বিভিন্ন ধরনের বিপণী বিতান ছাড়াও রয়েছে ফুডকোর্ট আর মাল্টিপ্ল্যাক্স সিনেমা স্ক্রিন। প্লাজায় কামরুলের অবস্থান জেনে তার সাথে মিলিত হবার জন্য চতুর্থ তলায় উঠে কামরুলের দেখা পেলাম। সে জানালো যে তার সহধর্মিণী কোন এক বিপণী বিতানে রয়েছেন। আমরা তাকে ফুডকোর্টে আমাদের সাথে দেখা করতে বলে জানালাম আমরা রাতের আহার এখানেই শেষ করে হোটেলে ফিরব। রাত তখন প্রায় নয়টা। আমি মুকুলকে নিয়ে ফুডকোর্টে উপস্থিত হলাম। প্লাজায় প্রচুর জনসমাগম, তবে দোকানগুলোতে তেমন ভিড় নেই। অনেকে শুধুমাত্র সময় কাটাতে, সিনেমা দেখতে আর ফুডকোর্টে ভারতীয় ব্যঞ্জনের সাথে সাথে তথাকথিত ফাস্টফুড খেতে ভিড় করছে বলে মনে হল। তবে খাবারের দোকানগুলোতেই বেশি ভিড়। ফুডকোর্টে বসবার জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না। মুকুল প্রথমে প্রধান কাউন্টারে টাকা জমা দিয়ে খাবারের কুপন কিনে নিল। মুকুল জানালো যে, এখানে প্রথমে টাকা জমা দিয়ে সমপরিমাণ কুপন নিয়ে যে কোন খাবারের স্টল থেকে বিভিন্ন অংকের কুপনের বিনিময়ে খাবার নেয়া যায়। পরে উদ্বৃত্ত থাকলে সমপরিমাণ অর্থ ফেরত পাওয়া যায় অথবা ঘাটতি হলে পুনরায় কুপন কিনতে হয়। এ ব্যবস্থাটি আমার কাছে ভালই মনে হল। এ ব্যবস্থায় প্রতি দোকানে ক্যাশ দেবার বিড়ম্বনা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। অবশ্য বসুন্ধরা সিটির ফুডকোর্টে এ রকম ব্যবস্থা নেই।

কলকাতার সাউথ সিটি মল প্লাজা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে। প্লাজার সামনের রাস্তাটির নামকরণ করা হয়েছে ইতিহাসে মৈশুরের সিংহ বলে খ্যাত টিপু সুলতানের একপুত্র প্রিন্স আনোয়ার শাহ-এর নামে, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড। প্লাজার আশপাশের সম্পূর্ণ জায়গাটি একসময় মৈশুরের বা শ্রীরাঙ্গাপট্টমের বীর সুলতান টিপুর সম্পত্তি ছিল। এখানেই ধারে কাছে রয়েছে টিপু সুলতানের একটি মসজিদ। একই সময়ে তৈরি অপর মসজিদটি রয়েছে এসপ্লানেডের নিকটবর্তী এলাকায়। দুটোই তৈরি হয়েছিল প্রায় দু'শ' বছর পূর্বে। মসজিদ দুটো বর্তমানে পরিচালিত হচ্ছে একটি ট্রাস্টের মাধ্যমে।

মৈশুরের ব্যাঘ্র বলে খ্যাত টিপু সুলতানের চার বেগমের গর্ভে জন্ম নিয়েছিল ষোল

www.pathagar.com

পুত্র আর আট কন্যা। চতুর্থ মৈশুর যুদ্ধে টিপু পরাজিত হবার এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বারা নির্মমভাবে টিপুকে হত্যার পর তাঁর পুত্রদের ভেলোর জেলে রাখা হয়। ভেলোর জেলে টিপুর পুত্রদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উস্কানি দেবার অভিযোগের প্রেক্ষিতে কলকাতায় আনা হয়। তাদের আপোষহীন চরিত্রের কারণে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধভাজন হয়ে থাকতে হয়। ক্রমেই ইতিহাসের পাতা হতে হারিয়ে যায় টিপুর বংশধররা। এখন টিপুর বংশধরদের অনেকেই কলকাতায় রিকশা চালিয়ে জীবনযাপন করে, এমন খবর ইদানিং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর কর্নাটক সরকার টিপুর এক পুত্রের বর্তমান বংশধর আনোয়ার আলী শাহকে রয়েল মর্যাদা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে থাকবার জন্য বসতবাড়িসহ তার সন্তানদের লেখাপড়ার খরচও বহন করবে বলে জানিয়েছে।

আনোয়ার আলী শাহকে সরকারি পর্যায়ে সম্মানও দেখানো হয়। কারণ, অধিকাংশ হিন্দুস্থানী ঐতিহাসিক ও জনগণের নিকট টিপু সুলতান স্বাধীনতার প্রথম সেনানী হিসাবে স্মরণীয় চতুর্থ মৈশুর যুদ্ধে শহীদ হন মে ৪, ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরাঙ্গাপট্টমে। টিপু সুলতানকে দাফন করা হয় শ্রীরাঙ্গাপট্টমে পিতা হায়দার আলীর পাশে।

টিপু সুলতানের দাফনের সময়ে এক অবিশ্বাস্য ঘটনার কথা এক তরুণ ইংরেজ সামরিক কর্মকর্তার ডাইরির বিবরণ ইতিহাসে উদ্ধৃত হয়েছে। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকদের জন্যে তুলে ধরলাম। টিপু সুলতানকে পরের দিন অর্থাৎ মে ৫, ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে যখন দাফন করবার সকল প্রস্তুতি শেষ করে ইংরেজ বাহিনীর সদস্যরা কবরে নামাতে যাচ্ছিল, ঠিক সে সময়েই সমস্ত শ্রীরাঙ্গাপট্টম আকাশ এমনভাবে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায় যে মনে হচ্ছিল গভীর রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে। অথচ সময় ছিল বিকেল পাঁচটা। টিপুর কবরের চারধার ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এবং হায়দ্রাবাদের নিজামের বাহিনী দ্বারা ঘেরা। কবরে টিপুর লাশ নামাতেই বিকট আওয়াজে বজ্রপাত হয়ে শুরু হল প্রবল ঝড়। এমন ঝড় ইতিপূর্বে মৈশুরের জনগণ প্রত্যক্ষ করেনি। টিপুর দাফনের দায়িত্বে ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ১২ রেজিমেন্টের লেফটেনেন্ট বেইলি। বেইলি তার ডাইরিতে লিখেন, 'আমি আমার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ওই দিনের কথা ভুলব না। যা দেখেছি তা প্রকাশ করবার জন্য পর্যাপ্ত শব্দ আমার জানা নেই। আমি সে দিন প্রকৃতির যে ভয়াবহতা দেখেছি তা প্রকাশ করবার ভাষা আমার জানা নেই। আমি বহুবার সমুদ্র পাড়ি দিয়েছি। বহুবার উত্তাল সমুদ্র দেখেছি। দেখেছি প্রচণ্ড বিদ্যুৎ চমকানো কিন্তু টিপুর দাফনের সময় যা দেখেছি তার তুলনায় আমি ইতিপূর্বে যা দেখেছি তা তুচ্ছ।'[১]

কলকাতায় এখন আমরা যেখানে দাঁড়ানো সাউথ সিটি মল হতে বর্তমানের রয়েল কলকাতা গলফ এবং টালিগঞ্জ ক্লাব সম্পূর্ণ এলাকাটাই ছিল টিপু সুলতান পরিবারের।

১. Bayly Richard "Diary of Colonel Bayly 12th Regimen : 1776-1803" London, PP 95-96.

www.pathagar.com

ব্রিটিশ সরকার টিপুর সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করে তার বংশধরদের রাস্তার ভিখারী বানিয়ে ছেড়েছিল। বর্তমানে এ এস্টেটটি একটি ট্রাস্টের হাতে রয়েছে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ব্রিটিশ সরকারের দারুণ ক্ষোভ ছিল টিপু সুলতানের উপরে। কারণ, টিপুকে কাবু করতে তিনটি নিষ্ফল যুদ্ধ করতে হয়েছিল। প্রতিবারই নাস্তানাবুদ হয়েছে ব্রিটিশ বাহিনী। এসব যুদ্ধে প্রতিবারই ধরা পড়েছে বহু ইংরেজ সামরিক কর্মকর্তা যারা মৈশুরে যুদ্ধবন্দি হিসেবে আটক ছিল বহুদিন। এ সব কর্মকর্তার সাথে ভাল আচরণ করা হতো না বলে রটানো হয়েছিল। রটানো হয়েছিল যে, টিপুর পোষা বাঘ ছেড়ে দেয়া হতো যুদ্ধ বন্দিদের উপর নেহাতই তামাশা দেখার জন্য। এ সব কাহিনী আজও লন্ডনের রয়েল এলবার্ট জাদুঘরে টিপু সুলতানের বাল্যকালের খেলার জন্য তৈরি কাঠের বাঘের প্রদর্শনীতে উদ্ধৃত রয়েছে। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ নিলাম ঘর হতে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও ধনকুবের বিজয় মালিয়া টিপু সুলতানের নিজস্ব তরবারি ৫০,৫২৫০ ব্রিটিশ পাউন্ড দিয়ে কিনে ভারতে তার ব্যক্তিগত সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন।

আমরা সাউথ সিটি মল প্লাজার ফুডকোর্টে খাওয়া শেষ করে বেশ কিছুক্ষণ ট্যাক্সির জন্যে প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মুকুল গড়িয়াহাটায় তার ফ্ল্যাটে ফিরে যাবে। আমরা তিনজন হোটেলে যাব তাই আমাদের ভিন্ন ভিন্ন গন্তব্যের জন্য দু'টি ট্যাক্সির প্রয়োজন ছিল বলে কিছুটা সময় কাটাতে হল। অবশেষে আমরা একটি ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলের পথে রওয়ানা হলাম। মুকুল আলাদাভাবে চলে গেল তার ফ্ল্যাটে গড়িয়াহাটায়। সে আমাদের সাথে যোগ দেবে ডিসেম্বর ২২,২০১০ সকালে আমার আর কামরুলের সহধর্মিণীদের কলকাতা ত্যাগ করবার পর। বস্তুতপক্ষে সে দিন থেকেই আমার এবারের ইতিহাসে ভ্রমণ শুরু করব উপমহাদেশের ওই প্রান্ত থেকে যেখান হতে শুরু হয়েছিল হিন্দুস্থানে ইংরেজ শাসনের একশ' নব্বই বছর আর একশ' বছরের উপরে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তৈরি উপমহাদেশের প্রথম ব্রিটিশ শহর কলকাতার। এ শহরের গোড়াপত্তন হয়েছে প্রায় তিন শত বছর পূর্বে। তবে আমার মতে গড়পড়তা বয়স দু'শ' বছরের কিছু উপরে। কলকাতা খুব দ্রুত শহর হিসেবে গড়ে উঠে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের পর হতে। সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের পরেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজত্ব প্রসারে বাধা পেয়েছে বহু ছোট হলেও শক্তিশালী প্রায় স্বাধীন রাজ্যগুলো হতে। এমনি রাজ্যগুলোর একটি ছিল মৈশুর যার বিবরণ আমি কিছুটা হলেও দিয়েছি।

রাত প্রায় এগারোটা, কলকাতার দোকানপাট বন্ধ তবুও রাস্তায় ভিড় কমেনি। তবে ট্রাফিক জ্যাম নেই। পেছনে কামরুল দম্পতি। আমি সামনে বসা। তখনও ট্যাক্সি প্রিন্স আনোয়ার শাহ স্ট্রিট ছাড়েনি। ভাবছিলাম হিন্দুস্থানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বের

www.pathagar.com

কথা। কিভাবে স্থানীয় শক্তি ব্যবহার করে সমগ্র হিন্দুস্থানকে এবং এর শাসকদের মাথা নত করাতে পেরেছিল। হাতে গোনা যে কয়েকজনকে করাতে পারেনি তার মধ্যে ছিলেন মৈশুরের হায়দার আলীর উত্তরসূরিদের, যার মধ্যে অবশ্য টিপু সুলতান সর্বশীর্ষে। টিপু সুলতানের মৃত্যুর পরও ভেলোরে কোম্পানির সেনাদের মধ্যে ব্যাপক বিদ্রোহ হয়েছিল যার নেতৃত্বে ছিলেন টিপু সুলতানের ভাইয়ের অন্যতম পুত্র শাহজাদা হায়দার আলী। শাহজাদা হায়দার আলী ছিলেন হায়দার আলীর নাতি টিপুর ভাই আব্দুল করিমের পুত্র।

টিপু সুলতানের মৃত্যুর পর তার পুত্রসহ পরিবারের সকলকে ভেলোর দুর্গে বন্দি করে রাখা হয়। প্রায় দু'বছর বন্দি থাকার পর শাহজাদা হায়দার আলী ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে দুর্গ থেকে পালিয়ে মারাঠাদের সাথে যোগ দেন। ওই সময় মারাঠারা কোম্পানির বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। অপরদিকে কোম্পানির বাহিনীতে নতুন পোশাক পরিবর্তনের সাথে হুকুম জারি করা হল যে, হিন্দু সিপাহিরা মাথায় তিলক লাগাতে আর মুসলমানরা দাড়ি রাখতে পারবে না। এ ধরনের নির্দেশ এবং সম্পূর্ণ ইউরোপীয় পোশাক ধর্ম-অবমাননার শামিল বলে উভয় সম্প্রদায় গণ্য করে ভিতরে ভিতরে ফুঁসে উঠতে থাকে।

জুলাই ৯, ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে ভেলোর দুর্গেই টিপু সুলতানের এক কন্যার বিবাহের আয়োজন করা হয়। ওই সময়েই সিপাহিরা বিদ্রোহ করে হায়দার আলীকে সুলতান হিসেবে স্বীকৃতি দিতে সম্মত হল। পরের দিন জুলাই ১০, ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রত্যুষে ভেলোর দুর্গের সিপাহিরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে গোলাগুলি শুরু করলে বহু ইংরেজ অফিসারের প্রাণহানি হয়। সিপাহিরা দুর্গের ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা নামিয়ে হায়দার আলীর পতাকা উত্তোলন করে শাহজাদা হায়দার আলীকে তাদের সুলতান মনোনীত করেন।

ভেলোরের বিদ্রোহ ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। কারণ, সিপাহিরা দুর্গের মূল দরওয়াজা বন্ধ করতে পারেনি। দুর্গ হতে পালিয়ে যাওয়া কয়েকজন কোম্পানির অফিসার দুর্গের বাইরে সম্পূর্ণ ব্রিটিশ সদস্য দ্বারা সংঘটিত ১৯ লাইট ড্রাগনস এবং মাদ্রাজ ক্যাভেলারি নিয়ে কর্নেল রোলো গিলিসপি (Rollo Gillespie) নয় ঘণ্টা পর দুর্গ আক্রমণ করে তুমুল লড়াইয়ের পর পুনঃদখল করেন। এ যুদ্ধে প্রায় ৩৫০ জন সিপাহি শহীদ এবং সমপরিমাণ সিপাহি সদস্য আহত হয়। পরে সতের (১৭) জন হিন্দুস্থানী অফিসার ও সিপাহিদের প্রকাশ্যে ফাঁসি দেয়া হল। এর পরপরই টিপু সুলতান তথা হায়দার আলীর উত্তরসূরিদের কলকাতাসহ দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলোতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। ওই বিদ্রোহকালে টিপু সুলতানের বংশধরদের অনেকেরই মৃত্যু হয়েছিল। ভারতের অনেক ঐতিহাসিকের মতে ভেলোর বিদ্রোহই ছিল প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ। যদিও ১৮৫৭-এর

www.pathagar.com

সিপাহি বিদ্রোহই হিন্দুস্থানের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে বিবেচিত। হয়ত ব্যাপ্তির কারণে। টিপু সুলতান আর হায়দার আলীর কথা ভাবতে ভাবতে আমরা আমাদের হোটেলে এসে পৌছলাম। আমাকে কাল সকালে বিমানবন্দর যেতে হবে আমার সহধর্মিণী ডা.রেহানা খানমকে হোটেলে নিয়ে আসতে। আগেই যেমনটা বলেছিলাম দিল্লীতে মেডিক্যাল কনফারেন্স শেষ করে ঢাকা যাবার পথে একদিন কলকাতায় থাকবেন।

আমি রুমে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে প্রাতঃভ্রমণের কাপড়গুলো বের করে শুয়ে পড়লাম।

www.pathagar.com

দুই

হুগলীর তীরের জনপদ

সকালে ফজরের নামাজের সময় হোটেলের অতি নিকটস্থ মসজিদগুলো হতে মাইকে একই সাথে আজানের ধ্বনিতে ঘুম ভেঙে গেল। এক সঙ্গে এত আজানের ধ্বনি শুনে আমি একটু থমকে গেলাম। মনে হল যে ঢাকায় আছি কলকাতায় নয়। পরে জেনেছি যে, এ অঞ্চলটি মুসলিম প্রধান অঞ্চল বিশেষ করে রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডের আশেপাশে মুসলমানদের বাস অনেক বেশি।

আজানের সমাপ্তির পর যথারীতি নামাজ পড়ে সকালে হাঁটতে বের হতে তৈরি হয়ে নিলাম। কামরুল সস্ত্রীক আমার পাশের রুমে আছে, কাজেই নিশ্চয়ই আমার তৈরি হবার শব্দ শুনে থাকবে। তাছাড়া আগেই নির্ধারিত করা ছিল যে, প্রতিদিনকার অভ্যাস মত সকালে প্রাতঃভ্রমণে বের হব। তবে কোনদিকে যাব তা অনির্ধারিত ছিল। আমি ভেবেছিলাম হয়তোবা এত সকালে ফুটপাত ধরে উত্তর-দক্ষিণে যে কোন একদিকে যাব এবং রাস্তায় কিছু দেখবার থাকলে দেখাও হয়ে যাবে, প্রয়োজনে পরে এসে বিস্তারিত দেখতে হলে দেখব। কামরুল আমার আগে বের হয়ে দক্ষিণ পূর্বদিকে রওয়ানা হয়ে আমাকে মোবাইলে তার অবস্থান জানালো।

কামরুল জানালো যে আমি রফি আহমেদ কিদওয়াই আর পার্কস্ট্রিট সংযোগ সড়ক ধরে এসে পার্ক স্ট্রিটের কোণাতেই একটি ছোট আকারের পার্ক দেখতে পাব এবং সে সেখানেই আছে। আমাকে আরও জানালো যে, ওই ছোট পার্কেই বহু প্রাতঃভ্রমণকারী জমা হয়েছে। আমি ওই নির্দেশনা বরাবর হাঁটতে লাগলাম। কিদওয়াই রোড ছেড়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে সংযোগ সড়কে উঠে দেখলাম ফুটপাত বলতে কিছু বাকি নেই। অত্যন্ত নোংরা পরিবেশ। হয়ত একসময় চওড়া ফুটপাত ছিল। এখন অজস্র খানা-খন্দ, খোঁড়াখুঁড়ি করে রাখা। বেশ কিছু অংশ গাড়ি মেরামতের কারখানা দ্বারা দখলিত হয়ে রয়েছে। বাকি জায়গা ছিন্নমূল পরিবারের দখলে। কাঁথা মুড়ি দিয়ে সপরিবারে নিদ্রারত। পাশে প্লাস্টিক দিয়ে আচ্ছাদন তৈরি। মনে হল ঘুম থেকে উঠে ওখানে আশ্রয় নেবে। নাকে রুমাল চাপতে হল কারণ মানুষের বিষ্ঠা আর প্রস্রাবের গন্ধ নাসিকা রন্ধ্রে প্রবেশ করার সাথে পেটে মোচড় দেয়া শুরু হয়ে যাবার উপক্রম হয়। সাবধানে না চললে চরণ দু'খানি বিষ্ঠার মধ্যে নিমজ্জিত হতে পারে। ফিরতি পথে কামরুলের জুতা

www.pathagar.com

পরিষ্কার করতে বেশ কিছু অর্থকড়ি খরচ করতে হয়েছিল। সংযোগ সড়কের শেষ মাথায় পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে যতটুকু জায়গা ছিল সেখানে প্রাতঃরাশ তৈরি শুরু করেছে ভ্রাম্যমাণ দোকান। পাশে বেশ কিছু চায়ের স্টল জায়গা দখল করে ফেলেছে। কাজেই ফুটপাত বলতে কিছুই রইল না। দৃশ্যটি আমাদের জন্য মোটেও নতুন নয়, তবে ঢাকার ফুটপাতে অন্য উপদ্রব অনেক কম। এ দৃশ্য কলকাতায় শুধু এখানেই দেখেছি তেমন নয়, এমনকি কলকাতার বিখ্যাত জনপথ চৌরঙ্গিতে দেখেছি একই রকম দৃশ্য। সকালে ফুটপাতে সাবধানে হাঁটতে হয় আর নাক ঢেকে রাখতে হয় প্রস্রাবের ঝাঁঝালো দুর্গন্ধ থেকে ত্রাণ পেতে। এমনটা আমি এককালের ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী শহর কলকাতায় আশা করিনি। কলকাতা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় আর ব্রিটিশ রাজধানী লন্ডনের আদলে গড়ে উঠেছিল। কলকাতা এক সময় হয়ে উঠেছিল বাঙালিদের সাহিত্য-সংস্কৃতির কেন্দ্র। বাংলার রেনেসাঁ এ শহর থেকেই শুরু হয়েছিল তৎকালীন ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায়। সে আলোচনায় পরে আসব।

আমি যে সংযোগ রাস্তাটির কথা এতক্ষণ বললাম তার নাম বিখ্যাত উডস্ট্রিট। উডস্ট্রিট আর পার্কস্ট্রিটের সংযোগস্থলেই গোপীনাথ শাহ উদ্যান, যার বিবরণ কামরুল আমাকে দিয়েছিল। আমি উডস্ট্রিট আর পার্কস্ট্রিটের সংযোগস্থলে এসে পার্কটির হদিস পেলাম। কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হল ট্রাফিক লাইটের অপেক্ষায়।

পার্কস্ট্রিট কলকাতার অন্যতম খ্যাত রাস্তা। দু'পাশে বহু নামিদামি বিপণী বিতান। বিমান সংস্থার অফিসসহ কিছু অফিস, ব্যাংক, বীমা অফিস আর রেস্তোরাঁর পসরা রয়েছে রাস্তার দু'পাশে। দু'পাশে চওড়া ফুটপাত। রাস্তাটি পরিষ্কার বটে। পার্কস্ট্রিট কলকাতা শহর পত্তনের সময়ের সড়ক। এর নাম ছিল ওই সময় বেরিয়াল গ্রাউন্ড স্ট্রিট। রাস্তাটি সে সময় নিয়ে যেত খ্রিস্টান কবরস্থানের দিকে। পরে স্যার এলিজা ইমপে-এর নামে কোণার পার্কটা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু কলকাতা শহর সম্প্রসারণের সময়ে নাম পরিবর্তিত হয় পার্কস্ট্রিটে। হালে পার্কস্ট্রিটের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে মাদার টেরেসা সরণি। এখানে রয়েছে ভারতের অন্যতম ক্রিকেট টিমের বিখ্যাত অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীর রেস্তোরাঁ সৌরভস্।

আমি স্যার এলিজা ইমপের কথা বলেছি। এলিজা ইমপে ছিলেন তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারক (১৭৭৩-১৭৮৯)। ইমপে ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস-এর কুকর্মের দোসর।[১] ওয়ারেন হেস্টিংস-এর প্ররোচনায় তারই এক সময়ের মুন্সী, পরে মহারাজা উপাধিধারী, মহারাজা নন্দকুমারকে কোম্পানির বিরুদ্ধাচরণ বিশেষ করে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর উৎকোচ গ্রহণ থেকে অন্যান্য অপকর্মের গোমড় ফাঁক করবার কারণে মনগড়া অভিযোগের প্রেক্ষিতে

১। The Telegraph, Calcutta, India, December 14, 2004.

www.pathagar.com

তাকে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল। ইমপে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন।

এই বিচার ছিল বৃটিশ ইতিহাসের এক জঘন্যতম প্রহসনের বিচার। যেমনটা আমি বলেছিলাম যে, প্রথমে পার্কস্ট্রিট বা বর্তমানে মাদার তেরেসা সরণির আদি নাম ছিল বেরিয়াল গ্রাউন্ড রোড। এ সড়কে দক্ষিণ দিকে ছিল সাউথ সেমিটারি বা ইউরোপীয়ান সেমিটারি। এখনও কিছু অংশ দাঁড়িয়ে রয়েছে কালের সাক্ষী হয়ে। ভগ্নপ্রায় প্রবেশ পথের শ্বেতপাথরের গায়ে লেখা রয়েছে "উদ্বোধন ১৭৬৯ এবং বন্ধ করা হয় ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে।' তবে ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের পরেও এখানে অনেককে কবরস্থ করা হয়েছিল। এখানে রয়েছে চার্লস হিন্দু স্টুয়ার্ট। হিন্দু স্টুয়ার্ট খ্রিস্টান হলেও হিন্দু ধর্মের বহু রীতিনীতি মেনে চলতেন। তিনি কালিঘাটে নিয়মিত পূজা দিতেন আর হিন্দু রীতিমতে পবিত্র গঙ্গানদীতে 'স্নান' করতেন। আর রয়েছে রোজ এলমারের সমাধি। রোজ এলমার ছিলেন তৎকালীন কলকাতার বিচারকের অবিবাহিত শ্যালিকা। যারা ঔপন্যাসিক প্রমথনাথ বিশীর 'কেরী সাহেবের মুন্সী' নামক বাংলা ভাষার অনবদ্য উপন্যাসটি পড়েছেন তাঁর এ দু'চরিত্রের সাথে নিশ্চয়ই পরিচিত। এই সেমিটারি বা গোরস্থানের উপর ভিত্তি করে সত্যজিৎ রায়ের পুত্র সন্দিপ রায় তৈরি করেন বাংলা ছায়াছবি 'গোরস্থানে সাবধান।'

ইতিমধ্যেই দু'বার সবুজ সংকেত জ্বলে উঠেছিল। খেয়াল করিনি। বোধহয় কলকাতার গোড়া পত্তনের পরপরই কিভাবে ইংরেজ সমাজ গড়ে উঠেছিল আর ভাবছিলাম কিভাবে তার সাথে যুক্ত হয়েছিল ওই সমাজের উপর তলায় উঠতে মরিয়া বাঙালি সমাজ। বিশেষ করে হিন্দু সমাজ। মুসলমানরা তখন ক্ষমতাচ্যুত দিশেহারা। দিশেহারা বাংলার নবাবরা আর তাদের নবাবী সংকুচিত হয়ে বেহাত হচ্ছিল। দিল্লীতে মোগলদের শেষের দিকের বাতি ছিল নিভু নিভু নিষ্প্রভ। আমি এতক্ষণ এতকিছু ভাবছিলাম বলে সবুজ বাতি লক্ষ্য করিনি। তৃতীয় দফায় সবুজ বাতির সদ্ব্যবহার করে রাস্তা পার হয়ে ছোট পার্কটিতে প্রবেশ করলাম। এক সময় এ পার্কটি ছিল বিশাল পার্ক আর পাশে ছিল জঙ্গল। প্রচুর হরিণের সমারোহ ছিল বলে ডিয়ার পার্ক নামেও এটি পরিচিত ছিল। এখন এটি একটি মাঝারি ধরনের সড়কদ্বীপ বললেও ভুল হবে না।

পার্কে ঢুকে দেখলাম চারপাশে হাঁটবার জন্য ফুটপাত করা রয়েছে। সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য হয়ত চারশত মিটার হবে। মাঝে গাছ-গাছড়ার বাগান। সবুজ ঘাস বিবর্ণ হয়ে আছে এ ডিসেম্বরে। রক্ষণাবেক্ষণ তেমন ভাল হয় বলে মনে হল না। সবুজ অংশে কয়েকটি বেঞ্চ যার উপরে বেশ কয়েকজন সিনিয়র সিটিজেন বসা। মাঝখানে জনা কয়েক নর-নারী ইয়োগা করছেন। বেশ কিছু মহিলা-পুরুষ হাঁটছেন। তবে তাদের কারও বয়স পঞ্চাশের নিচে নয়। আমি হাঁটতে শুরু করবার মাঝামাঝি পথে কামরুলকে পেলাম।

www.pathagar.com

কামরুল বলল যে, তার হাঁটা মাঝপথে আর আধাঘণ্টা হেঁটে ক্ষান্ত দেবে। আমিও বললাম যে, আজ আধাঘণ্টাই হাঁটব। তবে এ রাস্তা ধরে উত্তরদিকে গেলে ময়দান বা এককালের গড়ের মাঠের একাংশে যাওয়া যেত নয় কি। কামরুল আমার প্রস্তাবে তেমন সাড়া দিল না। অগত্যা ওই ছোট পরিসরেই হাঁটা শেষ করে ফিরতি পথে রওয়ানা দিলাম। নাস্তা সেরে সাড়ে ৯টার মধ্যে আমাকে বিমানবন্দরে পৌঁছতে হবে। সেখানে পৌঁছে ফিরবার সময় রমেশের ট্যাক্সিতেই আসব অবশ্য যদি রমেশকে পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন যে, সকালে তিনি বিমান বন্দরেই থাকবেন। ম্যাডাম পৌঁছলে তাকে মোবাইলে যোগাযোগ করলে তিনি আমাদেরকে হোটেলে নিয়ে আসবেন আর আমাকে গুনতে হবে দুইশ' পঞ্চাশ রুপি। সে রকমই সাব্যস্ত হয়েছিল রমেশ মুঙ্গেরের সাথে।

আমরা পার্কস্ট্রিট ছেড়ে পুনরায় উডস্ট্রিট ধরে হোটেলের দিকে ফেরবার পথে অপর পারের ফুটপাতে উঠলাম। কারণ, এতক্ষণে ওপারে ফুটপাতের উপর ভাসমান প্রাতঃরাশের দোকানের পসরার কলেবর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। উডস্ট্রিট এক সময় ছিল মধ্যবিত্ত ইংরেজদের বাসস্থান। তারও আগে তৎকালীন বাদামতলী, পরে গোরস্থান কা রাস্তা বা বেরিয়াল গ্রাউন্ড, পরে পার্কস্ট্রিট আর এখন মাদার তেরেসা সরণি, এলাকা ছিল গহীন জঙ্গল আর ডাকাতদের আড্ডাখানা। আরও পরে বেরিয়াল গ্রাউন্ড বা সেমিটারির উপরে গড়ে উঠে সেন্ট জোনস চার্চ। পরে নতুন সেমিটারি তৈরি হয় মারহাট্টা খাদ ভরাট করে যার একটি কথা আমি বলেছি। বর্তমান উডস্ট্রিটের চেহারার সাথে অতীতের কল্পিত অথবা স্কেচের ফুটিয়ে তোলা চেহারার সাথে কোথাও মিল নেই। এখন নোংরা ফুটপাত আর বিবর্ণ জরাজীর্ণ বাড়িগুলো দেখলে মনে হয় মৃতনগরীর একাংশ।

হাঁটতে হাঁটতে হোটেলের সামনে আসতেই ট্রাম আসতে দেখলাম। একেবারে খালি। এত সাত সকালে যাত্রী না থাকারই কথা। কামরুলকে বললাম, চল ট্রামে চড়ি। অন্তত আর কিছু না হোক অভিজ্ঞতা হবে। হাতে প্রচুর সময় আছে। এ ট্রামেই আমরা এখানে ফিরতি পথে নেমে যাব। ট্রামের গন্তব্য এসপ্লানেড পর্যন্ত। জায়গাটি আমাদের হোটেল হতে বেশি দূরেও নয়। কামরুল দ্বিগুণ উৎসাহে রাজি হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই ট্রাম আসলে হোটেলের সামনে হতেই আমরা দু'জনে ট্রামের দ্বিতীয় বগিতে উঠলাম। চেহারা দেখেই মনে হল এ সব বগি ন্যূনতম পক্ষে একশত বছর পুরাতনত হবেই। হয়তবা তারও বেশি। যাত্রীদের বসবার জন্য কাঠের বেঞ্চ। এ কোণায় গিয়ে দু'জনেই ঠাঁই নিলাম। সামনের বগিতে চালক। টং টং ঘণ্টা বাজিয়ে ছাড়লেন গন্তব্যের দিকে। তখন কিছুটা শীত শীত অনুভূত হচ্ছিল। আমাদের সামনেই টিকেট কালেক্টর বা কন্ডাক্টর সাহেব বসা। পরনে শার্ট-প্যান্ট, গায়ে সুয়েটার জড়ানো। গলায় মাফলার। চোখে পুরু গ্লাসের চশমা। মাথায় মাংকি ক্যাপ গলা পর্যন্ত নামানো। সামনের মুখমণ্ডলটুকু খোলা। কলকাতায় তেমন শীত নেই, তবে এত সকালে ট্রামের

www.pathagar.com

খোলা জানালা আর দরজা দিয়ে চলাকালীন সময়ে হু হু করে বাতাস আসলে কিছুটা কনকনে ভাব অনুভূত হয়। ট্রামের ঘড়ঘড়ানি শব্দ আর চালককে সতর্ক সংকেতের আওয়াজে এক প্রকার রোমাঞ্চকর পরিবেশ সৃষ্টি করছিল।

আমরা কন্ডাক্টর সাহেবকে টিকিটের দাম জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানালেন, 'চার রূপি', তারমানে যেতে আসতে 'ষোল রূপী'। কামরুল বিশ রুপির নোট বের করে ফিরতি টিকিটও এক সাথে নিয়ে নিল। কন্ডাক্টর জানালেন, এই সাত সকালে তার কাছে চার রুপি ফেরৎ দেবার মত খুচরা নেই। কামরুল রুপিগুলো তাকে রেখে দিতে বললে তিনি কিছুক্ষণ ইতস্তত করলেন। পরে আমাদের অনুরোধে রেখে দিলেন। ভাড়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে কন্ডাক্টর জানালেন যে, এ ভাড়া গড়পড়তা। ট্রামে একটাই ভাড়া তা যেখানেই একজন যাত্রী যাক না কেন। এ বক্তব্য শুনে বললাম, 'এত সস্তা?' কন্ডাক্টর সাহেব বললেন, 'সাহেব এটাত নেহাতই গরিবের বাহন। তাই করপোরেশন ট্রামের ভাড়া সহজে বাড়ায় না। আরও বললেন যে, অনেক যাত্রী এতটুকু ভাড়াও দিতে পারে না। তাদের কাছ থেকে ভাড়া নেওয়াও হয় না।'

'এটা কি করপোরেশনের নীতি?'

হ্যাঁ সাহেব, নীতি না হলেও এ বিষয় নিয়ে করপোরেশনও কোন বাড়াবাড়ি করে না।

'এভাবে অসাধু কন্ডাক্টর নিজের পকেটে পয়সা রাখতে পারে না কি?'

আমার কথা শুনে তিনি বললেন,' হ্যাঁ পারে। কিন্তু এ রকম অভিযোগ খুব কম। অহরহ পরিদর্শক ট্রামে উঠে পরিদর্শন করেন। এ রকম কিছু হলে তার রিপোর্টে চাকরিত যাবেই সাথে পেনশনও খোয়াবে।

'আপনার এ কোম্পানিতে কত বছর চাকরি হল ?'

আমার প্রশ্নের জবাবে বললেন, তা হবে তিরিশ বছর। আর দু'বছর পরেই আমি পেনশনে যাব।

'ট্রামগুলোতো বেশ পুরাতন ?'

'হ্যাঁ সাহেব, তা ধরুন বেশির ভাগই সত্তর বছর বা তারও আগের। তবে এখন অনেক আধুনিক ট্রাম আসছে। সেগুলো বেশ উন্নত মানের।' বললেন ট্রাম কন্ডাক্টর।

কন্ডাক্টরের সাথে আলাপ করতে করতে হাতের ডানে দেখা পেলাম নীল রংয়ের বেশ বড়োসড়ো আর পুরাতন এক মসজিদ। কন্ডাক্টর সাহেব জানালেন, এরই নাম টিপু সুলতান মসজিদ। নির্মাণ করেছিলেন প্রিন্স গোলাম মোহাম্মদ। মসজিদ পার হয়ে অল্প কিছুদূর আসতেই আমরা চলে আসলাম এসপ্লানেডে। এখান থেকে ট্রামকে ঘুরানো হবে ফিরতি পথের জন্যে। ফিরতি পথে রওয়ানা হবার প্রস্তুতি হিসেবে কয়েক মিনিট দাঁড়ানো। যাত্রী পাওয়া গেল না। ফিরতি পথের শেষ স্টপেজ ধর্মতলা। মিনিট দশেক

www.pathagar.com

পর আমরা নেমে যাব হোটেলের সামনে, ততক্ষণে হয়ত যাত্রী সমাগম হবে।

আমরা এসপ্লানেড পিছনে ফেলে আসছি। এক সময় এখানে ছিল বিশাল গড় (বর্তমানে ময়দান)। এসপ্লানেড গড়ের উত্তর প্রান্তর। এখান থেকে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে খিদিরপুর পর্যন্ত কলকাতার প্রথম বিদ্যুৎচালিত ট্রাম যাত্রা শুরু করছিল। বর্তমানে এখানে পাতাল রেলের স্টপেজ রয়েছে। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সময় এ গড় পরিষ্কার করে ইংরেজ বাসিন্দাদের জন্য প্রাতঃ এবং বৈকালিক ভ্রমণের সুবিধার্থে সবুজ পার্ক নির্মাণের জন্যে এরই আশেপাশে গড়ে উঠেছিল বহু ইউরোপীয় আবাসিক বাড়ি-ঘর।

প্রথম দিককার কলকাতার প্রধান পাঁচটি সড়কেরই কেন্দ্রস্থল ছিল এসপ্লানেড। আজও তেমনই রয়েছে। তবে সে জৌলুস আর নেই। কাছেই গঙ্গা বা বহুল প্রচলিত হুগলী নদী। অতি নিকটে হুগলীর চন্দপাল ঘাট। আর তারই সন্নিকটে কলকাতার বৃহত্তম ট্রাম ডিপো।

আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই হোটেলে পৌঁছলাম। আমাকে যেতে হবে বিমানবন্দর আর কামরুল তার সহধর্মিণীকে নিয়ে শপিং-এ বের হবে। সন্ধ্যায় আমাদের সাথে দেখা হবে মুকুলের আর তখন আমরা সবাই কোথাও একত্র হব রাতের খাবার খেতে। আমি আমার রুমে গিয়ে গোসল সেরে তৈরি হয়ে হোটেলের ছোট ডাইনিং রুমে প্রাতঃরাশ সেরে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম।

হোটেলের সম্মুখ থেকেই ট্যাক্সি পেলাম। ট্যাক্সিতে চড়ে রমেশকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলাম তাঁর অবস্থান। তিনি জানালেন যে, তিনি আন্তর্জাতিক টার্মিনালে রয়েছেন এবং আমার অপেক্ষায় থাকবেন। আমি পরে তার সাথে যোগাযোগ করলে তিনি আমাদেরকে হোটেলে পৌঁছে দেবেন। ইতিপূর্বে তাঁর সাথে ডিসেম্বর ২২, ২০১০ হতে দিনভিত্তিক চুক্তি হয়েছিল। সকাল নয়টা হতে রাত নয়টা পর্যন্ত কলকাতা শহর এবং শহরপ্রান্ত হতে তিরিশ কিলোমিটারের মধ্যে যে কোন জায়গায় যাবে এবং দিনপ্রতি আটশ' রুপি নেবে। আমরা রাজি হয়েছিলাম। এমনকি দুই হাজার রুপিতে তিনি আমাদেরকে মুর্শিদাবাদ যাওয়া ফেরত আসা এবং একরাত ট্যাক্সি রাখার চুক্তিতেও রাজি হয়েছিল। মোটামুটি কলকাতায় আমরা যতদিন ছিলাম রমেশই আমাদের সাথে ছিল। তবে আমাদের সাথে তার এ চুক্তি শুরু হয়েছিল আমার এবং কামরুলের সহধর্মিণীদ্বয়ের কলকাতা ত্যাগের পর হতে।

ট্যাক্সি আমাকে নিয়ে সল্টলেক সিটির প্রশস্ত রাস্তা ধরে দমাদম পার্ক হয়ে যশোহর রোডে উঠে বিমানবন্দরে পৌঁছতে প্রায় চল্লিশ মিনিট লেগেছিল। ট্যাক্সি ড্রাইভার জানালেন যে, এ পথে আসাতে তাড়াতাড়ি আসতে পেরেছি। শহরের মধ্য দিয়ে আসলে ট্রাফিকের কারণে অনেক সময় লাগত। কলকাতার এ ধারটায় নতুন উপশহর সল্টলেক

www.pathagar.com

সিটি নামে গড়ে উঠেছে। বেশ উঁচু অত্যাধুনিক দালান কোঠায় ভর্তি স্বল্প সময়ে গড়ে উঠছে বাণিজ্যিক ভবন এবং বাসস্থানগুলো। খোলামেলা আদি কলকাতার তুলনায় যথেষ্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। রাস্তাগুলো বেশ চওড়া। যশোহর রোডটি কলকাতা যশোহরের সাথে সংযোগ সড়ক। এ রাস্তাটি ঐতিহাসিক এবং ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এক সময় কলকাতার সাথে যশোহরের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। যদিও আজও রয়েছে, তবে এখন সে যোগাযোগ দু'টি আলাদা দেশের সাথে। কলকাতা এখন শুধুমাত্র ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজধানী ছাড়া আর কিছুই নয়। কলকাতার গুরুত্ব ক্রমেই লোপ পায় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে যখন ব্রিটিশরাজ দিল্লীর শাহজাহানাবাদের সন্নিকটে রাজধানী গড়ার মানসে তৈরি করে নতুন স্থাপনা, লুটিয়েন্স দিল্লী বা নতুন দিল্লী'।[২] তবে বাঙালির, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে, সাহিত্য সংস্কৃতি, আঁতেলদের সূতিকাগৃহ ছিল কলকাতা। ক্রমেই সে স্থান হারায়, প্রথমে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভক্তির পর এবং আরও পরে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর হতে। প্রাপ্ত ঐতিহাসিক দলিল সাক্ষ্য দেয় যে, কলকাতা বয়সে ঢাকার অনুজ। ঢাকা গড়ে উঠে মোগলদের সর্বপূর্বের দুর্গ শহর হিসেবে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়। তখন সবেমাত্র ব্রিটিশদের প্রথম দূত স্যার টমাস রো ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে আগ্রায় জাহাঙ্গীরের দরবারে আবির্ভূত হন। তিনি জাহাঙ্গীরের দরবারে ছিলেন ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ওই সময়েই ব্রিটিশ বাণিজ্যিক বহর হিন্দুস্থানে বাণিজ্যের প্রসার এবং ভাগ্য অন্বেষায় আসতে থাকেন। তখন ব্রিটেনের রাজা ছিলেন জেমস-১ (James-1)।

কলকাতা অঞ্চল কত পুরাতন জনপদ তার সঠিক তথ্য এখনও রয়ে গেছে অনির্ধারিত। তবে মনে করা হয় এ জনপদ নিম্ন অববাহিকার প্রধান কেন্দ্র হিসেবে যশোহর ও বর্তমান খুলনার সাথে যুক্ত ছিল। হিন্দু পৌরাণিক জনপদ হিসেবেও বিশিষ্ট ঐতিহাসিক সি আর উইলসন (CR Wilson) উল্লেখ করেছেন। সি আর উইলসন পৌরাণিক কাহিনীর সূত্র ধরে উল্লেখ করেন যে, হিন্দু দেবতা দখ্‌সা পুত্র পাবার আশায় এক যজ্ঞের আয়োজন করেন। ওই যজ্ঞে তিনি দেবতা শিবকে আমন্ত্রণ করতে ভুলে যান। শিব-এর স্ত্রী সতী ছিলেন দখ্‌সার কন্যা। কন্যা তাঁর স্বামীকে আমন্ত্রণ না জানানোকে স্বামীর অবমাননা বলে পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কেন তার স্বামীকে এ যজ্ঞে অন্তর্ভুক্ত করা হল না! উত্তরে পিতা দখ্‌সা জানালেন যে, তাঁর স্বামী যেহেতু মানুষের মাথার খুলির মালা পরিধান করে থাকেন কাজেই তাঁকে এ ধরনের আমন্ত্রণ করা শ্রেয় মনে করেন নাই। পিতার এহেন আচরণে এবং স্বামীর এ অবমাননা সহ্য না করতে পেরে সতী আত্মঘাতী হন। শিব স্ত্রীর লাশ তাঁর ত্রিশূলের আগায় করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ক্রোধে ছুটে বেড়ান। শিবের তাণ্ডবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংসের প্রান্তে পৌছে।

২। লেখকের 'কত জনপদ কত ইতিহাস' দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

অবশেষে শিব তার ধারালো চাকা ছুড়ে মারলে তার স্ত্রীর লাশ খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। যে সমস্ত জায়গায় দেহের অংশ বিশেষ ছড়িয়ে পড়ে ওই সমস্ত জায়গাই পরবর্তীতে তীর্থস্থানে পরিণত হয়। এ সব তীর্থস্থানের মধ্যে কিছু কিছু জায়গা অতি পরিচিত, কিছু রয়ে গেছে অপরিচিত জায়গা হিসেবে। মিঃ উইলসনের মতে ক্যালকাটা বা কলকাতা বা পুরাতন কালীঘাট যা আজও গঙ্গার ধারে স্থিত রয়েছে, সেখানে সতী বা পরবর্তীতে কালীর ডান পায়ের অংশ পড়েছিল এবং কালীঘাট থেকেই কলকাতার নাম চলে আসছে বলে তিনি মনে করেন।[৩]

আমি কালীঘাটের কালীমন্দিরের নিকট পর্যন্ত গিয়েছিলাম তবে ভেতরে যাইনি। ওই স্থানে সব সময়ই ভক্তদের ভিড় থাকে। অনেক দূর হতেই রাস্তায় গাড়ির চলাচল বন্ধ করা রয়েছে। প্রচুর ভক্তকে দেবী কালীর মন্দিরে পায়ে পায়ে হেঁটে যেতে দেখেছি।

কলকাতা জনপদের ইতিহাসে আরও তথ্য রয়েছে যার কারণে মনে করা হয় এখানে সম্পূর্ণ নতুন শহর গড়ে উঠবার বহুপূর্বে এটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে শহরের গোড়াপত্তনের সময়ে গুপ্ত শাসন আমলের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। চিৎপুর আলীপুর অঞ্চলে শিখ ধর্মের প্রধান গুরু গুরুনানক ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে এখানে ধর্ম প্রচারে আসেন। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে গুরু তেগ বাহাদুর জায়গাটি ক্রয় করে গড়ে তোলেন শিখ সঙ্গত গুরুদুয়ারা।[৪]

আকবরের সময়ের ঐতিহাসিক আবুল ফজল আইন-ই-আকবরিতে সাতগাঁওয়ের কথা উল্লেখ করেছেন যা বর্তমানে কলকাতার অন্তর্ভুক্ত। আরও পরে সুবা বাংলা আকবরের রাজত্বের অংশ হলে রাজা টোডরমল খাজনা আদায়ের জন্য ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে মনোহর ঘোষকে এ অঞ্চলের গোমস্তার দায়িত্ব দেন। মনোহর ঘোষের বংশধর হরি ঘোষ, যার নামে উত্তর কলকাতায় সড়ক রয়েছে ওই অঞ্চলেই বাস করতেন।

ক্রমেই এসব অঞ্চলেই বিশেষ করে হুগলী নদীর পূর্বপাড়ে কালীকাটা, সুতানুটি আর গোবিন্দপুর, কালীঘাটসহ, কলকাতা নগরী গড়ে উঠে। একসময়ে ওলন্দাজ (Dutch)-রাও এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল। পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি স্থানীয় হিন্দু ব্যবসায়ীদের নিকট হতে ভূমি ক্রয় করে পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম, বর্তমানে জেনারেল পোস্ট অফিস প্রাঙ্গণ গড়ে তোলে।

ক্রমেই উত্তর কলকাতার সুতানুটি গ্রাম ঘিরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তুলার ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে উঠে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র সুতানুটি গড়ে তুললেও ওই সময়ের সুবা বাংলার ঢাকা, বালশোর, কাশিমবাজার এবং পাটনায় কারখানা স্থাপন করে। পরে ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা নগরীর গোড়াপত্তনকারী হিসাবে পরিচিত জব

৩। Wilson CR, The Early Annals of English in Bengal, VOll- PP 128-129

৪। রাজা বিনয় কৃষ্ণ বাহাদুর, কলিকাতার ইতিহাস, সুবল চন্দ্র মিত্র সম্পাদিত, কলকাতা ১৯৮২, পৃষ্ঠা ১১

www.pathagar.com

চার্নক (Job Charnock) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান এজেন্ট, নিয়োগ হয়ে শহর পত্তনের অবৈধ প্রয়াস নিলে মোগলদের আক্রমণের মুখে স্থান ত্যাগ করে হিজলীতে পলায়ন করেন। তিন মাস হিজলীর অববাহিকায় অবস্থানকালে জব চার্নকের বাহিনীর সিহাংশ্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরে মোগল ফৌজদার শায়েস্তা খানের বদান্যতায় জব চার্নক পুনরায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য কেন্দ্র সুতানুটিতে নিয়ে আসেন। ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে বোর্ডের ডাইরেক্টরদের নির্দেশে কোম্পানির প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র মাদ্রাজে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় পনের বছর পর নবাব ইব্রাহীম খান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলায় আসবার অনুমতি দেন।

অবশেষে পুনরায় তৃতীয়বারের মত জব চার্নক আগস্ট ২৪,১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে সুতানুটিতে ফিরে আসেন এবং তৈরি করা শুরু করে ব্রিটিশ শহরগুলোর আদলে পূর্বভারতের সর্ববৃহৎ ব্রিটিশ শহর কলকাতা।[৫]

যশোহর রোড পার হয়ে বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টারমিনালে পৌছে নেমে গেলাম। ডিজিটাল বোর্ডে দেখলাম দিল্লী-কলকাতা জেট এয়ারওয়েজের বিমান ঠিক সময়েই অবতরণ করছে। আর দশ মিনিটের মধ্যেই বিমান অবতরণ করবে। মোবাইলে রমেশের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি জানালেন যে, তিনি আন্তর্জাতিক অংশে আছেন। তাঁকে সময়মত ডাকলে তিনি এগিয়ে এসে আমাদেরকে হোটেলে নিয়ে যাবেন। যেহেতু তার সাথে ডিসেম্বর ২২, ২০১০ থেকে কয়েকদিনের চুক্তি হয়েছিল সে ধারাবাহিকতায় তিনি জানালেন ফেরত যাবার সময়ে তিনি আমাকে উত্তর কলকাতার শোভাবাজার দিয়ে নিয়ে যাবেন। আমি তাকে বলেছিলাম যে, আমাকে অন্তত আজকের দিনে মহারাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট দেখাতে এবং রাজবাড়ির সামনে দিয়ে নিয়ে যেতে। রাজবাড়িটি যেহেতু মহারাজার বংশধরদের দখলে কাজেই ভেতরে যাওয়া যাবে না। তবে প্রধান ফটক পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারব। আমি তাতেই রাজি হয়েছিলাম। সময় পেলে খুঁজে বের করব আরেক ঐতিহাসিক চরিত্র মহারাজা নন্দ কুমারের বাড়ি। তবে মহারাজা নন্দকুমারের বাড়িটি এখন আর বিদ্যমান নেই। এরা এবং এদের মত অনেকেই কোম্পানির বড় সাহেবদের মুন্সী হতে তৎকালীন বাঙালি সমাজের শিরোমণি হয়ে উঠেন যদিও পরে মহারাজ নন্দ কুমারকে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল। সামান্য মুন্সী হতে ওই পর্যায়ে উঠবার পেছনে ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাপতি তথা প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতা আর বাংলার শাসক নবাবদের সাথে বিশ্বাসঘাতকের কাতারে দাঁড়াবার পুরস্কারস্বরূপ। অনেকাংশে মুসলমান শাসকদের হাত হতে হিন্দু রাজ্য পুনরুদ্ধারের তত্ত্বও কাজ করেছে।

৫। Dr. Dhru Bajoti Banerjee, European Calcutta, Images and Recolletions of a Bygone Era, UBS Publishers Distributors Prvt Ltd. Kaj p 4.

www.pathagar.com

দিল্লী হতে বিমান অবতরণের প্রায় বিশ মিনিট পর আমার সহধর্মিণী ডা. রেহানা খানম টার্মিনাল থেকে বের হলেন। আমি রমেশকে এগিয়ে আসতে বলে কিছু দূর হেঁটে গিয়ে রমেশের ট্যাক্সিতে উঠে হোটেলের দিকে রওয়ানা হলাম। এ সময়টা কলকাতার রাস্তায় গাড়ির ভিড় শুরু হয় তাই রমেশ পুনরায় সল্টলেক সিটি দিয়ে নিয়ে চললেন। রাস্তায় যেতে যেতে রমেশ বললেন যে, যখনই প্রয়োজন হবে রমেশকে জানালে তিনি হাজির হবেন। আমি জানালাম আজ হয়ত প্রয়োজন হবে না তবে কাল হয়ত তাকে প্রয়োজন হতে পারে।

হোটেলের রুমে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে দুপুরের খাবার খেতে বের হলাম। আমার সহধর্মিণীর একদিনের কলকাতা সফর শুধুমাত্র ছেলে এবং বৌমার জন্য কিছু টুকিটাকি বাজার করা। বাজার করবার শখ তার তেমন নেই। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কখনও তাঁকে কিছু কিনতে দেখিনি। দোকানে দোকানে ঘুরবার অভ্যাসও রপ্ত করতে পারেনি। কোন দোকান পছন্দ হলে সেখানে একবার ঢুকলে ওখান থেকেই যা খরিদ করা প্রয়োজন তাই করে থাকে। আর আমার বাজার করবার ধরন একটু ভিন্ন। আমি কয়েকবার একই ধরনের জিনিস বিভিন্ন দোকানে দেখবার পর মনস্থির করতে পারলে খরিদ করে ফেলি অন্যথায় নয়। আমার সব সময় মনে হয় আমরা বোধহয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস কিনে থাকি যা ভারতীয়দের মধ্যে দেখা যায় না। কলকাতাতেও বেশ কয়েকটি আধুনিক শপিং মল গড়ে উঠেছে, এসবগুলোতে ভিড় থাকলেও খুব কম লোককেই অযথা কেনাকাটি করতে দেখেছি।

কলকাতায় বাজার করবার কথায় মনে পড়ল দু'মাস পূর্বে, ঈদের পরে এবং দুর্গা পূজার কয়েকদিন আগে, আমি 'তারা টেলিভিশনের' একটি 'টক শোতে' যোগ দিতে কলকাতায় এসেছিলাম। হাতে অল্প সময় ছিল। তারা টেলিভিশনের চালককে নিয়ে নিউমার্কেটে কিছু শুকনো বাদাম আর ফল কিনতে এসেছিলাম। সেটা ছিল প্রায় পনের বছর পরে কলকাতায় আসা। গাড়ি নিয়ে গ্র্যান্ড হোটেলের সামনে দিয়ে ঢুকতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগেছিল। রাস্তায় ভীষণ জ্যাম। ড্রাইভার জানালেন, পূজোর বাজার তাই ভিড়। ফুটপাতে হাজারো হকারের জমজমাট বেচাকেনা। কি পাওয়া যায় না সেখানে। মানুষের ঢল ফুটপাতের দোকানগুলোতে। হগ মার্কেট বা নিউমার্কেটের চারিদিকে শত শত ছোট ছোট দোকান গহনা হতে সবই পাওয়া যাচ্ছে। ওইসব দোকানে উপচে পড়া ভিড়। ক্রেতার যেন অভাব নেই। ভিড় ঠেলে ড্রাইভার আমাকে নামিয়ে বলেছিলেন যে তিনি এখানে কোথাও পার্ক করতে পারবেন না। আমি অল্প সময়ের মধ্যে সদাই শেষ করে মোবাইলে আমার অবস্থান জানালে তিনি চলে আসবেন। আমি তার কথা মতই কাজ করেছিলাম। আশ্চর্য হলাম নিউমার্কেটের, হগ মার্কেট বা, আদি মার্কেটে ঢুকে। ভেতর খালি তেমন ক্রেতা নেই যেমনটা রাস্তায় এবং হকার মার্কেট দেখে ভেবেছিলাম।

www.pathagar.com

ভেতরে গিয়ে একটা জমকালো শাড়ির দোকানে ড্রাই ফ্রুট দোকানের অবস্থান জানতে গিয়ে কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে শাড়ির দোকানের কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাইরে এত ভিড় অথচ মার্কেটের ভেতরে এমন ফাঁকা কেন?'

কর্মচারী আমার কথা শুনে জিজ্ঞেস করলেন, 'দাদা কি ওপার থেকে এসেছেন?'

'হ্যাঁ' আমার ছোট জবাব।

'ও তাই, দাদা আমি ঠিক বুঝেছিলাম। দাদা আমাদের ব্যবসা হয় ঈদের আগে রোজার সময়। ওপার থেকে দাদারা আর দিদিমনিরা আসেন। তাঁদের মত ক্রেতাই হয় না। যেমন দাম দিতে জানেন তেমনি কিনতেও পারেন।' দোকানি দম নিয়ে বললেন, 'যেমন দেখতে দিদিমনিরা তেমনি কেনেনও দামি জিনিস। ওনাদের পছন্দ আছে। বেচেও আনন্দ।'

আমি মুচকি হেসে বললাম, 'তাই বুঝি'।

'হ্যাঁ দাদা, আসতেন যদি সে সময়ে এখানে বসতে দিতে পারতুম না। অনেকের সাথে তো আমাদের বহু দিনের সম্পর্ক হয়ে গেছে।'

'আর এখন? এ পূজোয়?' জিজ্ঞাসা করলাম।

দোকানি বললেন, 'পূজোতে কলকাতার ক্রেতারা ফুটপাতে ভিড় করেন। ওইসব দোকানের জন্য তো আমাদের বেচাকেনা লাটে উঠেছে। দেখতে তো পাচ্ছেন। এখানে তো বসেই আছি। এখানে তো এখন আর পয়সাওয়ালারা আসে না। তারা যান বিভিন্ন শপিং মলে। এখানকার ক্রেতারা মধ্যবিত্ত। নিউমার্কেটের দোকানের চাইতেও সস্তা জিনিস পাচ্ছেন ফুটপাতে বা পাশের দোকানগুলোতে, তাই আপনি এখানে ভিড় পাচ্ছেন না।'

আমি ধন্যবাদ জানিয়ে তার নির্দেশিত লেন দিয়ে শুকনা ফল আর বাদামের দোকানের দিকে চলে গিয়েছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে চোখ জ্বালা করছিল আর চারদিক থেকে কানে আসছিল জেনারেটরের ঘড়ঘড় শব্দ। বেশির ভাগ সময়েই ভেতরের দোকানগুলোতে বিদ্যুৎ থাকে না। দিনের বেলাতেও বিদ্যুৎ না থাকলে হাঁটা চলাও সম্ভব নয়। সেদিনও ছিল না। সে সব অভিজ্ঞতা নিয়েই সেবার ফিরে গিয়েছিলাম।

আমরা দুপুরের খাবার খেতে হোটেল থেকে বের হয়ে রাস্তা পার হয়ে অপর পাশের ফুটপাত দিয়ে রয়েড রোডের সংযোগের দিকে যাচ্ছিলাম। কোণায় বেশ কয়েকটি ছোট রেস্তোরাঁ রয়েছে, সেখানে খেয়ে নিউমার্কেটে যাব সামান্য কেনাকাটার জন্য। এ ধারে মুসলমানদের বসবাসটাই বেশি। বেশির ভাগ রেস্তোরাঁগুলোও মুসলমানরাই চালিয়ে থাকে। এরিয়াটা নোংরা। তেমনি নোংরা ফুটপাত। ফুটপাতের ধারে পানির নল, আর উদাম দেহে চলছে গোসল। রাস্তায় ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি ছাড়াও চলে দু'ধরনের রিকশা। প্যাডেল রিকশার পাশাপাশি টানা রিকশা। প্যাডেল রিকশা

www.pathagar.com

যদি ঢাকার ঐতিহ্য হয় তবে টানা রিকশা কলকাতার পরিচিতি। কলকাতার টানা রিকশা দেখলে আমার ব্রিটিশ রাজের সময়ের কথা মনে হয়। মনে হয় যেন নেটিভদের অবমাননার জন্য এ ধরনের রিকশার চলন করেছিল। বহু পুরাতন তৈল চিত্রে দেখেছি মেম সাহেবকে অথবা সাহেবকে টানা রিকশা নিয়ে যাবার চিত্র। এক সময় হংকং এবং চীনেও প্রচলন ছিল এ ধরনের রিকশার। টানা রিক্সা বিষয়টিই সব সময় আমার কাছে অবমাননাকর মনে হয়েছে। আমি কখনও চড়িনি তবে এ যাত্রায় বিপাকে পড়ে চড়তে হয়েছিল। সে কথায় পরে আসব।

আমরা রেস্তোরাঁয় যৎসামান্য খেয়ে যুৎসই কোন বাহন না পেয়ে হেঁটেই নিউমার্কেটের দিকে রওয়ানা হলাম। রাস্তায় মার্কেটের দিক নির্ধারণ করতে বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করতে হয়েছিল। জায়গাটি দক্ষিণ কলকাতার অন্তর্ভুক্ত। কোন এক সময় এ অঞ্চলটি ছিল ব্রিটিশ সাহেবদের বাসস্থান বিশেষ করে কলকাতা শহরের পত্তনের পর হতে সম্পূর্ণ উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। নেটিভ প্রভাবশালীদের বাসস্থান হিসেবে গড়ে উঠেছিল শোভাবাজার অঞ্চল। আমরা হাঁটছিলাম কখনও শুধু ফুটপাতে কখন রাস্তার ধার দিয়ে। এখানেও চলছে খোঁড়াখুঁড়ি। বসছে নতুন পানির লাইন। ফুটপাতগুলো বহু আগেই ছোটখাটো দোকানের চৌহদ্দির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। বেশ কয়েকটি অলিগলি ঘুরে আমরা পৌঁছলাম মীর্জা গালিব রোডে। এ জায়গাটি আমার মিসেসের সামান্য পরিচিত। কারণ, বছরখানেক পূর্বে প্রথমবারের মত কলকাতায় এসে এখানে কয়েকদিন কোন এক হোটেলে ছিল। ওই যাত্রায় ছেলেরা এবং বৌমাও সাথে ছিল। আমার আসা হয়নি।

মীর্জা গালিব রোডের শেষ প্রান্তে এসে কয়েকটি অলিগলি পার হয়ে আমরা কলকাতা নিউমার্কেটের আশেপাশে ছোট ছোট দোকানগুলো পার হয়ে মূল মার্কেটের সামনের চত্বরে প্রবেশের ফটকের ধারে আসলাম। সামনের রাস্তাসহ চার ধারের রাস্তাতেই অসংখ্য হকার আর ছোট ছোট দোকান। কি নেই ওই সব দোকানে, সব ধরনের পণ্য পাওয়া যায়। সাথে রয়েছে অসংখ্য ফাস্ট আর স্ট্রিট ফুডের দোকান। ফুচকা, চটপটি, দই বড়া, ফালুদা, পানিপুরি, ফ্রুট চাট আর ভেলপুরির দোকান। এসব স্ট্রিট ফুডের দোকানগুলোতে ভিড় লেগেই রয়েছে। আমরা অতীতের হগ মার্কেট পরে ক্লক টাওয়ার মার্কেট বর্তমানে নিউমার্কেট বলে পরিচিত এক সময়ের কলকাতার তথা হিন্দুস্থানের একান্ত ইউরোপীয় মার্কেটের সামনে দাঁড়ানো। বর্তমানে সামনের পাকা চত্বরের নিচে রয়েছে কার পার্কিং। তবুও ও ধারের রাস্তার পাশেও পার্ক করা রয়েছে অজস্র গাড়ি। তবে সামনের রাস্তায় নেই কোন ধরনের যানবাহনের পার্কিং। বর্তমানে আদি মার্কেটের পেছনে সংযোজিত হয়েছে পাঁচ তলা আরেকটি উইং।

একসময় এ মার্কেট পরিচিত ছিল 'হগ সাহেবের বাজার' নামে। কারণ, এ

www.pathagar.com

মার্কেটটি জানুয়ারি ১, ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে উদ্বোধন করা হলেও এর নামকরণ করা হয় ব্রিটিশ ভারতের তৎকালীন রাজধানী কলকাতা কর্পোরেশনের সভাপতি স্যার স্টুয়ার্ট হগ (Sir Stuart Hogg) এর নামে। এর নামকরণ করা হয় ডিসেম্বর ২, ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে, এ মার্কেট তৈরিতে তাঁর অবদানের জন্য। আজও মূল মার্কেটের সামনে সন উল্লেখ করে লেখা রয়েছে 'হগ মার্কেট'– অধিকতর নিউমার্কেট নামেই পরিচিত।

প্রথমদিকে ব্রিটিশ রাজের গোরা সাহেবদের বাসস্থান সীমিত ছিল ওই সময়ের ডালহৌসি স্কয়ার (Dalhouse Square) বর্তমানের বিবিডি (BBD) পার্ক এরিয়াতে। তখন ইউরোপীয়দের জন্য বিপণী বিতান নির্ধারিত ছিল লাল বাজার অঞ্চলে। ক্রমেই রাজের ইউরোপীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বণিকের বসতি বাড়তে থাকে চৌরঙ্গি ও ধর্মতলা অঞ্চলে প্রয়োজন দেখা দেয় আরও আধুনিক বিপণী কেন্দ্রের। মার্কেট হতে হবে সম্পূর্ণ ইউরোপীয়দের জন্য যেখানে নেটিভদের প্রবেশাধিকার থাকবে না। এরই প্রেক্ষিতে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার কর্পোরেশন ব্রিটিশ নাগরিকদের কমিটি গঠন করলেন একটি অত্যাধুনিক বিপণী কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা তৈরি করবার জন্য। মার্কেটের জন্যে জমি কেনা হয়। এক হাজার রুপি পরিতোষের বিনিময়ে নক্সা তৈরি করেন ওই সময়কার বিখ্যাত স্থপতি আর বেইনিই (R. Beyney)। নির্মাণের দায়িত্ব দেয়া হয় ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানিকে। এটাই ছিল কলকাতা তথা উপমহাদেশের প্রথম মিউনিসিপ্যাল ব্রিটিশ মার্কেট। ওই সময়ে এখানে বিশ্বখ্যাত বিপণী বিতান যেমন র‍্যাংকিন এন্ড কোম্পানি কাপড়ের বস্ত্রাদি তৈরির জন্য বিখ্যাত, জুতার জন্য বিখ্যাত কার্টবাস্টোন এন্ড কোম্পানি, বিখ্যাত বই বিক্রেতা থাকার পিঙ্ক-এর মত ব্রিটিশ দোকান ছিল এ মার্কেটে। এ মার্কেটের প্রসার ঘটতে থাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে এখানে যোগ করা হয়েছিল ক্লক টাওয়ার বা ঘণ্টাঘর, যা আজও রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এ ঘণ্টাঘর সম্পূর্ণভাবে তৈরি অবস্থায় 'হাডারসফিল্ড' ইংল্যান্ড থেকে জাহাজে করে আনা হয়।[৬] সামনের রাস্তাটির নাম ছিল লিনডসে স্ট্রিট। এখানে পোর্চের নিচে গাড়ি এসে থামত। সেই পোর্চ বা গাড়ি বারান্দাটি এখনও রয়েছে। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে এ মার্কেটের পেছন দিকে আগুন লেগে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল যার প্রেক্ষিতে বর্ধিত অংশ তৈরি করা হয়।

সেই থেকে এখনও কলকাতার নিউমার্কেট শহরের বিকিকিনির প্রাণকেন্দ্র আর বাংলাদেশিদের অন্যতম গন্তব্যস্থল নিউমার্কেট কলকাতা। আমরা এসেছি একই কারণে। আমি এসেছি গিন্নীর সাথে যা কেনবার তিনিই কিনবেন, যদিও নিজের জন্য কিছুই নয়, তবুও দিল্লী ছেড়ে কলকাতাতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেন।

৬। Rathin Mitra, Calcutta Then and Now P-39

www.pathagar.com

মার্কেটে ওই সময় তেমন ভিড় ছিল না। যেহেতু আজ কর্মদিবস সেহেতু বিকেলের দিকে আশপাশের হকার মার্কেট আর ফুটপাতের দোকানগুলোতে ভিড় জমে বেশি। ওই সময় অফিস ফেরত লোকগুলো টুকিটাকি কেনাকাটি করে বাড়িতে ফেরেন। দু'জনে হগ মার্কেটের প্রধান ফটক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। ওই একই দৃশ্য। ভেতরে খুব একটা ভিড় নেই। বিদ্যুৎ না থাকার কারণে চারদিকে ছোট ছোট জেনারেটরের শব্দ। অবাক কাণ্ড যতদিন এসেছি মার্কেটে বিদ্যুৎ থাকতে খুব কমই দেখেছি অথচ কলকাতার অন্য কোথাও তেমন লোডশেডিং চোখে পড়েনি; যেমন দেখেছিলাম প্রায় দেড় দশক আগে যখন প্রথমবার আমার কলকাতায় আসা হয়েছিল। তখন কলকাতা ছিল লোডশেডিং-এর শহর।

কয়েকটি দোকান ঘুরে দোতলার একটি দোকানে গিয়ে ঠাঁই নিলাম। দোকানি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে সামনের টুলে বসতে দিল। বিশেষ ধরনের 'ল্যাঙ্গার' দোকান। ছোট ছেলের কবে বিয়ে হবে। তারই যোগাড় করতে উঠে পড়ে লেগেছে আমার সহধর্মিণী। তার কথায় একটু একটু করে না করলে পরে একসাথে চাপ সামলানো যাবে না তাই অগ্রিম চিন্তা। দোকানি আলাপ জুড়ে দিয়ে একের পর এক বিভিন্ন রংয়ের আর জাতের দ্রব্য বের করছে। সাথে ঢাকার দোকানগুলোতে সরবরাহের গল্প জুড়ে দিল। মুসলমান দোকানি। জানালো পুরনো ঢাকায় তার আত্মীয়ের কাপড়ের দোকান রয়েছে। অনর্গল কথা বলে চলল। কিছুক্ষণ পর ঠাণ্ডা কিছু পান করব নাকি জিজ্ঞাসা করলে শুধুমাত্র পানি দিতে বললাম। হাঁক দিয়ে ছোকরা গোছের এক কর্মচারীকে দুটো কফি আনতে বলল। ওই সময়ে আমারও কেন যেন কফি অথবা চা জাতীয় কিছু পান করবার ইচ্ছাটা উঁকি দিচ্ছিল তাই সানন্দচিত্তে তার অফার গ্রহণ করলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর ছোকরা কর্মচারী দু'কাপ (!) কফি আনলো। একটা কাপ! সাইজ দেখে আক্কেল গুড়ুম। এর চাইতে ছোট সাইজের পাত্র হতে পারে কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ হল। কাপ তো নয় মনে হল মাঝারি সাইজের বোতলের ক্যাপ হতে পারে। প্লাস্টিকের তৈরি ডিসপোজেবল পাত্র। মনে মনে হাসলাম। বিচিত্র অভিজ্ঞতা। এখানকার বাসিন্দাদের মিতব্যয়িতার অনেক গল্প শুনেছি কিন্তু এতটা দেখব আশা করিনি। তুলনা করলাম আমাদের চা বা কফির কাপগুলোর সাথে। এমনকি ইদানিং ভেন্ডর মেশিনে বিশেষ কাপ ব্যবহার হয় তার সাথেও। যাই হোক এক চুমুকে শেষ করে দোকানের পর্ব সেরে আরও কিছু টুকিটাকি কেনা শেষ করে ফেরত পথে বের হলাম। এতক্ষণে বিকেল হয়েছে। অফিস ছুটির সময় সামনের রাস্তায় প্রচুর ভিড় জমে উঠেছে।

রাস্তায় কোন বাহন পাচ্ছিলাম না। হাতে বাজারের কয়েকটি ব্যাগ। এগুলো নিয়ে মানুষের ভিড় ঠেলে আবার অলিগলি ঘুরে যাওয়াটা এবার কষ্ট সাধ্য হবে ভেবে ভাবলাম অন্তত একটা রিকশায় উঠি। প্যাডেল রিকশার স্ট্যান্ড খুঁজতে খুঁজতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে

www.pathagar.com

আসল। এমনিতেই ডিসেম্বরের দিন। তাড়াতাড়ি অন্ধকার নেমে আসে। প্যাডেল রিকশা পেলাম না। যা পেলাম সেটা টানা রিকশা। অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও চড়তে হল। চড়তে বেশ যেমন কসরত করতে হল তেমনি বসে স্থির থাকতেও কসরত করতে হল। চালক বলব না টানার ব্যক্তি বলব জানি না। শীর্ণকায় চল্লিশের কোঠার ব্যক্তি। বললেন যে আমরা যেন খুব বেশি নড়াচড়া না করি। তার নির্দেশনা মত ঠায় বসে রইলাম। এবার তিনি হাতল দুটো টেনে তুলে কোমড় সমান উচ্চতায় নিয়ে আস্তে আস্তে ভিড়ের মধ্য দিয়ে টানতে শুরু করলেন। ভয় হচ্ছিল হাত ফসকালে পেছনে উল্টে যাবে কিনা? তেমনটা হয়ত হয় না। পেছনে দু'পাশে দুটো পায়ার মত রয়েছে হয়ত ওই ধরনের দুর্ঘটনা ঠেকাতে। প্রথমবার চড়েছি তাই হয়ত শংকিত অবস্থায় আমরা মূর্তিমান স্থায়ী হয়ে সমস্ত পথটা বসে রইলাম। আমাদের চালক কখনও শ্লথ কখনও বেগবান হয়ে ভিড়ে ফাঁকফোকর দিয়ে চলছেন। তিনি অলিগলি দিয়ে আমাদেরকে নিয়ে চলছেন হোটেলের দিকে। হঠাৎ পাশের ফুটপাত থেকে এক যুবক উচ্চস্বরে বলে উঠল, 'স্যার আসসালামুআলাইকুম। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন কি আপনাদের মেয়াদকালে হবে?' আমি কিছুটা অপ্রস্তুতের মত তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দিয়ে ইশারায় সালামের উত্তর দিয়ে চুপ রইলাম। তিনি পাশের গলিতে ঢুকতে ঢুকতে আবার বললেন, 'স্যার মনে কিছু করবেন না আপনাকে আমার খুব ভাল লাগে তাই কথাটা বললাম, আমি ঢাকায় থাকি।' আমার উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে তিনি দৃশ্যপটের বাইরে চলে গেলেন। আমার সহধর্মিণী বললেন, 'এখানেও শান্তি নেই। আমি বললাম এ রকম তো হর-হামেশাই হচ্ছে। কলকাতাতেও বহু বাংলাদেশি আসা যাওয়া করে বিভিন্ন কারণে। রাস্তায় অনেকের সাথেই দেখা হয়। আর টেলিভিশনের কারণে আমাদের চেহারা এতই পরিচিত যে, মাঝে মধ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে গেলে মোটামুটি ভিড় লেগে যায়। এ পরিচিতি একেবারে যে খারাপ লাগে তেমনও নয়। মাঝে মধ্যে বিরক্তিরও উদ্রেক হয়। উটকো ঝামেলা মনে হয়। কেমন যেন চলাফেরার স্বাধীনতায় বাধা মনে হয়।

যতক্ষণ আমরা টানা রিকশায় ছিলাম ততক্ষণ বেশ শংকিত ছিলাম শুধু আমাদেরকে নিয়েই নয় যিনি টানছেন তার জন্য বেশ শংকিত ছিলাম। কারণ, তিনি যেভাবে এ জ্যামের মধ্যে কখনও ধীর কখনও দ্রুত গতিতে টেনে চলছিলেন তাই। শংকিত হচ্ছিলাম তিনি নিজেই হয়ত দুর্ঘটনায় পড়ে যেতে পারেন। এমন হলে বেশ বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আমার কাছে মনে হল সম্পূর্ণ বিষয়টি বেশ অমানবিকও বটে। একবিংশ শতাব্দীতে এভাবে মানুষকে মানুষ টানবে কেমন যেন ভাবতেই মনোকষ্ট হয়। ছোটবেলায় পাল্কি বাহকদের দেখতাম আমার মা-খালাদের কাঁধে নিয়ে যেতো তখন বেশ ভাল লাগত। কিন্তু এখন এতগুলো বছর পরে ভাবলে মনে হয় মানুষের অসহায়ত্বের এক নগ্ন প্রকাশ ছিল ওই ব্যবস্থা। যদিও এখন গ্রামেগঞ্জে

www.pathagar.com

পালকির বাহন চোখে পড়ে না হয়ত বা নেই। তবে ইদানিং অনেক বিত্তবানদের দুলালীদের বিয়ের সময় মানুষের কাঁধে চড়ে বিয়ের আসরে আসতে দেখলে আমার মন তিতিয়ে উঠে। অনেকে হয়ত এটাকে বাংলার ঐতিহ্য বলবেন। হয়ত বা তাই, তবে এগুলো মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা ছিল।

এসব ভাবতে ভাবতেই নিরাপদে রিপন রোড জংশন পর্যন্ত পৌছে পঁচিশ রুপির স্থলে পঞ্চাশ রুপি দিয়ে টানা রিকশা ছেড়ে হেঁটে হোটেলে পৌছলাম। ইতিমধ্যেই কামরুল মোবাইলে জানালো যে তারা মধ্য কলকাতার 'ফোরাম' নামক শপিং প্লাজাতে রয়েছে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে মুকুল যোগ দেবে এবং রাতের খাবার সবাই মিলে শপিং মলের ফুডকোর্টেই খাব। সারাদিন কামরুল দম্পতি বাইরেই ছিল যে কারণে আমার সহধর্মিণীর সাথে কামরুলের সহধর্মিণীর দেখাই হয়নি। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আমরা 'ফোরামে' যখন পৌছলাম তখন মুকুল খাবারের অর্ডার দেয়া নিয়ে ব্যস্ত। রাতের খাবার শেষ করে সিনেপ্লেক্সে একটি থ্রি ডি ছবি দেখে হোটেলে ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

তিন

রাজা-মহারাজাদের উত্থান

সকালে ঘুম দেরিতে ভাঙার কারণে আর হাঁটতে যাওয়া হয়নি। কামরুলের রুমে যোগাযোগ করলে সেও জানালো যে, আজকে তার হাঁটতে যেতে ইচ্ছে হয়নি বলে নিজেও যায়নি আমাকেও ডাকেনি। আমার সহধর্মিণী এ বেলা আর বের হতে চাইলেন না। আমাদের নাস্তা শেষ হলে আমি ঘণ্টা কয়েকের জন্য একা বের হবার পরিকল্পনা করলাম। ইতিমধ্যে কামরুলরা নাস্তার পর পরই বের হয়ে গিয়েছিল। মুকুল আজকের দিনেও ব্যস্ত থাকবে অফিসের কাজ নিয়ে। যেহেতু কাল সকালে মানে ডিসেম্বর ২২, ২০১০-এর ভোর সাড়ে ছয়টার ফ্লাইটে কামরুলের মিসেস আর আমার সহধর্মিণী ঢাকা রওনা হবে; সে কারণেই তিনি কিছু গোজগাছ করে দুপুরের খাবারের পরে টুকিটাকি কিনতে বের হবে বলে আমাকে জানালে আমি কয়েক ঘণ্টার জন্য একাই বের হবার জন্য লবিতে নেমে ট্যাক্সি ড্রাইভার রমেশের সাথে যোগাযোগ করলাম। রমেশ আধা ঘণ্টার মধ্যে হোটেলে পৌঁছবে বলে জানালেন।

আমি হোটেলের লবিতে রমেশের অপেক্ষায়। হোটেল গুলশান। বাজে হোটেল। লবি তেমন আহামরি কিছু নয়। দুটো সোফার মত রাখা। বসে বাইরে কাচের দরওয়াজা দিয়ে লাগোয়া রোডে কলকাতার আরেক ঐতিহ্য ট্রামের আনাগোনা দেখছিলাম। এখান থেকে রয়েড রোড আর রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডের জংশন দেখা যায়। এ রোডের নাম এককালে ছিল ওয়েলেসলি স্ট্রিট।

রফি আহমেদ কিদওয়াই ভারতের স্বাধীনতা সেনানীদের অন্যতম ছিলেন। তৎকালীন যুক্ত প্রদেশ বর্তমানে উত্তর প্রদেশের বারাবাঙ্কি জেলায় জন্ম ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে। তিনি পড়াশুনা করেছিলেন তৎকালীন মোহামেডান এঙ্গলো ওরিয়েন্টাল কলেজ, বর্তমানে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর আস্থাভাজন হয়েছিলেন। পরে তিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম যোগাযোগ মন্ত্রী এবং আরও পরে খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন। তিনি খাদ্যমন্ত্রী থাকাকালে গরিব ও মধ্যবিত্তদের জন্য 'রেশনিং পদ্ধতি চালু করেছিলেন। অনেকটা বামঘেঁষা হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। ওই সময়ে তিনি ছাড়াও আরেকজন মুসলমান ব্যক্তিত্ব কংগ্রেসের প্রথম মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছিলেন। তিনি হলেন মৌলানা আবুল কালাম

www.pathagar.com

আজাদ। রফি আহমেদ কিদওয়াই অক্টোবর ২৪, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

রফি আহমেদ কিদওয়াইর নামে দিল্লীসহ ভারতের আরও কয়েকটি বড় শহরে সড়ক রয়েছে।

যেমনটা বলেছিলাম যে, পূর্বে এ সড়কের নাম ছিল ওয়েলেসলি স্ট্রিট। লর্ড ওয়েলেসলি ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা বৃটিশ রাজকে পাকাপোক্ত করতে যথেষ্ট সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তৎকালীন ভারতের কর্নওয়ালিশ এবং জন শোরের পরে ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হয়েছিলেন। তখন জব চার্নকের কলকাতা দ্রুত বিশাল নগরীতে রূপান্তরিত হচ্ছিল। ওয়েলেসলি তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেসামরিক প্রশাসকদের এ দেশের ভাষা আর সংস্কৃতির পাঠদানের সাথে সাথে অন্যান্য শিক্ষার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ওয়েলেসলির পরে লর্ড মিন্টো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হয়েছিলেন যার নামে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে এখনও একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক রয়েছে। মন্ত্রীপাড়া হিসেবে অধিকতর খ্যাত ঢাকার মিন্টো রোড।

আমি তখনও রমেশের অপেক্ষায়। আমার সামনে এসে একজন সালাম দিয়ে বাংলা ভাষায় সম্বোধন করলেন, 'স্যার আপনি এখানে?' তাকিয়ে দেখলাম মধ্য পঞ্চাশ বয়সী মাঝারি গড়নের এক ভদ্রলোক। হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে বললেন, 'আমার নাম শামসুদ্দিন, আমি ঢাকার বংশালে থাকি। আপনাকে এখানে দেখে দাঁড়ালাম। তার ভাষায় ঢাকাইয়া উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

দাঁড়িয়ে করমর্দন করে হেসে বললাম, 'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হলাম।' শামসুদ্দিন সাহেব অতি উৎসাহে বললেন, 'আপনাকে এখানে দেখব আশা করিনি।' বুঝতে বাকি রইলো না যে টেলিভিশনের বদৌলতে আমার ব্যক্তিগত জীবন এখন আর ব্যক্তিগত নেই। 'অফিসের কাজে এসেছেন?'

'ও আমিও' বললেন 'না' বেড়াতে এসেছি, আমার ছোট উত্তর, শামসুদ্দিন।

তিনি জানালেন যে, তার স্টিল রি-রোলিং মিলসহ আরও গোটা কয়েক মাঝারি ধরনের শিল্প-কারখানা রয়েছে। এখানে তিনি সপরিবারে এসেছেন। সাথে বিবাহিত এক মেয়ে রয়েছে। আগামীকাল তার ওই মেয়ে ঢাকায় চলে গেলে আরেকজন আসবেন বাবা-মার সাথে কলকাতায় যোগ দিতে। কিছুদিন থাকবেন এখানে। কলকাতা আসলে তিনি এখানেই থাকেন। অবশ্য কামরুল আগেই বলেছিল যে, এ হোটেলে প্রচুর বাংলাদেশি ভিড় জমায়। শামসুদ্দিন সাহেব তথ্য দিলেন যে, সকালে পরাটা আর নেহারী খেতে হলে আমি যেন রিপন রোডের কোণায় মুসলিম রেস্তোরাঁতে যাই। অবশ্য তিনি পুরাতন ঢাকার তেহারীর স্বাদের কথা বলতেও ভুললেন না। হয়ত তিনি আমার

www.pathagar.com

সাথে কথোপকথন চালিয়ে যেতেন যদি না আমি রমেশের আগমন বার্তায় রণে ভঙ্গ না দিতাম। রমেশের ট্যাক্সির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবার পূর্বে আবার দেখা হবে বলে রমেশের ট্যাক্সিতে চেপে বসলাম।

রমেশ ভাঙা ভাঙা বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন 'স্যার কোথায় যাবেন?' বললাম, 'সোভাবাজার রাজবাড়ি চিনবেন?' বললেন, 'সোভাবাজারে অনেক বাড়িই রাজবাড়ি নামে পরিচিত, তবে রাস্তার নাম বললে ভাল হয়।' আমি বললাম 'নবকৃষ্ণ দেব স্ট্রিট বা রোড বা লেন।' রমেশ মাথা নাড়িয়ে উত্তর কলকাতার পথে রওয়ানা হলেন। রাস্তায় যেতে যেতে বললেন, এখন কিছুটা ভিড় হতে পারে বিশেষ করে সোভাবাজারের দিকে। আমি চুপ করেই রইলাম। সোভাবাজার গঙ্গার তীরে। কলকাতার এ নদী হুগলী এবং বহুলাংশে ভাগিরথী নামে পরিচিত। কিছুক্ষণ পরে রমেশ বললেন, 'স্যার চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়ে যাই?' এমনভাবে বললেন, যেন আমি এ শহরের সাথে কত পরিচিত। বললাম, 'আমি তো কখনও ওখানে যাই নাই কাজেই রাস্তার সাথে পরিচিত নই। আপনিই নিয়ে চলুন।'

রমেশ বেশ কিছু রাস্তা ঘুরে অবশেষে নদী হাতের বাঁয়ে রেখে চিত্তরঞ্জন সড়ক ধরে উত্তরমুখী রওয়ানা হলেন। এ ধারটার রাস্তায় বেশ ভিড়। উত্তর কলকাতার এ অংশটাও দক্ষিণ কলকাতার মত পুরাতনাংশ। কলকাতা শহর পত্তনের পর হতে ক্রম ব্যাপ্তির সময় উত্তর কলকাতায় গড়ে উঠেছিল হিন্দু অধ্যুষিত এক বাঙালি সমাজ। এখানকার ধনাঢ্য ব্যক্তিদের পূর্ব পুরুষরা ওই সময়ে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন কলকাতায় ভিত পাকা করছিল, এখানে কোম্পানির ছত্রছায়ায় এবং কোম্পানির আজ্ঞাবাহক হিসাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে ধনধান্য ফুলে উঠেছিল আর শ্যামবাজার, সোভাবাজার ছিল এই উঠতি ধনাঢ্য সমাজের আস্তানা। এখানকার বাড়ি-ঘরগুলো এখনও এর সাক্ষ্য দেয়। বাড়ি-ঘরগুলোর অনেকাংশে ওই সময়কার সাক্ষ্য বহন করে। যদিও কালের বিবর্তনে এখানকার আদি বাসিন্দাদের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ওই সময়ে এখানকার বাড়ি ঘরগুলো ছিল বিশাল আঙ্গিনাসহ খোলামেলা অংশ। আজ আর তেমন নেই। এখন জনাকীর্ণ হাড়-পাঁজর বের করা অতীত ঐতিহ্যের আর বর্তমানের অব্যবস্থার ধারক।

আমি ট্যাক্সিতে বসে আশপাশে দেখতে দেখতে রমেশকে আমার পাটনা সফরের কথা পাড়লাম। মনে হল রমেশ বেশ উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'স্যার কবে যাবেন?'

'২৪ তারিখে গরিব রথ নামক মেইল ট্রেনে'।

'খুব ভাল স্যার। কোন স্টেশন থেকে?'

'কলকাতা স্টেশন হতে', আমি রমেশকে জানালাম।

'স্যার কলকাতা স্টেশন নতুন হয়েছে তবে নদীর পশ্চিম পাড়ে।' তিনি বললেন,

www.pathagar.com

অসুবিধে নেই আমি উঠিয়ে দেব, আবার যেদিন আসবেন আমাকে জানাবেন আমি স্টেশন থেকে নিয়ে আসব। আপনি একা যাবেন না সাথীরাও যাবে?'

'আমরা তিন জনেই যাব',

'তবে তো ঠিক হ্যায় সাহাব। আচ্ছা হোগা পাটনা দেখ আইয়ে।' রমেশকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম পাটনার কতখানি পরিবর্তন হয়েছে।

রমেশ বিহার মুঙ্গেরের অধিবাসী অতি উৎসাহে বলল, 'স্যার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নিতিশ কুমার গত আট বছরে পাটনার আর বিহারের চেহারা বদলাতে সক্ষম হয়েছেন। এর আগে লালুপ্রসাদ আর রাবরী দেবীর সময়ে ছিল জঙ্গল রাজ। তখন দেখে থাকলে এখন পরিবর্তন দেখবেন।

আমি বললাম, রমেশ আমি কখনও পাটনা বা বিহারে যাইনি এবারই প্রথম।

ফির ঠিক হ্যায়।

'কেন লালুত রেলমন্ত্রী হিসাবে বেশ নাম কামিয়েছে।'

আমার কথা শুনে রমেশ বললেন, 'স্যার আমি গরিব মানুষ। লেখাপড়া কম। রাজনীতি বুঝি না। তবে এটুকু বুঝি লালুপ্রসাদ গং থেকে নিতিশ কুমার অনেক ভাল মানুষ। এতক্ষণে বড় রাস্তা ছেড়ে সোভাবাজারের গলিগুলোতে প্রবেশ করলাম। রমেশ এক দোকান থেকে সোভাবাজার রাজবাড়ির অবস্থান জেনে নিলেন। রাজবাড়িটির প্রথম পুরুষ রাজা নবকৃষ্ণ দেবের নামে রাখা স্ট্রিটের উপরে। এখন রাজা নবকৃষ্ণ দেবের উত্তরাধিকারীরা থাকেন। সম্পত্তি ভাগাভাগি হতে হতে অনেকাংশ হলেও রাজবাড়িটি সংরক্ষিত রয়েছে হেরিটেজ বিল্ডিং হিসাবে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই রমেশ আমাকে প্রধান ফটকের সামনে এনে দাঁড় করালেন, বিশাল ফটক। বিশাল আঙ্গিনা। গেটটি সামনে থেকে বন্ধ তবে ভেতরের অংশ দৃশ্যমান। খবর নিয়ে জানা গেল যে, পূর্বানুমতি নিয়ে রাজবাড়ির বর্তমান বাসিন্দারা একাংশ দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করেন। আমার এ স্বল্প সময়ে তেমন ইচ্ছে নেই বলে রমেশকে জানালাম। শুধুমাত্র এই ঐতিহাসিক বাড়িটি দেখবার জন্য এসেছিলাম। কারণ, এখানকার ইতিহাসের সাথে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার পতন তথা তৎকালীন ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্য গঠনের সম্পৃক্ততা রয়েছে। বাড়িটির আরেকটি অংশ বর্তমান নবকৃষ্ণ দেব স্ট্রিটের অপর পাড়ে ওই অংশের গেটের দু'ধারে দু'টি সিংহের মূর্তি রয়েছে। গেট দিয়ে ঢুকলেই সামনে পড়বে একটি কামান। কামানটি ব্যবহৃত হতো সম্মানী অভিবাদনের জন্যে। এক সময় এ অংশের একভাগে ব্রিটিশ বাহিনীর জন্য রসদ মওজুদ করা হতো। বাকি অংশটি ব্যবহার হতো রাজদরবার বা অন্যান্য অফিস হিসেবে। বাড়িটির এ অংশের সংস্কার চলছিল। একজন জানালেন

www.pathagar.com

এখানে ভিতরের সবুজ চত্বরের একদিকে রয়েছে বিশাল পূজামণ্ডপ। দুর্গাপূজার সময় এ মণ্ডপটি আগত অতিথিদের জন্য তখন হতে এখনও উন্মুক্ত থাকে।

বাড়িটি একাংশে মহারাজা নবদেব কৃষ্ণের অষ্টম অথবা নবম বংশধররা থাকেন। পুরাতন অংশে নবদেব কৃষ্ণের বংশের অন্যান্য সদস্যদের বাস।

এ বাড়িটি বানিয়েছিলেন রাজা নবকৃষ্ণ দেব। তিনি জন্মেছিলেন ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে আর তাঁর মৃত্যু হয় ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে। পলাশীর যুদ্ধ আর সিরাজের পতনের সময় নবকৃষ্ণের বয়স ছিল চব্বিশ বছর। সিরাজের সমবয়সী। ওই সময়ের আগ হতেই তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নয়ন তারাতে পরিণত হয়েছিলেন। নবকৃষ্ণ দেবের উত্থান ওই সময়ের এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে হয়েছিল। নবাব আলীবর্দী খান আর দিল্লীর মসনদের নড়বড়ে মোগল সাম্রাজ্যের শেষ দিককার সময়তেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় পা জমাতে শুরু করে। মুর্শিদাবাদের বাইরে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ক্রমেই যুক্ত হতে থাকেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নীতি-নির্ধারকদের সাথে। সম্পর্ক গড়ে তোলেন ব্যবসার। কোম্পানির প্রয়োজন ছিল স্থানীয় লোকের অংশীদারিত্ব। বিশেষ করে প্রথম দিকে। তখনও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত ভূখণ্ডে সাম্রাজ্য গঠনের দিকে নজর দেয়নি। কিন্তু সে সুযোগ এনে দেয় একদিকে নবাবদের অবিমৃষ্যতার, অপরদিকে শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে শাসক আর শাসিতদের মাঝে ব্যাপক ব্যবধান তৈরি হওয়াতে। বিশেষ করে উচ্চবর্ণের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সাথে মুর্শিদাবাদের যোজনের ব্যবধান অব্যাহত থাকে। সে সময়েই তৈরি হতে থাকে নব্য ধনী গোষ্ঠী। রাজা নব কৃষ্ণদেব ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। নবকৃষ্ণ দেব সিরাজ-উদ্-দৌলার বিপক্ষে উমিচাঁদ, জগৎশেঠদের দলে ভিড়েন অনেকটা নিজের এবং উচ্চবর্ণ হিন্দুদের স্বার্থে।

নবকৃষ্ণদেব যখন নেহাত বালক তখন তাঁর পিতা রামচন্দ্র দেব মৃত্যুবরণ করেন। মায়ের তত্ত্বাবধানে বড় হন নবকৃষ্ণ। উর্দু, ফার্সি, আরবি আর ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী করে তোলেন পুত্রকে। নবকৃষ্ণ দেব যখন যৌবন সন্ধিক্ষণে সে সময়েই তিনি নিয়োজিত হন ওয়ারেন হেস্টিংস-এর ফারসি ভাষার শিক্ষক হিসাবে। ফারসি তখন রাজভাষা। ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষক হতে পরিণত হন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর ডেস্ক-এর মুন্সি হিসাবে। ক্রমেই নবকৃষ্ণ দেব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্থানীয় পরামর্শক হয়ে উঠেন। পলাশীর যুদ্ধের পরিকল্পনাকারীদের অন্যতম অনুঘটক হিসাবে তিনি আমীর বেগ, রামচান্দ রায় আর মীরজাফরদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে যোগসূত্র তৈরি করে দেন। তিনি এ কাজের জন্য প্রচুর অর্থও পেয়েছিলেন। পলাশীর যুদ্ধ আর সিরাজের পতনের পর গোপন তহবিল হতে অন্যদের সাথে তিনিও আট লক্ষ রুপির মালিক হয়েছিলেন। সময়কাল ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ। অতি অল্প বয়সে প্রচুর অর্থ আর বৈভবের মালিক হয়ে উঠেন। ক্রমেই হয়ে উঠেন উঠতি বাঙালি সমাজের শিরোমণি।

www.pathagar.com

তৈরি করেন বিশাল প্রাসাদ। মুন্সি নাম ঘুচিয়ে বনে যান রাজা।

বিশাল এ রাজবাড়িতে আয়োজন করেন দুর্গাপূজার যার পরম্পরা এখনও চলছে। সময় ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীতে স্বাধীন বাংলার সূর্য অস্তমিত। বাংলার মসনদে মীরজাফর আলী খান। নামেমাত্র দিল্লীর প্রভাবে। ক্লাইভ, পলাশীর নায়ক, কলকাতাতে প্রভুকে ধন্যবাদ দেবার জন্য প্রার্থনা সভার আয়োজন করতে চাইলেন। কিন্তু করবেন কোথায়? ওই সময়ে একমাত্র গীর্জাটি বানিয়েছিল তা সিরাজের কলকাতা আক্রমণের সময়ে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। এ ঘটনা পলাশীর এক বছর পরে। তখনও নতুন গীর্জা তৈরি হয়নি। ক্লাইভের মনোবাঞ্ছার কথা জানতে পারলেন নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। তিনি ক্লাইভকে দুর্গা মাতার সামনে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের প্রস্তাব দিলেন। সাথে জানালেন ওই ব্যবস্থা তিনি নিজের বাড়িতেই করবেন। 'কিন্তু আমি খ্রিস্টান' ক্লাইভ বললেন। উত্তরে রাজা বললেন 'সে সমস্যার সমাধানও করা যাবে'। ক্লাইভকে রাজা জানালেন যে, তিনি ওই বছরের দুর্গাপূজার নাম দেবেন 'কোম্পানির পূজা।' ক্লাইভ আটঘোড়ার গাড়িতে চড়ে তৎকালীন নতুন কলকাতা হতে পুরাতন কলকাতায় যেখানে নেটিভদের বাস, আসলেন।[১] মহাধুমধামে বাড়িতে দুর্গাপূজার আয়োজন আর দশদিনব্যাপী উৎসব হল। ক্রমেই বাড়িতে বাড়িতে দুর্গাপূজার উৎসব বাঙালি উচ্চবিত্ত এবং ধনী বণিকদের সমাজে প্রতিপত্তির চিহ্ন হয়ে উঠল। যা আজও বিদ্যমান। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে এ রাজবাড়ি উদ্‌যাপন করেছিল ২৫০তম দুর্গাপূজা। রাজবাড়ির ভেতরে ঠাকুর দালানের চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় দুর্গাপূজা।

পরে নবকৃষ্ণ দেব মহারাজা বাহাদুর টাইটেল পেয়েছিলেন। তৈরি করেছিলেন সিংহ দরওয়াজা, প্রধান ফটক। ভেতরে রয়েছে নাটমন্দির যেখানে সমাগম হতো তৎকালীন ইংরেজ সমাজের উচ্চতর সদস্যদের। আসতেন গভর্নররা। ভেতরে আরও রয়েছে কামানগুলো, যেগুলো দিয়ে ক্লাইভকে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। রাজা বাহাদুর নবকৃষ্ণ দেব পলাশীর যুদ্ধের পর হতে আমৃত্যু অত্যন্ত শক্তিশালী জমিদার হয়ে উঠেছিলেন। রাজা নবকৃষ্ণের আট পুত্রের প্রত্যেকের নামে কলকাতার এ অংশে অনেক সড়ক রয়েছে। অবশ্য নবকৃষ্ণ সেন্ট জন গীর্জা এবং কলকাতা মাদরাসা স্থাপনে প্রচুর অর্থদান করেছিলেন।

ভাবছিলাম হয়ত ওই সময়ে নবকৃষ্ণ দেবরা ধারণাও করতে পারেননি যে, মুর্শিদাবাদে নবাব পরিবর্তনের মধ্যেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেমে থাকবে না বরং ক্রমে সাম্রাজ্য স্থাপনের লিপ্সায় মেতে উঠবে। ইংরেজ বণিকরা পদলেহন করতে তৈরি করবে

১। Jaya Chaliha and Bunny Gupta, "Durga Puja in Calcutta the Living City. vol 11, ed. Shukanta Chowdhry. Oxford University Press, 2005 edition, pp-332-333

www.pathagar.com

চাটুকারদের দল। প্রভু হবে ভারতে কোটি কোটি জনতার 'নেটিভ নিগার' বলে সম্বোধন করবে ভারতীয়দের আগামী একশত নব্বই বছর (১৯৪৭)। তছনছ করবে সম্পূর্ণ সমাজকে। গড়ে উঠবে ইংরেজদের ছত্রছায়ায় আরেক এঙ্গলিসাইজড বাঙালি সমাজ।

আমি এখানে প্রায় আধাঘণ্টা দাঁড়িয়ে আশে পাশে দেখার চেষ্টা করেছি। ভাবছিলাম যোগাযোগ করলে হয়ত ভেতরটাও দেখতে পেতাম। সে দুঃখ রয়ে গেল। আগামীতে আবার কলকাতায় আসলে হয়ত ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করব।

আমি সোভাবাজার থেকে যখন ফিরলাম তখন বেলা বারোটার উপর। প্রায় দুটোর দিকে আমরা বেরিয়ে পড়লাম নিউমার্কেটের দিকে পার্কস্ট্রিট হয়ে। পার্কস্ট্রিটের ম্যাকডোনাল্ড থেকে খেয়ে বের হয়ে পশ্চিম দিকে চৌরঙ্গির দিকটাতে হেঁটেই রওয়ানা হলাম। রাস্তার ফুটপাতে তখন বেশ ভিড়। দু'ধারে দোকানপাট রেস্তোরাঁ অফিস ফুটপাতে কিছু হকারের দোকান। কোথাও কোথাও ভ্রাম্যমাণ খাবারের দোকান। আমরা পূর্বদিকে হাঁটছিলাম। বেশ কিছু দূর হেঁটে পার্কস্ট্রিট আর জওহরলাল নেহেরু রোড, যার পূর্ব নাম ছিল চৌরঙ্গি রোড, সংযোগস্থলে পৌঁছলাম। এখান থেকে পার্কস্ট্রিট শুরু হয়েছে। জওহরলাল নেহেরু রোডের উপরে বর্তমানে তৈরি হয়েছে ফ্লাইওভার। ফ্লাইওভারের নিচে দিয়ে পার্কস্ট্রিট বরাবর পশ্চিম দিকে ময়দানের একাংশের মাঝে দিয়ে চলে গিয়েছে আউটরাম রোড। এ জংশনের কোণাতেই ১নং পার্কস্ট্রিট রয়েছে এক সময়ের গোথিক স্থাপনায় নির্মিত এশিয়াটিক সোসাইটির বর্তমান আধুনিক বৃহৎ দালানটি। কলকাতা নগরীর পত্তনের সময় এখানে চৌরঙ্গি নামের এক সাধুর তৈরি শিবমন্দির ছিল। আবার অনেকে মনে করেন এটি ছিল জৈন মন্দির আর চৌরঙ্গিতে ছিলেন জৈন ধর্মের একজন তীর্থকরা।

এশিয়াটিক সোসাইটির ভিত্তি স্থাপন করেন স্যার উইলিয়াম জোনস্ জানুয়ারি ৫, ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে এক বৈঠকের মাধ্যমে, যার সভাপতিত্ব করেছিলেন তৎকালীন সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার রবার্ট চেম্বারস। এ বৈঠকটি হয়েছিল নতুন আঙ্গিকে তৈরি ফোর্ট উইলিয়ামে যা ওই সময়ে ছিল সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজের রাজধানী। কলকাতা তখনও বাড়ন্ত শহর। তখনও এসব এলাকা ছিল গড় বা জঙ্গল এলাকা। আজ ময়দান ঘিরে যে বিশাল কয়েকটি উদ্যান রয়েছে এগুলোই ছিল গড় এবং এ কারণেই সংলগ্ন মাঠগুলো গড়ের মাঠ নামে বাঙালির কাছে অধিক পরিচিত হয়ে উঠে। অবশ্য গড়ের মাঠ বললে এখন সহজে কেউ নির্দিষ্ট করে দেখাতে পারবে না।

কথা বলছিলাম 'এশিয়াটিক সোসাইটির' যার একটি রয়েছে বাংলাদেশেও। এশিয়াটিক সোসাইটি গঠন করা হয়েছিল ওরিয়েন্টাল ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং সাহিত্য ইত্যাদির গবেষণার জন্য। আরও পরে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে এর একবার নাম পরিবর্তন করে

www.pathagar.com

রাখা হয় 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান নামে ফিরে আসে। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি এই স্থানে এই দালানে স্থানান্তরিত হয়। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে মেডিক্যাল এন্ড ফিজিক্যাল সোসাইটি অব ক্যালকাটা (Medical and Physical society Calcutta) এর জন্ম এখানেই এশিয়াটিক সোসাইটি প্রাঙ্গণেই হয়েছিল। হলুদ বর্ণের পুরাতন দালানটি এখনও রয়েছে ঠিক ফুটপাত ঘেঁষে। এর লাইব্রেরিটি বিশাল, বর্তমানে প্রায় ৮০,০০০ দুষ্পাপ্য দলিল, তথ্যাদি এবং বই রয়েছে। এখানে মোগল সম্রাট শাহজাহানের স্বাক্ষর করা আত্মজীবনী 'পদশাহ নামা' এর দুর্লভ কপি সংরক্ষিত রয়েছে।

আমরা দু'জনে এশিয়াটিক সোসাইটিকে ডান হাতে রেখে ফুটপাত ধরে উত্তর দিকে এগুলাম। বেশ কিছু দূর এগিয়েই হাতের ডানে ফুটপাত সংলগ্ন গোথিক স্থাপনার আদলে তৈরি বিশাল দালান চোখে পড়ল। এক সময়কার এ দ্বিতল দালানটি ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম বা জাদুঘর। এটাই ভারতের সর্ববৃহৎ জাদুঘর যার স্থাপনা হয়েছিল এশিয়াটিক সোসাইটির হাত ধরে ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে। তথ্য মতে এ জাদুঘরে রয়েছে ১, ০২, ৬৪৬টি দর্শনীয় দ্রব্য যার মধ্য রয়েছে মিসরীয় মমি (Mummy) এবং গৌতম বুদ্ধের দেহভস্ম। সময়ের অভাবে জাদুঘরটি দেখা হয় নাই। সম্পূর্ণ দ্রব্যগুলো দেখতে প্রায় একদিন লেগে যায়।

আমরা আরেকটু এগুতে গিয়ে দেখলাম প্রশস্ত ফুটপাতের অর্ধেকাংশে রয়েছে হকারদের পসরা। এখান থেকে শুরু হয়ে গ্র্যান্ড ওবরয় হোটেল হয়ে সদর রোড এবং নিউমার্কেটের সম্মুখ পর্যন্ত হকারদের দোকান। সম্পূর্ণ অঞ্চলটিই এক প্রকার বাজারের অংশ মনে হয়। কি না পাওয়া যায় এখানে। প্রায় সব ধরনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যে সমাহার হয় এ জায়গার ফুটপাতে।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে সদর স্ট্রিট আর নব সেন গুপ্ত সরণি ছেড়ে গ্র্যান্ড ওবরয়ের সামনে দিয়ে ডান দিকে বারোট্রাম স্ট্রিট দিয়ে নিউমার্কেটের পেছন দিকে যাব ঠিক করলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল কলকাতার ঐতিহ্যবাহী গ্র্যান্ড হোটেলটির সম্মুখ ভাগটি দেখার। বহু নাম শুনেছি। এ হোটেলের জীবন নিয়ে একাধিক উপন্যাস এবং ছায়াছবি নির্মিত হয়েছে। এ মুহূর্তে শংকরের কালজয়ী উপন্যাস 'চৌরঙ্গি' এর কথা মনে পড়ে।

এখন যেখানে গ্র্যান্ড হোটেল এক সময় সেটি ছিল কর্নেল গ্র্যান্ড-এর বাড়ি। বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিলেন কলকাতায় সদ্য আগত আইরিশ মহিলা, এনি মন্থ। তিনি এখানে প্রথমে শুরু করেন আবাসিক অতিথিশালা হিসেবে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে। ক্রমেই তিনি এ চৌরঙ্গি এলাকার ১৩ হতে ১৭ নম্বর পর্যন্ত অতিথিশালার বিস্তৃত করেন। এখানে বেশ কিছু বছর ধরে একটি থিয়েটারও ছিল। থিয়েটারের নিচে দোকানে আগুন লাগলে সমস্ত জায়গা পুড়ে যায়। ওই সময় এক দোকানের মালিক আমেরিকান বংশোদ্ভূত আরাটুন

www.pathagar.com

স্টিফেন কিনে নিয়ে হোটেলের ভিত্তি স্থাপন করেন। সময় ছিল ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে, যখন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হবার পথে ছিল। স্টিফেন ক্রমেই এনি মন্থ-এর স্থাপনাগুলোও ক্রয় করে নেন। এ খরিদের মাধ্যমেই চৌরঙ্গি লেনের ১৩-১৮ নম্বর হোল্ডিং পর্যন্ত গ্র্যান্ড হোটেল বিস্তৃত হয়ে আজকের রূপ নেয়। আরাটুন স্টিফেন চতুর্থ তলা এবং লম্বা গাড়ি বারান্দা যুক্ত করেন। এক সময় ওই গাড়ি বারান্দা এবং হোটেলের জানালা দিয়ে পশ্চিমে গড়ের মাঠ বা বর্তমান ময়দান দেখা যেত। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে হোটেলে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়।

আমরা গ্র্যান্ড হোটেলের টানা গাড়ি বারান্দার, এখন ফুটপাতের অংশ, নিচ দিয়ে হোটেলের নিচ তলার সুসজ্জিত দোকানগুলোর কাচের ঘেরার প্রদর্শিত বিভিন্ন দ্রব্যের নমুনা দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে হাঁটছিলাম। এখানেও প্রচুর হকার। এক সময় এ হোটেল এবং হোটেলের এ এলাকা নিষিদ্ধ ছিল নেটিভদের জন্য। পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হতে। সে সময়ে নেটিভ সিপাহিরা ব্রিটিশ বাহিনীতে যোগ না দিলে ব্রিটিশ সূর্য প্রায় অস্তগামী হয়ে যেত। তেমনটা হয়নি।

গ্র্যান্ড হোটেলের কথায় আবার ফিরছি। তৎকালীন মালিক আরাটুন স্টিফেন ক্রমেই হোটেল ব্যবসা সম্প্রসারণ করে দার্জিলিংয়ে খোলেন আরেকটি হোটেল। স্টিফেন ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে মারা গেলে তার বিধবা পত্নী এবং জামাতা ব্যবসার ভার নেন। তবে তাদের জীবনে দুর্ভাগ্য নেমে আসে যখন হোটেলে সুয়ারেজ আর পানীয় জল মিশে গিয়ে টাইফয়েড ছড়িয়ে পড়লে হোটেলের বাসিন্দাদের মধ্যে ছয় জনের মৃত্যু হয়। হোটেল বন্ধ হয়ে গেলে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে মার্কেন্টাইল ব্যাংককে হস্তান্তর করা হয় লিজ অথবা বিক্রির জন্য।

আমি হাঁটছিলাম আর ভাবছিলাম। পৃথিবীর ইতিহাসের কত সন্ধিক্ষণ আসে যার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের, রাষ্ট্র ব্যবস্থার এমনকি অনেক মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হতে সময় লাগে না। ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে বহু জনের মধ্যে ভারতের একজনের ভাগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল যার নাম ছিল মোহন সিং ওবরয়া, যার নামে বর্তমানের এ হোটেল গ্র্যান্ড ওবরয়। বর্তমানে শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ওবরয় চেইন অব হোটেল রয়েছে বেশুমার।

১৯৩৭-এর পরেই শুরু হয় মোহন সিং ওবরয়ের গল্প। তাও কোন রূপকথার চাইতে কম নয়। মোহন সিং ওবরয় পশ্চিম পাঞ্জাবের (এখন পাকিস্তানে) ঝিলামের এক অখ্যাত গ্রামে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কলেজের পাট চুকাতে পারেননি। বেরিয়ে পড়েন ভাগ্যের অন্বেষায়। চেষ্টা করেন সরকারি চাকরিতে ঢুকতে। পরীক্ষায় ব্যর্থতার কারণে তাও সম্ভব হয়নি। সিমলার সেসিল হোটেলে চাকরির খোঁজে প্রবেশ করতে চাইলে ফটকে দাঁড়ানো নিরাপত্তা কর্মী তাকে বের করে দেয়। উদ্যম না হারিয়ে

www.pathagar.com

গেটের সামনে হোটেলের ম্যানেজার মি. গ্রোভের অপেক্ষায় থাকেন। দৈবাৎ দেখা হয়। ওবরয়ের চেহারা, চলন, বলন এবং চৌকস ব্যবহারে ম্যানেজার মি. গ্রোভ সাহেব পরে দেখা করতে বলেন। পরে ওবরয় ওই হোটেলে অতিথিদের রোজনামচা রক্ষণাবেক্ষণের কাজে যোগ দেন। গ্রোভ অন্যত্র চলে গেলে আরনেস্ট ক্লার্ক ম্যানেজার হয়ে আসেন। মি. ক্লার্ক ততদিনে আরেকটি হোটেল ভাড়া নিয়ে নিজে হোটেল ব্যবসা শুরু করলে ওবরয়কে তার প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করেন। এক পর্যায়ে ক্লার্ক কয়েক মাসের জন্য দেশে গেলে ওবরয়ের সততা ও নিষ্ঠা দেখে এমন অভিভূত হন যে, ভারতের স্বাধীনতার কয়েক বছর পূর্বে ব্রিটেনে ফিরে যাবার প্রাক্কালে ২৫,০০০ রুপিতে হোটেলটি ওবরয়কে দিতে চাইলেন। ওবরয়ের এককালীন এ অর্থ প্রদানের ক্ষমতা না থাকায় ক্লার্ক কিস্তিতে পরিশোধের প্রস্তাবে রাজি হন। ক্লার্কের অগাধ বিশ্বাস ছিল ওবরয়ের উপরে। ওবরয় বেশ কয়েক বছরে ওই টাকা ব্রিটেনে পাঠিয়ে পরিশোধ করেছিলেন। ওবরয় সিমলার হোটেলের নাম পরিবর্তন করে রাখলেন 'ক্লার্কস্'। হোটেলের বদৌলতে ক্রমেই ওবরয় আর্থিক ও ব্যবসায়িক উন্নতির শিখরে উঠতে লাগলেন।

আমরা হোটেলের গাড়ি বারান্দা ছেড়ে সুসজ্জিত দোকানের সামনে ডিসপ্লে দেখছিলাম। থরে থরে সাজানো মূল্যবান সব সম্ভার। বেশির ভাগই বিয়ের সরঞ্জাম। সাদা গাউন হতে লাল চেলী। অলঙ্কার আর বিদেশি পাদুকার দোকান। মূল্য চড়া। এ দোকানগুলো অতীতের ধারাবাহিকতায় চলে আসছে। হঠাৎ পেছনে কোন একজনের সালামের জবাব দিতে গিয়ে পেছন ফিরে দেখলাম একজন মধ্যবয়সী দম্পতি। ভদ্রলোক কেতাদুরস্ত। সাথের ভদ্র মহিলা হিজাব টানা। ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে পরিচয় দিলেন তিনি আমাদের উচ্চ আদালতের একজন বিচারক। সস্ত্রীক যাচ্ছেন মুম্বাইতে কোন এক কনফারেন্সে। গতকাল কলকাতায় এসেছিলেন। এখন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন কলকাতার বাংলাদেশি কনস্যুলেটের গাড়ির অপেক্ষায়। তিনি জানালেন, তাঁর জন্য একটি গাড়ি পাঠাবার কথা কিন্তু এখনও আসছে না। সদর স্ট্রিটের এক রেডিমেড স্যুটের দোকান থেকে সদ্য কেনা কোটখানি হাতে ধরা।

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। দেখলাম বিচারকের বেগম সাহেবের সাথে ডা. রেহানা আলাপে ব্যস্ত। আপনি কি কোন সরকারি কাজে এসেছেন? জিজ্ঞেস করলেন বিচারক মহোদয়। 'জ্বী না, আমি কয়েকদিনের ছুটিতে এখানে এসেছি। ডা. রেহানা ছিলেন দিল্লীতে এক সেমিনারে। তিনি আমার সাথে যোগ দিলেন গতকাল। আগামীকাল তিনি ঢাকায় ফিরবেন। আমি আরও কয়েকদিন থেকে যাব।'

এর মধ্যেই বিচারক মহোদয়ের জন্য কলকাতাস্থ ডেপুটি হাই কমিশনারের সৌজন্য গাড়ি এসে গেলে আমি একটু সরে আসলাম। যদিও আমার কলকাতায় আগমন বার্তা এবং হোটেলের ঠিকানা কনস্যুলেট সরকারিভাবেই জানে, তবে ওখান

www.pathagar.com

থেকে আমার সাথে কোন যোগাযোগ করেনি আমিও প্রয়োজন মনে করিনি। তবে কলকাতা হতে পাটনা যাবার রেলের টিকিট করতে সাহায্য নিয়েছিলাম। যাক সে বিবরণে পরে আসব। ইতিমধ্যে বেগম সাহেব এক হকারের নিকট হতে ডাইনিং টেবিল মেট হাতে নিয়ে দেখছিলেন। আমি পাশে দাঁড়িয়ে গ্র্যান্ড ওবরয় হোটেলের ইতিবৃত্ত রোমন্থন করছিলাম।

যুবক মোহন সিং ওবরয়ের গল্প আমি এখনও শেষ করিনি। মোহন সিং ওবরয় ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের কোন একদিনে দিল্লী রেলওয়ে স্টেশনে তাঁর এক সুহৃদের কাছে শুনতে পান যে কলকাতার ৫০০ কামরা বিশিষ্ট ঐতিহ্যবাহী গ্র্যান্ড হোটেল বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এ সংবাদের প্রেক্ষিতেই তিনি গ্র্যান্ডের দরজায় এসে পৌঁছলেন। ওবরয় মার্কেন্টাইল ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করলেন। ব্যাংক ওবরয়কে মাসিক দশ হাজার রুপিতে গ্র্যান্ড হোটেলের লিজ দিতে সম্মত হল। সেই থেকে গ্র্যান্ড রূপান্তরিত হল গ্র্যান্ড ওবরয়। এরপরে ওবরয় খোঁজ করলেন সেসিল হোটেলের এককালীন ম্যানেজার মি. ডি ডাব্লিউ গ্রোভকে, যিনি সিমলাতে ভাগ্যের অন্বেষায়রত যুবক ওবরয়কে চাকরি দিয়েছিলেন। মি. গ্রোভ ওবরয়ের অনুরোধে তার হোটেলে যোগ দিতে রাজি হয়ে গেলেন। ওবরয় শুধু তাকে জেনারেল ম্যানেজারের পদই দেননি বরং ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের পদও দিলেন। মি. গ্রোভ ওবরয়ের নিচে কাজ করতে কুণ্ঠিত হননি। আর চেয়ারম্যান হলেও ওবরয় মি. গ্রোভকে আজীবন সম্মান দিয়েছেন। এমন গুণ, সততা আর একাগ্রতা থাকলেই বোধ হয় মানুষ সাধারণ হতে অসাধারণে পরিণত হন।

মোহন সিং ওবরয় মে ৩, ২০০২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ভারতের হোটেল ব্যবসার জনক হিসেবে সমাদৃত। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার এই বিরল ব্যক্তিত্বকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে সম্মানিত করেন।

আমাদের ফুটপাতের বাজার শেষ হলে নিউমার্কেট ও তৎসংলগ্ন দোকান হতে প্রয়োজনীয় টুকিটাকি সদাই করে হোটেলে ফিরলাম। কাল ভোর তিনটাতেই উঠতে হবে। রমেশকে সকাল চারটায় আসতে বললাম। ওদিকে কামরুল আগেই অন্য ট্যাক্সি ঠিক করে রেখেছিল। কারণ, তার মিসেসও একই ফ্লাইটে ঢাকা ফিরবেন। রাতে হোটেলেই যৎসামান্য খেয়ে নিলাম। ডা. রেহানা গোজগাছ শেষ করলে শুয়ে পড়লাম।

www.pathagar.com

চার

গঙ্গার তীরে স্নিগ্ধ সমির

খুব ভোরে বা অসময়ে বিশেষ করে যামিনীর শেষাংশে কোথাও যেতে হলে সে রাতে ঘুম খুব ভাল হয় না। কেমন যেন অস্থিরতা থাকে। আমার তেমন হয়। ওই সময়ে আমার নিজেরই ঘুম ভেঙে যায় কাউকে উঠাতে হয় না। আর আমার সহধর্মিণীর ব্যাপারটাতো আরও সিরিয়াস। তিনি কোথাও যেতে হলে বিশেষ করে বিমান, ট্রেন অথবা নৌযানে ভ্রমণে, নির্ধারিত সময়ের বহু আগেই উপস্থিত হন। শুধু নিজেই নয় পরিবারের কেউ কোথায় ওই সব বাহনে ভ্রমণ করলে বেশ কয়েক ঘণ্টা আগেই বাড়ি ছাড়তে হয়। তা না হলে তিনি অস্থিরতায় ভোগেন। কাজেই নিশ্চিত ছিলাম যে, আমাকে কোন প্রকার উদ্বেগে থাকতে হচ্ছে না। দু'ঘণ্টা আগে বিমান বন্দরে থাকতে হবে। সে ক্ষেত্রে সকাল সাড়ে চারটায় বিমান বন্দর পৌঁছতে হলে আমাদেরকে সর্বশেষ চারটায় পৌঁছতে হবে। হোটেল হতে বের হতে হয়ত আরও একঘণ্টা লাগতে পারে। কাজেই সাব্যস্ত হল আমরা দু'জনে ভোর তিনটায় উঠে তৈরি হয়ে চারটায় বের হয়ে যাবো। রমেশকে আগেই সময়টা জানিয়ে রেখেছিলাম। তিনি সময়মত আসবেন সাথে কামরুল এবং তার স্ত্রীর জন্য আলাদা আরেকটি ট্যাক্সি নিয়ে আসবেন।

সকালে যথাসময়ে বিমানবন্দরের দিকে রওয়ানা হলাম। ডিসেম্বরের সকাল হালকা কুয়াশা। কিছুটা শীত অনুভূত হচ্ছিল। কলকাতা শহরের রাস্তাগুলো এ সময়ে জনশূন্য। তবে কিছু কিছু গাড়ি বিশেষ করে লরিগুলো গোঁ গোঁ করে নিস্তব্ধতা ভাঙতে ভাঙতে ছুটছিল। রাস্তাগুলোর ডিভাইডারে সোডিয়াম বাতি অনেক রাস্তার দু'পাশের জীর্ণশীর্ণ পুরাতন বাড়ির, অনেকগুলোর বয়স হয়তো দেড় শত বছরেরও হতে পারে, রাস্তার উপরে সোডিয়াম বাতির পিঙ্গল বর্ণ পুরাতন বাড়িগুলির দেয়ালে ঠিকরে কেমন ভৌতিক মনে হচ্ছে। রাস্তার আশপাশে এ সময়ের দৃশ্য দেখে আমার মনে হচ্ছিল এ শহরে, ইতিকথা।

একদিকে ষড়যন্ত্র, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা আর অন্যদিকে ইংরেজদের আত্ম অহমিকার তলে নিষ্পেষিত পদলেহনকারী একদল তথাকথিত বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের আত্মপ্রকাশের ইতিহাস। কত বিবর্তন হয়েই আজকের শহর, তৎকালীন ভারতের প্রথম ইংলিশ শহর কলকাতা। কত অত্যাচারিত মানুষের আহাজারিতে এখনও বিষণ্ন এ নগর। যতদিন

www.pathagar.com

ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল ততদিন এ শহরের যৌবন ছিল। পরে সমগ্র ভারতে ইংরেজদের প্রভুত্ব কায়েম হলে মাত্র ছত্রিশ বছরের জন্য দিল্লী রাজধানীতে রূপান্তরিত হয়। হবেই বা না কেন প্রাচীন হতে মধ্যযুগ পর্যন্ত তৎকালীন ভারতের একক রাজধানী ছিল দিল্লী। যে গোষ্ঠী এতদঞ্চলে সাম্রাজ্য গঠন করেছে তারাই দিল্লীকে কেন্দ্র বানিয়েছিল। মোগলরা দিল্লী-আগ্রাকেই রাজধানী করে সাম্রাজ্য শাসন করেছিল তিনশত তেত্রিশ বছর। ইংরেজরাও সে পথ ধরল। কলকাতা রাজধানী হিসেবে পরিত্যক্ত হল। ক্রমেই কলকাতার সেই জৌলুস হ্রাস পেতে পেতে এখন মৃত নগরী প্রায় হয়ে পড়েছে।

যাই হোক, রমেশ বেশ কয়েকটি প্রধান সড়ক ঘুরে আমাদেরকে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস বিমান বন্দরের আন্তর্জাতিক টার্মিনালে নিয়ে আসলেন। শীতের এ সকাল বেশ কুয়াশাচ্ছন্ন। প্রায় জনমানবহীন বিমান বন্দরের আন্তর্জাতিক টার্মিনাল। টার্মিনালের মূল ভবনে ঢুকবার পথে পুলিশের নিরাপত্তা চৌকি। চৌকিতে দুই নিরাপত্তা রক্ষী দাঁড়ানো। আপাদমস্তক শীত নিবারণের প্রচেষ্টায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাপড় জড়ানো। কান দুটো মাফলার দিয়ে ঢাকা। হাতের ইশারায় থামতে বলে একবার ভেতর দিকটা উঁকি মেরে দায়সারা গোছের তল্লাশি করে ছেড়ে দিল। পেছনে কামরুলের ট্যাক্সি। আমরা টার্মিনালের সামনে নেমে কামরুলের ট্যাক্সি পৌছলে দু'জনকে হলে প্রবেশ করিয়ে বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলাম। আমরা বহু আগেই বিমান বন্দরে এসেছি আর কলকাতা-ঢাকাই বোধ হয় আজ দিনের প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্লাইট। কিছুক্ষণ পর ঢাকাগামী দু'একজন যাত্রী আসতে শুরু করলেন। আমাকে এমনভাবে টার্মিনাল বিল্ডিং-এর সামনে হাঁটতে দেখে অনেকেই শনাক্ত করবার চেষ্টা করছিলেন। আমরা দু'জন খোঁজ করছিলাম টার্মিনাল টিকেট ঘরের কর্মচারীকে। তিনি লাপাত্তা অথবা অত সকালে সুখনিদ্রা ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। অগত্যা বাইরে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের ক্রমাগমন প্রত্যক্ষ করা ছাড়া আর কিছু করবার ছিল বলে মনে হলো না।

আমরা তখনও টার্মিনালের ভেতরে যাবার জন্য টিকেট ঘরের সামনে দাঁড়ানো। মাত্র সাড়ে চারটা বাজে। কামরুলকে বললাম, 'দুই মহিলা চেকিং কাউন্টার পার হলে আমরা হোটেলে ফিরে যেতে পারি। কামরুল সায় দিল। কিন্তু এভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না। এরই মধ্যে আরও কয়েকজন যাত্রী এসে উপস্থিত। হঠাৎ পেছন থেকে একজন সালাম দিয়ে এক গাল বিগলিত হাসি দিয়ে বললেন, 'স্যার আপনি এখানে? ঢাকায় যাচ্ছেন?' ভদ্রলোক একটা স্যুট পরা। কান মাফলার দিয়ে ঢাকা। আপাদমস্তক দ্রুত দেখে নিলাম। গায়ের রং শ্যামলা বলা যাবে না। কালো বললেও বলা যেতে পারে। আমি কিছু বলার আগেই হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন করমর্দনের জন্য। ডান হাতে বিভিন্ন রংয়ের পাথরের চারটা আংটি। অপর হাতে সমপরিমাণ আংটি।

www.pathagar.com

আজকাল প্রায়ই এমনটা দেখা যায়। পরিচয় দেবার আগেই অনুমান করলাম ব্যবসায়ী হবেন। বললেনও তাই। ভদ্রলোকের ভৈরবে কয়েকটি গোডাউন রয়েছে। রয়েছে গদি, বাড়ি, আড়ৎ আর স্থানীয় পরিবহনের ব্যবসা।

আমি সৌজন্য বজায় রাখতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি কি ঢাকায় ফিরছেন।

বললেন, 'জ্বী না, স্যার'–

'আমার বন্ধুকে উঠিয়ে দিলাম। আমি আরও কয়েকদিন কলকাতায় থাকব।

তিনি আমাকে তাঁর ভারতের আসবার উদ্দেশ্য বয়ান করলেন। তার ভাষ্যমতে, বহুদিন থেকে দুই বন্ধু আজমীরে খাজা গরিব নেওয়াজের দরগা জিয়ারত করবার মানত করেছিলেন। এবার তা পূর্ণ করলেন। তবে এ জেয়ারতে উৎসাহ যুগিয়েছেন ওখানকার এক খাদেম, যিনি প্রতিবছর বাংলাদেশ সফর করে এ ধরনের ভক্তদের খোঁজ-খবর নিয়ে থাকেন। ওই মাজারের খাদেমগণ মাজার সংলগ্ন এলাকাতেই থাকার ব্যবস্থাসহ ছোটখাটো পান্থশালা চালিয়ে থাকেন, যেখানে ভক্তদের রেখে টু-পাইস ইনকামের বন্দোবস্ত করে থাকেন। আমার সামনে ভৈরবের এ ভদ্রলোকও তেমন ব্যবস্থায় ছিলেন। তিনি এবং তাঁর বন্ধু কলকাতা হতে আজমীর-এ দীর্ঘ পথ ট্রেনে প্রায় আটাশ ঘন্টায় পাড়ি দেবার অভিজ্ঞতাও আমাকে শোনালেন। আমাদের কথা বেশ জমে উঠেছিল। এর মধ্যেই কামরুল জানালো যে অবশেষে টিকেট বাবুকে পাওয়া গিয়েছে। দুটো টিকেট নিয়ে আসলে আমি রণে ভঙ্গ দিয়ে ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে টার্মিনাল ভবনের ভেতরে প্রবেশ করলাম।

হল রুমটি ছোট। কয়েকটি দোকান রয়েছে তখনও খোলেনি। ঢাকার যাত্রীরা চেক-ইন করে ভেতরে চলে গেছে। কাজেই ওখানে আর থাকার কোন প্রয়োজন নেই মনে করে আমি আর কামরুল রমেশের ট্যাক্সিতে চড়ে হোটেলের দিকে রওয়ানা হলাম। মুকুল সকাল নয়টার দিকে আমাদের সাথে যোগ দেবে। আমরা তৈরি হয়ে প্রাতঃরাশ সেরে বের হব কলকাতার কিছু নির্ধারিত ইতিহাস খ্যাত কয়েকটি জায়গা ঘুরে দেখতে। কলকাতা হতে ডিসেম্বর ২২, ২০১০-এ আমরা ট্রেনযোগে পাটনার উদ্দেশে রওয়ানা হবো। মুকুল ঢাকা হতে রওনা হবার পূর্বেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে কলকাতা-পাটনার দানাপুর নামক মেইল ট্রেনের নন-এসি তিনটি বার্থ রিজার্ভ করে রেখেছিল। আমি তাকে বলেছিলাম যে, সারা রাত আমাদেরকে সফর করতে হবে সে ক্ষেত্রে নন এসিতে ধূলাবালি খেতে খেতে যাওয়া ছাড়া আর কোন পন্থা ছিল কিনা? উত্তরে মুকুল বলেছিল, সব ট্রেনের এসি বার্থ বুক করা দেখাচ্ছিল। তবে কলকাতা থেকে চেষ্টা করা যেতে পারে। আমি হোটেলে ফিরবার পথে ভাবছিলাম এ ব্যাপারে কলকাতার বাংলাদেশ মিশনের কোন সাহায্য নেব কিনা? তখনও মনস্থির করতে পারিনি। আমি অনেকটা স্বাধীনচেতা মানুষ। সরকারি সফর না হলে সহসা কোন

www.pathagar.com

সহযোগিতার প্রয়োজন মনে করি না বিশেষ করে তেমন পরিচিত কেউ না থাকলে। আমার সব সময়েই মনে হতো যে ভবিষ্যতে আমি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি থাকবো না আর তখন হয়ত বিপদে পড়লেও কোন সহযোগিতা হয়তো তেমন করে পাবো না, কাজেই অভ্যাস নষ্ট করে লাভ হবে না।

এ সময় রাস্তায় বেশ ভিড় জমে উঠেছে। মনে হল আস্তে আস্তে শহরটা জেগে উঠছে। রাস্তার আশপাশের ছোট ছোট দোকানগুলো খুলতে শুরু করেছে। পাবলিক বাসগুলো যাত্রী নিয়ে চলাচল শুরু করেছে। প্রাইভেট বাসগুলোর চেহারা তেমন নয়। অনেকাংশে ঢাকা শহরের বাসের চাইতেও জীর্ণ মনে হল। তবে এগুলো বিশ বছরের বেশি পুরাতন নয়। রমেশের সাথে আমাদের চুক্তির কথা আগেই বলেছি। আজ থেকে আগামী কয়েকদিন তিনি আমাদের সাথে দিন চুক্তিতে থাকবেন। পাটনা যাবার পথে এবং ফেরত আসবার সময় স্টেশন ছাড়ার এবং নিয়ে আসবার দায়িত্বও তার। এমনকি পরবর্তীতে মুর্শিদাবাদ সফরের জন্যও তারই পরিচিত একজনকে ঠিক করে রেখেছেন। আমরা হোটেলে পৌঁছে তৈরি হয়ে কলকাতা দর্শনের প্রস্তুতি নিতে যে যার কক্ষে চলে এলাম। রমেশকে সাড়ে নয়টায় আসতে বলে তাকে আগেই বিদায় দিয়েছিলাম।

সকাল নয়টায় সমস্ত দিনের প্রস্তুতি নিয়ে ছোট্ট ডাইনিং রুমে নাস্তার টেবিলে কামরুলের সাথে আজকের দিনের কর্মসূচি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সারলাম। ইতিমধ্যেই মুকুল এসে যোগ দিল। মুকুল জানালো যে তার কলকাতার অফিসের কাজ শেষ। আগামী দিনগুলোর জন্য আগেই ছুটি নিয়ে রেখেছিল। কোথায় কোথায় যাব তার একটা মৌখিক বিবরণ দিলাম। আমি বললাম যে কলকাতা অবশ্যই ইংরেজদের তৈরি ইউরোপিয়ান শহর হিসেবে উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্য গঠনের সাক্ষী বহনকারী শহর। বর্তমান শহরটির গোড়াপত্তন সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকে হলেও এ শহরের দ্রুত নগরায়ন শুরু হয়েছিল ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয় আর বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে। তবে নিষ্কণ্টক ছিল না ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তার। ছলা কলা আর কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছিল কোম্পানিকে। দিল্লীতে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার শুরু হয়েছিল সম্রাট আওরঙ্গজেবের পতনের পর হতে। এ সব খণ্ড চিত্র বহুভাবে পরবর্তীতে আলোচিত হবে।

আমরা তিনজনই এখন নির্ভেজাল পর্যটক। আমার পায়ে কেডস, একটি সুয়েটার সাথে। কাঁধে আমার পর্যটনের সফরসঙ্গী ব্যাগ। ব্যাগের মধ্যে ক্যামেরা, একটি তোয়ালে, পানির বোতল, একটি কলম এবং নোটবুক। ট্যাক্সিতে বসে রমেশকে বললাম যে প্রথমে ধর্মতলার কাছে শহীদ মিনার, পরে গভর্নর হাউস হয়ে প্রিনসেপ ঘাট, রাইটার্স বিল্ডিং হয়ে দুপুরের খাবারের পরে জব চার্নকের সমাধি এবং পরে নবাব

www.pathagar.com

সিরাজ-উদ্-দৌলার বিরুদ্ধে আনীত ইংরেজদের তথাকথিত হত্যার সাক্ষী ব্ল্যাকহোল মনুমেন্টখানি খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের তিনজনের কারোই এ সব জায়গার সঠিক অবস্থান জানা নেই, তবে মুকুল রাইটার্স বিল্ডিং আর তৎসংলগ্ন লালদীঘির রাস্তাঘাট চেনে। অবশ্য ওই জায়গা কলকাতার প্রাণকেন্দ্র হওয়াতে খুব সহজেই চিনবার কথা।

আমরা রমেশকে নিয়ে প্রথমেই গ্র্যান্ড হোটেল পার হয়ে এককালের বিখ্যাত ম্যাট্রো সিনেমার সামনে দিয়ে এসপ্লানেড হয়ে বর্তমানে শহীদ মিনার সংলগ্ন পার্কে প্রবেশ করলাম। পার্কটি কলকাতার বিখ্যাত এবং সবচাইতে বড় সবুজ ময়দানের, যা একসময় গড়ের মাঠ নামে পরিচিত ছিল, তার উত্তর কোণের একাংশে।

কলকাতার ময়দান এখন বেশ কয়েক অংশে বিভক্ত। বর্তমানে এখানে রয়েছে বিখ্যাত ইডেন গার্ডেন ক্রিকেট স্টেডিয়াম। একপাশে রেসকোর্স, রাজভবন, যা এক সময় লাটভবন নামে অধিক পরিচিত ছিল– অপরদিকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এবং রয়েল ক্যালকাটা গলফ ক্লাব। রয়েল ক্যালকাটা গলফ ক্লাব ইংল্যান্ডের বাইরে যে কোন স্থানে প্রথম গলফ ক্লাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানেই রয়েছে উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রতীক ফোর্ট উইলিয়াম। মূল ফোর্ট উইলিয়ামটি এখানে ছিল না। মূল ফোর্ট উইলিয়াম যাকে কেন্দ্র করে ইংরেজদের সাথে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার প্রথম সংঘাত সেটি ছিল বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিং-এর জায়গায়।✦ সে কথায় পরে আসছি।

কথা হচ্ছিল কলকাতার ময়দানের। এ ময়দানের একাংশ প্রায় পাঁচ কিলোমিটার ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্যারেড গ্রাউন্ড হিসেবে যা আজও ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে রয়েছে। ফোর্ট উইলিয়াম এখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর, সংক্ষেপে 'ইস্টার্ন কমান্ড'। ইস্টার্ন কমান্ডের নাম আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

ময়দান প্রসঙ্গ এখনও শেষ হয়নি। ময়দানকে ঘিরেই কলকাতার ব্যাপ্তি যেমন হয়েছিল, তেমনি এখানে গড়ে উঠে ইউরোপিয়ান তথা ইংরেজদের বাসস্থান। ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে, পলাশী যুদ্ধের এক বছর পর, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পুনরায় এ স্থানে ফোর্ট উইলিয়াম গড়ে তোলে তৎকালীন গোবিন্দপুর গ্রামের মধ্যখানে। গ্রামবাসীদের ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। অর্থের সাথে তালতলা, কুমারটুলি এবং সোভাবাজার এলাকায় জমি দেয়া হয়। ফোর্ট উইলিয়াম তৈরি শেষ হয় ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে। ততদিনে চৌরঙ্গি গ্রাম হতে গঙ্গা বা কলকাতার হুগলী নদীর তীর পর্যন্ত একসময়ের বাঘের অভয়স্থল

✦ Cotton, HEA Calcutta Old and New, PP 220-241

www.pathagar.com

জঙ্গল পরিষ্কার করে বিশাল ময়দানে রূপান্তরিত করা হয়। এক সময় ময়দানের চতুর্দিকে লর্ড কার্জন, কিচেনার, রবার্টস, মিন্টো নর্থব্রুক এবং ক্যানিং-এর বিশাল মূর্তি ছিল। সেগুলো আজ নেই। ১৯৪৭-এর পর কয়েকটি এবং ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের পর সবগুলো সরানো হয়। বর্তমানে সে সব জায়গায় রয়েছে গান্ধী, রাজা রামমোহন রায়, চিত্তরঞ্জন দাস, নেহেরু, সুভাষ বসু, অরবিন্দ, মাতা গিনি হাজারি, ইন্দিরা গান্ধী আর মোস্তপাল। এসপ্লানেডের উত্তর প্রান্তে রয়েছে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বলশেভিক নেতা ভি আই লেনিনের বিশাল মূর্তি। ময়দানের এক মাথাতেই এক সময় ছিল ইতিহাস খ্যাত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, যে কলেজটির অবদান রয়েছে বাংলা ভাষার আধুনিকীকরণ আর বিকাশের।

বলেছিলাম ময়দানের কথা। গোবিন্দপুরে যে সব ধনাঢ্য বাঙালি পরিবার ছিলেন তাদের মধ্যে 'দেব'-রা বসতি নিলেন সোভাবাজার, ঠাকুররা জোড়াসাঁকো ও পাথুড়িয়াঘাটা এবং ঘোষালরা খিদিরপুর এলাকায়। আজও কলকাতার এ তিন জায়গাতেই বংশ পরম্পরায় মূলত এদের বাস। জোড়াসাঁকোতেই এখন রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাপ-দাদার জমিদার বাড়ি। বাড়িটি বর্তমানে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়।[১]

আমরা ময়দানের এ অংশের পূর্ব পাশ দিয়ে শহীদ মিনারের ভেতরে যাবার গেট দিয়ে প্রবেশ করলাম। একপাশে ক্রিকেটের পিচ বানানো। রয়েছে নেট প্র্যাকটিসের জায়গা। অপরদিকে বেশ কিছু বৃক্ষের সমারোহ। সামনেই ৪৮ মিটার উঁচু স্তম্ভ যেটি সিরীয়, মিসরীয় আর ইউরোপীয় স্থাপত্যের আদলে তৈরি। এ মিনারটি, যার এক সময়ের নাম ছিল মনুমেন্ট, তৈরি করেছিলেন জেনারেল স্যার ডেভিড অকটারলোনি (General sir David Octerloney) ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে, ১৮১৪-১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম গুর্খা যুদ্ধের (Gurkha war) শহীদদের স্মরণে। একসময় এ মনুমেন্টকে অকটারলোনি মনুমেন্টও বলা হতো। এই ডেভিড অকটারলোনি দিল্লীতে মোগল দরবারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন।'[২]

অকটারলোনি ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে তৎকালীন হিন্দুস্থানে আসেন। তারপর তিনি আর নিজ ভূমিতে ফিরে যাননি। তাঁর সমাধি রয়েছে দিল্লীতে। অকটারলোনির পিতা ছিলেন স্কটিশ এবং বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস-এর বাসিন্দা হয়েছিলেন। যখন আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ হয় তার পিতা পরিবারসহ কানাডাতে চলে আসেন। কিছুদিন পরে লন্ডনে এবং সেখানেই অকটারলোনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে যোগ দিয়েছিলেন। অকটারলোনি তৎকালীন হিন্দুস্থানের মোগল

---

১. Cotton, HEA Calcutta Old and New;
২. লেখকের 'কত জনপদ কত ইতিহাস'

www.pathagar.com

রাজধানী দিল্লীতে পৌঁছলে মোগল দরবারে তাকে সম্মানসূচক উপাধি দেয়া হয় নাসির-উদ-দৌলা। তিনি ওই নামেই পরিচিত হয়ে উঠেন। শুধু নামেই নয়, তিনি চলনে বলনে ছিলেন ছোটখাটো মোগল শাহজাদা। তিনি মিশে গিয়েছিলেন ওই সময়ের উচ্চ সমাজের সাথে। পরতে ভালবাসতেন চোগা, পাগড়ি। ছিল বিশাল হাতির বহর আর তের জন পত্নী-উপপত্নী এবং ছোটখাটো হেরেম।[৩] অকটারলোনি ছিলেন সাদা মোগলদের অন্যতম।

আমরা রমেশের ট্যাক্সি মিনারের পাদদেশের একপ্রান্তে রেখে হেঁটে মিনারের কাছেই গেলাম। ভেতরে প্রবেশের গেট বন্ধ। মিনারের উপরে উঠতে ২১৮ ধাপ উঠতে হয়। উপরে উঠতে গেলে লাল-বাজারের পুলিশ কমিশনারের পূর্বানুমতির প্রয়োজন। মিনারের গায়ে লেখা শহীদ মিনার ১৯৬৩ সাল। এর অন্য কোন ইতিহাসের বর্ণনা নেই। বর্তমানে শহীদ মিনার হিসেবে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে নাম পরিবর্তিত হয় এবং এ মিনারটি উৎসর্গ করা হয় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শহীদদের উদ্দেশ্যে। তবে এ পরিবর্তনটি আমার খুব পছন্দ হয়নি। আমি মনে করি, নাম পরিবর্তনে ইতিহাস পরিবর্তিত হয় না বরং ইতিহাসকে বিকৃত করাই হয়। ইতিহাস ঘাটলে আদি তথ্য বের হয়ে আসবেই। ফোর্ট উইলিয়ামসহ অন্যান্য রাস্তাঘাটের নাম ব্রিটিশ শাসক আর জেনারেলদের নামে থাকতে পারলে এ মনুমেন্টের নামও অপরিবর্তিত থাকতে পারতো।

যাই হোক, আমরা শহীদ মিনারের সামনে। জায়গাটা বেশ অপরিষ্কার। সামনে উদ্যান। বাঁশ দিয়ে মঞ্চ তৈরির প্রয়াস চলছে। জানতে পারলাম যে আজ বিকেলে এখানে পশ্চিম বাংলার শাসক দল সিপিআই (এম)এর কোন নেতার সভা হতে যাচ্ছে।

এ জায়গাটি অবশ্য পশ্চিম বাংলার রাজনীতির সাথে জড়িত। ভারতের যে কোন দলের পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের র‍্যালি এবং সভা এখান থেকেই শুরু হয়। আমাদের এককালের পল্টন ময়দানের মত। আমি চারদিকে অপরিষ্কার অবস্থা এবং মলমূত্রের দুর্গন্ধের কারণে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে ট্যাক্সিতে বসে দু'জনকে ডেকে বের হতে বললাম। মুকুল তখন ভিডিও করা নিয়ে ব্যস্ত। ভিডিওতে চিত্র ধারণ শেষ করে মুকুল আর কামরুল ট্যাক্সিতে বসলে রমেশ বললেন, 'চলিয়ে রাজভবন হয়ে গঙ্গাঘাটে নিয়ে যাই। পথে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখতে পাবেন।' আমি বললাম 'চলুন'। মুকুলকে জিজ্ঞেস করলাম যে সে কখনও এ শহীদ মিনারে এসেছিল কিনা? উত্তরে বলল, 'বাইর থেকে দেখেছি এখানে কখনও আসিনি।' মিনারটি রাতে আলোকিত থাকে। তখন এর অন্যরূপ দেখা যায়। আমরা মিনার ছেড়ে রাজভবনের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম।

---

৩. William Dalrymple। White Mughuls, P-30.

www.pathagar.com

'রাজভবন' যেটি এক সময় ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতের গভর্নর জেনারেলের বাসভবন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এটি গভর্নর জেনারেলের বাড়ি ছিল। এর নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে। তৈরি করেছিলেন তৎকালীন গভর্নর মারকুস ওয়েলেসলি। ২৭ একরের উপর তৈরি এ চারতলা ভবনের ক্ষেত্র প্রায় ৮৪,০০০ বর্গফুট। মারকুস ওয়েলেসলি এ ভবন নির্মাণে খরচ করেছিলেন, তৎকালীন পাঁচ লক্ষ ছয় হাজার তিন শত ছাব্বিশ রুপি (৫,০৬,৩২৬) ওই সময়কার তেশট্টি হাজার দু'শত একানব্বই পাউন্ডের সমান। ইংল্যান্ডের কেডেস্টোন হলের (Kedteston Hall) অনুকরণে তৈরি এ ভবন নির্মাণে এত অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অব ডাইরেক্টর ভালভাবে নেয়নি। পরে ওয়েলেসলিকে বরখাস্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং তাকে ইমপিচ করারও চিন্তা করা হয়েছিল, কিন্তু পার্লামেন্ট গ্রহণ করেনি। বর্তমানে এটি পশ্চিম বাংলা রাজ্যের গভর্নরের বাসভবন। ভারতের স্বাধীনতার পর প্রথম গভর্নর বা রাজ্যপাল ছিলেন সি গোপালাচারী। প্রথম রাজ্যপালের অভিষেকও হয়েছিল রাজ সিংহাসন রুমে (Throne Room)। ফেব্রুয়ারি ৮, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড মেয়ো-এর হত্যার পর দশদিন ঘটনাস্থল আন্দামান থেকে আনার পর ফেব্রুয়ারি ২০, ১৮৭২ পর্যন্ত লাশ এখানেই জনগণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে রাখা হয়েছিল। মেয়োকে আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারের বন্দিশালায় একজন পাঠান কয়েদি হত্যা করেছিল। কেন করেছিল তার বিবরণ পরে দেবার চেষ্টা করব।

গভর্নর জেনারেলের তৎকালীন প্রাসাদে ১৮০৩ হতে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বারো জন গভর্নর জেনারেল বাস করেছিলেন।

আমরা পশ্চিমের গেটের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। গেটটির সংস্কার করা হচ্ছিল। প্রাসাদের চারটি গেট ছিল যার দু'টি এখন প্রায় বন্ধ থাকে। এর দু'টি পশ্চিম আর দু'টি পূর্ব দিকে। আমাদেরকে রমেশ জানালেন যে, পূর্বদিকের গেট সংলগ্ন এলাকাই লালদীঘি আর রাইটারস্ বিল্ডিং এবং অন্যান্য স্থাপনা রয়েছে। যার এক সময়ের নাম ছিল ডালহৌসি স্কয়ার বর্তমানে বিবিডি স্কয়ার। রমেশকে বললাম যে, সেদিকে পরে যাব এখন আমাদেরকে হুগলীর তীরে নিয়ে যেতে।

আসলে কলকাতা হুগলী নদীর দুই তীরেই বিস্তৃত। যদিও হুগলী গঙ্গা নদীর শাখা নদী তথাপি হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এ নদীকেও গঙ্গা নদীর মত পবিত্র মনে করে, যার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় হুগলী নদীর দু'পাশে গড়ে উঠা অসংখ্য মন্দিরের অস্তিত্ব দেখে। এখানে ভক্তরা আসেন পূজা পাঠ করে নদীতে স্নানের জন্যে।

এখন অবশ্য অত না হলেও, অতীতে এখানে হিন্দুদের মৃতদেহও সৎকার করা হতো। ভাসিয়ে দেয়া হতো অস্থিমজ্জার অবশিষ্ট ছাইভস্ম। এখনও এখানকার ঘাটগুলোতে বিসর্জন দেয়া হয়।

www.pathagar.com

রমেশ বেশ কয়টি রাস্তা ঘুরে বিশাল ময়দানের একমাথা দিয়ে কলকাতার সবচাইতে পরিচিত ঐতিহাসিক স্থাপনা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে দিয়ে নদীর ধারে নিয়ে চলছিল। আমার পাশে বসা কামরুল একনাগাড়ে বহু বিষয়ে কথা বলেই চলছিল। সামনের সিটে বসে মুকুল তার হ্যান্ডিক্যাম বা ভিডিও ক্যামেরায় রাস্তার বিভিন্ন দৃশ্যের ছবি তুলতে ব্যস্ত। তার মুখ ভর্তি পান পরাগ থাকায় সহজে কথা বলতে পারছিল না। সব কথার সংক্ষিপ্ত জবাব 'হু' 'হা' এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখছিল। কিছুক্ষণ পর রমেশ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে দিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন যে আমরা এখানে নামব কিনা? আমরা তিনজনের কেউই নামতে চাইলাম না বরং কয়েক মিনিট দাঁড়াতে বললাম ছবি তুলবার জন্যে। আমি কয়েকবারই কলকাতায় এসেছি। যতবার এসেছি বাইর থেকেই এ স্থাপনা দেখেছি। আমার কখনই মনের তাগিদ হয়নি ভেতরে গিয়ে দেখবার। কেন যেন আমার সব সময় মনে হয়েছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল উপমহাদেশে ইংরেজ ঔদ্ধত্যের বহিঃপ্রকাশ। মনে করিয়ে দেয় আমরা নেটিভরা রাণী ভিক্টোরিয়ার এবং তার উত্তরসূরিদের নিকৃষ্টতম প্রজা ছিলাম। আমি দেখতে চাইনি। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আমাকে গৌরবান্বিত করে না। আমাকে মনে করিয়ে দেয় ঔপনিবেশিক নিষ্পেষণের একশত নব্বই বছর।

আমি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বা মেমোরিয়াল হলের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছিলাম। অপূর্ব সুন্দর শৈলীতে নির্মাণ করা হয়েছে এ মেমোরিয়াল। তৈরি শেষ হয়েছিল ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে। নির্মাণশৈলী ব্রিটিশ-মোগল আদলে গড়া। অনেকটা তাজমহলের আদলে। তৈরি করা হয়েছে রাজস্থানের সাকরানা শ্বেতপাথর দিয়ে। যে পাথর ব্যবহার হয়েছিল তাজমহল তৈরিতে। ৬৪ একরের বিশাল সবুজ চত্বর নিয়ে তৈরি এ মেমোরিয়াল। এর প্রধান স্থপতি ছিলেন স্যার উইলিয়াম এমারসন। তিনি নক্সা তৈরি শেষ করেছিলেন ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে এবং উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস পরে রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড। এক সময় এর সামনে লর্ড কার্জনের একটি মূর্তি ছিল বর্তমানে সে স্থানে স্থাপিত রয়েছে শ্রী অরবিন্দ গোস্বামীর মূর্তি। এ মেমোরিয়াল দৈর্ঘ্য প্রস্থে ৩৩৯ ফুট এবং ২২৮ ফুট। মাঝে গম্বুজের উচ্চতা ১৮২ ফুট। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে যখন নির্মাণ শেষ হয় তখন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা হতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। তথাপি ব্রিটিশ রাজ সরাসরি ভারত শাসনের প্রথম অধিশ্বর রাণী ভিক্টোরিয়ার মূর্তি চির ভাস্বর রাখতে এর নামকরণ করেছিল।

এ মেমোরিয়াল তৈরি করতে খরচ হয়েছিল ছিয়াত্তর লক্ষ রুপি (৭৬,০০,০০০)। তথ্যে প্রকাশ, এ খরচের সমুদয় অর্থ এসেছিল বিভিন্ন রাজ্যের রাজাদের এবং ব্রিটিশ রাজঘেঁষা স্থানীয় বিত্তবানদের নিকট হতে। মেমোরিয়ালের ভেতরে রয়েছে একটি জাদুঘর আর আর্ট গ্যালারি যেখানে রাণী ভিক্টোরিয়ার ছবি এখনও বিদ্যমান। আমি

www.pathagar.com

কখনও ভেতরে যাইনি। তথ্যে আরও প্রকাশ, এ স্থানটিতে একসময় ছিল পুরাতন প্রেসিডেন্সি জেল। অনেকের মতে এখানেই মহারাজা নন্দ কুমারের ফাঁসি হয়েছিল। অনেকে দ্বিমত পোষণ করে মনে করেন প্রকৃত ফাঁসির স্থানটি ছিল লালবাজার জেল প্রান্তরে।

আমি বেশ কয়েকটি ছবি উঠালাম সাথে মুকুল তার ভিডিও ক্যামেরা আর কামরুল ট্যাক্সিতে বসেই কয়েকটি ছবি নিয়ে নিল। আমাদের কাছাকাছি দাঁড়ানো অত্যন্ত সুন্দর সজ্জিত ঘোড়ার গাড়ি, এক সময়ের ভিক্টোরিয়া। এখানেই সীমিতভাবে ঘোড়া গাড়িগুলো পর্যটক বা উৎসুক জনতাকে নিয়ে চারিপাশে চলে। বেশ কিছু দর্শনার্থী জড়ো হয়েছে ভেতরে যাবার জন্য। এ ধারটা বেশ সবুজ। সারি সারি পাম গাছ ছাড়াও অন্যান্য ধরনের নানাবিধ বৃক্ষের সারি। ভেতরের চত্বরে, মোটামুটিভাবে পরিচর্যিত সবুজ ঘাসের আচ্ছাদন। আমরা ট্যাক্সিতে এসে বসলাম। রমেশ সার্কুলার রোড ধরল আমাদেরকে হুগলীর পাড়ে নিয়ে যাবার জন্য।

সার্কুলার রোডের দু'পাশেই বেশ সবুজের সমারোহ। রাস্তার দু'পাশের বহু গাছের বয়স একশত বছরের উপরে। রাস্তার দু'ধারসহ এ এলাকাটি কলকাতার আর সব এলাকা হতে বেশ পরিষ্কার এবং রাস্তাগুলোও পরিষ্কার। এই সম্পূর্ণ জায়গাটি ছিল এক সময়ে গহীন জঙ্গল। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আশে পাশের অংশসহ এ জায়গাটি নবাবী আমলে ছিল শিকারগাহ এবং মুর্শিদাবাদের শাসক নবাবদের পশুচারণ ক্ষেত্র। এ জায়গাটির এক সময়ের নাম ছিল হরিণ বাড়ি।

আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই হুগলী নদীর তীরে 'প্রিনসেপ' ঘাটের কাছে এসে পৌঁছলাম। রমেশ সেখানে আমাদের নামিয়ে দিয়ে বাবুঘাটের দিকে কাছাকাছি কোথাও দাঁড়াবে বলে জানালেন। আমরা তিনজনেই নেমে সামনে এগিয়ে ছোট একটি উদ্যানের মাঝে রোমান নির্মাণ শৈলীতে চতুরপাশে উন্মুক্ত একটি সাদা হলের সামনে পৌঁছলাম। এই হল বানানো হয়েছিল জেমস প্রিনসেপের স্মৃতিরক্ষার্থে। ছোট শিলালিপিতে কয়েকটি কবরের কথা বলা থাকলেও মেঝেতে খ্রিস্টান কবরের কোন কিছুই দেখতে পেলাম না। সবুজ চত্বরের একপাশে জনাবিশেক তরুণ-তরুণী গ্রুপ ছবি তুলবার জন্য দাঁড়িয়েছিল। তাদের একজন এসে পরিচয় দিয়ে বললেন যে তিনি একজন বাংলাদেশি ট্যুর অপারেটর। তরুণ-তরুণীর দল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের পঞ্চম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা এসেছে শিক্ষা সফরে, আজই কলকাতা ছেড়ে সিমলার দিকে রওয়ানা হবে। বেশ কয়েকজন তরুণ-তরুণী অতি উৎসাহে এসে আমার সাথে ছবি তুলল। মুকুল চুপচাপ তার হাতের মুভি ক্যামেরা নিয়ে ছবি তোলা অব্যাহত রেখেছে। কামরুল নিজের পরিচয় দিয়ে বহু বিষয়ে গল্প জুড়ে দিল। আমি ছবির পর্ব শেষ করে প্রিনসেপ সাহেবের বৃত্তান্ত খুঁজতে লাগলাম। বেশি দূর যেতে হয়নি। সামনেই পেলাম

www.pathagar.com

আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (ASI) এর গাঢ় নীল রংয়ের একটি বোর্ড, যার উপরে প্রিনসেপ ঘাটের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আর বিবরণী দেয়া। এখান থেকে পাঁচ হতে ছয়শত মিটার দূরেই হুগলী নদী আর তার অদূরেই বিদ্যাসাগর সেতু বা দ্বিতীয় হুগলী ব্রিজ। যার আরও উজানে বিখ্যাত হাওড়া ব্রিজ, বর্তমান নাম রবীন্দ্র সেতু।

প্রিনসেপ ঘাট জনসাধারণের জন্য খুলে দেয়া হয়েছিল ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে। তবে ঘাটটি ব্যবহৃত হতো ইউরোপীয়ানদের জন্য। নামকরণ করা হয় জেমস প্রিনসেপ নামক বহু গুণের অধিকারী একজন এঙ্গলো ইন্ডিয়ানের নামে। সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে জানা যায় যে, এ ঘাটটি তৈরি করা হয়েছিল তৎকালীন কলকাতা পৌরসভার বাসিন্দাদের অনুদানে। জেমস প্রিনসেপ ছিলেন একজন স্থপতি পরে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মী ভাষার একজন স্বীকৃত অনুবাদক। একসময় কলকাতা টাকশালের প্রধানও ছিলেন। প্রিনসেপ ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন। এখানে বছরে একবার প্রিনসেপ উৎসব হয়। ওই সময়ে এখানে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক রজনী।

www.pathagar.com

পাঁচ

১৮৫৭-ব্যারাকপুরের বিদ্রোহ

আমরা তিনজন প্রিনসেপ পার্ক ছেড়ে পাশের হাঁটা পথ ধরে হুগলী নদীর তীরে যেতে রওয়ানা হলাম। রাস্তাটির দু'পাশে ঘেরা দেয়া। গাছপালা থাকাতে ছায়ায় ঘেরা। এতক্ষণে মুকুল মুখ খুলতে পারল কারণ ততক্ষণে তার মুখের পানপরাগ শেষ। মুকুল শ্রীবাস্তব যখন বাংলায় কথা বলে তখন শুনতে বেশ মজাই লাগে। 'আমি কলকাতায় থাকছি বহু বছর লেকিন প্রিনসেপ ঘাটে কখনই আসি না' মুকুলের সরল উক্তি। কামরুল স্বভাবজাত ভঙ্গিতেই বলে উঠল– তুমি তো কলকাতায় বিয়ে করেছ মাত্র। মাঝে মধ্যে থাক 'ঘুরবে কোথায়?' জবাবে মুকুল বলল, 'আমি ঢাকায় অনেক ঘুরেছি তোমাদের সাথে'। দু'জনের কথা জমে উঠেছিল।

হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধারে রেললাইনের ফটক পার হলাম। মুকুল জানালো এটা কলকাতার সার্কুলার ট্রেন লাইন। কিছুক্ষণ পরেই একটি ট্রেন এসে প্রিনসেপ ঘাট স্টেশনে থামল। ট্রেনটি ছিল প্রায় ফাঁকা। আমরা হুগলী নদীর তীরের নদীর পাড়ের পাকা রাস্তায় এসে উঠলাম। এটি এখন পায়ে চলা পথ। গাড়ির প্রবেশ নিষেধ। নদীর পাড় ঘেঁষে কংক্রিটের রেলিং। জায়গায় জায়গায় বসবার জন্য সিমেন্টের বেঞ্চ পাতানো। কোথাও ইটের উপরে কাঠে তক্তা পেতে রাখা অস্থায়ী বেঞ্চ। হুগলী নদী। গঙ্গার অন্যতম শাখা যা হুগলী জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে হলদিয়া হয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। গঙ্গার আরেকটি শাখা মুর্শিদাবাদের পাশ দিয়ে হুগলীতে মিশেছে। ওই শাখাটিই বাংলা প্রান্তরের বহু ইতিহাসের সাক্ষী ভাগিরথী নদী। আদি গঙ্গা হতে ২৬০ কি. মি. প্রবাহিত হয়ে হুগলী নদী সাগরে পড়েছে। এ হুগলী নদী দেখেছে ইংরেজদের ভীরু পায়ে আগমন, নবাবের সেনাদের তাড়া খেয়ে পলায়ন, পলাশীর পর পুনরাগমন আর কলকাতা শহরের পত্তন।

আমরা নদীর ধারের রাস্তা দিয়ে দক্ষিণ মুখে হাঁটছিলাম। সামনেই রমেশের থাকবার কথা। সকালের দিকটা এ সময়ে এখানে জনসমাগম নেই বললেই চলে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে থাকলে নদীর পাড় হয়ে উঠে জনাকীর্ণ। তরুণ-তরুণীদের ভিড় জমে। ভিড় জমে প্রেমিক-প্রেমিকা আর নদীর বুকে নৌকা ভ্রমণের জন্য। পাড়ে বেশ কিছু ছৈওয়ালা নৌকা ভেড়ানো। এক মাল্লার নৌকায় মাল্লা নির্বিকারে ঘুমাচ্ছে। বিকেল

www.pathagar.com

হতে মধ্যরাত পর্যন্ত ব্যস্ত থাকে। এটাই তাদের রোজগারের একমাত্র পথ। আগের থেকে বলা থাকলে হালকা এ সব নৌকায় খাবারের ব্যবস্থাও করে রাখে। বিকেলে এখানে হালকা আর স্ট্রিট ফুডের পসরা বসে। মুখে পানি আনার মত কলকাতার বিখ্যাত ফুচকা, চটপটি আলুরদম আর ভেলপুরির হকারদের ভিড় থাকে এখানে। কয়েকটি হালকা খাবারের রেস্তোরাঁও রয়েছে নদীর এদিকটাতে।

আমরা হাঁটছি বাঁ দিকে বিদ্যাসাগর সেতু। এটি ঝুলন্ত সেতু। মাঝখানে সাসপেনশনের জন্য একটি পিলার। ওপারে হুগলী জেলা–কলকাতার আরেকাংশ। আমরা আরেকটু এগিয়ে ইটের পায়ার উপরে কাঠপাতা বেঞ্চের মত পেলাম। সাথে ছোট্ট একটি ঠেলাগাড়িতে চা বিক্রেতা ভদ্রলোক, তারই পাশে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক সাথে এক তরুণী। বেশ আয়েশে ছোট মাটির চা পাত্রে চুমুক দিচ্ছিলেন। কামরুল তিন কাপ চায়ের অর্ডার দিল। এ সব ফেরিওয়ালারা চা পরিবেশনে ছোট ছোট মাটির পাত্র ব্যবহার করে যেগুলো পরে ফেলে দেয়া হয়। যদিও এ ব্যবস্থা ছুঁত অছুঁতদের জন্য করা, তবে স্বাস্থ্যসম্মত বটেই। এ কারণেই রাস্তার পাশের খাবারগুলো সালপাতা ধরনের পাতার তৈরি পাত্রে পরিবেশন করে বলে খেতে অরুচি হয় না। এতক্ষণে কামরুল বয়স্ক ভদ্রলোকের সাথে জমিয়ে ফেলেছে। পরে আমাদের দাদা আর নাতনীর বিস্তারিত জানিয়ে বলল যে এক সময় ওই ভদ্রলোকের বাপ-দাদার বাড়ি ছিল সিরাজগঞ্জে। ভদ্রলোক পিডাব্লিউডিতে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। যেহেতু কামরুলের পিতা মরহুমও ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন এবং শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাস করেছিলেন, সে কারণেই পিতার সূত্র ধরে গল্পে মেতেছিল। বিদায় নেবার সময় কামরুল তার ভিজিটিং কার্ড দিয়ে এসেছে। আমাদের চা খাওয়া শেষ হলে আমরা পুনরায় হাঁটা শুরু করলাম।

হাঁটতে হাঁটতে কয়েক শ' মিটার এগুতেই নদীর তীর ঘেঁষে লোহার বেষ্টনী দিয়ে ঘেরা অনেকটা পর্যবেক্ষণ টাওয়ারের মত দ্বিতল চুবুর্জা দেখলাম। উপরের অংশে একটি ছত্রি। চতুর্দিকে খোলা। নিচের তলাটি উপরে উঠবার সিঁড়ি ঘর। সামনে ছোট একটি লোহার ফটক। ফটকটি এবং সিঁড়ি ঘরের দরজাটি তখন বন্ধ ছিল। ফটকের পাশেই একটি ফলকে বাংলায় এ জায়গার ইতিবৃত্ত লেখা। ওই ফলকের লেখাটি ছিল নিম্নরূপ :

'ভারতের মাটিতে পাকাপোক্তভাবে গেঁড়ে বসবার আগে ব্রিটিশ ফৌজ ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের শেষে অভিযান চালায় গোয়ালিয়র রাজ্যে। কিন্তু গোয়ালিয়রে মারাঠাদের দুর্বার প্রতিরোধের মুখে ২৯ ডিসেম্বর মহারাজপুর ও পুর্নিয়াতে ইংরেজ সেনাবাহিনীর ফৌজি অফিসার ও সেনানী নিহত হয়। তৎকালীন ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল লর্ড এলেনবরার-এর পরিকল্পনায় ও উদ্যোগে এবং সামরিক বাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল এইচ গডউইনের তত্ত্বাবধানে নিহত সেনানীদের স্মৃতির উদ্দেশে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে ঐস্লামিক (ইসলামিক) ও ইউরোপীয় নির্মাণ স্থাপত্যের মেলবন্ধনে নির্মিত হয় স্বল্প

www.pathagar.com

উচ্চতার এই আকর্ষণীয় স্মৃতিসৌধ গোয়ালিয়র মনুমেন্ট।"

পরিশেষে ভারতীয় পূর্ত বিভাগ যুক্ত করে '২০০০ খ্রিস্টাব্দে এই সৌধের মূল আদলটি রাজ্যবাসীর নিকট ফিরিয়ে দিতে পেরে স্বার্থের প্রতি দায়বদ্ধতা পালনে বিনম্র দাবিদার।'

১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের গোয়ালিয়রের যুদ্ধ এবং গোয়ালিয়র দখল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, বিশেষ করে পাঞ্জাব এবং সিন্ধু দখলে রাখবার জন্য। গোয়ালিয়রের নাবালক রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসতে দেয়নি ব্রিটিশ ইন্ডিয়া কাউন্সিল। ব্রিটিশ বাহিনী দু'দিক থেকে আক্রমণ করে। প্রথম আক্রমণ হয় আগ্রার কমান্ডার স্যার হিউজ গগের নেতৃত্বে মহারাজাপুরে। বেশ দুর্বার লড়াইয়ে মারাঠাদের ১৭,০০০ সদস্যের বাহিনী পরাজিত এবং ছত্রভঙ্গ হয়। অপরদিকে মেজর জেনারেল জন গ্রে-এর নেতৃত্বে ঝাঁসির অদূরে পুর্নিয়ায় ব্রিটিশ বাহিনী ১২,০০০ মারাঠা সদস্যদের পরাজিত করে গোয়ালিয়র দখল করে নেয়। ওই যুদ্ধে প্রায় ৮০০ ব্রিটিশ অফিসারসহ সদস্যদের মৃত্যু হয়। নাবালক রাজকুমার ছিলেন জয়াজিরাও সিন্ধিয়া। এই জয়াজিরাওই পরে ব্রিটিশ ছত্রছায়ায় প্রতিষ্ঠা করেন সিন্ধিয়া বংশ যারা আজও গোয়ালিয়রের প্রধান পরিবার। বর্তমানে ভারতের রাজনীতির সাথে জড়িত রয়েছে এ পরিবারের সদস্যরা।

গোয়ালিয়র মনুমেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকটি ছবি নেয়া শেষ হলে আমরা আবার উত্তর দিকে হাঁটা শুরু করলাম। আমাদের বাঁয়ে নদীর তীরে সান বাঁধানো বেশ কয়েকটি ঘাট পেলাম। মুকুল জানালো যে এ পুরোটাই আউটরাম ঘাট। এ এলাকার নাম রাখা হয়েছে জেনারেল স্যার আউটরামের নামে। বর্তমানে শেক্সপিয়র রোড, একসময়ের থিয়েটার রোড, হতে যে রাস্তাটি পার্ক স্ট্রিটের বরাবর হয়ে ময়দানের একাংশ দিয়ে এখানে মিলছে, সে রাস্তাটির নামও আউটরাম স্ট্রিট। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর যে কয়েকজন কর্মকর্তা ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহ বা প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে কোম্পানি তথা ব্রিটিশ রাজ আরও নব্বই বছরের জন্য দীর্ঘায়িত করেছিলেন আউটরাম তাদের অন্যতম। হ্যাভালক, চার্লস নেপিয়ার হেনরি লওরেন্স আর নিকোলসনের চাইতেও আউটরাম অগ্রসৈনিক হিসেবে বিবেচিত।[১] পরে আউটরাম কলকাতায় বহু বছর কাটান। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি বেঙ্গল ক্লাবের, সে দালানটি এখনও চৌরঙ্গিতে রয়েছে, সভাপতি ছিলেন।

আউটরাম ঘাটের আশেপাশে কয়েকটি মন্দির রয়েছে সেখানে প্রতি সকালে সূর্য উদয়ের এবং অস্তের সময় ভক্তরা পানিতে নেমে পূজো করেন। দিনের অন্যান্য সময়

১। লেখকের 'কত জনপদ কত ইতিহাস' ও 'যমুনা-গোমতীর-তীরে' একটি ভ্রমণ কথা' দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

গঙ্গার শাখা নদীতে ডুব দিয়ে পবিত্র হন। আমরা আরও কিছু দূর হাঁটলাম। দূরে কলকাতার প্রথম হাওড়া ব্রিজ, যার নাম এখন রবীন্দ্র সেতু, নজরে পড়ল। এই সেতুটি বর্তমান বিশ্বের হাতেগোনা যে কয়েকটি স্টিল ক্যান্টিলিভার প্রযুক্তিতে ব্রিজ রয়েছে তার অন্যতম। এর একটু দক্ষিণেই ছিল ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথম নির্মিত পন্টুন ব্রিজ। এরই পরিবর্তে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হাওড়া ব্রিজ জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেয়া হয়। এ ব্রিজ নির্মাণে ২৫,০০০ টন স্টিল ব্যবহার হয়েছিল। এটি তৈরি করেছিল ক্লিভল্যান্ড ব্রিজ এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি নামক একটি ব্রিটিশ কোম্পানি। বর্তমানে এর অধিকতর সংস্কার হয়েছে।

আরও কিছু উত্তরে গিয়ে রমেশের দেখা পেলাম। তিনি রাস্তার ধারে গাড়ি পার্ক করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন। আমরা গাড়িতে উঠলে রমেশকে জিজ্ঞাসা করলাম আমরা এখন ব্যারাকপুর যেতে চাইলে বিকেলে-সন্ধ্যার আগে ফিরতে পারব কিনা? রমেশ হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলে আমরা পূর্ব পরিকল্পনায় কিছুটা পরিবর্তন এনে ব্যারাকপুরে যেতে বললাম। দুপুরের খাবার ব্যারাকপুরে খেয়ে নেব। ব্যারাকপুর যেতে হলে আমাদের নদী পার হতে হবে। ভালই হল সে সুযোগে হাওড়া ব্রিজের উপর দিয়ে যেতে পারব। মুকুল রমেশকে জিজ্ঞাসা করল যে, ব্যারাকপুর যেতে হলে শিবপুর হয়ে যেতে হবে কিনা। রমেশ জানালেন যে শিবপুর হয়েই যেতে হবে। এবার কামরুল বলে উঠল, 'ভালই হবে পথে আমি আমার বাবার কলেজটি দেখতে চাইব।' আমিও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ দেখতে উৎসাহিত বোধ করছিলাম। আমাদের পূর্ব প্রজন্ম বাপ চাচারা ওই সময়ে বেশির ভাগই উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতাতে আসতেন। ওই সময় পূর্ব বাংলায় কারিগরি বিদ্যালয়ের অভাবে কলকাতায় এবং শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অনেকেই পড়তে আসতেন। শিবপুরের আলোচনায় কামরুলের যোগদানই ছিল বেশি। সে তার বাপের মুখে শোনা ছাত্র জীবনের অনেক কথাই বলল। তিনি (কামরুলের পিতা) কোন মাঠে ফুটবল খেলতেন তাও কামরুলকে বলেছিলেন।

আমরা বর্তমানের রবীন্দ্র সেতুতে উঠতে গিয়ে বাবুঘাট পার হলাম। এ ঘাটটি ছিল কোম্পানির কর্মচারীদের জন্য নির্মিত। বোধকরি বাঙালিরা বাবু থাকতেই পছন্দ করতেন। কোম্পানি বাহাদুরের করণিকদেরকে বাবুই বলা হতো। কোম্পানি বাহাদুরের মুন্সী এবং করণিক হিসেবে বাঙালি সমাজ এঙ্গলোসাইজড হয়ে উঠেছিল– সে কথা আগেও বলেছি।

আমরা রবীন্দ্র সেতু দিয়ে অপর পাশে হাওড়ার দিকে আসলাম। হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন ছিল তৎকালীন কলকাতার সাথে ব্রিটিশ ভারতের পূর্বাংশের অন্যান্য স্থানের যোগাযোগের পূর্ব প্রান্তর। এখান থেকে হুগলীর দিকে প্রথম ট্রেন চালু হয় আগস্ট ১৫, ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে। কলকাতাতে স্থাপিত হয়েছিল ইস্টার্ন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে হেডকোয়ার্টার

www.pathagar.com

(Eastern Indian Railway Headquarter)। এখনও সে দালানটি রয়েছে অতীতের ক্লাইভ রোড, বর্তমানের নেতাজি সুভাষ রোডে। বর্তমানে ভারতের ইস্টার্ন রেলওয়ের হেডকোয়ার্টার, যেখানে কোম্পানি স্থাপন করেছিল, সে জায়গাটি আদি ফোর্ট উইলিয়ামের উপর-পূর্ব কোণ। এ দালানের বর্তমান গেটটি ছিল ওই ফোর্টের উত্তরের নদী ঘাটের ফটক যেখান দিয়ে সিরাজ-উদ্-দৌলা তার বাহিনী নিয়ে জুন ২০,১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে দুর্গ (ভা ফোর্ট) দখলের পর প্রবেশ করেছিলেন।

আমরা হুগলীর পূর্ব পাড় হয়ে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি। গন্তব্যস্থান শিবপুর হয়ে ব্যারাকপুরে। এক সময়ের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পূর্বপ্রান্তের গুরুত্বপূর্ণ সেনানিবাস। এপার থেকে পশ্চিম পাড়ের কলকাতার গগনচুম্বি অট্টালিকাগুলো দৃশ্যমান। এ ধারটা এখনও পুরাতন জরাজীর্ণ এবং জনাকীর্ণ অঞ্চল। নদীর পাড়টাও তেমন গোছানো বা ভালভাবে সংরক্ষিত নয়। আশেপাশে দেখে মনে হচ্ছিল হাওড়া স্টেশন ধরেই একসময় গড়ে উঠেছিল রেলওয়ে কলোনি। জরাজীর্ণ বাড়িগুলোর বাইরের দেয়ালে প্লাস্টার বহু আগেই খসে পড়েছে। পুরাতন ইটগুলো কালের সাক্ষী দিচ্ছে। দেয়ালের গায়ে প্লাস্টারের জায়গায় রয়েছে অজস্র গোবরের কাচা ঘুটে। দেয়ালে সাঁটানো হয়েছে শুকাবার জন্য। এগুলো ব্যবহার হবে উনুন জ্বালাবার জন্য। কিছুদূর এগুতে দেখতে পেলাম একটি লোকো সেডকে সুন্দর সাজিয়ে রেলগাড়ির বহু পুরাতন স্টীম ইঞ্জিন তার সাথে লাগানো গার্ডের গাড়ি। দেখে মনে হল নতুন করে সজ্জিত হয়েছে সামনের চত্বর। ভেতরে ঢুকবার জন্য একটি গেট। রমেশকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে কয়েক মাস পূর্বে রেলমন্ত্রী পশ্চিম বাংলার অগ্নিকন্যা মমতা ব্যানার্জী, (বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী) পূর্বভারতের প্রথম রেলওয়ে ইঞ্জিন ও গার্ডের গাড়িকে সংস্কার করে জাদুঘর বানিয়েছেন। তবে এখনও জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়নি। কামরুল আমার পাশে পেছনের সিটে বসা আর সামনে মুকুল তার হাতে ভিডিও ক্যামেরা। মুকুল অনবরত ছবি তুলে যাচ্ছে আর কামরুল এসএমএস নিয়ে ব্যস্ত।

আমরা নদীর পূর্ব তীর ধরে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি। সামনে বিদ্যাসাগর সেতু, তার সামনে দিয়ে শিবপুর হয়ে ব্যারাকপুর যাব। হুগলী নদীর দু'তীরেই গড়ে উঠেছে কলকাতা শহর। বর্তমানে আরও সম্প্রসারিত হচ্ছে। চারটি বৃহৎ সেতু দু'পাড়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে। তবে এপারটি কিছুটা অনগ্রসর। নদীর দু'তীর দিয়েই উঁচু করে রাস্তা তৈরি। আমি পৃথিবীর অনেক শহরের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত নদী দেখেছি যার দু'ধার সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো এবং দু'ধারেই বন্যা নিবারণের প্রয়াসে উঁচু রাস্তা রয়েছে। দু'পাড়েই সমানভাবে বিস্তৃত রয়েছে শহর। এ মুহূর্তে জার্মানীর ডুসেলডর্ফে রাইন নদী আর দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলের হান নদীর দু'পাড়ের কথা মনে পড়ছিল। তবে হুগলীর দু'পাড়ে রয়েছে উন্নয়নের বৈষম্য। আমাদের রাজধানীর প্রধান নদী বুড়িগঙ্গার

www.pathagar.com

কথা মনে পড়লে দুঃখিত হওয়া ছাড়া কিছু করবার নেই। দূষিত দুর্গন্ধময় মৃতপ্রায় নদীর কথা মনে করিয়ে দেয়। আর দুঃখ হয় যখন দেখি নদীর দু'পাড় দখল করে অপরিকল্পিত স্থাপনা গড়ে উঠতে।

নদীর ধার ছেড়ে আমরা ঘনবসতি আর বাজারের মধ্যে পূর্ব দিকের রাস্তা ধরে চলছি। বাজারের মধ্যের রাস্তায় অসম্ভব যানজট। অনেকটা ঢাকা শহরের যাত্রাবাড়ির দিকটার মত। প্রায় আধাঘণ্টা লাগল এ বিশাল বাজার আর ঘনবসতি পারহতে। প্রায় ঘণ্টাখানেক চলবার পর আমরা শিবপুরের বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রধান প্রবেশপথের সামনে দাঁড়ালাম। সরু রাস্তায় গাড়ি রাখবার তেমন জায়গা নেই। হেঁটে কলেজে প্রবেশ করতে হবে। ফটকে দাঁড়ানো রক্ষী আমাদেরকে ভেতরে হেঁটে যেতে বললেন। আমরা তাই করলাম।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে কলেজের মূল দপ্তরের সামনে আসলাম। দালানটি দেখে মনে হয়নি যে এটি শতবর্ষ পুরাতন? তবে পিছনে যে অংশটি রয়েছে সেটিই আদি কলেজ যার বয়স প্রায় দু'শত বছরের উপরে হবে তাতে সন্দেহ নেই। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়েছিল ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে। এখানে তৎকালীন পূর্ব বাংলার বহু ছাত্র আসত ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। কামরুলের পিতা মরহুম এম এ ইসলাম সাহেব এখান থেকে পাস করেছিলেন। তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, পরে স্বাধীন বাংলাদেশের পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী ছিলেন। কামরুল খুঁজছিল সেই ক্লাস রুম যেখানে তার পিতা ক্লাস করেছিলেন। কামরুল একজন দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে সদুত্তর পেল না। পরে কলেজের ফুটবল মাঠের এক পাশে দাঁড়িয়ে বলল 'আমার আব্বার মুখে শুনেছি যে কলেজের ফুটবল মাঠে তিনি নিয়মিত খেলতেন। এটাই হয়ত সে মাঠ।' আমি বললাম 'কালের বিবর্তনে সে মাঠ কি এখন সে রকম রয়েছে? যদি এটাই সে মাঠ হয় তা হলে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। হয়ত এখন যে গ্যালারির ফটকে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সে সময় এ গ্যালারি নাও থেকে থাকতে পারে? কামরুল অনেক কিছুই বলছিল। আমি বুঝলাম এ সময়ে কামরুল তার পিতার কথা স্মরণ করছে।

আমরা অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং নয়, পূর্ব বাংলায় (বর্তমানে বাংলাদেশ) কারিগরি বিদ্যাপীঠের অভাবে এসব বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্যে আসতে হতো কলকাতায়। আমার পিতা মরহুম বেলায়েত হোসেনও কলকাতায় পশুসম্পদ (তৎকালীন এনিম্যাল হাজবেনড্রি) বিভাগে পড়াশুনা করেছিলেন।

শিবপুরের ওই সময়কার কলেজটি এখন বিশ্ববিদ্যালয়, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড সাইন্স ইউনিভার্সিটি (Bengal Engineering on Science Univvesity) নামে পরিচিত। প্রথমে এই কলেজ ক্যালকাটা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হিসাবে স্থাপিত

www.pathagar.com

হয়েছিল। ওই সময়ে এখানে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের জন্যে ইঞ্জিনিয়ারদের তৈরি করা হতো। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে এই কলেজ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আওতায় আসে। ১৮৬৫-১৮৭১ পর্যন্ত এ কলেজটি প্রেসিডেন্সি কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট হিসেবে পরিচিত ছিল।

বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এ কলেজ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এ.পি.জে আব্দুল কালাম।

গ্যালারি দরওয়াজার ডান পাশে বহু পুরাতন অশত্থ গাছ। ঝুড়িগুলো মাটিতে নেমেছে। গাছটির গুঁড়ি চারদিকে বাঁধানো। খুব বেশি ছাত্র-ছাত্রী চোখে পড়ল না। সামান্য কিছু দূরে দুই তরুণী ছাত্রী আরেকটি ছোট অশত্থ গাছের নিচে বসা। কামরুল কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে তাদের সাথে কিছুক্ষণ আলাপ করে আমরা যে ধারে অপেক্ষারত সেখানে এসে বলল, 'আমি পুরাতন ক্লাস রুমগুলোর খোঁজ নিচ্ছিলাম। ওরা বলল যে, যেহেতু তারা প্রথমবর্ষের ছাত্রী তাই এ কলেজের আদিঅন্ত সম্বন্ধে এখনও ওয়াকেব হাল হতে পারেনি।' মুকুল এবারে মুখ খুলে বলল, 'চলনা নেহী হ্যায় ক্যায়া' আমরা এখানে 'ছময়' কাঁঠালে 'কতখুনে' ব্যারাকপুর যাবো? চলো এখন এ খান থেকে'। মুকুল উত্তর প্রদেশের হিন্দি ভাষাভাষী বাংলায় কথা বললে বেশ ভালই লাগে। মহিলাকে মহিলা বলতে পারবে না বলে 'ময়লা'। হয়ত 'ময়লা'র অর্থ জেনে সজ্ঞানে বলে না হয় অজান্তে বলে তা আজও পরিষ্কার করেনি। এ যেন উইলিয়াম ক্যারির বাংলা শেখার মত। ক্যারি সাহেব মানুষকে 'মিনসে' বলতেই ভালবাসতেন। এ শব্দটা নাকি ইংরেজ পাদ্রী সাহেবের খুব পছন্দ হয়েছিল। অথচ ক্যারি সাহেবই বাংলা ব্যাকরণের উদ্যোক্তা ছিলেন। তারই উদ্যোগে বাংলাভাষায় প্রবন্ধ লেখা শুরু হয়েছিল তাও উনিশ শতকের মাঝামাঝি অর্থাৎ ১৮৪০-৫০ খ্রিস্টাব্দের কথা। উইলিয়াম ক্যারি কলকাতায় এগ্রি হরটিকালচার সোসাইটি স্থাপন করেছিলেন, ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে। তবে মুকুল কোন ক্যারি সাহেব নন। ওই নাম কস্মিনকালেও শুনেনি।

আমরা গেট দিয়ে বের হয়ে রমেশের গাড়িতে চড়লাম। একটু দূরেই কলকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেন। এখানে নবাবী আমলে ছোট দুর্গ ছিল। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের পরে এ দুর্গের জায়গায় বোটনিক্যাল গার্ডেনের গোড়াপত্তন হয়। রমেশ জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমরা ভেতরে যাব কিনা? সময়ে কুলাবে না বলে আমরা তাকে ব্যারাকপুরের দিকে যেতে বলে রাস্তায় ভাল কোন খাবারের দোকান পেলে দাঁড়াতে বললাম। দুপুরের আহারের সময় প্রায় সন্নিকটে। তাই সিদ্ধান্ত হল যে আমরা ব্যারাকপুরের ধারে কাছে কোথাও গিয়ে খেয়ে নেব। কিছুদূর গিয়ে বাঁয়ের এক রাস্তা দেখিয়ে রমেশ আমাদেরকে জানালেন, যে এ রাস্তার নাম 'যশোহর রোড'। এধার দিয়ে পেট্রাপোল বর্ডারে যাওয়া যায়। জিজ্ঞাসা করলাম রাস্তাটি কেমন, রমেশ জানালেন, তেমন ভাল নয়। কেন এত

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ভাল নয়। উত্তর দিল মুকুল। ভারতীয় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এ রাস্তাকে উন্নত করতে চাইলেও পশ্চিম বাংলা সরকার ভূমি অধিগ্রহণ করছে না বলে রাস্তাটি চওড়া করে ন্যাশনাল গ্রিডে আনতে পারছে না। এদিকে পশ্চিম বাংলা সরকারও তেমন গা করছে না। জমি অধিগ্রহণ করলে ভোট নষ্ট হবে তাই।'

'ও তাই বুঝি' আমি ওটুকু বলেই চুপ রইলাম। কামরুল পশ্চিম বাংলার বাম সরকারকে এক হাত নিল। মুকুল বলল, 'তাহলে তুমি মমতা ব্যানার্জিকে চীফ মিনিস্টার বানিয়ে দাও।' আমি হেসে বললাম 'সম্ভাবনা আছে।' রমেশ আমাদের হৈ চৈ আর এ সব কথাবার্তা শুনে মুচকি হাসছিলেন আর পাশে আড়াআড়িভাবে দাঁড়ানো বাস ড্রাইভারের পিন্ডি চটকাতে চটকাতে কষ্ট করে পাশ কাটিয়ে চলছিলেন।

আমরা ঘনবসতি ছেড়ে কিছুটা উন্মুক্ত রাস্তা দিয়ে চলছিলাম। রাস্তার দু'ধারের জায়গায় জায়গায় অস্থায়ীভাবে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করার জন্য নির্মিত আচ্ছাদন। প্রত্যেকটি পরিবারের সাথে বেশ কয়েকটি মহিষ। এক প্রকার মহিষের বাতান বানানো। আমি মুকুলকে এদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিলেন রমেশ। রমেশ বললেন, 'স্যার এরা বিহারের ছোট জাতের লোক। মহিষ চড়ায় আর দুধ বেচে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এরা কি যাদব গোত্রের'।

'না সাহেব যাদবদের নিচে'।

'যাদবরা কি এখন জাতে উঠেছে?'

'না সাহেব, তবে এরা বিহারে বেশ শক্তিশালী হয়েছিল। এখনও একটু আধটু আছে।'

'লালু প্রসাদের বদৌলতে বিহারের যাদবদের উন্নতি হয়েছে। লালুর বাবাও 'ভেহেস' (মহিষ) চড়াতো, দুধ বিক্রি করতো। রমেশের মুখ খুলবার পূর্বেই মুকুল বলল।

এ ধরনের অর্থবিহীন কথাবার্তা চলতেই লাগল। আমরা ব্যারাকপুর শহরে চলে এসেছি। রমেশ বললেন, 'কোথায় যাবেন স্যার।'

'ব্যারাকপুর ছাউনি (সেনানিবাস)'

আমার কথার জবাবে রমেশ বললেন, 'রাস্তাটা জিজ্ঞাসা করে নেই?'

এবার কামরুল বলল, 'আমরা কি দুপুরের খাবার খাব না?'

'নিশ্চয়ই এখানে কোন রেস্তোরাঁ পেলে খেয়ে তারপরে যাই।' কামরুল বলল, সেটাই ভাল। আমাদের চোখে কোন রেস্তোরাঁ পড়ল না। রমেশ ডান বাঁ না দেখেই চলছিলেন। শহরটি একেবারেই এ অঞ্চলের যে কোন ছোট মফস্বল শহরের মত তবে

www.pathagar.com

কলকাতার অতি সন্নিকটে বলে হয়ত একটু বেশি ব্যস্ত। আমাদের দুপুরের খাবারের তোয়াক্কা না করে কয়েক রাস্তা ঘুরে রমেশ ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টের প্রধান সড়ক দিয়ে প্রবেশ করলেন। ঢুকবার মুখে ছোট বাজার, যেমনটা উপমহাদেশের সকল সেনা ছাউনিগুলোতে দেখা যায়। এখান থেকেই ব্যারাকপুরের ঐতিহাসিক আর বহুল আলোচিত সেনাছাউনি শুরু। কামরুল বলে উঠল 'আমরা ক্যান্টনমেন্ট পৌছলাম কিন্তু দুপুরের খাবারের কোন জায়গা পেলাম না? আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, হয় ক্যান্টনমেন্টেই রেস্তোরাঁ পাব আর না হয় বের হবার সময় খেয়ে নেব। একটু দেরি হলে ক্ষতি নেই।' দু'জনেই সম্মতি দিল। দু'জনেই আমার কাছে ব্যারাকপুর সম্বন্ধে শুনতে চাইল। মঙ্গলপান্ডে সম্বন্ধে দু'জনেই আমীর খানের ছবি 'দি রাইজিং' দেখেই ধারণা করে নিয়েছে। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতটুকু কুলালো ব্যারাকপুরের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিলাম।

উপমহাদেশের ইতিহাসের ছাত্র এবং যারা আমার মত যৎসামান্য ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়গুলো পড়েছেন ব্যারাকপুর তাদের কাছে অজানা নয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের 'সিপাহি বিদ্রোহ' বা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা এখান থেকেই হয়েছিল। যে ব্যক্তি ওই যুদ্ধের মূল স্পৃহা হিসেবে কাজ করেছিলেন তাকে মিরাটের বিদ্রোহের কয়েকমাস পূর্বেই ফাঁসি দেয়া হয়েছিল। তিনি ছিলেন উচ্চবর্ণের ওউধের ব্রাহ্মণ সিপাহি মঙ্গল পান্ডে। ৩৪ নেটিভ ইনফেন্ট্রি ব্যাটালিয়নের সিপাহি মঙ্গল পান্ডে বিদ্রোহ করেছিলেন ২৯ মার্চ, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে। পলাশীর যুদ্ধের প্রায় একশত বছর পর।[২]

কলকাতা শহর হতে প্রায় চৌদ্দ হতে পনের মাইল দূরে হুগলী নদীর তীরে ব্যারাকপুর কলকাতা পত্তনের পূর্বেই জব চার্নকের হাতে গড়ে উঠে। পরের বার চার্নক আরও উত্তরে কলকাতা শহরের পত্তন করেন। পলাশীর যুদ্ধের পরে পরেই কোম্পানির ইংরেজ বাহিনী সেখানে ঘাঁটি গেড়ে বসে। তবে ১৭৭৫ হতে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ব্যারাকপুরই ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্যতম ঘাঁটি। এখনও ভারতীয় সেনাবাহিনীর অন্যতম ছাউনি এই ব্যারাকপুর। এখানে তৎকালীন গভর্নর জেনারেলের গ্রীষ্মকালীন বাসস্থানও ছিল। এ বাসস্থান তৈরি করা নিয়ে অনেক ভিন্নমত রয়েছে। অনেকে মনে করেন বর্তমানের এ বিশাল প্রাসাদোপম বাড়িটির আসল প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জব চার্নক। সতের শতকের কথা।

ব্যারাকপুরে মঙ্গল পান্ডের বিদ্রোহই ভারতীয় সেনা সদস্যদের প্রথম ছিল না। তবে ওই বিদ্রোহ ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহি যুদ্ধ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছিল। নড়বড়ে করে দিয়েছিল উপমহাদেশে কয়েক শত বছরের ইংরেজ শাসনের পরিকল্পনা। ওই বিদ্রোহের নব্বই

২। লেকের 'কতজনপদ কত ইতিহাস' এবং 'যমুনা গোমতীর তীর : একটি ভ্রমণ কথা' দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

বছরের মাথাতেই ব্রিটিশকে ভারত ছাড়তে হয়েছিল। মঙ্গল পান্ডের বিদ্রোহের আগেও ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিদ্রোহ করেছিলেন সিপাহি বিন্দা তিওয়ারী। সিপাহিরা ভারতের অন্য অঞ্চলে যেতে এবং বেতন ভাতার বৈষম্য দূর করবার দাবির প্রেক্ষিতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ করেছিল। ঘটনাটি ঘটে অক্টোবর, ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে। ওই সময়ে বহু সিপাহির চাকরিচ্যুতি হতে পর্যন্ত শাস্তি দেয়া হয়েছিল। সিপাহি তিওয়ারীসহ ছয়জনকে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেবার জন্য প্রকাশ্যে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল। ওই ঘটনার পর কোম্পানির বাহিনীর কমান্ডাররা নিশ্চিত ছিলেন যে ভবিষ্যতে এ ধরনের বিদ্রোহ করবার সাহস পাবেনা নেটিভ সিপাহিরা। তেমন হয়নি। মাত্র ২৭ বছরের মাথায় এখান থেকে (ব্যারাকপুর) বৃহত্তর বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। ফাঁসি দেয়া হয় জমাদার ঈশ্বরি প্রসাদ আর সিপাহি মঙ্গল পান্ডেকে। স্বাধীন ভারতে মঙ্গল পান্ডে একজন নায়ক। ব্যারাকপুর ও ভারতের রাজধানীসহ বহু শহরে মঙ্গল পান্ডের স্মরণে বহু সড়ক ও স্থাপনার নাম রয়েছে।

আমরা আরও কিছু দূর এগুলাম। আশপাশের দালান কোঠার চেহারা দেখেই মনে হল আমরা মূল ছাউনিতে প্রবেশ করেছি। পুরাতন ব্রিটিশ সেনা ছাউনি-এর আদলে উপমহাদেশের, বিশেষ করে ভারত-পাকিস্তানে এ ধরনের সেনাছাউনি আজও রয়েছে। কিছু দূর সামনে যেতেই দু'রাস্তার মাথায় কোমর সমান উচ্চতার দেয়াল ঘেরা একটি সরণি চোখে পড়ল। বেশ বড় অশত্থ গাছের নিচে এই সরণি। সামনে ভারতের পতাকা উড়ছে। একটি ফটক। ফটকটি বন্ধ। উপরে লেখা 'মঙ্গল পান্ডে' সরণি। রমেশকে গেটের পাশে দাঁড়াতে বললাম। ফটকটি বন্ধ ভেতরে যাবার উপায় নেই। দেয়াল টপকে যাওয়া যেত, যাইনি। সামনে ছোট একটি বেদি। সেখানে মঙ্গল পান্ডের নাম লেখা। এ জায়গাটি মঙ্গল পান্ডের ফাঁসির জায়গা নয়। তাকে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল তৎকালীন ৩৪ ব্যাটালিয়নের প্যারেড গ্রাউন্ডের এক কোণায়।

আমরা তিনজনেই দাঁড়ানো। কামরুল জিজ্ঞাসা করল এখানে কি ফাঁসি দেয়া হয়েছিল?

'মনে হয় না' আমার উত্তর।

'তবে এখানে এ সরণি কেন'

'এর উত্তর আমার কাছে নেই'। মুকুলের দিকে তাকালাম। মুকুল ভিডিও ক্যামেরা হতে চোখ সরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'জানি না' আমি কখনও আসি নাই আর ছবিতে যা দেখেছি তার বাইরে আমার জ্ঞান নেই।'

হয়ত বা আমাদের এখানে দাঁড়াতে দেখে কয়েকজন লোককে জড়ো হতে দেখলাম। একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে এখানকার বাসিন্দারা মঙ্গল পান্ডের মৃত্যু দিবস পালন করে আর ভারতের স্বাধীনতা দিবসে এখানে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান

www.pathagar.com

হয়। সে কারণেই সেনা ছাউনির বাইরে এ সরণি তৈরি করা হয়েছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে মঙ্গল পান্ডেকে যেখানে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল সে জায়গাটি কোথায়। ভদ্রলোক জানালেন সে জায়গায় একটি মন্দির রয়েছে আর জায়গাটি বর্তমানে পুলিশ একাডেমির প্যারেড গ্রাউন্ডের একাংশ। পরে রমেশকে কোন দিকে যেতে হবে তাও দেখিয়ে দিল। আমরা ওই নির্দেশনা মোতাবেক মূল সেনানিবাসে প্রবেশ করলাম। মূল সড়ক বেশ চওড়া। অন্যান্য সেনানিবাসের মতই মূল সড়ক থেকে বিভিন্ন ইউনিট লাইনের দিকে লেন চলে গিয়েছে। রাস্তার দু'পাশে বাংলো প্যাটার্নের ব্রিটিশ আমলের তৈরি বাড়ি। আরও পুরাতনগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে জঙ্গল হয়ে রয়েছে। বহু পরিচিত স্থাপনাগুলো দেখলাম। এসব স্থাপনা আর রাস্তার নামের সাথে আমি পরিচিত। এগুতেই চোখে পড়ল মঙ্গল পান্ডে পার্কের দিক নির্দেশনা। এতক্ষণে আমরা খাবারের কথা ভুলে গেলাম। রমেশকে দিক নির্দেশনা ধরে পার্কে যেতে বললাম। জায়গা এবং রাস্তাটি যে কোন সেনাছাউনির মতই পরিষ্কার। সবুজের সমারোহ। গাছগুলো যত্ন করে রাখা। ক্যান্টনমেন্ট নির্বাহী অফিসারের বাড়ি আর দপ্তর চোখে পড়ল। যে কোন সেনা ছাউনিতেই এ অফিস দেখা যায়। এ অফিসই সেনাছাউনিতে বেসামরিক প্রশাসকের দপ্তর।

আমরা অপেক্ষাকৃত নির্জন রাস্তায় প্রবেশ করে নদীর দিকে এগুচ্ছিলাম। আশপাশের গাছগুলো বিশাল বহু পুরাতন মনে হয় এরা শতবর্ষের ইতিহাসের সাক্ষী। এ ধারটা নিরিবিলি। কিছু দূর এগুতে চোখে পড়ল 'ফ্লাগ স্টাফ হাউজের' ফলক। ছায়ায় ঘেরা বাউন্ডারি দেয়ালের মধ্যে সুরক্ষিত একটি মাঝারি গোছের বাংলো। এখানেই এ ছাউনির কমান্ডারের বাস। পাশের রাস্তা ধরে কিছু দূর এগুতেই দু'পাশে দেয়ালের মধ্য দু'টি দালান। প্রচুর জায়গা উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা বাঁদিকের উঁচু দেয়ালের উপর দিয়ে বিশাল বাংলো প্যাটার্নের প্রাসাদোপম অট্টালিকা চোখে পড়ল। এটাই এক কালের গভর্নর জেনারেলের বাড়ি। বাড়ির বিশাল সীমানার চতুর্পাশে ভেতরের দিকে মুখ করা বেশ কয়েকটি মূর্তি। মূর্তিগুলো দেখেই মনে হল ব্রিটিশ রাজের হর্তাকর্তাদের মূর্তি। ভেতরে ঢুকবার এধারের পথ বন্ধ। পরে জানলাম এটা সংরক্ষিত স্থান। দালানটি এখন পুলিশ ডিপার্টমেন্টের হাসপাতাল। আরও কিছুদূর এগুতেই হাতের ডানে লোহার জালি দিয়ে ঘেরা দেয়া একটি পার্ক। পার্কের প্রধান ফটকটি বন্ধ। পার্কের সামনে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে হুগলী নদী। নদীর দু'পাড়েই সবুজের সমারোহ। পার্কের মাঝখানে মঙ্গল পান্ডের আবক্ষ মূর্তি। মূর্তির দু'পাশে উনিশ শতকের দুটো কামান রাখা। ফটকের উপরে বড় করে সাইনবোর্ডে লেখা 'মঙ্গল পান্ডে পার্ক'। এ পার্কসহ পাশের দেয়াল ঘেরা অংশসহ এক সময় অনেক বিশাল এলাকা জুড়ে এ পার্কটি তৈরি করা হয়েছিল। এখানে পুরাতন গভর্নর হাউসের অপর পাশে গলফ গ্রাউন্ড ছিল। এখনও আছে কিনা

www.pathagar.com

জানা যায়নি, কারণ আমরা সেদিকে যাইনি। পার্কটি আজ বন্ধ, কাজেই আশপাশে লোক সমাগমও কম। পার্কের ফটকে, সামনে ছোট ছোট তিনটি চায়ের দোকান। দোকান খোলা তবে একটিতে ছাড়া বাকি দু'টিতে কোন জনমানুষ চোখে পড়ল না।

আমরা পার্কের সামনে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে নদীর পার পর্যন্ত গেলাম। একটি বিশাল ঘাট বাঁধানো। তারই সামনে কালী মন্দির। এখানেও হয়ত ভক্তরা গঙ্গা স্নানে আসেন। আমরা ঘাটে দাঁড়িয়ে ওপারের গ্রামগুলো দেখলাম। চারদিকে সবুজের সমারোহ, তার মাঝ দিয়ে হুগলী নদী বয়ে যাচ্ছে। এ সময়েও নদীতে ভরা পানি। হবে না কেন এ নদীকে বাঁচাতে ফারাক্কা বাঁধ কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এক সময়ের মৃত প্রায় হুগলীতে এখন বারো মাস পানি থাকে। ঘাটে একটি সুন্দর সাজানো নৌকা বাঁধা। মাঝি আমাদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে নৌকা ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানালো। ঘণ্টা প্রতি দুইশ' রুপি। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম এত টাকা দিয়ে কত লোক এ নৌকা ভ্রমণ করে। তিনি জানালেন, পার্ক খোলা থাকলে প্রচুর লোক হয় তখন তার ফুরসত থাকে না। এ সময়ে তার আমদানি তেমন নয়। তার আমন্ত্রণে আমাদের কাছ থেকে তেমন সাড়া না পেয়ে নিজেই নৌকার ভেতরে বসে প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে প্রাণভরে ধূমপানে মনোযোগ দিলে আমরা ঘাট ছেড়ে ফিরতি পথে রওয়ানা হলাম।

ফিরতি পথে দেয়াল ঘেরা বাংলোটির একপাশে একটি বিশাল মূর্তির পেছন দিকটা চোখে পড়ল। বেশ কয়েকটি মূর্তি যার মধ্যে সবচাইতে বড়টি লর্ড ক্যানিং-এর। লর্ড ক্যানিং-এর বিশাল মূর্তিটি বাংলোর সামনে ছিল। ভারতের স্বাধীনতার পর মূর্তিটি সরিয়ে নেবার কথা থাকলেও কম্পাউন্ডের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় নাই। তবে স্থান পরিবর্তন করে এখন যেখানে রাখা হয়েছে তার কাছেই মিসেস ক্যানিং-এর মূল কবর রয়েছে। তবে কবরের স্তম্ভটি এখান থেকে সরিয়ে সেন্ট জন চার্চের বারান্দায় রাখা হয়েছে। এখনও সেখানে রয়েছে।

www.pathagar.com

ছয়

কফি হাউসের সেই আড্ডা

আমরা রমেশের গাড়িতে ফিরতি পথে রওয়ানা হলাম। তখনও দুপুরের খাবার খাইনি। ভাবছিলাম পথে কিছু একটা খেয়ে নেব। তখন প্রায় বিকেল হয়ে আসছে। দুপুরের খাবারের সময় অতিক্রান্ত। রাস্তায় অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মনমত খাবারের কোন জায়গা পেলাম না। তাছাড়া সন্ধ্যা প্রায় হয়ে আসছে, কাজেই এ সময় কোন রেস্তোরাঁই দুপুরের খাবার পরিবেশন করতে পারবে বলে মনে হলো না। রাস্তায় ক্রমেই ভিড় বাড়ছিল। এখন অফিস ছুটির সময়। কলকাতায় প্রচুর যানবাহন থাকলেও রাস্তার সংখ্যা অনেক বেশি। এক জায়গায় যাবার একাধিক পথ রয়েছে। দুপুরে অভুক্ত থাকলেও আমরা সবাই এই ঐতিহাসিক সেনা ছাউনিটি দেখে বেশ তৃপ্ত বোধ করছিলাম। আমি এরই মধ্যে কলকাতায় আমাদের মিশনের একজন কর্মকর্তার সাথে কথা বলে ২৪ ডিসেম্বর পাটনা যাবার এবং ২৬ ডিসেম্বর ফিরতি পথের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ট্রেনে তিনটি টিকেটের ব্যবস্থার অনুরোধ জানালে তিনটি টিকেট রাতে নয়টার দিকে হোটেলে পৌঁছে দেবার কথা বলেছিল। টিকেটের জন্য আমাদের নাম আর বয়সের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনজনের নাম আর বয়স জানিয়ে দিলাম। একমাত্র আমি ছাড়া আর দু'জনের বয়স ষাট পার হয়নি। কাজেই আমি একমাত্র সিনিয়র সিটিজেনের আওতায় পড়ি এবং ট্রেনের টিকেটের মূল্যে রেয়াত পাবার দাবিদার।

বেশ কিছুদূর এগুবার পর মুকুলকে জিজ্ঞাসা করলাম কলকাতার বিখ্যাত কফি হাউস কতদূর। এই কফি হাউস নিয়ে মান্না দে-এর অসামান্য গানের কারণে দুই বাংলাতেই ঘরে ঘরে পরিচিত হয়ে উঠেছে। আমার প্রশ্নের জবাব মুকুল দেবার আগেই রমেশ বললেন, 'কলেজ রোড একটা কফি হাউস আছে।' আমি বললাম, 'হ্যাঁ কলেজ রোড বা স্ট্রিটেই কফি হাউস। মুকুল বলল 'আমি কোন দিন যাইনি।' কামরুলেরও ওই একই কথা। কাজেই সিদ্ধান্ত হল আমরা কফি হাউসে গিয়ে কিছু হালকা খাবার খেয়ে নেব। রথ দেখা আর কলা বেচা এক সাথে হবে। এই কফি হাউসেই এক সময় কলকাতার আঁতেলরা ভিড় জমাতেন। চলতো আড্ডা। আর এ আড্ডাকে কেন্দ্র করেই গান গেয়েছিলেন মান্না দে। তার গানেও কয়েক বন্ধুর আড্ডা মারার গল্পটি ফুটে উঠেছে। ফুটে উঠেছে কিভাবে এই কফি হাউসে প্রজন্মের পর প্রজন্ম আড্ডা দিয়েছে এবং এখনও দিচ্ছে।

www.pathagar.com

আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই কলকাতার আঁতেলদের মিলন স্থান বিখ্যাত কলেজ স্ট্রিটের জনাকীর্ণ গলিতে প্রবেশ করলাম। একসময় হয়ত রাস্তা প্রশস্তই ছিল। রাস্তার মাঝ দিয়ে ট্রাম লাইন। দু'পাশ এখন বইয়ের দোকানে ছেয়ে গেছে। চোখে পড়ল স্ট্রিট ফুড আর বইয়ের দোকান। সব বয়সের নারী-পুরুষের ভিড়। কিছু দূর এগুতেই চোখে পড়ল উপমহাদেশ খ্যাত এক সময়ের অবিভক্ত বাংলার অন্যতম বিদ্যাপীঠ কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ, যে কারণে এ রোডের নাম কলেজ স্ট্রিট। প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনেই একটি সরু গলি। দু'পাশে শত শত বইয়ের দোকান। হরেক রকমের বই। নভেল নাটক হতে সব ভাষার বই পাওয়া যায় এখানে। এখানে রয়েছে বাংলা ভাষার বহু নামকরা প্রকাশকের অফিস আর বইয়ের দোকান।

রমেশ গাড়িটি প্রধান সড়কে রেখে আমাদের একটি ছোট নিয়ন বোর্ডে শুধু কফি হাউস লেখা একটি তিনতলা দালান দেখিয়ে বললেন, 'এটাই কফি হাউস। আমি কলেজের আশপাশেই থাকব। যাবার সময়ে আমাকে মোবাইল করলেই আমি আপনাদের নিতে আসব।' সামনে প্রেসিডেন্সি কলেজের চত্বরে হয়তো কোন অনুষ্ঠান হচ্ছে। ভেসে আসছিল গানের আওয়াজ। বর্তমান যুগের ব্যান্ড সঙ্গীত। আমরা বেশ পুরাতন এক দালানের ভেতরে ঢুকতেই একটি দিক-নির্দেশনা পেলাম। কফি হাউস দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায়। সরু পুরাতন ধাঁচের সিমেন্টের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয়। ধাপগুলো বেশ উঁচু। প্রচুর লোক উঠানামা করছে। দ্বিতীয় তলায় উঠতে হাতের ডানদিকের একটি দরজার উপরে বোর্ডে নিয়নসাইনে সুন্দর করে লেখা 'কফি হাউস' ইন্ডিয়ান কফি ওয়ার্কারস কোঅপারেটিভ সোসাইটি। আরেকটু উপরে নীল রংয়ের সাইনবোর্ডে লেখা 'ইন্ডিয়ান কফি হাউস', ১৫, বঙ্কিম চন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩। সিঁড়িটি উঠে গেছে আরেক তলায়। কফি হাউসের হলের উপরের বেলকনিতে উঠবার পথ। দরজার বাঁ দিকে রয়েছে অনেকগুলো প্রকাশনা অফিস। হলের ভেতর থেকে প্রচুর লোকের কথোপকথনের আওয়াজ গম গম করছে।

আমরা তিনজনে ভেতরে প্রবেশ করলাম। একটি বড়োসড়ো হল ঘর। প্রচুর টেবিল পাতা। প্রত্যেক টেবিলে পাঁচ থেকে ছয়টি চেয়ার পাতা। একনজরে যা দেখলাম তাতে মনে হল কোন টেবিলই খালি নেই। উর্দি পরা বেয়ারারা ছুটাছুটি করছে। এখানে বয়স্ক হতে মধ্যবয়েসি এমনকি কলেজের তরুণ-তরুণীদের বসা দেখলাম। তবে তরুণ-তরুণীদের সংখ্যা কম। উপরে চারপাশে টানা বেলকনি। সেখানে প্রচুর লোক। ভেতরে ধূমপান নিষিদ্ধ তাই রক্ষা। সামনের দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের যুবা বয়সের বেশ বড়োসড়ো একটি বহু পুরাতন পেইনটিং শোভা পাচ্ছে। ছবিটিই এই কফি হাউসের মাহাত্ম্যকে ফুটিয়ে তুলেছে। হাতের ডান দিকে একটু বয়স্ক লোকদের সমাগম। মনে হচ্ছিল এ জায়গাটি বোধহয় নির্ধারিত কবি-সাহিত্যিকদের জন্য। অন্তত সেখানে বসা

www.pathagar.com

লোকজনকে দেখে তাই মনে হল। আমরা তিনজনে দাঁড়িয়ে বসবার জায়গা খুঁজছি। সারাদিনের হাঁটাহাঁটিতে কিছুটা ক্লান্ত তার উপরে পেটে দারুণ ক্ষিদে।

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে তার সামনেই ছোট একটি টেবিল। টেবিলের এক পাশে মধ্য পঞ্চাশ অথবা ষাটের কাছাকাছি দু'জন ভদ্রলোক বসে কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছেন আর নিজেদের মধ্যেই কিছু হালকা কথাবার্তায় মগ্ন। একজন প্যান্ট শার্ট পরা। গায়ে চেকের শার্ট। শার্টের উপরে সোনালী রংয়ের হাফ সোয়েটার। তার উপরে টুইডের কোট। চোখে চশমা। থুতনির নিজের অংশে সাদা-কালো দাড়ি। মাথার প্রায় সাদা কালো চুলের মাঝখান দিয়ে সিঁথি। চোখে চশমা-চুপচাপ অন্যজনের কথা শুনছেন বলে মনে হল। যিনি বক্তা তিনি প্রায় সমবয়সী। ঠোঁটের উপরে ভারী মোছ। সামান্য টাক, চুলগুলো কালো রং করা, চোখে শৌখিন ফ্রেমের চশমা। পরনে চোগা পাজামা। গায়ে আচকান। তার উপরে ধূসর রংয়ের পশমি শাল জড়ানো। চাহনিতে নাটুকেপনা রয়েছে। আমাদের তিনজনকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একজন বেয়ারা তিনটে চেয়ার এনে ওই টেবিলে লাগিয়ে দিলে আমি দু'জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভদ্রতা রক্ষার্থে বসবার অনুমতি চাইলে আচকান পরা ভদ্রলোক মাথার চুলে হাত দিয়ে চুলগুলোকে সামলাতে সামলাতে সিনেমার নায়কের মত চাহনি দিয়ে গম্ভীর সুরে বললেন, 'বসুন'। তার ভঙ্গিতে মনে হল আমাদের এখানে বসতে বলাতে খুব খুশি হতে পারেননি। আমি মাঝে মুকুল আর কামরুল দু'পাশে বসে পড়ল। মুকুল মেন্যু কার্ড থেকে তার পছন্দমত কিছু খাবারের অর্ডার দিলে আমরা দু'জনও আমাদের পছন্দ মত হালকা খাবারের অর্ডার দিয়ে তিন কাপ কালো কফি আর সাথে পানি আনবার অর্ডার শেষ করে কিছুক্ষণ মৌনতা পালন করছিলাম। আমরা মুখোমুখি। সামনের ভদ্রলোক দু'জনের আলাপে কিছুটা ছেদ পড়ল। আচকান পরা ভদ্রলোক গুন গুন করে কিছু একটা গাইছিলেন। এত লোকের কথার আওয়াজে গানের কলি বোঝা যাচ্ছিল না। এ দু'জনার দিকে একবার তাকিয়ে মনে হল এদের মত এ পাশে যতজন রয়েছেন সবাই এ কফি হাউসে বহু সময় ব্যয় করেন।

আমার চোখ পড়ল আরেকটি ছোট ছবির উপরে। পুরাতন ছবি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের। দু'পাশের দুটো ছবির সাথে এ কফি হাউসের ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। ইন্ডিয়ান কফি হাউস নামে অনেকগুলো শাখা কলকাতা ছাড়াও অন্যান্য শহরে রয়েছে। কলকাতাতেই একাধিক শাখা রয়েছে। এগুলো চালাচ্ছে ওয়ার্কারস্ সোসাইটি। তবে সবচাইতে বিখ্যাত কলেজ স্ট্রিটের এই কফি হাউস। এই হলটির পুরাতন নাম এলবার্ট হল। স্থাপিত হয়েছিল ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে। এলবার্ট ছিলেন ভারতের প্রথম ব্রিটিশ অধিশ্বর রাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী। পরে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর দিকে কফি বোর্ড এখানে কফি হাউসের দোর খোলে। সেই থেকে এখানে কবি, সাহিত্যিক, চিন্তাবিদদের

www.pathagar.com

আনাগোনা বিদ্যমান। এক সময়ে এখানে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হতে সুভাষ চন্দ্র বোস পর্যন্ত। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান কফি হাউসের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় শুধু কফি হাউস। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ব্যবস্থাপনা পর্ষদ কফি হাউস বিলুপ্ত করবার সিদ্ধান্ত নিলে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হন বিশিষ্টজনেরা। এ প্রতিবাদের নেতৃত্ব দেন প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এবং ছাত্ররা। বিলুপ্তিকরণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট স্মারকলিপি দেয়া হয়। ওই স্মারকলিপিতে কফি হাউসকে জাতীয় ঐতিহ্যের মর্যাদা দেবারও দাবি জানানো হলে সরকার কর্তৃক এ সিদ্ধান্ত বাতিল করে কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসকে 'হেরিটেজ প্লেস' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। আজও তেমনটি রয়েছে।

বাংলার বিখ্যাত ব্যক্তিদের পদচারণায় এই কফি হাউসের মর্যাদা বহুগুণ বেড়ে যায়। এসব ব্যক্তিদের মধ্যে রবি ঠাকুর আর নেতাজী ছাড়াও রয়েছেন সত্যজিত রায়, ঋত্তিক ঘটক, মান্না দে, অপর্ণা সেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং অমৃত্য সেন-এর মত নাম। আজও এ কফি হাউসে এ প্রজন্মের তরুণ উদীয়মান লেখক, রাজনীতিবিদ আর সংস্কৃতি সেবীদের পদচারণায় মুখরিত।

এরই মধ্যে আমাদের চাহিদার খাবার পরিবেশন করে গেল। আমরা তখনও বুঝতে পারিনি যে, আমরা কত খাবারের অর্ডার দিয়েছিলাম। এটা হয়ত পেটের ক্ষুধার চাইতে চোখের ক্ষুধাই ছিল বেশি। টেবিলের উপর এত খাবার দেখে সামনে বসা দুই ভদ্রলোক একবার করে আড়চোখে দেখলেন। আমার মনে হল হয়তো বা ভাবছেন এরকম বুভুক্ষু বাঙাল কোথা হতে উদয় হল। আমি ভাবলাম সামনে বসা দু'জন ভদ্রলোক একেবারেই অপরিচিত হলেও তাদের রেখে সামনে বসে খাওয়াটা শোভনীয়তার পর্যায়ে পড়বে। তাই হাত বাড়িয়ে নিজের নামটুকু বলে করমর্দন করে আমাদের সাথে যোগ দিতে বললাম। মনে হল আমার এ সৌজন্যে দু'জনই বেজায় খুশি হলেন। মুখে স্মিত হাসি ফুটিয়ে শ্মশ্রুধারী ভদ্রলোক নাম বললেন অরবিন্দ সরকার। আচকান আর আলোয়ান গায়ে ভদ্রলোক তার নামটি বললেন সত্যেন বোস।✦

অরবিন্দ সরকার ইন্ডিয়ান রেডিওর (আকাশ বাণী) প্রাক্তন কর্মকর্তা, কবি এবং গীতিকার হিসাবে তাঁর পরিচয় রয়েছে। ইতিমধ্যেই তার বেশ কিছু রচনার গানের সিডি বের হয়েছে। তিনি আরও জানালেন, তিনি ছায়াছবির এবং টেলিভিশন সিরিয়ালের জন্যও গল্প লেখেন, এমনকি কয়েকটি স্ক্রিন প্লেও তৈরি করেছেন। আমরা বুঝতে পারলাম মি. অরবিন্দ সরকার একজন গুণী ব্যক্তি এবং বর্তমানে তিনি এ সব নিয়ে ব্যস্ত। থাকেন কফি হাউসের ধারে কাছে। কোন সমস্যা না হলে প্রতি সন্ধ্যায় তিনি কফি হাউসে হাজির হন। আর সত্যেন বোস? তিনি চাকরি করতেন কলকাতা

✦ নাম ঈষৎ পরিবর্তিত।

www.pathagar.com

দূরদর্শনে। বর্তমানে অবসরে। তবে অভিনয়ে আর আবৃত্তির সাথে এখনও যুক্ত আছেন বলে জানালেন। ছবিতেও পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন বলে চুলে হাত দিয়ে বাঁ পাশের চুল ডান দিকে নিতে নিতে জানিয়েছিলেন।

দু'জনই পরিচয় দেবার ফাঁকে ফাঁকে টেবিলের উপরে রাখা আমাদের তিনজনের জন্য দিয়ে যাওয়া খাবারের দিকে তাকাচ্ছিলেন। হয়ত ভাবছিলেন আমরা কোন প্রান্তের লোক যে এত খাবারের অর্ডার দিলাম। আমি একটু ইতস্তত বোধ করছিলাম।

'হায়! আমি কামরুল। এক সময় সেনাবাহিনীতে ছিলাম এখন ব্যবসার সাথে জড়িত আছি। আর উনি মি. মুকুল শ্রীবাস্তব। আমরা দু'জন বাংলাদেশি আর মুকুল ভারতীয়। তবে গত কয়েক বছর আমাদের সাথে ঢাকায় আছেন।' এক নিঃশ্বাসে কামরুল করমর্দন করে পরিচিত হল।

'আমি সৌজন্যের খাতিরে বললাম, 'দাদারা আমাদের সাথে খাবারে যোগ দিন'।

'আসলে কি আমরা সকালে বের হয়ে ব্যারাকপুর হয়ে আসতে আসতে দুপুরের খাবার খাওয়া হয়নি। তাই এখানে খেতেও আসলাম আর কফি হাউস দেখতে আসলাম।' কামরুল কথা পাড়ল।

'প্লিজ কিছু নিন' আমি আবার অনুরোধ করলাম। এবার অনুরোধ রাখতে সম্মত হলেন। দুটো আলাদা প্লেট আনতে বললাম।

'পাঁচ কাপ কফিও আনবেন'। মুকুলের বেয়ারাকে ফরমায়েশ। আতিথেয়তা দেখাতে সেই বা পিছিয়ে থাকবে কেন।

প্লেট থেকে এক টুকরা চিকেন কাটলেট নিয়ে কামড় দিতে দিতে মি. বোস বললেন, 'আপনারা কি কলকাতায় বাংলাদেশ মিশনের স্বাধীনতা সপ্তাহ উদযাপনে যোগ দিতে ঢাকা থেকে এসেছেন?'

'না আমরা তিনজন বেড়াতে এসেছি। পরশু আমরা পাটনায় যাব, পাটনা থেকে ফিরে মুর্শিদাবাদ যাব। এখন আমরা মঙ্গল পান্ডের স্মৃতি বিজড়িত ব্যারাকপুর থেকে ফিরলাম।' কামরুল দু'জনকে আমাদের সফরের পূর্ণ বিবরণও দিল।

'ও তাই বুঝি' সত্যেন বোস কাটলেটে আরেক কামড় বসালেন। আমি স্যান্ডউইচের প্লেটটা মি. সরকারের দিকে এগিয়ে দিলে তিনি কিছুটা ইতস্তত করে নিলেন। কামরুল পকেট থেকে ভিজিটিং কার্ড বের করে দু'জনের হাতে দিয়ে তার স্বভাবজাত ভঙ্গিমায় আলাপরত রইল। কামরুলের কথার তুবড়ি আমরা দু'জনে চুপচাপ শুনছিলাম। পেটে ক্ষিধে তাই অনেক কথা না বলে খাবারে মনোযোগ দিয়ে আলাপের ভারটা আপাতত কামরুলকেই দিলাম।

'ঢাকার অনেক শিল্পীর সাথে আমার বেশ অন্তরঙ্গতা রয়েছে। এখানে (কলকাতায়)

www.pathagar.com

পরিচিত হয়েছিলাম রিজওয়ানা চৌধুরী বন্যার সাথে আর আসাদুজ্জামান নূর ভাইয়ের সাথে। নূর ভাইতো এখন একটি চ্যানেলের স্বত্বাধিকারী?' বললেন সত্যেন বোস।

'জি দেশ টিভি চ্যানেলে'র কামরুলের জবাব।

'এইতো ভাই গতকাল বাংলাদেশের মিশনে স্বাধীনতা দিবসের সপ্তাহ উদযাপনের আমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। অনেক শিল্পী এসেছিলেন ঢাকা থেকে।' একটু বুক ফুলিয়ে মাথার চুলের অবস্থান নিশ্চিত করে সত্যেন বোস কথা শেষ করলেন।

আমি মনে মনে ভাবছিলাম আমাদের কলকাতায় অবস্থানের কথা মিশন জানে। ডেপুটি হাই কমিশনারের কাছে ঢাকা ছাড়বার আগে কলকাতায় আমাদের ঠিকানাও জানিয়েছিলাম। কিন্তু কোথায় মিশনের কোন দাওয়াত তো আমরা অন্তত আমি পেলাম না। দাওয়াতপত্র পাঠাবেন অবশ্য ডেপুটি হাইকমিশনার নিজ উদ্যোগেই বলেছিলেন। আজও এক কর্মকর্তার সাথে কথা হয়েছে পাটনার ট্রেন টিকেট সংক্রান্তে। কিন্তু আমরা উদযাপনের কোন আমন্ত্রণ পেলাম না। যদিও আমার তেমন আগ্রহও ছিল না। চেয়ে দেখলাম মি. সরকার কিছুটা নিশ্চুপে স্যান্ডউইচের সদ্ব্যবহারের পর গরম কফিতে চুমুক দিতে উদ্যোগী হলেন। এ সময় কফি হাউসে কোন চেয়ার বা টেবিল খালি থাকবার কথা নয়, ছিল না। বেয়ারারা মহাব্যস্ত। কাউন্টারে ক্যাশিয়ারের তেমন ব্যস্ততা দেখলাম না। কারণ, যারাই এখানে এসেছেন তারা সহজে গাত্রত্থান করবেন বলে মনে হয় না। সে কারণেই হয়ত তার ব্যস্ততা কম।

কামরুল একাধারে দু'জনার সাথে সমানতালে কথা বলেই যাচ্ছে। সে প্রচুর কথা বলতে ভালবাসে। এক পর্যায়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা কখনও ঢাকায় গিয়েছিলেন?' দু'জনেই না সূচক জবাব দিলে কামরুল শতগুণ উৎসাহে বলে চলল 'আপনারা ঢাকায় আসলে আমার মেহমান হবেন। বহু চ্যানেলের মালিকদের সাথে আমার পরিচয় আছে। এবার মি. বোসকে বলল আপনার এত অভিজ্ঞতা আপনাকে তো আমাদের কোন চ্যানেলে উপদেষ্টা করতে পারে। আমাদের প্রাইভেট চ্যানেলে বেশ কয়েকজন ভারতীয় উপদেষ্টা রয়েছে। আপনাকে এ রকম একজন করতে কোন অসুবিধেই হবে না।'

কামরুলের অতি উৎসাহী কথার কতখানি গভীরতা রয়েছে তা খতিয়ে না দেখেই মি. বোস বললেন, 'আমি আশ্চর্য হচ্ছি এতজনকে টিকিট দিয়ে ঢাকায় নিয়ে যায়, আমাকে আজ পর্যন্ত কেউ ডাকল না।'

'আমি ফিরে গিয়েই আপনাদের জন্যে টিকেট পাঠাবার একটা বন্দোবস্ত করছি। আপনারা দু'জনেই আসবেন।' কামরুলের এ আমন্ত্রণে দু'জনেই খুশি হলেন বলে মনে হল। মুকুল আমার দিকে তাকিয়ে অর্থবহ মুচকি হাসি দিল। আমি একটু ইতস্তত করে কামরুলকে বললাম 'এবার আমাদের উঠতে হবে। রাত আটটার পর হোটেলে মিশনের

www.pathagar.com

একজন কর্মকর্তার আমাদের জন্য পাটনার ট্রেন টিকেট আনবার কথা রয়েছে।'

'আরে হ্যাঁ, আমাকে ইন্টারনেটের টিকেট বাতিল করতে হবে।' মুকুল এ কথা বলে বেয়ারাকে আমাদের বিল আনতে বলল।

মুকুল ঢাকা থেকে পাটনার জন্য ইন্টারনেটে যে মেইল ট্রেনের টিকেট বুক করেছিল সেটি ছিল নন এসি টু-টায়ার। যদিও শীতের সময় তবুও নিরাপত্তা আর ধুলোবালির কথা চিন্তা করে আমি নন এসিতে যাবার পক্ষপাতী ছিলাম না। এমনিতেই ট্রেন মাওবাদীদের এলাকা দিয়ে যাতায়াত করে। তার উপরে সম্পূর্ণ রাত কাটাতে হবে ট্রেনে। সে কারণেই আমি এসি ট্রেনের খোঁজে মিশনের সাহায্য চেয়েছিলাম। 'গরিব রথ' নামক থ্রি-টায়ার এসিতে টিকেট পাওয়া গেছে বলে বিকালেই মিশন থেকে জানিয়েছিল। টিকেট কিনতে গিয়ে আমাদের বয়সের প্রয়োজন হবে জানালে মুকুলের বয়স ৫৭ আর কামরুলের বয়স ৫৬ বলেছিলাম। আমি জানতাম ভারতে ৬০ বছরের উপরে বয়স হলেই সিনিয়র সিটিজেন হিসাবে রেল হতে শুরু করে বহু জায়গায় ভাড়া ইত্যাদিতে রেয়াত পাওয়া যায়। আর থ্রি-টায়ার ট্রেন? আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। শুনেছিলাম মাত্র। অদ্ভুত সে ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা অর্জন করব আর দু'দিন পরে। সে অভিজ্ঞতা যথাসময়ে বিস্তারিত বর্ণনা করব।

'দাদা আপনি এখানকার সন্দেশ না খেয়ে যেতে পারবেন না। আমি খাওয়াচ্ছি।' বললেন সত্যেন বোস।

'এখানে সন্দেশ পাওয়া যায় নাকি?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম। 'না এখানে নয় এখান থেকে কাছেই পনের মিনিট হাঁটলেই আমরা নকুলের দোকানে পৌঁছে যাব। আহা এমন সন্দেশ হয় না।' আপনাদের না খাইয়ে ছাড়ছি না। কি বল সরকার। মি. বোসের কথায় সরকার সাহেব মাথা নেড়ে মৌন সম্মতি জানালেন।

ইতিমধ্যে বিল নিয়ে আসলে মুকুল আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ বিল চুকিয়ে দিল।

আমি বললাম, 'দাদা আমাদের হাতে সময় নেই। আমি দুটো বই কিনব। কাজেই এখান থেকে অন্যস্থানে যেতে আসতে বেশ সময় লাগবে বরং বই দু'টি খোঁজ করি। ওই বিখ্যাত সন্দেশ পরে আরেকবার খাওয়া যাবে।'

মাথা নেড়ে চুল ঠিক করতে করতে মি. বোস বললেন, 'তা কি করে হয় সন্দেশ না খেয়ে যাবেন কি করে। আমি এখানে আনবার ব্যবস্থা করছি। আর বই আমরা তো বইয়ের সাগরেই ভাসছি। কি বই খুঁজছেন? এ কথা বলেই মি. বোস পকেট থেকে মোবাইল বের করে কোন এক নরেশকে ফোনে বললেন 'নরেশ বাংলাদেশ থেকে তিনজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মেহমান আমার এখানে, তুমি দাদা নকুলের দোকান থেকে কয়েকটি সন্দেশ কফি হাউসে নিয়ে আসবে? কতক্ষণ সময় লাগবে।' মি. বোস কি

www.pathagar.com

উত্তর পেলেন শুনতে পাচ্ছিলাম না। তবে আমি বেশ মজা পাচ্ছিলাম। এ যেন 'চা খেয়ে এসেছেন না খাবেন' গল্পের বাস্তব দেখছি।

'ও তাই রাস্তায় প্রচুর জ্যাম। আসতে আধা ঘণ্টা লাগবে? তা হলে আমি উনাদের এ মিষ্টি খাওয়াতে পারছি না। ওনাদের হাতে সময় নেই। মি. বোসের এ কথায়, যার উদ্দেশ্যেই হোক, অন্তত আমাদের তিনজনের মুখে মুচকি হাসি ফোটালো। মি. সরকার বোধহয় আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বিব্রত হলেন। আমি বলে উঠলাম, 'থাক দাদা অন্য সময় হবে।'

'কি লজ্জা বলুন তো। শুনেছি বাংলাদেশে নাকি আপনারা অতিথিদের খাইয়ে খাইয়ে একেবারে মেরেই ফেলেন আর আমি সামান্য সন্দেশ খাওয়াতে পারলাম না।' বোসের আফসোস।

'ওখানে তিন বছর থেকে খেতে খেতে দেখুন আমার ভুঁড়ি বের হয়েছে' মুকুলের এ বক্তব্যটি ছিল বোসের সহায়ক।

এবার মি. বোস বললেন, 'দাদা আপনি কোন বই কিনবেন' আমি বললাম 'বেশ পুরাতন। প্রমথনাথ বিশীর কেরী সাহেবের মুন্সী' আর নিহার রঞ্জন গুপ্তের 'অস্তি ভাগিথীর তীরে'। 'ও আমি আপনাকে নিয়ে দিচ্ছি। চলুন-সরকার তুমিও চল।'

দুটো বইই আমি আমার বাল্যকালে পড়েছি। আমার মত অনেকেই পড়েছেন বিশেষ করে প্রমথনাথ বিশীর বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য অবদানমূলক বইগুলো যার মধ্যে কেরী সাহেবের মুন্সী অন্যতম। উনিশ শ' পঞ্চাশের দশকে লেখা এই বই উনিশ শতকের কলকাতা তথা বাংলা সাহিত্যের যুগান্তকারী পরিবর্তনের সময়ের রাম রাম বসু এবং উইলিয়াম কেরীর জীবনীর আলোকে রচিত। প্রায় সবগুলোই ওই সময়কার ঐতিহাসিক চরিত্র আর নব্য ধনাঢ্য উঁচু জাতের উঠতি বাঙালি সমাজের চিত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। কেরী সাহেব আর রাম রাম বসুর বাংলা সাহিত্য বিশেষ করে গদ্যে অবদান ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। রাম রাম বসু ছিলেন কেরী সাহেবের মুন্সী। আর 'অস্তি ভাগিরথীর তীরে' ছিল বাংলার নবাবশাহীর পতনের পর ইংরেজদের সাথে সাথে কলকাতার বৃদ্ধ আর উচ্চবর্ণের একদল বাঙালি চাটুকারদের উত্থানের ইতিহাস–সম্পূর্ণ উপন্যাস। পুনরায় পড়ব বলেই এই বই দু'টির খোঁজ।

মি. বোস উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলুন' আপনাকে বই দু'টি কিনে দেই।' দেখলাম কেতাদুরস্ত ভদ্রলোক। চোগা পাজামার সাথে আচকান গায়ে আলোয়ান আর পায়ে নাগরাই। অনেকটা সেকালের জমিদারী পোশাক। মাথার চুলে আবার হাত দিলেন। গুন গুন করে গানের কলি ধরলেন। চলনে কিছুটা নাটকের নায়কের ধাঁচ। তার পেছনে আমরা তিনজন সাথে মি. সরকার। নিচে নেমে আমরা যে গলি দিয়ে

www.pathagar.com

এগুচ্ছিলাম তার দু'পাশে শত শত বইয়ের দোকান। হাঁটতে হাঁটতে এক পর্যায়ে মি. সরকার বললেন, 'আমি কাছাকাছিই থাকি। ভবিষ্যতে কলকাতায় এসে কোন বিপদে পড়লেই আমাকে স্মরণ করবেন'। বিপদে পড়লে? এমনি নয় কেন? তার ব্যাখ্যা চাইবার প্রয়োজন মনে করলাম না। হেসে ধন্যবাদ জানালাম।

মি. বোস আমাদেরকে পাশের গলিতে নিয়ে বেশ ভেতরের দিকে এক প্রকাশকের দোকানে নিয়ে এসে হাঁক দিয়ে বললেন, 'ভজহরি আমার সাথে বাংলাদেশের কয়েকজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা রয়েছেন। দু'টো বই দাও দিকি। হ্যাঁ, স্পেশাল দামে দিতে হবে।' তিনি বইয়ের নাম দু'টো বললেন। ভজহরি নামক ভদ্রলোক হয় মালিক অথবা কর্মচারী হবেন। বেশ ব্যস্ত বইয়ে ঠাঁসা মাঝারি ধরনের বইয়ের দোকান। বেশ কিছু খদ্দের নিয়ে তিনি মহাব্যস্ত। বেশ কিছুক্ষণ পর বই দু'টি বের করলেন। দিলেন মি. বোসের হাতে। আমি তাড়াতাড়ি মূল্য বের করে হাতে রাখলাম। ভাবলাম মি. বোস মূল্য চুকাতে গেলে আমি অনুরোধ করে বারণ করব, আর একান্ত নাছোড়াবান্দা হলে নিয়ে নেব। এবার মি. বোস স্পেশাল মূল্যছাড় চাইলেন। স্পেশাল মূল্য ছাড় মানে গতানুগতিক কমিশন যা প্রায় সব বইয়ের দোকানই দিয়ে থাকে। জিজ্ঞেস করবার আগেই তিনি আমাকে মোট মূল্য জানালে আমি মূল্য চুকিয়ে দিয়ে বই দু'টো নিয়ে ফিরতি পথ ধরে মি. বোসকে তার এ সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে দু'জনের কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলে তিনি বললেন, 'দাদা কিছু তো করতে পারলাম না, তবে আবার আসলে অবশ্যই মিষ্টি খাইয়ে ছাড়ব।'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আবার আসলে আপনার মিষ্টি না খেয়ে যাব না।' বাকপটু কামরুলের জবাব। মি. সরকারের দিকে তাকিয়ে বলল : এর পরে কলকাতায় আসলে আমরা আপনার ওখানেই উঠব। সরকার মৃদু হেসে বললেন, 'অবশ্যই।'

আমরা হাঁটতে হাঁটতে গলি ছেড়ে কলেজ স্ট্রিটে রমেশের খোঁজে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে মোবাইলে যোগাযোগ করে ট্যাক্সিতে বসলাম। কলেজ স্ট্রিটে বেজায় ভিড়। তখনও প্রেসিডেন্সি কলেজে কনসার্ট চলছে। ট্যাক্সিতে বসে কামরুল মুকুলকে একটু খোঁচা দিল। মুকুল বলল, 'এমন হবে তুমি কি জানতে না। এরা কি তোমাদের মত যে লোক পেলেই খাওয়াবে আর দেখভাল করবে? এরা কলকাতার বাঙালি। তোমাদের মত নয় যে ধরে ধরে খাওয়াবে। আরে বাপরে পার্কে হাঁটতে গিয়ে খাওয়াতে খাওয়াতে আমার ভুঁড়ি বের করে দিয়েছে।'

'তাহলে তফাৎটা বুঝতে পারছ।' কামরুলের কথার জবাবে মুকুল বলল, 'তাতো আমি অনেক আগের থেকেই বুঝতে পেরেছি।' আমি দু'জনের এ কৃত্রিম বিতর্ক বেশ উপভোগ করছিলাম। এ বিতর্ক আর এগুতে না দিয়ে আমি বললাম, 'বই দুটো কিনতে পারলাম আর কফি হাউস দেখলাম এটাই মুখ্য আর সব গৌণ।' কামরুল বলল

www.pathagar.com

'এতবার কলকাতায় এসেছি এই কফি হাউসে কখনই আসা হয়নি। এবার হল। এত সাধারণ একটা রেস্তোরাঁ অথচ কত বিখ্যাত হয়ে গেছে।' আমি বললাম 'বিশেষ করে মান্না দে-এর গানের বদৌলতে।'

আমরা কথা বলতে বলতে হোটেলে এসে পৌঁছলাম। লবিতে মিশনের এক কর্মচারী হাতে তিনটি টিকেট ডিসেম্বর ২৪, ২০১০-এর রাত সাড়ে আটটার থ্রি-টায়ার এয়ার কন্ডিশন ট্রেন 'গরিব রথ' (গরিবের রথ) ট্রেনের। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে পাওনা চুকিয়ে দিলাম। আসা যাওয়ার ভাড়া চারশত কিছু রুপি। ফিরব ২৮ ডিসেম্বর সকালে। ট্রেন ছাড়বে নতুন স্টেশন কলকাতা হতে। তখনও আমি টিকেটের বিস্তারিত দেখিনি। মুকুল সাথে সাথে ইন্টারনেটে গিয়ে পূর্বেকার টিকেট বাতিল করে দিল। বলল, কিছু জরিমানা দিতে হয়েছে। সে আজকের খরচের হিসাবের সাথে যোগ করে দিবে। সকালে আমরা দিনের খরচ তিনভাগ করে যার যার দেনা তাকে দিয়ে দেব। এমনই ছিল আমাদের খরচের পরিকল্পনা।

মুকুল বাকি কয়দিন কামরুলের রুমেই থাকবে। সে পরিকল্পনা করে আগে থেকেই একটি ব্যাগ আমার রুমে রেখে দিয়েছিল। সকালে উঠে হাঁটতে বের হবো। এ বেলা আর খাবারের প্রয়োজন হবে না। লবি থেকে যার যার রুমে চলে আসলাম। পাশের রুমেই কামরুল। সমস্ত দিনের ক্লান্তি গায়ে। গরম পানি দিয়ে গোসল করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। পাশের রুমের দরজা খুলবার আর বন্ধ হবার শব্দ পেলাম। শুনতে পেলাম মুকুল আর কামরুলের বাইরে যাবার প্রস্তুতি। আমি আর বের হবো না। তা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ টিভি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমাবার আগে ঢাকায় বেগম সাহেবার সাথে কথা বলে জানলাম কোন অসুবিধে ছাড়াই ঢাকায় সময়মত পৌঁছেছিলেন।

www.pathagar.com

সাত
জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়িতে

বেশ অন্ধকার থাকতেই তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম প্রাতঃভ্রমণে। কলকাতা তখন সম্পূর্ণভাবে জেগে উঠেনি। রাস্তায় কিছু কিছু যানবাহন চলছে। ওমনি সারা রাতই চলে। একটি ট্রাম ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে হোটেলের সামনে দিয়ে এসপ্লানেডের দিকে চলে গেল। আমরা তিনজনই হাঁটতে হাঁটতে পার্কস্ট্রিটে গিয়ে উঠলাম। পার্কস্ট্রিট হয়ে আমরা চৌরঙ্গির পথে চলে আউটরাম রোডের কিছু দূর গিয়ে ময়দানের বাম পাশের অংশে পায়ে চলা পথ দিয়ে প্রবেশ করলাম। কলকাতার ময়দানের কথা বহুবার বলেছি। বেশ কয়েক খণ্ডে খণ্ডিত বর্তমানে এককালের বিশাল গড়। এখনও বিশাল এলাকা রয়ে গেছে ময়দান হিসাবে। বেশ কিছু রাস্তার কারণে ময়দান খণ্ডিত।

ময়দানের এ প্রান্তে স্বাস্থ্য সচেতন প্রাতঃভ্রমণকারীদের আগমন শুরু হয়েছে। বেশ কয়েকটি প্রাইভেটকার শিক্ষানবিশ চালককে গাড়ি চালানো শিখাচ্ছে। কিছু দূরে ক্রিকেটের এক টিম খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আস্তে আস্তে পূর্ব দিগন্ত ফর্সা হয়ে সূর্যের আভা ছুটাচ্ছে। ময়দানের অপর প্রান্তে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উপরের গম্বুজ দেখা যাচ্ছিল। তার খানিকটা বাঁয়ে কলকাতার প্রধান গীর্জা সেন্ট পলের চূড়া দেখা যাচ্ছিল। আমরা হাঁটতে হাঁটতে ওই গীর্জার দিকে যাবার পরিকল্পনা করেছিলাম। আমার ধারণা ছিল ওই গীর্জার সমাধিতেই হয় আমরা কলকাতা নগর পত্তনকারী জব চার্নকের হদিস পাব।

আমরা ময়দানের ভেতরে প্রায় আধাঘণ্টা ঘুরে পাশের প্রধান সড়কে উঠে পড়লাম। ময়দান আর এ সড়কের দু'পাশে বহু পুরনো বৃক্ষের সমারোহ রয়েছে। দৃশ্যত মনে হয় প্রায় গাছগুলো শতবর্ষ পুরাতন হতে পারে। বিশেষ করে বট আর অশত্থ গাছগুলো। চওড়া সড়ক। দু'পাশে বেশ জায়গা রয়েছে প্রয়োজনে আরও চওড়া করবার জন্য। সড়কটির নাম খিদিরপুর রোড। আমরা তিনজনেই কথা বলতে বলতে হাঁটছি। আমাদের সামনে কিছু দূরে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছিলেন। মাথায় গরম টুপি। গায়ে ভারী ফুল হাতার সোয়েটার। পেছনে অপেক্ষাকৃত কম বয়সের একজন, সামনের ভদ্রলোকের সাহায্যকারী হবেন হাতে বড় ধরনের একটি ভাণ্ড। ভদ্রলোক সামনের বড় গাছের গোড়ায় দাঁড়ালে পেছন থেকে ভাণ্ডখানি তুলে ধরেন।

www.pathagar.com

সেখান থেকে সাদা পাউডার মত কিছু পদার্থ হাতের মুঠোয় নিয়ে গাছের গোড়ার চারি পাশে ছিটিয়ে দিচ্ছেন। এ দৃশ্য আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেও আমরা বুঝতে পারছিলাম না যে তাঁরা কি ছিটিয়ে দিচ্ছেন। কামরুল বলল, 'কলকাতার রাস্তায় গাছের গোড়াগুলোতে যে উৎকট পেসাবের গন্ধ সে কারণেই এই ভদ্রলোক ব্লিচিং পাউডার ছড়াচ্ছে। তিনি কতখানি সমাজ সচেতন মানুষ। এতগুলো বয়সেও মানুষটি এ কাজ করছেন।'

আমি কামরুলের বক্তব্যে নিশ্চিত হতে পারছিলাম না যে ভদ্রলোক যা ছিটাচ্ছে তা ব্লিচিং পাউডার। কারণ, তেমন কোন গন্ধ নাকে আসছিল না। তদুপরি এ জায়গাটায় তেমন উৎকট বাজে গন্ধও পাওয়া যাচ্ছিল না। আমরা ওই দু'জনকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় আমার কৌতূহল ধরে রাখতে পারলাম না। নিশ্চিত হতে চাইলাম। আমি কামরুল আর মুকুলকে বললাম 'তোমরা হাঁটতে থাক আমি আসছি।' আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখছিলাম ভদ্রলোক পাশের বিশাল অশত্থ গাছটির গোড়ায় এবং ফাঁকফোকরে সাদা পদার্থ ছিটিয়ে দিচ্ছেন।

'সুপ্রভাত দাদা'

ভদ্রলোক চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন 'সুপ্রভাত'।

'আমরা বাংলাদেশি। সকালে হাঁটতে বেরিয়েছি।'

'ও তাই বুঝি। তা বাংলাদেশে কোথায় থাকা হয়?'

'ঢাকায়'।

'বেশ বেশ ভাল।'

আমি ভাবলাম কথা বাড়াবনা। জিজ্ঞেস করলাম এ শীতের সকালে তিনি আসলে কি কাজ করছেন।

তিনি বললেন, 'দেখুন। সবারই খাবার খেতে হয়। আমি গত চল্লিশ বছর পিঁপড়েগুলোকে খাইয়ে আসছি। বিশেষ করে শীতের সময়ে। ওদের গর্তে খাবার পৌঁছে দেবার চেষ্টা করি। গর্ত না পেলে গাছের গোড়ায় ছিটিয়ে দেই।'

সহযোগীর হাতে ভাণ্ডে রাখা আরও কিছু সাদা পদার্থ নিয়ে ছিটাতে ছিটাতে বললেন, 'পিঁপড়েরাতো শীতে খুব একটা বের হয় না তাই ওদের বেশ কষ্ট হয়।'

'দাদা এ খাবার কিসের তৈরি'

'এগুলো চিনি আর ইসুবগুলের ভূষি মেশানো। মাঝে মধ্যে অন্যকিছুও এনে দেই।'

আমি জীবনে প্রথম পিঁপড়েকে এত যত্ন করে খাওয়াতে দেখলাম। হয়তো বা জৈন ধর্মাবলম্বী হতে পারেন। কারও ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা আমার স্বভাবের অংশ নয়। তাই নিশ্চিত হতে পারলাম না। তবে এতটুকু জানি যে জৈন ধর্মে মশা মাছি পিঁপড়ে

www.pathagar.com

কোন জীবকেই মারা হয় না। আমি অভিভূত হলাম। ভদ্রলোক ধন্যবাদ জানিয়ে জোর কদম চালিয়ে দু'জনকে আমার অভিজ্ঞতার কথা বলে আমরা সেন্টপল গীর্জায় যাবার উদ্দেশ্যে চৌরঙ্গির দিকে হাঁটছিলাম। ময়দানের বাউন্ডারির সাথে চৌরঙ্গি রোডের ফুটপাত থেকেও দুর্গন্ধ আসছিল। মুকুলকে বললাম, ৩৫ বছর বামফ্রন্ট সরকার কলকাতার এ হাল করেছে। মুকুল হেসে বলল, 'এ জন্য এবার হারবে'। সড়কের মাঝের বৈদ্যুতিক পিলারগুলোর গায়ে তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জির ছোট ছোট বিল বোর্ড লাগানো। পশ্চিম বাংলায় নির্বাচন আসন্ন। এ কয়দিনে কলকাতায় তৃণমূলের যে দাপট দেখলাম তাতে মনে হয় বামদের এবার উৎখাত হতে হবে (এ লেখার সময়েই এমনটাই হয়েছে)।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে হ্যারিংটন স্ট্রিটের মাথায় ক্যাথেড্রাল রোডে উঠলাম। সামনে হাতের বাঁয়ে বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম। সামনেই বিশাল এলাকা জুড়ে সেন্টপল ক্যাথেড্রাল বা গীর্জা। এখানে দাঁড়িয়ে আছে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে। এর আগে এখানে চার্চ থাকলেও এত বড় ছিল না। আদি গীর্জা ভেঙে দিয়েছিল সিরাজ-উদ-দৌলা।

আমরা সেন্টপল ক্যাথেড্রালের সামনে। গেটটি বন্ধ। ভেতরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করতে গেলে নিরাপত্তা রক্ষী এসে জানালো যে গীর্জার দরওয়াজা নয়টার আগে খুলবে না। তখন গীর্জার অফিস শুরু হয়। ওই সময় আসলে দেখা যাবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এখানে গোরাদের কোন পুরাতন কবর আছে কিনা? রক্ষী সঠিক উত্তর দিতে না পেরে বলল 'তখন আসবেন পাদ্রী সাহেব থাকবেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে সব জানতে পারবেন।' অগত্যা আমরা ফিরতি পথ ধরলাম। আমি মুকুলকে বললাম 'আজ না হলেও কাল এখানে আসব।'

আমরা বিড়লা প্লানেটোরিয়ামের সামনে দিয়ে সরণিতে এসে পৌঁছলাম। এক সময়কার ৪ নম্বর এখনকার ৭নং থিয়েটার রোডে শ্রী অরবিন্দ গোস্বামীর বাড়ির দেয়ালের শেষ মাথায় ফুটপাতের উপর সকালের নাস্তার জন্য ঠেলা গাড়ির উপরের অস্থায়ী রেস্তোরাঁর রসইখানা স্থাপিত হয়ে গেছে।

শ্রী অরবিন্দের বাড়িটির গেটে কাউকে পেলাম না। সেটি বন্ধ ছিল। বাড়িতে কেউ আছে বলে মনে হলো না। তবে বাড়িটি এখন একটি ট্রাস্ট। অতি পরিপাটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। গেটের ফলকে লেখা রয়েছে শ্রী অরবিন্দ ভবন। শ্রী অরবিন্দ'র জন্ম ১৫ আগস্ট, ১৮৭২ সাল।

শ্রী অরবিন্দ সাত বছর বয়সে ইংল্যান্ডে পাড়ি জমান। সেই থেকে ক্যাম্ব্রিজে পড়াশুনা শেষে ভারতে ফিরে বারোদার মহারাজা দ্বারা চালিত বারোদা কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। কলেজে থাকাকালীন সময়েই তিনি বিপ্লবী হয়ে উঠেন। শুরু করেন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে রাজ উৎখাতের আন্দোলনে। বঙ্গভঙ্গের পর তিনি

www.pathagar.com

কলকাতায় চলে এসে ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্টের অগ্রসৈনিকে পরিণত হন। তিনি প্রথম বন্দে মাতারম পত্রিকায় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলেন। বহুবার কারাবরণও করেছিলেন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের পর হতে তিনি জীবনধারায় পরিবর্তন এনে পন্ডিচেরিতে চলে যান। প্রবেশ করেন আধ্যাত্মিক জগতে। তৈরি করেন অরবিন্দ আশ্রম। ডিসেম্বর ৫, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে শ্রী অরবিন্দ মৃত্যুবরণ করেন। এই ভবনটি এখন মূল আশ্রমের শাখা।

আমি অরবিন্দ ভবনের সামনে থেকে পেছনে এসে দেখলাম মুকুল আর কামরুল ফুটপাতের একপাশে ঠেলাগাড়ির রেস্তোরাঁর অস্থায়ী টেবিল আর বেঞ্চের উপর বসে পড়েছে। আমাকে কাছে আসতে দেখে বলল যে এখানে গরম গরম লুচি ভাজছে, সাথে ছোলার দম আর চাটনি, তাই ঐখানেই প্রাতঃরাশ করবে। আমি বললাম, 'আর হোটেলের নাস্তা?' কামরুল বলল, 'স্যার সেটাও খাব তবে আগে এটা খেয়ে নেই। ইতিমধ্যেই সারি দিয়ে কয়েকটি অস্থায়ী রেস্তোরাঁই খুলেছে। অগত্যা কামরুলের পাশেই বসে পড়লাম। একটি বাক্সকে টেবিল বানানো হয়েছে। হয়ত এ বাক্সের মধ্যই রশুইয়ের সব জিনিসপত্র গুটিয়ে রাখা হয়। দু'জনের বেশি বসবার জায়গা নেই। তাই মুকুল ফুটপাতের উপরেই দাঁড়ানো। কামরুল জানালো তারা তিন প্লেট অর্ডার দিয়ে দিয়েছে। এক প্লেটে দুটো লুচি, ছোলা, সালাদ আর চাটনি থাকবে। এক্সট্রা লুচির দাম দু'রুপি। আমি মুকুলকে বললাম যে পাশের ঠেলা থেকে ডিমের অমলেটও আনতে। এরই মধ্যে কামরুল দোকানের মালিকের নাম জিজ্ঞাসা করলে নাম জানালো সুন্দর শিকারী। সুঠাম দেহী মধ্য তিরিশের মোটাসোটা এই সুন্দর শিকারী। পরনে নীল রংয়ের লুঙ্গি গায়ে চকলেট রংয়ের একটি কলারওয়ালা সোয়েটার। একাই লুচি বানাচ্ছে আর ভাজছে। একটু পরেই এ সব দোকানে ভিড় জমে উঠবে। বেচাকেনা হবে ভাল। ২৪ পরগণার সুন্দর শিকারী। বাপ মা শখ করে সুন্দরের সাথে শিকারী লাগিয়েছেন। কেন লাগিয়েছেন তা সুন্দর শিকারী জানে না। আমরা যে বাংলাদেশ থেকে এসেছি তা কামরুল তাকে জানাতেও ভোলেনি। 'আপনার নাম শিকারী কেন? আপনি কি শিকার করতেন নাকি?' কামরুল জিজ্ঞাসা করল।

'না স্যার বাবা মা শখ করে রেখেছিল। ভেবেছিল অমন কিছু একটা হবো। তা কি আর হয় বাবু। সব শখ পূরণ হয় না। আমি ভালই আছি।' বলল সুন্দর শিকারী।

ইতিমধ্যেই শিকারী তিনটি প্লেট তিনজনকে দিয়ে বলল, 'আরও লুচি লাগলে বলবেন।'

পাশের দোকানের অমলেটও চলে এসেছে। সব মিলিয়ে খেতে বেশ ভালই লাগছিল। আরও কয়েকটি লুচি দিয়ে গেল সুন্দর শিকারী। দু'দোকান মিলিয়ে আমরা ৬৪ রুপি বিল দিয়ে চায়ের খোঁজে পার্কস্ট্রিটের কোণায় পৌছলাম। পার্ক স্ট্রিটের কোণায়

www.pathagar.com

একটি বিশাল গাছের গুঁড়ির নিচে ছোটখাটো অস্থায়ী চায়ের দোকান নিয়ে বসেছেন একজন শীর্ণকায় বৃদ্ধ। আমরা তিনজন চায়ের অর্ডার দিলে ছোট ছোট মাটির তিনটি পেয়ালা ২ রুপির বিনিময়ে চা পরিবেশন করল। সাধারণ চায়ের কাপের থেকে ছোট মাটির পেয়ালায় চা এর আগেও কলকাতাতেই পান করেছি। এ সব পেয়ালা একবারই ব্যবহার যোগ্য, তবে এর আর কোন মোজেজা আছে কিনা জানা নেই।

আমরা তিনজনেই হাঁটতে হাঁটতে পার্ক স্ট্রিট হয়ে ফিরছিলাম। দোকানপাট তখনও বন্ধ। ফুটপাত প্রায় খালি। আমি আর মুকুল সামনে হাঁটছিলাম। হঠাৎ পেছন ফিরে দেখলাম কামরুল দাঁড়িয়ে জুতা পালিশ করাচ্ছে। মুচি পালিশ করছে আর কামরুলের সাথে কথায় মশগুল। দু'জনে কি বলছিল শুনতে পারিনি। কামরুল আমাকে ডেকে বলল যে, আমি ওখানে গিয়ে মুচির সাথে কথা বললে ওর সম্বন্ধে কিছু জানতে পারব। কামরুলের মতে সে হতে পারে আমার ভ্রমণ কাহিনীর এক চরিত্র। আমিও লোভ সামলাতে পারলাম না। এমনিতেই কোথাও ভ্রমণ করতে গেলে আমি চেষ্টা করি অনেক লোকের সাথে কথা বলতে। অনেকেই হয়ে উঠেন আমার ভ্রমণ কাহিনীগুলোর চরিত্র। প্রায় সব ভ্রমণকাহিনী লেখকরাই এমনটি করেন। অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তোলেন সামান্য চরিত্রগুলো।

আমি আর মুকুল গিয়ে দাঁড়ালাম যেখানে কামরুল জুতায় পালিশ করাচ্ছে সেখানে। ফুটপাতের উপরে একটি বৃহদাকারের গাছ আর তার নিচে দোকান সাজিয়ে বসেছেন কথিত মুচি। জুতা সেলাই থেকে পালিশ করা প্রায় সব কাজই করে থাকেন। আমি গাছের নিচে বসলাম। নাম জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি নাম বললেন সুধীর দাশ। বাড়ি বিহারের মুঙ্গেরে। বয়স মধ্য পঞ্চাশে। গায়ের রং তামাটে। মুখে খোঁচা দাড়ি। দাড়ি আর মাথার হালকা চুলগুলোতে বেশ পাক ধরেছে। গায়ে একটি পুরাতন সুয়েটার। পরনে লুঙ্গি। জিজ্ঞাসা করলে জানালেন তিনি নিম্নজাতের 'রবি দাস' সম্প্রদায়ের। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি এ জায়গাতেই বসেন। তিনি জানালেন, তার দাদাও এখানে কোথাও একই কাজ করতেন। তখন ইংরেজ সাহেবরা থাকতেন এ অঞ্চলে। মুচির কাজ করে বেশ পয়সা কামিয়েছিলেন। পরে সুধীরের বাবাও এখানে বসতেন। বাবার সাথেই সুধীর এখানে বসতেন। সেই থেকে এ জায়গায় তিনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসেন। আমাদের বললেন তাঁর জীবন বৃত্তান্ত।

সুধীর দাস বিপত্নীক। যা কামাই করেন তা দিয়ে তিনি তার তিন পুত্রকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনাদের ছেলেদেরকে এ পেশায় আনবেন।'

'না সাহেব ওরা দিল্লীতে। বড় দু'টি দফতরে চাকরি করে আর ছোটটি এখনও পড়ছে। ওরা আধুনিক হয়ে গেছে। বাপ দাদার পেশায় আর আসতে চাইছে না। তাছাড়া সাহেব, এখন তো জাতপাতের হিসাব আগের মত নেই।' সুধীর কথাগুলো বলে কামরুলের অপর পায়ের জুতা পালিশ করতে শুরু করলেন।

www.pathagar.com

'ছেলেরা চাকরি করে তারা পয়সাকড়ি পাঠায় না?'

সুধীর বললেন, 'পাঠায় কিছু, তবে আমি তাদের জানিয়েছি যতদিন সক্ষম থাকি আমি এ কাজ করে যাব। আমি ছেলেদের মুখাপেক্ষী হতে চাই না।

'তা হলে আপনার পরে আপনাদের তিন পুরুষের পেশায় বদল হবে তাই না?' আমার প্রশ্নের জবাবে সুধীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'তাই সাহেব। আমিই বোধহয় শেষ পুরুষ এই কাজ করছি। আমি সবসময়েই আমার কাজে আনন্দ পেয়েছি। কত সাহেব মেম সাহেবদের সাথে এখানে পরিচয় হয়েছে। ভদ্র, অভদ্র, দুষ্টু, চোর আর বদমাশ সব ধরনের মানুষই দেখা যায়।'

জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আয় হয়?

সুধীর বললেন, 'মন্দ নয়, তবে ছুটির দিনে এবং সপ্তাহান্তে ভাল হয়। বহু বাবুজিদের দেখেছি পেটে মাল পড়লে দিল দরিয়া হয়ে যান। এখানে অনেক বার (Bar) রয়েছে। ওই দু'দিন বিকেল থেকেই এখানে ভিড় লেগে যায়। অন্যসময় অফিসগামী ও ফেরত মানুষগুলোর তেমন সময় থাকে না। তবে আমার রোজগার ওই সব দিনেও মন্দ হয় না।

কামরুলের জুতোর পালিশ করা শেষ হল। কিছু বাড়তি পয়সা দিলে দু'হাত তুলে কপালে ঠেকালো। কামরুল আমাকে দেখিয়ে সুধীরকে বলল, 'এই সাহেব বই লিখেন। তোমার কথা নিশ্চয়ই লিখবেন।'

'গরিবের কথা কি সাহেব লিখবেন?'

আমি বললাম, 'অবশ্যই সুধীর। আপনার জীবনী নিয়ে তো উপন্যাস লেখা যায়। আমি তো তেমন লেখক নই, তবে অবশ্যই আপনি আমার বইয়ের চরিত্র হবেন।'

আমরা সুধীরকে ছেড়ে হোটেলের দিকে পা বাড়ালাম। নিয়েছিলাম আত্মতৃপ্ত সুধীর নামক এক নিচু জাতের মুচির ছবি। সুধীররা জীবন সংগ্রামে বেঁচে থাকে তাদের সন্তানদের তাদের চেয়ে বড় দেখতে। বাবা হিসেবে সুধীরের সন্তানদের জন্য ত্যাগ বাবা নামক ব্যক্তিদের নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রতীক করে তোলে।

আমরা সকালের হাঁটা আর এ বিচিত্র অভিজ্ঞতালব্ধের পর যখন হোটেলে ফেরত আসলাম তখন সকাল নয়টার বেশি। রমেশ হোটেলে প্রবেশের মুখে দাঁড়ানো। তিনি জানালেন যে, তিনি তার ট্যাক্সি নিয়ে নয়টার সময়েই এসেছেন। কামরুল তাকে জানালো যে, প্রায় দশটার দিকে আমরা প্রথমে লালদীঘি পরে অন্যান্য জায়গায় যাব।

গোসল সেরে তৈরি হয়ে নিচে নেমে দেখলাম হোটেল লবি সংলগ্ন ছোট ডাইনিং রুমে কামরুল আর মুকুল বসে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে। আমি যোগ দিলে মুকুল চা ঢেলে আমাকে এককাপ দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এখন আমরা কোথায় যাব।'

'প্রথমে রাইটার্স বিল্ডিং–যার বাংলা নাম মহাকরণ-লালদীঘি সংলগ্ন এলাকা দেখা

www.pathagar.com

শেষ করে তথাকথিত ব্ল্যাকহোল সরণি দেখতে চাইব। খুঁজে বের করব জব চার্নকের সমাধি। দুপুরে বাইরে কোথাও খেয়ে সময় থাকলে আবার বের হবো।'

মুকুল বলল, 'এককালের ডালহৌসি স্কয়ার বর্তমানে বিবিডি (BBD) বাগ বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত এবং দিনেশ গুপ্তের নামকরণ করা হয়েছে। সাথেই লালদীঘি এখান থেকে বেশি দূরে নয়।'

'বেশি দূরে নয় তবে সেখানে অনেকগুলো স্থাপনা রয়েছে যেগুলো দেখতে গেলে অনেক সময় লাগবে।' আমি আরও বললাম, 'এখানেই ইংরেজরা নবাবের অগোচরে ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম তৈরি করেছিল। তার কাছেই ছিল কলকাতার প্রথম ক্যাথেড্রাল। কাজেই বাংলার নবাবশাহীর পতনের এবং ভারতে ব্রিটিশ রাজগঠনের সূত্রপাত এখান থেকেই হয়েছিল। ১৮ জুন ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে নবাবের ফৌজ আক্রমণ শুরু করলে তিন দিন পর এ দুর্গ সিরাজের বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। দুর্গের ইংরেজ গভর্নর রজার ড্রেক পালিয়ে প্রাণে রক্ষা পান।' মুকুল আর কামরুল সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনে বলল, তাহলে এ জায়গা ভালভাবে দেখতে হয়।

'এখন অবশ্য ওই ফোর্টের তো কিছু নেই, তবে বিভিন্ন বইয়ের সূত্র থেকে জানা যায়, কোথাও মার্কিং রয়েছে। খুঁজে বের করতে হবে। মুকুল তোমার কি জানা আছে?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'আমি এত ইতিহাস পড়িনি তবে বিনয়, বাদল আর দিনেশ যে বাঙালি ছিল তা জানি।'

মি. মুকুল শুধু বাঙালিই নয় পূর্ব বাংলা, বর্তমান বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন। আমার কথা শুনে মুকুল বলল তাই নাকি?

কামরুল বলে উঠল, 'তার মানে ঘটি ছিল না। ছিল খাঁটি বাঙালি। তারা কি করেছিল।'

ট্যাক্সিতে যেতে যেতে বলব। চল এখন রওয়ানা হই। না হয় দেরি হয়ে যাবে। বলেই আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।

তিনজনে গিয়ে রমেশের ট্যাক্সিতে বসলে মুকুল রমেশকে রাইটার্স বিল্ডিং-এ যেতে বলল। ট্যাক্সিতে যেতে যেতে আমি ঐতিহাসিক লালদীঘির নাম পরিবর্তনের ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরলাম।

ইংরেজ বণিকদের ভারতে আগমনের পূর্বে এখানে এক বিশাল জলাশয় ছিল। এই জলাশয় তৈরি করেছিলেন একজন বাঙালি বণিক লাল মোহন শেঠ। তবে অনেকে বলেন হোলীর সময় এখানকার প্রধান তিনটি গ্রামের, যার উপর ভিত্তি করেই শহর গড়ে উঠেছিল– মানুষ একত্র হয়ে হোলীর উৎসব করতো। ওই সময় লাল রংয়ের কারণে সমস্ত পানি লাল হয়ে উঠতো বলে ক্রমেই এর নাম হয় লালদীঘি। ক্রমে ইংরেজদের

www.pathagar.com

আগমনের এবং বিভিন্ন পর্যায়ে এর নাম পরিবর্তিত হতে থাকে। লালদীঘি হতে, বিশাল জলাশয় (Great Tak) থেকে ট্যাঙ্ক স্কয়ার এবং পরে ডালহৌসি স্কয়ার। ভারতের স্বাধীনতার পর এ তিন বিপ্লবী যুবকদের যুক্তনামে রাখা হয় বিনয়, বাদল, দিনেশবাগ বা বি বি ডি বাগ।

বিনয় বসু (১৯০৮-৩০), বাদল গুপ্ত (১৯১২-৩০), দিনেশ গুপ্ত (১৯১১-৩১)। এ তিনজন প্রায় সময় বয়েসি যুবক ভারতীয় জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার (Bengal Volunteers) নামক সংগঠনে যোগ দেন। সংগঠনটি নেতাজী সুভাষ বোস দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। এরা ব্রত নিয়েছিলেন সহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজদের ভারত ছাড়া করতে হবে।

ডিসেম্বর ৮, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে বিনয় বাদল আর দিনেশ সশস্ত্র অবস্থায় ইংরেজ সরকারের এ অংশের সরকারের প্রাণকেন্দ্র রাইটার্স বিল্ডিং-এর মধ্য প্রবেশ করতে সক্ষম হন। খুঁজে বের করেন কারাগার সমূহের মহাপরিদর্শক মি. সিম্পসনকে। উপর্যুপরি গুলি করে তাকে হত্যা করা হয়। কথিত আছে যে মি. সিম্পসন কারারুদ্ধ জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের সাথে সদ্ব্যবহার করতো না। তারা নানা রকম নির্যাতনের শিকার হতেন তারই সামনে। গুলি করে সিম্পসন হত্যার পরপরই পুলিশের হাতে ধরা পড়বার আগেই 'সায়নাইড' খেয়ে বিনয় আর বাদল আত্মহত্যা করেন। দিনেশ আত্মহত্যা করতে নিজের উপরে গুলি চালালেও মারা যাননি। আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে রাখা হয়। পরে ৭ জুলাই, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে দিনেশকে কলকাতাতেই ফাঁসি দেয়া হয়।[১] তাদেরই স্মরণে ভারত সরকার ডালহৌসি স্কয়ারের নাম পরিবর্তন করে বর্তমান নামকরণ করেন।

বিনয়, বাদল আর দিনেশ তিনজনই বর্তমানে বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার সন্তান। বাদল বিক্রমপুরের পূর্ব শিমুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দিনেশ ছিলেন তৎকালীন মিটফোর্ড, বর্তমানের স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। আর বিনয় ছিলেন ঢাকা কলেজের ছাত্র। তিনজনেই সুভাষ বসুর ডাকে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার বা বেঙ্গল স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য হয়েছিলেন?

বেঙ্গল ভলান্টিয়ারস গ্রুপ ছিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের একটি গুপ্ত সংগঠন। এ সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে। প্রথমে এ স্বেচ্ছাসেবক দল সুভাষ চন্দ্র বসু গঠন করেছিলেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের কলকাতা বৈঠকে সহায়তা করবার জন্য। পরে হয়ে উঠে সশস্ত্র সংগঠন যার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন মেজর সত্য গুপ্ত আর নেতাজী সুভাষ বোস ছিলেন প্রধান পরিচালক।

---

১ । Hemendranath Dash Gupta, BharaterBiplob Kahini111

www.pathagar.com

আমরা এতক্ষণে জওহরলাল নেহেরু রোড, এসপ্লানেড মেট্রো স্টেশন পার হয়ে শহীদ মিনার বা অকটারলোনি মনুমেন্টকে হাতের বাঁয়ে রেখে সিদু কানুধর রোড হয়ে রাজভবনের দক্ষিণ পাশ ঘুরে একাকালের ডালহৌসি স্কয়ার আর বর্তমানের বিবিডি বাগের ইতিহাস খ্যাত লালদীঘির পশ্চিম পাড় ধরে লাল রংয়ের ঐতিহাসিক দালান রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনে দিয়ে পূর্ব পাড়ে বাসস্ট্যান্ডে পৌছলাম। রমেশ আমাদেরকে নামিয়ে দিয়ে বললেন যে তিনি সামনের পার্কে থাকবেন এবং আমাদের এ এলাকা দেখা শেষ হলে যোগাযোগ করলে তিনি এখান থেকেই আমাদের উঠিয়ে নেবেন। আমরা নামলাম কলকাতার তথা পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু রাইটারস বিল্ডিংসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার সামনে। এখানেই প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ফোর্ট উইলিয়াম নামে আদি দুর্গ তৈরি করে ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে নদীর ধার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। প্রথমে এর আকার ছোট ছিল। নামকরণ করা ওই সময়ের ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নামে। বর্তমানে লালদীঘির পশ্চিম পাড়ে কলকাতার অন্যতম আকর্ষণীয় দালান জেনারেল পোস্ট অফিস যে জায়গায় তৈরি করা হয়েছিল, সেটিই আরও পূর্বের বর্ধিত ফোর্ট উইলিয়াম। আমরা পশ্চিম পাড়ে দাঁড়িয়ে পূর্ব পাড়ের জিপিও (GPO) বিল্ডিংটি দেখছিলাম।

কলকাতায় তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্থাপনাগুলো বিশেষ রাজস্ব সংগ্রহের সাথে জড়িত থাকায় গড়ে উঠেছিল তৎকালীন দিল্লীর মোগল সম্রাট-এর সুবেদার ছিলেন আজিম-উস-সান-এর সময়ে। আজিম উস-সান ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের নাতি। ওই সময়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব আর বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহের কারণে হিন্দুস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে দিল্লীর প্রভাব কমতে কমতে না থাকার মত হয়েছিল। দিল্লী মসনদের দুর্বল অস্তগামী মোগল সাম্রাজ্যের সম্রাটদের পক্ষে এত দূরের অঞ্চল সামাল দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। ব্যয় সাধ্যও হয়ে উঠেছিল। এসব প্রান্তের মোগল সুবেদাররা নিজেরাই ক্ষমতাধর হয়ে উঠে বিদ্রোহী হতে থাকেন। সুবেদার আজিম-উস-সান তাই কাজে লাগাতে চাইলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে। প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে এ এলাকার তিনটি গ্রাম কিনতে অনুমতি দিয়েছিলেন। গ্রাম তিনটি ছিল সুতানুটি, কালিকাটা আর গোবিন্দপুর। এগুলো কেনা হয়েছিল তৎকালীন জমিদার সুবর্ণ রায় চৌধুরীর বা মজুমদারের নিকট হতে। দেয়া হয়েছিল ১৬০০০ রুপি উপঢৌকন আর গ্রামগুলোর জন্যে মাস প্রতি ১২০০ রুপি।[২]

জব চার্নকের মৃত্যুর পর ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির গভর্নর হন জন গোল্ডসবারো (John goldsborough) তিনি কোম্পানির সদর স্থানান্তরিত করেন হুগলীর পূর্ব পাড়ে

২। Lostly J.P. Calcutta City of Palaces, pp 35-36 এবং বাংলা পিডিয়া।

www.pathagar.com

কলকাতায়। আজিম-উস-সান-এর সম্মতির পর কোম্পানি রালপ সেলডনকে রাজস্ব সংগ্রহের কালেক্টর নিয়োগ করে। তিনি ছিলেন, তৎকালীন ভারতের প্রথম কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট। এরই মধ্যে রাজা সোভা সিং নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি আঁতাত করেন ইংরেজ, ফরাসি ও ওলন্দাজদের সাথে। একই সাথে তাদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে বাংলার নবাবদের রোষ হতে শক্ত অবস্থান তৈরির পরামর্শ দেন। ইতিমধ্যেই ইংরেজ কোম্পানি লালদীঘির আশপাশে আরও জায়গা খরিদ করে। গড়ে তোলে কোম্পানির গোডাউন, অফিস এবং দুর্গের মধ্যে সৈনিক বাসস্থান। প্রয়োজনে পরে হুগলী নদীর তীর ঘেঁষে দুর্গের আরও পরে তৈরি হয় সেইন্ট এনা নামের প্রথম গীর্জা। এ দুর্গ আর গীর্জা পরে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা আক্রমণ করে প্রায় গুঁড়িয়ে দেন। সময় তখন ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ।

আমরা লালদীঘির পূর্বপাড় ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে দক্ষিণ পাড়ের মাঝামাঝি তৈরি বিশাল পাকা ঘাটলার সামনে দাঁড়ালাম। সামনেই লাল ইট রংয়ের ব্রিটিশ স্থাপনার নিদর্শন তিনতলা রাইটার্স বিল্ডিং। স্থাপত্য অতি পরিচিত। আমাদের দেশে বহু জেলা শহরে ওই আদলে বিদ্যমান আছে এককালের কালেক্টরেট বিল্ডিং। রাইটার্স বিল্ডিং হতে অনেক ছোট এ দালানগুলো ছিল ব্রিটিশ ভারতের জেলাগুলোর ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। কিছু কিছু জেলাতে এখনও এগুলোকে কালেক্টরেট বিল্ডিং বলে সাধারণ জনগণ চিহ্নিত করেন।

লালদীঘির চারদিকে রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত অনেকটা বর্গক্ষেত্রের মত ছিল। যে কারণে এটাকে স্কয়ার নামকরণ করা হয়েছিল। এখন লালদীঘি নামেই মাত্র দীঘি। চারপাশে গ্রিলের ঘেরা দেয়া। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে সে জায়গাটি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত। কাপড় কাঁচা হতে গোসল করা হয় এখানে। ওই সময়ে অনেকেই গায়ে তৈল মর্দনরত ছিলেন গোছলের পূর্ব প্রস্তুতিতে। দীঘির পানিতে লাল দালানের প্রতিবিম্ব দেখা যায় না, কারণ উত্তরদিকে রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনের অংশে আন্ডার গ্রাউন্ডে গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করায়-এর আকার আরো ছোট হয়ে গেছে। পানির রঙ সবুজ আর কোণায় কোণায় ময়লা আবর্জনার স্তূপ। এক কথায় স্বপ্নভঙ্গের দীঘি। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে মানে দক্ষিণ পাড়ে রয়েছে ট্রাম লাইন।

আমাদের সামনে রাইটার্স বিল্ডিং। সম্পূর্ণ ডালহৌসি স্কয়ার বা বর্তমানের বিবিডি বাগের লালদীঘির পূর্ব-পশ্চিম প্রান্তের একপ্রান্ত হতে আরেক প্রান্ত সদর্পে দাঁড়িয়ে আছে ব্রিটিশ রাজের রাজধানী (১৯১১ পর্যন্ত) কলকাতার অন্যতম স্থাপনা রাইটার্স বিল্ডিং। বর্তমানে পশ্চিম বাংলার মন্ত্রণালয় ও সচিবালয়। রাইটার্স বিল্ডিং-এর দু'প্রান্তে উত্তর-দক্ষিণে রয়েছে দু'বাহু। আর পেছনে সংযুক্ত আরেকটি পূর্ব-পশ্চিম বাহু।

এ বিল্ডিংটি প্রথমে তৈরি করা হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তরুণ ইংরেজ

www.pathagar.com

রাইটার্স (বস্তুতপক্ষে করণিক ও শিক্ষানবিশ কর্মকর্তা)দের বাসস্থান ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে। এখানেই ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে গোড়াপত্তন হয় বিখ্যাত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের। এ কলেজের ব্যাপক অবদান রয়েছে বাংলা ভাষার আধুনিকায়ন ও গদ্য রচনার সূত্রপাতে। পরে বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট (সচিবালয়) এবং স্বাধীনতার পরে ওয়েস্ট বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট (সচিবালয়)। এরই পাশে ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল সেন্ট এনা চার্চ (গীর্জা)। এখন সে গীর্জা নেই। তবে পূর্ব দিকে রয়েছে সেন্ট এনড্রুস চার্চ। রাইটার্স বিল্ডিং-এর পূর্ব পাশে, এখন যেখানে সেন্ট এনড্রুস চার্চ সেখানে ছিল পুরাতন কোর্ট বিল্ডিং যা পরে সরিয়ে নেয়া হয়।

বলছিলাম ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কথা। কলেজটি এখনও রয়েছে তবে অন্যত্র। এ কলেজ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করতেই হয়। কারণ, পরের একশত পঞ্চাশ বছরে ব্রিটিশ ভারত শাসনে এ কলেজ ব্যাপক প্রভাব রেখেছিল। যেমন রেখেছিল বাংলা সাহিত্য আর বেঙ্গলি রেনেসাঁতে। এ কলেজের প্রভাবেই তৈরি হয়েছিল কলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ। এখানেই খ্যাতির শিখরে উঠেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে এখানে কলেজের গোড়াপত্তন করেন তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল মার্কিস ওয়েলেসলি। গভর্নর জেনারেল ছিলেন প্যাট্রন এবং উচ্চ আদালতের বিচারক হতে অন্যান্যরা পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ছিলেন। আইন মোতাবেক এ কলেজের প্রভোস্ট, বস্তুতপক্ষে প্রধান, নিয়োগ হতেন চার্চ অব ইংল্যান্ডের মনোনীত ধর্মযাজক। প্রথম প্রভোস্ট ছিলেন রেভারেন্ড ডেভিড ব্রাউন। আরেকজন বিখ্যাত প্রভোস্ট ছিলেন রেভারেন্ড উইলিয়াম ক্যারি। তারই অনুপ্রেরণায় বাংলা ভাষার আধুনিকায়ন করা হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষানবিশরা পরীক্ষার মধ্যদিয়ে নিয়োগ হতো ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এখানেই সূত্রপাত হয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ পরে আমরা আইসিএস (ICS) নামে জেনেছি। এই কলেজের ইতিহাস ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বেড়ে উঠার ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আমরা এখনও লালদীঘির সান বাঁধানো ঘাটের সামনে দাঁড়ানো। মুকুলকে জিজ্ঞাসা করলাম যে কেন এই ঐতিহাসিক এককালের দৃষ্টিনন্দন দীঘির এ রকম বেহাল? মুকুলের সাফ জবাব, ৩৪ বছরের বামদের শাসন। কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির অব্যবস্থা।

কামরুল বলে উঠল, 'আমাদের দেশের সচিবালয় কত পরিচ্ছন্ন আর সুরক্ষিত। এখানে তো তেমন দেখছিনা।'

'আমরাতো পশ্চিম বাংলার রাজধানীতে। ভারতের রাজধানীতে নেই।' কামরুল

www.pathagar.com

সুযোগ পেলেই মুকুলকে খোঁচা মারে। দু'জনের মধ্যে এ খুনসুটি লেগেই আছে।

আমরা ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে টমাস লিওনের নক্সা করা রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনের দীঘি অপর পাড় থেকে পশ্চিম দিকের এ অঞ্চলের সবচাইতে আকর্ষণীয় বিল্ডিং জিপিও-এর সামনে কয়লাঘাট রোডে চলে আসলাম। আমাদের সামনে, এ ভবনটি যেখানে বর্তমানে রয়েছে সেখানেই ছিল আদি ফোর্ট উইলিয়াম আর এখানেই ছিল সেই বিতর্কিত ব্ল্যাকহোল অব ক্যালকাটা। বহু বছর এখানে মনুমেন্টটি ছিল যা বর্তমানে সেন্টজন গীর্জার অঙ্গনে রয়েছে। এটি একবার ভেঙে দিয়েছিলেন সুভাষ চন্দ্র বোস। ব্ল্যাকহোল আর সিরাজ কর্তৃক দুর্গের ইংরেজ বন্দিদের কথিত নির্মম হত্যার কল্পিত ইতিহাস ইংরেজদের উৎসাহিত করেছিল নেটিভদের উপরে অত্যাচারের। সে বিষয়ে পরে আসব। এ জেনারেল পোস্ট অফিস নির্মিত হয়েছিল ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে। বিল্ডিং-এর মাঝ বরাবর রয়েছে ২২০ ফুট উঁচু গম্বুজ সদৃশ স্থাপনা। এখানে ১৮৮৪ থেকে একটি পোস্টাল জাদুঘর স্থাপিত রয়েছে। এখান থেকেই সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের জন্য প্রথম ডাক টিকিট প্রবর্তন করা হয়। সময়টি ছিল অক্টোবর ১,১৮৫৪ সাল। এটা এখনও পশ্চিমবাংলার প্রধান ডাকঘর, ভারতের অন্যতম বৃহত্তম পোস্টঅফিস। প্রসঙ্গত ভারতে ১৫৫,৩৩৩টি পোস্ট অফিস রয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম পোস্টাল সার্ভিসই ভারতের পোস্টাল ব্যবস্থা।

আমরা প্রধান পোস্ট অফিস ছেড়ে উত্তর দিকে পুরাতন কাস্টমস হাউসের কোণা হতে রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনে দিয়ে পূর্বপাশে সেন্ট এনড্রুজ গীর্জার সামনে এসে দাঁড়ালাম। আমি জব চার্নকের সমাধির খোঁজ করছিলাম। ওই সমাধিটি কোন গীর্জায় সে নামটি ভুলে গিয়েছিলাম। সেন্ট এনড্রুজের সামনে কোথাও ফলক না পেয়ে মুকুলকে গীর্জার ভেতরে খবর নিতে পাঠালে সে ঘুরেফিরে এসে বলল সেখানে কোন জনমানবের চিহ্ন সে পায়নি। তাই কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারল না। ততক্ষণে আমার মনে পড়ল যে, আমরা খোঁজ করছি সেন্ট জন গীর্জা যেটি এখানেই কোথাও রয়েছে। অগত্যা রাস্তার মোড়ে দাঁড়ানো ট্রাফিক পুলিশের শরণাপন্ন হলাম। ভারতের পুলিশের এসব বিষয়ে জ্ঞানের অজ্ঞতার কথা আমার জানা আছে। দিল্লীর আর আগ্রার অভিজ্ঞতার কথা আমার আগের দু'টি বইতেই রয়েছে। আমি সঠিক তথ্য পাব এমন আশা করি নাই।

রাস্তার মোড়ে দাঁড়ানো ট্রাফিক আমাদের সামনের পুলিশ হেড কোয়ার্টারের উল্টোদিকের আর এন মুখার্জি রোডের ভেতরে খোঁজ করতে বললেন। সামনেই পুলিশ হেডকোয়ার্টার এবং কলকাতার ইতিহাসখ্যাত বহুল চর্চিত লাল বাজার পুলিশ স্টেশন। আমরা ট্রাফিকের নির্দেশনা মোতাবেক কিছু দূরে গিয়ে হাতের বাঁয়ে একটি ছোট গীর্জায় জিজ্ঞাসা করলাম। সেখানে যে ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন তিনি অনেকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে মাথা চুলকানো শুরু করলে আমি উল্টোপথে হাঁটা শুরু করলাম। কিছুক্ষণ

www.pathagar.com

পর কামরুল আর মুকুল এসে খবর দিল যে ওই লোক জানে না।

'আমি তার অঙ্গভঙ্গি দেখেই বুঝেছিলাম যে তার জানা নেই।'

'কিভাবে বুঝলেন?' কামরুলের জিজ্ঞাসা।

'অভিজ্ঞতা।' কাউকে কোন জায়গার অবস্থান জিজ্ঞাসা করলে তিনি যদি মাথা চুলকানো আর বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করেন বুঝে নিতে হবে তিনি জানেন না।' আমার কথায় কামরুল সায় দিল কিনা বুঝতে পারলাম না। সময় তখন দুপুর গড়িয়ে।

'লাল বাজার পুলিশ স্টেশনে যাবেন। এখানেই সামনে। চলুন ও ধারে গিয়ে চা খেয়ে নেই।' আমরা দু'জন মুকুলের প্রস্তাবে সায় দিলাম। হাঁটা শুরু করলাম লাল বাজারের দিকে। ফুটপাতে অসংখ্য ফেরিওয়ালাদের দোকানের পসরা। বিভিন্ন ধরনের খাবার, শরবত মালটা জুস থেকে শুরু করে ঘড়ি আর প্রসাধনী কি নেই সবই পাওয়া যায়। তবে ফুটপাত চওড়া এই যা রক্ষা।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে লাল বাজার অঞ্চলে আসলাম। বিভিন্ন দ্রব্যের প্রচুর ছোট ছোট দোকান আর ফুটপাতে হকাররা। রাস্তায় গাড়ির ভিড় আর মাঝ দিয়ে রাজসিক গতিতে চলছে কলকাতার ট্রাম। বাসের সংখ্যাও কম নয়। রাস্তার উল্টোদিকে পুলিশ স্টেশন বা থানা তার পেছনে বিশাল এলাকা জুড়ে পুলিশ হেড কোয়ার্টার। এখানে ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ বণিক জন পামারের বাড়ি। এখন সেখানে পুলিশ কর্মকর্তার কার্যালয়। কলকাতা পুলিশ হেড কোয়ার্টারের মূল দালানটি ব্রিটিশ রাজের সময়ের লাল ইটের তৈরি। নির্মাণে ভিক্টোরিয়া আমলের নির্মাণশৈলীর ছাপ রয়েছে। এখানে বহু ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নির্যাতিত হয়েছিল। এখানেই প্রকাশ্যে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বহু সদস্যকে।

১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা পুলিশের যাত্রা শুরু হয়। ওই সময় নাম ছিল ব্ল্যাক ডেপুটি। থানাদার, পাইক আর নায়েব ছিল পুলিশের পদবি। আরও পরে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন শহরের আদলে কলকাতা পুলিশ পুনঃবিন্যাসিত হয়। বর্তমানে কলকাতা পুলিশের প্রধান হলেন পুলিশ কমিশনার।

আমরা কলকাতা পুলিশ হেড কোয়ার্টারের উল্টোদিকে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে প্রথমে মাল্টার জুস পরে চা খেয়ে পুনরায় রাইটার্স বিল্ডিং-এর উত্তরদিকে (পেছন দিকের) রাস্তা দিয়ে ঘুরে পুরাতন কাস্টমস হাউসের সামনে দিয়ে, যেখানে রমেশ আমাদের নামিয়েছিল, ঘুরে আসলাম। রাইটার্স বিল্ডিং-এর পেছনের রাস্তায় বেশ কিছু রেস্তোরাঁ আর ফুটপাতে ততক্ষণে দুপুরের খাবার খেতে বহু মানুষের ভিড় ছিল। এখানে অতি স্বল্পমূল্যে বিভিন্ন ধরনের খাবার পাওয়া যায় বলে মধ্যাহ্ন ভোজের ছুটিতে আশপাশের অফিসের প্রচুর কর্মচারী জড়ো হন। ততক্ষণে আমাদেরও খাবার সময় হয়ে গিয়েছিল,

www.pathagar.com

তবে জুস আর চা খাওয়াতে ক্ষিদের তীব্রতা এখনও অনুধাবন করিনি।

রমেশ ধারে কাছেই ছিলেন। আমরা এখন মোটামুটি ধরনের রেস্তোরাঁর খোঁজে। কামরুল প্রস্তাব করল যে, আমরা হোটেলে ফিরে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে সামনে রেস্তোরাঁতে গিয়ে খেয়ে পুনরায় বের হতে পারি। কামরুলের প্রস্তাবে আমরা আবার হোটেলে ফিরলাম। যাবার পথে কলকাতা হাইকোর্টের সামনে দিয়ে বিবিডি বাগ ছেড়েছিলাম। হাইকোর্টের গেটের সামনে কালো গাউন পরিহিত আইনজীবীদের তৎপরতা ছিল চোখে পড়বার মত। দেখেই মনে হল বাঙালি মানেই মামলা। মামলাবাজ এমন জাতি বিশ্বে তেমন খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। এই হাইকোর্টেই ভারত তথা অবিভক্ত বাংলার বহু মামলা হয়েছে। রয়েছে সে সব দুর্লভ দলিল আর দস্তাবেজ।

আমরা প্রায় আধা ঘন্টা পর হোটেলের পাশেই এক রেস্তোরাঁতে বসে খেয়ে নিলাম। রমেশও দুপুরের খাবার শেষ করে হোটেলের সামনেই ছিলেন। শীতের দিন খুব তাড়াতাড়িই বেলা শেষ হতে থাকে। কলকাতায় এই ডিসেম্বরের শেষের দিকেও তেমন ঠাণ্ডা অনুভূত হয়নি। ঢাকায় ফোন করে জানলাম সেখানে শৈত্য প্রবাহ চলছে গত কয়েকদিন ধরে। দিনের বেলাতেও বেশ ঠাণ্ডা অনুভূত হচ্ছে। আমরা খাওয়া শেষ করে রমেশের ট্যাক্সিতে বসলাম।

মুকুল বলল, 'এখন কোথায় যাব।'

কালিঘাট আর জোড়াসাঁকোর দিকে যাই!

'যেতে যেতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে নাকি?'

রমেশ বললেন, 'জোড়াসাঁকো আর কালীঘাট অঞ্চলে ট্রাফিক ব্যবস্থা খুব ভাল নয়। ওই জায়গাটা পুরাতন কলকাতার মধ্যে।'

এত সব কথার পর আমরা রমেশকে নিয়ে জোড়াসাঁকোর দিকে রওয়ানা হলাম। জোড়াসাঁকোর কথা বাঙালি মাত্রই অল্পবিস্তর জ্ঞাত আছেন। জোড়াসাঁকো বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষের বাড়ি। রবীন্দ্রনাথ জীবনের বহু সময় এখানেই কাটিয়েছেন। শৈশব কাটিয়েছেন। পরিণত বয়স কাটিয়েছেন জোড়াসাঁকোতে। আগেই বলেছি যে কলকাতা শহর সম্প্রসারণের সময় ঠাকুরদের জোড়াসাঁকোতে বসতি করতে দেয়া হয়েছিল। ঠাকুর পরিবারের জমিদারী ছিল তৎকালীন পূর্ব বাংলায়। রবীন্দ্রনাথ এই জোড়াসাঁকোতে বসেই বহু কবিতা লিখেছেন। এ সব ইতিহাস বলবার অবকাশ নেই। কারণ, শিক্ষিত বাঙালি মাত্রই এ ইতিহাস আমার চাইতে অধিক গভীরভাবে জানেন।

আমরা লেনিন সরণি পার হয়ে বৌবাজার বা বো-বাজার এলাকায় প্রবেশ করলাম। এ ধারটায় বেশ ভিড়। আমরা বৌ বাজারস্ট্রিটে। আশপাশে অনেক পুরনো ধাঁচের বাড়ি দালান-কোঠা আর বিভিন্ন পণ্যের দোকান। বৌবাজার অনেকে উচ্চারণের বিভ্রাটে

www.pathagar.com

বলেন বহু বাজার আবার অনেকে মনে করেন বৌবাজার। তবে প্রাপ্ত নথিপত্রে এ জায়গার নাম বো-বাজার হিসেবে উল্লেখিত। তবে সাধারণের নিকট বৌবাজার হিসেবেই অধিক পরিচিত। আসলে বৌ-এর সাথে এ বাজারের কোন সম্পর্ক নেই। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে বো বাজারের প্রধান সড়কের নাম রাখা হয় বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী রোড। এখানে বহু ফার্নিচারের দোকান। এক সময় বহু নামকরা ফার্নিচারের দোকান ছিল। এখন হাত বদল হতে হতে সে মান হয়ত নেই।

বো বাজারে বহু নামিদামি ব্যক্তি জন্মগ্রহণ এবং বাস করতেন। এদের মধ্যে রয়েছেন স্যার আশুতোশ মুখার্জী, ডা. বিধান চন্দ্র রায় এবং ঋষি অরবিন্দ ঘোষ। এখানেই কোন এক বটগাছের নিচে জব চার্নক বৈঠকখানা বানিয়েছিলেন। এ জায়গাটি কলকাতার সবচাইতে পুরাতন অঞ্চলের অন্যতম। এখন এখানে রয়েছে কলকাতার সর্ববৃহৎ নিষিদ্ধ পল্লী। এখানে রয়েছে বহু স্কুল-কলেজ। এ সবের মধ্যে রয়েছে বিখ্যাত লরেটো ডে স্কুল।

এখানে বো-বাজারের ৩৪৫ নং দাগে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে উনিশ শতকে নির্মিত ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি। ছোট ধুসর রংয়ের একটু ব্যতিক্রমধর্মী সুন্দর একেবারে রাস্তার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই মন্দির। দেখতে গিয়েছিলাম এই কালী বাড়ি মন্দির। ভেতরে প্রবেশ করিনি কারণ সন্ধ্যা পূজো চলছিল। তবে বাইর হতে দেখলাম, ছোট মন্দির যার ভিতরে এখনও পূজা অর্চনা চলে। অদ্ভুত নাম এ মন্দিরের, 'ফিরিঙ্গি কালী বাড়ি'। এ নাম হয়েছে এর প্রতিষ্ঠাতা উনিশ শতকের বাংলা ভাষার তথা তৎকালীন কোলকাতা ভিত্তিক বাঙালি সমাজের কবিয়াল বলে বিখ্যাত হয়ে উঠা পর্তুগীজ হেঞ্জম্যান এনথোনি (Hensman Anthony) ওরফে এনথোনি ফিরিঙ্গি-এর নামে।

এনথোনি ফিরিঙ্গির অতীত তেমন জানা নেই, তবে তার পিতা বাংলায় আসেন আঠারো শতকের শেষের দিকে। এনথোনি ফিরিঙ্গির মাতা বাংলার মেয়ে বলে কথিত রয়েছে। এনথোনি বেড়ে উঠেন এবং গানের চর্চা শুরু করেন অষ্টাদশ শতকের শেষের এবং উনিশ শতকের প্রথম দিকে। ওই সময়ে কেরি সাহেব, রাম বসু এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরদের বাংলা ভাষায় বৈচিত্র্য আনবার প্রয়াসের যুগ। কবি গান আর কবিয়ালদের পৃষ্ঠপোষকতার যুগ। সমাজের উঠতি ধনী জমিদার আর রাজা-মহারাজা খেতাবধারীদের মধ্যে সাহিত্য, শিল্প নিয়ে প্রতিযোগিতার যুগ। ভোলা ময়রা, রাম বসু আর হারু ঠাকুর সিংদের যুগ। এদের মধ্যে যোগ দিলেন এনথোনি তত দিনে তিনি পরিচিত হয়ে উঠলেন এনথোনি ফিরিঙ্গি হিসেবে।

শুধু এনথোনি ফিরিঙ্গিই নয় ভোলা ময়রাও অনেক উঁচু দরের কবিয়াল ছিলেন। ভোলা ময়রা ছিলেন বাংলার বিখ্যাত মিষ্টি প্রস্তুতকারীদের জাতের। আর এদের সবার গুরু বলে খ্যাত ছিলেন ঠাকুর সিং। যার পুরো নাম ছিল হরেকৃষ্ণ দিঘারী, সংক্ষেপে

www.pathagar.com

হরি ঠাকুর। যিনি মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের পৃষ্ঠপোষকতায় দরবারের প্রধান কবিয়াল হয়ে উঠেন। এই মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় ওই সময়ের কোলকাতার উঠতি বাঙালি বনেদি সমাজে সমাদৃত এই কবিগান জন্ম দিয়েছিল বহু বড় বড় নাম। মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের কথা বহু জায়গায় ইতিপূর্বেও বলেছি। পরবর্তীতেও ইতিহাসে বহুল আলোচিত এই ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনার ইচ্ছা রাখি। এসব কবিয়ালদের প্রত্যেকের জীবন আলেখ্য নির্মিত হয়েছিল বেশ কয়েকটি ছায়াছবি। যদিও এদের জীবনের যে সমস্ত দিক ছায়াছবিতে তুলে ধরা হয়েছে অনেকে মনে করেন ছবিকে আকর্ষণীয় করতেই এসব উপাদান যুক্ত হয়েছিল। এই সময়কার কবিয়ালদের জীবনী তেমন রচিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। শুধু এনথোনি ফিরিঙ্গি চরিত্রেই নয় প্রয়াত উত্তম কুমার ভোলা ময়রা চরিত্রেও ভোলানাথ ময়রাকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন।

এনথোনি ফিরিঙ্গি চন্দননগরের ফরাশডাঙ্গায় বসবাস শুরু করেন। যেহেতু তার জাতপাতের বালাই ছিল না, সেহেতু তিনি বিয়ে করলেন এক বিদূষী বাঙালি হিন্দু বিধবা, সুধামনিকে। সুধামনির সাহচর্যেই বাংলা ভাষা, কবিতা ভক্তি আর কবিগানের প্রতি আকর্ষণ বাড়তে বাড়তে ওই সময়কার অন্যতম কবিয়াল হয়ে গেলেন। নামিদামি জলসা, পালা পার্বণে অন্যান্যদের সাথে এনথোনি ফিরিঙ্গির উপস্থিতি প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। এনথোনি ফিরিঙ্গির রচিত 'দুর্গার আগমনী' সংগীত আজও হিন্দুদের দুর্গা উৎসবের অপরিহার্য অংশ। দুর্গা ছাড়া এনথোনি ফিরিঙ্গি 'কালী'-কে নিয়ে রচনা করেছিলেন বহু ভক্তিমূলক কবিতা ও গান। এনথোনি ফিরিঙ্গি ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন বলে ইতিহাসে পাওয়া যায়।

পাঠকদের অনেকেই হয়ত বাংলা চলচ্চিত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক উত্তম কুমার এবং তনুজা অভিনীত, ১৯৬৭ সালে নির্মিত ছায়াছবি 'এনথোনি ফিরিঙ্গি' দেখে থাকবেন। পরিচালক সুনীল ব্যানার্জির মতে ছবিটি এনথোনির জীবনালেখ্য। ওই ছবিতে অবশ্য সুধামনির সাথে এনথোনির বিবাহের পূর্বে এবং পরের বহু ঘটনা দেখানো হয়েছে। দেখানো হয়েছে ওই সময়কার সমাজ ব্যবস্থা আর এনথোনি ফিরিঙ্গির প্রতিষ্ঠিত হবার সংঘর্ষ। এ ছবির জন্যেই উত্তম কুমার ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছিলেন।

ওই ছবির গল্পটির বিন্যাস যেভাবে হয়েছিল তাতে এনথোনি ফিরিঙ্গির প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পথের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছিল। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার সংগ্রাম করতে গিয়ে পরিচয় হল কলকাতার এক বাঈজী সাকিলার সাথে। ক্রমেই এনথোনি সাকিলার সান্নিধ্যে ফিরিঙ্গি হতে বাঙালিতে পরিবর্তিত হতে লাগলেন। জানলেন সাকিলার আসল পরিচয় এবং তার জীবনের দুঃখ ভরা অতীত। সাকিলা ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। প্রেমিকের সাথে বিয়েতে অর্থের লোভে পিতা বাদ সাধলেন।

www.pathagar.com

বিয়ে দিলেন এক অসুস্থ বৃদ্ধের সাথে। স্বামীর মৃত্যুর পর সাকিলা ওরফে সুধামনিকে সহমরণে বাধ্য করলে পুরাতন প্রেমিকের হাত ধরে পালিয়ে যান। সুধামনি সরল বিশ্বাসে প্রেমিকের উপর নির্ভর করে এত বড় শহরে চলে আসেন। কিছু দিন পরেই জানতে পারেন যে তাকে বাঈজীপাড়ায় বিক্রি করে প্রেমিক সরে পড়েছে। এরপরই শুরু হল এমন এক জীবন যেখানে তাকে সাকিলা নাম ধারণ করতে হল। ওই সময়কার সমাজের বড় বাবুদের গান-বাজনায় মাতিয়ে রাখার কাজের গণ্ডির বাইরে যেতে পারলেন না।

এনথোনি ফিরিঙ্গির করুণা আর সান্নিধ্য প্রেমে পরিণত হলে বিয়ে করলেন সাকিলাকে আর নাম পাল্টিয়ে রাখলেন সুধামনি। বিবাহিত জীবনে এনথোনির সাথে বসবাস করছিলেন ফরাসডাঙ্গা গ্রামে। সেখানেও অতীত তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। একদিন সুধামনি মন্দিরে পূজো দিতে গেলে গ্রামের লোকেরা চিনে ফেলে তাড়া করে ঘরের ভিতরে নিয়ে বাড়ি শুদ্ধ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারল। সেইদিন এনথোনি ফিরিঙ্গি ওই সময়কার এক নম্বর কবিয়াল ভোলানাথ ময়রার সাথে চূড়ান্ত কবির লড়াইয়ে। শেষ পর্যন্ত কবির লড়াইতে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন এনথোনি ফিরিঙ্গি। সেটাই ছিল এনথোনি ফিরিঙ্গির জীবনের সবচাইতে বড় বিজয়। তার এ সুখ আর আনন্দ ভালবাসার অনুপ্রেরণাদানকারী স্ত্রীর সাথে ভাগাভাগি করতে এসে এনথোনি দেখলেন যে তার ঘরখানি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। সে সাথে ছাইয়ে পরিণত ভালবাসার পাত্রী সুধামনি।

ছবির এ গল্পে কতখানি কল্পনা রয়েছে তা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। তবে সে ছবিতে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল প্রায় দুই শত বছর পূর্বের বাঙালি সমাজের চিত্র। তৎকালীন হিন্দু সমাজের ধর্মীয় সংকীর্ণতা আর ওই সমাজে মহিলাদের স্থান।

ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি দেখার পর ১৯৬৭ সালে নির্মিত এ ছবিটি পুনরায় দেখতে ইচ্ছা হচ্ছিল।

আমি এতক্ষণ এমন একজন বিদেশির কথা বললাম যিনি বাংলায় জন্মগ্রহণ না করেও বাংলার মাটির সাথে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। আজও এ অঞ্চলে কবিগানের যতটুকু প্রচলন রয়েছে তার মধ্যে ভোলা ময়রা আর এনথোনি ফিরিঙ্গির রচনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ওই সময়ে তাৎক্ষণিক রচনার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠতা প্রমাণে কবিয়ালদের মধ্যে কবির লড়াই বাংলার কৃষ্টি সাহিত্য আর সংস্কৃতিকে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছে তা এখন রিমিক্সের যুগে হারিয়ে গিয়েছে বা না থাকার মতই প্রায়। আমি যতক্ষণ ফিরিঙ্গি কালী বাড়ির সামনে ছিলাম ততক্ষণ ওই সময়ের পরিবেশ কল্পনা করছিলাম। এ অঞ্চলের ইতিহাসে কত জানা-অজানা উপাদান রয়েছে তার কতটুকুরই আমরা খোঁজ রাখি।

আমরা বো-বাজার ছেড়ে গিরিশ পার্কের পূর্বদিকে কালী কৃষ্ণ ঠাকুর রোডে উঠলাম। এ রাস্তাই আমাদেরকে নিয়ে যাবে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি। এ রাস্তার মাঝ

www.pathagar.com

দিয়েও চলমান ট্রাম লাইন। এ লাইন বহু পুরাতন কলকাতার প্রথম দিকের ট্রাম ব্যবস্থার আওতায় ছিল জোড়াসাঁকোর ট্রাম লাইন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা চিত্তরঞ্জন এভিনিউ হয়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে পৌঁছলাম। গাড়িটি গলির মুখে রেখে কিছুদূর হেঁটে বাড়ির প্রধান ফটকের সামনে হাজির হলাম। বিশাল সবুজ চত্বরসহ লাল রংয়ের তিনতলা দালান বাড়ি। এটিই ঠাকুর পরিবারের আদি বাড়ি। বর্তমানে বাড়ির একপাশে নতুন দালান হয়েছে। একধার এখন রবীন্দ্র বিশ্বভারতী ইউনিভারসিটি এবং ঠাকুর বাড়ি জাদুঘর। বিকেল চারটা বাজাতে জাদুঘরটি বন্ধ হয়ে গেছে। বাড়ির মূল দরওয়াজার সামনে রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ ভাস্কর্য রয়েছে। গেটের কাছেই রাখা রয়েছে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহার্য গাড়ি। এ জাদুঘর দেখতে সম্ভব হলে হয়ত আরেকবার আসতে হবে।

এখানেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম এবং মৃত্যু হয়েছিল। বাড়িটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে তৈরি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর দাদা মশাই প্রিন্স দোয়ারকানাথ ঠাকুর। এ বাড়িটি ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের শততম জন্মবার্ষিকীতে তৎকালীন পশ্চিম বাংলা সরকার প্রধান ডা. বিধান চন্দ্র রায়ের উদ্যোগে সরকার খরিদ করে জাদুঘর স্থাপন করেন। প্রায় দুইশত বছর পুরনো এই বাড়িটি পূর্বতন অবস্থাতেই রাখা হয়েছে। জাদুঘর মে ৮, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে উদ্বোধন করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু। এবার উদযাপন করা হয় রবীন্দ্রনাথের সার্ধ শতবার্ষিকী।

আমরা তিনজনেই বেশ কিছুক্ষণ বাইর থেকে বাড়িটি দেখে লনে হেঁটে বেড়িয়েছি। সামনের চত্বরে কয়েকজন মহিলা-পুরুষের দেখা পেলাম। সবাই ব্যস্ত রবীন্দ্রচর্চায়। হয়ত রিহার্সেল চলছে কোন ডান্স-ড্রামার। মুকুল ছবি তুলতে চলে গেল। আর কামরুল কয়েকজন কোরিয়ান ছাত্র-ছাত্রীর সাথে গল্পে মশগুল। পরে জানালো এরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আর সাহিত্য নিয়ে লেখাপড়া করছে। আগামীকাল শান্তিনিকেতনে যাবে। আমি সবুজ লনের এক প্রান্তে একটি বেঞ্চে বসলাম। আমার পাশে একজন কবি কবি ভাব নিয়ে বসা। পরনে স্যান্ডেল, পাজামা আর ধুসর রংয়ের পাঞ্জাবী। অগোছালো চুল। কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ। আমি আমার পরিচয় দিলাম। তিনি জানালেন তিনি আর্ট কলেজের ছাত্র। এখানে এসেছেন কিছু স্কেচ করতে। নাম বিষ্ণু পাল। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঠাকুর পরিবারের বর্তমান সদস্যরা কি কেউ এখানে আসা যাওয়া করেন কিনা। উত্তরে বললেন যে, ওই পরিবারের সদস্যরা কলকাতাসহ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। তিনি বললেন, 'আসলে এ বাড়িটি এক বিঘার উপরে ছিল। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে একজন স্থানীয় বণিক বিঞ্চব চন্দ্র সেঠ জায়গাটি নীলমনি ঠাকুরকে দেন। তখন এখানে মাটির দেয়াল ঘেরা মাটির বাড়ি ছিল।' তিনি আরও বললেন, 'নীলমনি ঠাকুরের মৃত্যুর পর দোয়ারকানাথ ঠাকুর এ বাড়িটি তৈরি করেন। দোয়ারকানাথ ঠাকুর এ অঞ্চলে ঠিকাদারি করতেন এবং প্রথম রেল ব্যবস্থা চালু হলে

www.pathagar.com

সেখানে অর্থলগ্নি করে অর্থ উপার্জন করেন। তারপরের ইতিহাস জমিদারির।'

'এখন কি ঠাকুর বংশের বর্তমান প্রজন্ম এখানে আসেন?'

বিষ্ণু পাল বললেন, আমার জানা নেই তবে দু'বছর আগে এখানে সাইফ আলী খান একবার এসেছিলেন। আপনি হয়ত জানেন সাইফ আলী খান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক নাতনী শর্মিলা ঠাকুরের ছেলে।'

'জি আমি জানি'।

'শর্মিলা ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের ভাইয়ের ছেলে জীতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে।' 'বোধ হয়' আমি বললাম মনসুর আলী খান পতৌদির সাথে বিয়ের পর তিনি নাম পরিবর্তন করে বেগম আয়েশা সুলতানা হয়েছেন।

বিষ্ণু পাল আর কথা বাড়ালেন না। হঠাৎ উঠে বিদায় নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সতীর্থদের সাথে বাইরে চলে গেলেন।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। শরীরেও ক্লান্তি জমেছে। মুকুল আর কামরুলকে ডেকে আমরা জোড়াসাঁকো ত্যাগ করলাম।

আমরা ফিরতি পথে। অন্ধকার হয়ে আসছে। রাস্তার বাতি বহু আগেই জ্বালানো হয়েছে। দু'পাশের দোকানগুলোতেও সাঁঝ বাতি জ্বলছে। এ সময়ে মানুষজন আর গাড়ির ভিড় যেন বিকেলের তুলনায় বেড়েছে। মুকুল আর কামরুলের খুনসুটিতে কমতি নেই। আমি ভাবছিলাম তড়িঘড়ি করে শুধু ঠাকুর বাড়িটাই দেখলাম। ভেতরের জাদুঘরটি না দেখার আফসোস রয়ে গেল। বাড়ির ভেতরে গেলে হয়ত দেখা যেত কোন বাতায়নের পাশে দাঁড়িয়ে বালক রবীন্দ্রনাথের কবিতায় হাতেখড়ি হয়। লিখেছিলেন 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বসে লিখেছিলেন 'পরিচয়' যার শেষ ক'টি লাইন মনে পড়ছে।

> 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
> আমি তোমাদেরই লোক,
> আর কিছু নয়–
> এই হোক শেষ পরিচয়'।

হয়ত তিনি জানতেন অথবা জানতেন না যে একদিন তিনি বাঙালিত্বের সাথে একাকার হয়ে যাবেন। শুধু ভারতেরই নয় আরও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, যার রাষ্ট্র ভাষাই হবে বাংলা– তার রচিত গানকে নির্বাচিত করবে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে। রবীন্দ্রনাথ দু'দেশের জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম। আমি বিশ্বের বহু জায়গায় গিয়েছি, কিন্তু শান্তিনিকেতনে আজও যাওয়া হয়নি। হয়ত আগামীতে সুযোগ আসলে যাব। আমি কবিতার অনুরাগী তেমন নই, তবে বাংলা ভাষা শিখতে হলে রবীন্দ্র-

www.pathagar.com

নজরুল যে অপরিহার্য সে জ্ঞানটুকু বাল্যকাল হতেই হয়েছে। আবার হয়ত এদিকে আসা হলে ঠাকুর বাড়ির জাদুঘর অবশ্যই দেখব।

'আরে বাপরে সাহেব গাড়ির কাচ উঠিয়ে নিন'। রমেশের ভয়ার্ত আওয়াজ পেয়ে আমি দেখলাম তিনি সামনের জানালার কাচ দুটো তুলে দিলেন। আমি আর কামরুল মন্ত্রচালিতের মত রমেশের কথামতো কাচ তুলে দিলাম। আমরা তখন চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এর জংশনে। কাছেই সোভাবাজার, বিডন স্ট্রিট। আমরা রমেশকে জিজ্ঞাসা করলাম যে এমনতো ঠাণ্ডা লাগছে না তারপরেও কাচ উঠাবার দরকার পড়ল কেন। 'সাহেব ওদিকের রাস্তায় এখন জ্যাম। দু'তিন ঘণ্টা লাগবে ঘুরে যেতে। তাই আমি আপনাদের এ জায়গা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। এ সোনাগাছি এলাকা আছে। কাচ না তুললে আপনাদেরকে দালালরা বিরক্ত করবে।' রমেশের জবাব।

'এখানে কি কোন বিশ্ববিদ্যালয় যে এত ছাত্র-ছাত্রী রাস্তার দু'পাশে দেখা যাচ্ছে'। মুকুল তুমি যান। কামরুল হঠাৎ মুকুলকে জিজ্ঞাসা করে বসল। আমি বুঝতে পারছিলাম না বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা কামরুলের মাথায় কিভাবে ঢুকল।

'হ্যাঁ এখানে বড় বিশ্ববিদ্যালয় আছে তোমাকে পরে ভর্তি করে দেব। এখন এখান থেকে বের হও।' মুকুল একটু উদ্বেগের সাথে রমেশকে বলল।

রমেশ, মুকুল আর কামরুলের কথায় একটু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বললেন, 'স্যার এখানে কোন বিশ্ববিদ্যালয় নাই। একটু দূরে মার্বেল প্যালেস। এ জায়গা কলকাতার সবচাইতে বড় ব্রথেল রয়েছে। এখানে গাড়ির কাচ খোলা রাখলে আপনাদের বিরক্ত করবে। এখানে বহু বাংলাদেশি আর নেপালী মেয়েদেরকে কাজ দেবার কথা বলে নিয়ে এসে বিক্রি করে এসব কাজে লাগায়।'

'কিভাবে কে নিয়ে আসে' কামরুল জিজ্ঞাসা করল 'কেন পেপারে দেখ না হিউম্যান ট্রাফিকিং। বাংলাদেশিরাই নিয়ে আসে। সে জন্যই তো কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে তবুও তো বন্ধ হল না।' এবার মুকুল কামরুলকে খোঁচা দিল মনে হল।

'বাংলা বললেই কি বাংলাদেশি হয়'। এগুলো সব কলকাতার, বাংলাদেশি বলে চালিয়ে দাও।' কামরুলের জবাব। কামরুলের যা আমার কাছে খুব ভাল লাগে তা হল নিজের দেশকে সবসময় উপরে রাখে। কোনভাবেই বাংলাদেশের বিষয়ে আপোষ নেই।

আমি দু'জনের কথার মাঝে রমেশকে জিজ্ঞাসা করলাম এ জায়গার নাম সোনাগাছি কেন?

'স্যার আমি শুনেছি এখানে সোনাগাজী নামে এক বুজুর্গ বাবার আস্তানা ছিল। এখন বাবার মাজার রয়েছে। এ জায়গার নাম ছিল সোনগাজী, ওখান থেকে হয়েছে

www.pathagar.com

সোনাগাছি। এখানের বাসিন্দারা বাবা গাজীকে খুব মানে।' রমেশ আমাদেরকে তথ্য দিলেন।

রমেশ ভিড় ঠেলে আমাদেরকে নিয়ে বড় রাস্তায় বের হয়ে আসলেন। আমাদের হোটেল খুব দূরে নয়। কামরুল রমেশকে জিজ্ঞাসা করল এ সব জায়গায় আপনি সব সময় আসেন?' যতদূর কম পারি আসি তবে অনেক সময় মদ্যপ প্যাসেঞ্জারের খপ্পরে পড়লে আসতে হয়। কি করব সাহেব আমাদের তো প্যাসেঞ্জার নিয়ে কারবার। সব প্যাসেঞ্জার তো আপনাদের মত এত ভাল মানুষ নয়। 'আপনাদের সাথে আমার খুব ভাল লাগছে।' ভাবলাম রমেশ কি তৈল মর্দন করছে ? আপনারা শুধু জায়গা দেখতে চান আমার ভাল লাগে। স্যার, এরপরে যখনই 'কলকাতায়' আসবেন আমাকে আগে জানালে আমি বিমানবন্দর থেকেই আপনাদের নিয়ে আসব। এবার মনে হল রমেশ আমাদেরকে পাকাপোক্তভাবে তার নির্ধারিত প্যাসেঞ্জার করে ফেলেছে।

আমরা যখন হোটেলে ফিরলাম তখন সন্ধ্যা প্রায় সাতটা। রমেশকে কাল সকালের এবং সন্ধ্যায় স্টেশনে পৌঁছাবার কথাটা স্মরণ করিয়ে বিদায় দেয়া হল। সাব্যস্ত হল আমরা নয়টার দিকে ধারে কাছে কোথাও খেতে যাব। হয়ত পার্ক স্ট্রিটের কোন রেস্তোরাঁয়। মুকুল আমাকে ট্রেনের টিকিটগুলো দিতে বলল। সে ওই টিকিটগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে পুনঃনিশ্চিত করবে।

রুমে গিয়ে ঘণ্টা দুই বিশ্রাম নিয়ে আমরা লবিতে জড়ো হলাম। আমি টিকেটের বিস্তারিত না দেখেই মুকুলের হাতে তুলে দিলাম। মুকুল ইন্টারনেটে পুনঃনিশ্চিত করতে গিয়ে দেখল যে কামরুল আর তার বয়স লেখা রয়েছে যথাক্রমে ৬৭ আর ৬৮ বছর। ভারতীয় আইনে 'সিনিয়র সিটিজেন' এবং ট্রেনের টিকেটে রেয়াত পাবার কথা। দ্বিতীয় বিষয়টি হল উভয়দিকে যাত্রাকালে আমাদের আসন আলাদা আলাদা বগিতে। আলাদা বগির বিষয়টি আমাদের হতাশ করল। কামরুল অবশ্য বলল যে, এখন আর কিছু করবার নেই এভাবেই সফর করতে হবে। রাতের সফর ঘুমিয়েই কাটাবো। তখনও বুঝি নাই লালু প্রসাদের 'গরিব রথ' এ ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হবে।

এবার মুকুল বলল, 'আমাদের দু'জনকে সিনিয়র সিটিজেন বানিয়ে পয়সা কম নিয়েছে ছেটার কি হোবে।'

'কি আর হবে তোমাদের জেল যেতে হবে।' হেসে বললাম।

'তাই নাকি স্যার। কেন বাড়তি পয়সাটা দিয়ে দিলে হবে না?' কামরুলের কথায় একটু উদ্বেগের আমেজ।

মুকুল এবার কামরুলকে পেয়েছে। বলল, 'আমি কাল পর্যন্ত সেভ না করলে আমার সাদা চুল আর দাড়ি দেখে আমার বয়স বুঝবে না। তোমার তো চুল কালো

www.pathagar.com

আছে তার উপরে তুমি বিদেশি, জেল যাবার সম্ভাবনা তোমারই বেশি। প্রস্তুত হয়ে থাক।'

'আমাদের যা হবার হবে তবে এভাবে বয়স বাড়ালো কিভাবে?' বোধহয় ৫৭-৫৮ কে ৬৭ আর ৬৮ করেছে। যা হবার তখন দেখা যাবে। টিটিকে খুলে বললে সেই একটা সমাধান করে দেবে। চিন্তা করবার কারণ নেই। তখন দামের পার্থক্যটা দিয়ে দিলেই হবে। আমি উভয়কেই এ বিষয় নিয়ে এখনই অত ভাবতে মানা করলাম। আমি আমাদের মিশনের উপরে একটু মনঃক্ষুণ্ন হলাম। সামান্য একটু সাহায্য চেয়েছিলাম তাও কেমন যেন গাছাড়া ভাব করল।

সাধারণ নাগরিকদের হয়তো তোয়াক্কাই করবে না। সত্যিই দুঃখজনক আমাদের বেশির ভাগ মিশন এবং দূতাবাসগুলোর কর্মকাণ্ডে মনে হয় এগুলো সাধারণ নাগরিকের জন্য নয়, ক্ষমতা মেপেই সাহায্য সহযোগিতা অথবা আপ্যায়ন করে। অবশ্য মানুষ মানুষের মধ্যে তফাত তো রয়েছেই।

আমরা রেস্তোরাঁতে বসে খেতে খেতেই আমাদের পাটনা পৌঁছবার সময় ট্রেনের নাম পাটনায় ড. সতেন্দ্র সিংকে মুকুল জানিয়ে দিল। আমরা তিনজনেই তার সাথে কথা বললাম (সতেন্দ্র সিং-এর পরিচয়, আমার লেখা কত জনপদ কত ইতিহাস আর যমুনা গোমতীর তীরে : একটি ভ্রমণ কাহিনীতে রয়েছে)। সতেন্দ্র এখন বিহার সরকারের পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব। তার পরিবার অবশ্য দিল্লীতে। স্ত্রী প্রতিভা সিং দিল্লীতে এক কলেজে অধ্যাপনা করেন। দিল্লীর গুরগাওতে থাকেন। দিল্লীতে আমার স্ত্রীর সাথে প্রতিভা বেশ কিছু সময় কাটিয়েছিলেন। কামরুল পাটনায় থাকবার ব্যবস্থা করেছিল ভারতীয় ফেন্সিং ফেডারেশনের মাধ্যমে। সে নিজে বাংলাদেশের ফেন্সিং ফেডারেশনের সাধারণ সচিব। পাটনার ফেডারেশনের সচিব রামাকৃষ্ণ প্রসাদ আমাদের থাকার জন্য ভাল এক হোটেলে ব্যবস্থা করেছে। অপরদিকে সতেন্দ্রও এক রেস্ট হাউস বুক করেছিলেন। আমরা তার বুকিং বাতিল করতে বললাম। সতেন্দ্র আরও জানালেন, ইতিমধ্যেই তাঁর বদলি দিল্লীতে হয়েছে। আন্দামানে ছুটি কাটাতে যাবার কথা ছিল। আমাদের সফরের জন্য সে তার ছুটি বাতিল করেছেন।

কামরুল কথা বলে পাটনার ব্যবস্থা নিশ্চিত করল। সকালে পাটনায় পৌছলে সতেন্দ্র নিজে আমাদের ওই কাকডাকা ভোরে নিতে আসবেন। আমরা পরশু সকাল ৬টা নাগাদ পাটনা সেন্ট্রালে পৌছব।

রাতের আহার শেষ করে আমরা হোটেলে ফিরে আসলাম। আগামীদিন দুপুরের আগেই রুম ছেড়ে বড় লাগেজগুলো হোটেলে রেখে বের হয়ে যাব। সন্ধ্যায় সরাসরি ট্রেনে চাপব।

www.pathagar.com

আট
কলকাতার জব চার্নক

পরের দিন সকালে আমরা নাস্তা সেরে রুম থেকে মালপত্রগুলো নামিয়ে হোটেল লবিতে রেখে হাত ব্যাগ এবং পাটনার জন্য আলাদা ব্যাগে কাপড় চোপড় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে একবারে বের হয়ে রমেশের ট্যাক্সিতে চড়লাম। পাটনা থেকে ফিরবার পরেও আমরা এ হোটেলে আসছিনা। কলকাতা ফেরত এসেই ওই দিন সকালেই আমরা সড়ক পথে মুর্শিদাবাদ যাব। মুর্শিদাবাদের রাস্তায় পড়বে পলাশী, বেহরামপুর আর কাশিম বাজার। আমরা একরাত মুর্শিদাবাদে থাকব। থাকতে হবে বেহরামপুরে, কারণ মুর্শিদাবাদে থাকবার তেমন ভাল জায়গা নেই বলেই ঢাকা থেকে জেনেছিলাম। বেহরামপুরে আমাদেরকে ভারতীয় পর্যটনের মোটেলে থাকবার জন্য বুক করে দিয়েছিলেন দেশ টিভি-এর ভারতীয় পরামর্শক মুকুল রায় চৌধুরী। যাই হোক আপাতত কলকাতার আজকের দিনটি নিয়ে আলোচনায় আসছি।

রমেশের ট্যাক্সিতে বসেই মুকুল জিজ্ঞাসা করল, 'আব কাহা যায়।' আমি বললাম, 'জব চার্নকের সমাধি সেন্ট জন গীর্জার কবরখানায়, কিন্তু ওই গীর্জার অবস্থান আমরা কেউ জানি না তাই, সেন্ট পল গীর্জা দেখবার পর সেখান থেকেই ঠিকানাটা নিতে হবে।' কামরুল বলল, 'ঠিক আছে, তবে আমার সামান্য কাজ রয়েছে ফোরাম সুপার মার্কেটে। সেন্ট পল দেখবার পর ফোরাম (forum) এ যাব।' আমরা সম্মত হলাম।

সেন্ট পল গীর্জা হোটেল থেকে খুব বেশি দূরে নয়। গতকাল আমরা প্রাতঃভ্রমণেই হেঁটেই গিয়েছিলাম সেখানে। চৌরঙ্গি পার হয়ে বিড়লা প্লানেটোরিয়ামের উল্টো দিকেই সেন্ট পল ক্যাথেড্রাল। আমরা চৌরঙ্গির রাস্তা ধরলাম। চৌরঙ্গি রোড কলকাতার অন্যতম পুরাতন রাস্তা। এর নামকরণের বিষয়ে পূর্বে যৎসামান্য বলেছি। রাস্তাটি কালীঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত। এর ডান দিকে বর্তমানে ময়দান বলে পরিচিত জায়গাটি গহীন জঙ্গল ছিল। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে নতুন ফোর্ট উইলিয়াম নির্মাণ শুরু হলে আস্তে আস্তে এ জঙ্গল পরিষ্কার হতে হতে বর্তমান অবস্থায় আসে। ময়দানের বৃহত্তর অংশ জুড়ে রয়েছে বর্তমান দুর্গ যেটি এখন ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ড হেড কোয়ার্টার। এ চৌরঙ্গির আশপাশের হোটেল আর এঙ্গলোসাইজড সমাজের উপর ভিত্তি করে শংকর বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিলেন কালজয়ী উপন্যাস 'চৌরঙ্গি'। উপন্যাসটি শুধু ছায়াছবিতেই

www.pathagar.com

রূপান্তরিত হয়নি অনূদিত হয়েছিল চৌদ্দটি ভারতীয় ভাষাসহ চারটির বেশি আন্তর্জাতিক ভাষায়। অনূদিত হয়েছিল ইংরেজি ভাষাতেও। চৌরঙ্গির বাঁদিকে এক সময় ছিল ইউরোপিয়ানদের বসতি। তৈরি হয়েছিল বিশাল বাড়িঘর। স্থাপন করা হয়েছিল বহু বাণিজ্যিক ভবন। সেগুলোর অনেকগুলো এখনও রয়েছে। অধুনা যুক্ত হয়েছে ফ্লাইওভার। চৌরঙ্গির দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে বালীগঞ্জ আর আলীপুরের মত বনেদি এলাকা। চৌরঙ্গি এলাকার বহু বিখ্যাত দালানের মধ্যে এখনও চোখে পড়ে মেট্রো সিনেমা হল।

আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই সেন্ট পল ক্যাথেড্রালে এসে পৌঁছলাম। বিশাল এলাকা জুড়ে কলকাতার, এক সময় ব্রিটিশ ভারতের, প্রধান গীর্জাগুলোর একটি। এঙ্গলিকান ক্যাথেড্রাল অব ক্যালকাটা এখনও দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা হিসাবে দণ্ডায়মান। আমরা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে চত্বরের ভিতরে হেঁটে প্রবেশ করলাম। ঢুকতেই হাতের বাঁয়ে গীর্জার প্রধানের বাসস্থান। এ গীর্জার গোড়াপত্তন হয় অক্টোবর ৮,১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে। এর মূল নক্সা এবং তৈরির দায়িত্বে ছিলেন মেজর ডব্লিউ এন ফরবস, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার-এর সদস্য। তিনি কলকাতা টাকশালেরও স্থপতি। এ গীর্জার কাজ শেষ হয় ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে।

আমরা ক্যাথেড্রালের ভেতরের আঙ্গিনায় প্রবেশ করলাম। দু'পাশে সবুজ বৃক্ষরাজি। সামনে ইন্দো-গোথিক শৈলীতে তৈরি বিশাল গীর্জা। উপরের চূড়া প্রায় ২০১ ফুট। গীর্জার প্রধান দরজায় ঢুকবার পূর্বে হাতের ডানে ছোট্ট সবুজ চত্বর ঘেরা দেয়াল। সেখানে দেখানো হয়েছে জেরুজালেমের বেথেলহাম গ্রামে যিশুর [হযরত ঈসা (আঃ)] এর জন্ম দৃশ্য। ঠিক যেমনটি বাইবেলে বর্ণিত। আমরা বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখলাম। মনে হল ২৫ ডিসেম্বরের ক্রিসমাস দিবসের জন্য তৈরি করা হয়েছে এ দৃশ্য। আর কয়েকদিন পরেই খ্রিস্টানদের সবচাইতে বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান ক্রিসমাস বা যিশুর জন্মদিন। সারা দুনিয়ায় উদযাপন করা হয় এ দিনটি। কলকাতায় স্থানীয় খ্রিস্টানদের সংখ্যা কম নয়। এদের অনেকেই এঙ্গলো ইন্ডিয়ানদের উত্তরসূরি। কলকাতা ছিল প্রথম বৃহত্তম ইংলিশ তথা ইউরোপীয় শহর। এখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম দিকের কর্মকর্তারা অনেকে স্থানীয় মহিলাদের পাণি গ্রহণ করেন আবার অনেকের উপপত্নীর সংখ্যাও কম ছিল না। এদের সংমিশ্রণে কলকাতায় তৈরি হয় এঙ্গলো-ইন্ডিয়ান সমাজ। এমন কি জব চার্নকের স্ত্রীও ছিলেন একজন স্থানীয় মহিলা।

প্রথম দর্শনে মনে হবে ইংল্যান্ডের বৃহৎ ক্যাথেড্রালের মত। একই ধাঁচের ক্যাথেড্রাল আমি ইংল্যান্ডের ক্যাম্ব্রিজেও দেখেছি। ইংল্যান্ডের নরউইচ-এ রয়েছে একই নক্সায় তৈরি ক্যাথেড্রাল। গীর্জার চূড়াটি ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে একবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এ গীর্জায় সেন্টপলকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে।

www.pathagar.com

আমরা আঙ্গিনা ছেড়ে মূল দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। মূল প্রার্থনা হলে প্রবেশের পথের পাশে রয়েছে বেশ কয়েকটি কক্ষ। এখানে গীর্জার মধ্যেই ভল্ট আকারে কয়েকটি সমাধি রয়েছে। এখানে রয়েছেন বিশপ উইলসন যিনি এ গীর্জা তৈরির মূল প্রেরণাদাতা তার দেহাবশেষ। ঢুকবার পথে একটি ফলক লাগানো যেখানে উপরের তথ্যগুলো লিপিবদ্ধ রয়েছে। এখানে আরও সমাধিস্থ রয়েছেন আরথার উইলিয়াম গারনেট ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার, যিনি ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন এবং টিএফ মিডলটন কলকাতার প্রথম বিশপ মৃত্যুবরণ করে ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে। বর্তমানে বিশপ রেভারেন্ট অশোক বিশ্বাস আর ধর্ম যাজক এনড্রু সিমিক।

মূল হলে প্রবেশের পথে দেয়ালের গায়ে সাঁটানো রয়েছে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন রণাঙ্গনে নিহত বহু ইংরেজ বাহিনীর ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের র‍্যাঙ্ক, নাম, মৃত্যুর তারিখ এবং স্থান। এদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপটেন হতে কর্নেল পর্যন্ত কর্মকর্তাদের নাম।

আমরা নিঃশব্দে প্রার্থনা হলে প্রবেশ করলাম। হলটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে তৈরি। প্রায় সব বড় গীর্জার মতই উঁচু। হলের দু'পাশে কাচের জানালা। প্রতিটি জানালায় রঙ্গিন কাঁচের ভেতরে বিভিন্ন সেইন্টদের প্রতিকৃতি অঙ্কিত। পশ্চিমের জানালায় লর্ড মেয়োর প্রতিকৃতি রয়েছে। লর্ড মেয়ো ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারের আততায়ীর হাতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ১৮৬৯ হতে ১৮৭২ পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় ছিলেন। মেয়োর নামে পাকিস্তানের লাহোর শহরে একটি হাসপাতাল ও বিশাল উদ্যান ছিল। হয়ত এখনও সে নামেই থেকে থাকতে পারে।

হলের উত্তরে অলটার যেখানে বিশপ দাঁড়িয়ে প্রার্থনা পরিচালনা করেন। তার সামনে তিন সারিতে স্থায়ীভাবে বসানো কাঠের বেঞ্চ যেখানে প্রার্থনাকারীরা প্রতি রবিবার এবং অন্যান্য সময়ে বসে প্রার্থনায় যোগ দেন। ডানদিকে নীল পর্দার পেছনে স্থাপিত যিশুর প্রার্থনাঘরের আদলে তৈরি ছোট প্রার্থনা ঘর আর বাঁ দিকে রয়েছে গীর্জার যাবতীয় ধর্মীয় উপকরণের ঘর। দেয়ালের দু'পাশে রঙিন কাচের মধ্যে যিশুর প্রতিকৃতি। ডান দিকে কোণায় একটি কাচের আচ্ছাদনের মধ্যে দু'টি ঐতিহাসিক রেজিমেন্টাল ফ্ল্যাগ। এর একটি অষ্টাদশ বেঙ্গল ইনফেনট্রির আর অপরটি আলীপুর রেজিমেন্টের। এগুলো এ গীর্জায় পাঠানো হয়েছিল ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে যা আজও অক্ষত রয়েছে।

আমরা হলের ভেতরে অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে চারদিকে দেখছিলাম। কাঠের বেঞ্চগুলো দেখে মনে হল শতবর্ষ পুরাতন তো অবশ্যই হবে। চারপাশের জানালায় বাইরের আলোর ছটায় প্রার্থনা হলের ভেতরটায় এক ভাবগম্ভীর পরিবেশ তৈরি করেছে। হলের দু'পাশে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বসবার জায়গা রয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম ওইগুলো একসময়ে সংরক্ষিত ছিল ভাইসরয়, বাংলার লাট বাহাদুর এবং ব্রিটিশ বাংলার প্রধান

www.pathagar.com

বিচারপতির জন্য। বর্তমানে এখানে সে রকম কেউ বসে কিনা জানা গেল না। গীর্জার চত্বরে রয়েছে আরেকটি হল যার নাম 'পেরিস হল' যেখানে বিবাহ হতে অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ গীর্জার প্রথম ভারতীয় বিশপ ছিলেন রেভারেন্ড অরবিন্দ মুখার্জি, তার নামাঙ্কিত রয়েছে অনার বোর্ডে।

হল ঘর থেকে বেরিয়ে আমরা উত্তরদিকে রাখা ছোট গ্যালারিতে গেলাম যেখানে রাখা হয়েছে কিছু গীর্জা তৈরির সাথে সম্পৃক্ত বেশ কিছু দ্রব্যসামগ্রী আর গীর্জা তৈরির স্কেচ। আমরা মূল গীর্জা থেকে বের হবার পথে একজন তরুণকে গীর্জাটির স্কেচ আঁকতে দেখলাম। আমি তাকে সেন্ট জন গীর্জার অবস্থান জিজ্ঞাসা করলে তিনি সঠিক জানেন না বলে জানালেন। একটু হতাশই হলাম তবে হাল ছাড়লাম না। মূল দরজার সামনে গীর্জার একজন কর্মকর্তার দেখা পেলাম। আমি তাকে ওই গীর্জার অবস্থান জানতে চাইলে তিনি জানালেন যে ওই গীর্জাটি বিবিডি বাগের সাথে গভর্নর হাউসের উত্তর কোণায়, এককালের চার্চ হাউস স্ট্রিট আর হেস্টিং স্ট্রিট বর্তমান কিরন শংকর রায় রোডে। আমি ঠিকানাটা জেনে মুকুলকে বলে আমরা ভারতের বৃহত্তম এঙ্গলিকান গীর্জা ত্যাগ করে বিবিডিবাগের দিকে রওয়ানা হলাম। পথে কামরুলের বিশেষ কার্যসম্পাদনের জন্য 'ফোরাম' শপিং মলে যাত্রা বিরতি করব।

আমরা ক্যাথেড্রাল রোড দিয়ে বিড়লা প্লানেটোরিয়ামের সামনে দিয়ে শেক্সপিয়র সরণিতে প্রবেশ করলাম। এ রাস্তাটির পূর্বের নাম ছিল থিয়েটার রোড। আজও সাধারণ লোকজনের কাছে থিয়েটার রোড হিসেবে বেশ পরিচিত। লক্ষণীয় বিষয় হল একশত নব্বই বছরের ব্রিটিশ শাসনের সময় কলকাতার রাস্তার প্রায় নামগুলোই ছিল কোন না কোনভাবে শাসনের সাথে জড়িতদের নাম। ওই দেশের বিশ্বখ্যাত কবি-সাহিত্যিক অথবা দার্শনিকের নামে কোন রাস্তাঘাটের নাম ছিল না। এমনকি শেক্সপিয়রের নয়। তার নামে সড়কের নাম ভারত স্বাধীন হবার পর রাখতে হল। এর কারণ বোধহয় নেটিভদের প্রভু বন্দনা করাবার জন্যই এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অথবা শাসক গোষ্ঠীকে মহৎ বানাবার প্রচেষ্টা।

আমরা আশুতোষ মুখার্জী রোড, যার আদি নাম ছিল চৌরঙ্গি রোড, হয়ে এলগিন রোডে ফোরাম শপিং মল-এর এধারের প্রবেশের গেটের সামনে পৌঁছলাম। এর আগে আমরা সস্ত্রীক একবার এসেছিলাম কোন এক সন্ধ্যায়। সেদিন 'ইনক্স' এর সামনে দিয়ে প্রবেশ করেছিলাম। আজ এলগিন রোড দিয়ে মলের পেছন দিকে আসলাম। কামরুল একাই মলে গেলে আমি আর মুকুল ট্যাক্সি থেকে নেমে আশপাশে দেখছিলাম। রাস্তার ঠিক উল্টোদিকে একটা সাদামাটা পুরাতন ধাঁচের বাড়ির ফটকের দিকে নজর পড়ল। বাড়িটি উত্তর-দক্ষিণে আর এলগিন রোড পূর্ব-পশ্চিমে তাই সামনের দিকটি তেমন নজরে পড়ে না। রাস্তার এপার থেকেই ফটকের পাশে দেয়ালের গায়ে লাগানো একটি

www.pathagar.com

সাইনবোর্ড দেখে চমকিত হলাম। বোর্ডে লেখা 'নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো' নিচে লাল অক্ষরে লেখা নেতাজী ভবন। তিন তলা হলুদ আর লাল রংয়ের মিশ্রণে বাড়ি। বাড়িটি উপমহাদেশের অন্যতম বিপ্লবী নেতা সুভাষ চন্দ্র বোস, জনগণের নেতাজী-এর স্মৃতি বিজড়িত স্থান। পরে জানতে পারলাম বাড়িটি নেতাজী পরিবারের বাসস্থান ছিল। এখান থেকেই 'সুভাষ চন্দ্র বোস' শেষবারের মত কলকাতা ত্যাগ করেন। এরপর ভারতের মাটিতে তিনি আর কখনই ফেরেননি।

আমি মুকুলকে নিয়ে বাড়ির ফটকের সামনে গেলাম। ভেতরে পোর্চের সামনে একটি কাচের ঘরে একটি গাড়ি যত্ন করে রাখা। ফটকের উপরে সাদা কালোতে বোধকরি কোন পত্রিকা হতে নিয়ে এনলার্জ করা একটি ছবি। একপাশে সাদা ধুতি আর পাঞ্জাবী, পায়ে চটি জুতা পরা অবস্থা সুভাষ বোসের ছবি। আমরা গেটের ধারে কামরুলের অপেক্ষা করছিলাম। আমাদের সূচির মধ্যে নেতাজীর বাড়ি ছিল না এমনকি আমি কলকাতায় সুভাষ চন্দ্র বোসের বাড়ির অস্তিত্বও জানতাম না। পুলকিত হলাম যে অজান্তে এখানে এসে পড়েছি। মনে মনে কামরুলকে ধন্যবাদ জানালাম। ফোরামে তার স্ত্রীর রেখে যাওয়া কোন কাজ না থাকলে হয়ত এ যাত্রা এখানে আসা হতো না। অথচ বাঙালিদের মধ্যে ক্ষণজন্মা যে ক'জন বিপ্লবী নেতা ছিলেন তাদের মধ্যে সবচাইতে বেশি আলোচিত নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস। ব্রিটিশ রাজের একজন আইসিএস (ICS) কর্মকর্তা হতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আইএনএ (INA : Indian National Army) আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করা এবং ভারতে ব্রিটিশ দখলদারিত্বের যুদ্ধে নেতৃত্বদান করা পর্যন্ত তার উত্তরণ ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। আমি ইতিপূর্বে এই অগ্নি পুরুষ সম্বন্ধে যতটুকু জেনেছি মনে হল ওই জ্ঞানের যৎসামান্য পূর্ণ হবে এ জায়গা নিজের চোখে দেখে। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর কামরুলের দেখা পেলাম। তাকে ডেকে এপারে আসতে বললাম। কামরুল জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা এখানে কেন?'

'এটা নেতাজী সুভাষ বোসের বাড়ি আর আমরা ভেতরে যাব, সে কারণে তোমার অপেক্ষা করছি।' কামরুলকে বললাম।

'আমরা এখানে আরেকবার এসেছি। আমি বহুবার এ পথ দিয়ে গিয়েছি, কিন্তু সুভাষ বোসের বাড়ি এখানে আমার জানা ছিল না।' মুকুলের কণ্ঠে পরিতাপের ছোঁয়া।

'আমি কতবার মিসেসকে নিয়ে ফোরামে এসেছি তার হিসেব নেই। বহুবার রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে মিসেসের শপিং শেষ হবার অপেক্ষায় থেকেছি, কিন্তু এ বাড়ির দিকে কখনই নজর যায়নি। 'কামরুল অনেকটা অপরাধীর মত বলল।

'অতীতের কথা বলে লাভ নেই। চল ভেতরে যাই। বোধকরি এখানে নেতাজীর স্মরণে কোন জাদুঘর রয়েছে। যেটা দেখে কাছে কোথাও লাঞ্চ করে সেন্টস গীর্জা দেখতে যাব।'

www.pathagar.com

আমরা তিনজন গেট পার হয়ে মূল বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলাম। কাচের ঘরে রাখা গাড়িটি দেখলাম। ১৯৪০-এর মডেলের ওয়ানডারার গাড়ি। রংটি ধূসর। গাড়ির পাশের দেয়ালে ছোট করে লেখা যার সারমর্ম হল– এ গাড়িটি সুভাষ বোসের ভাই শরৎ বোসের ব্যক্তিগত গাড়ি এবং এ গাড়িতে করেই নেতাজী সুভাষ বোস শেষবারের মত এ বাড়ি এবং কলকাতা ত্যাগ করেন। গাড়ির নাম্বার বিএলএ ৭১৬৯। আমি গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মনে করছিলাম যখন নেতাজী আইসিএস থেকে পদত্যাগ করেন সে অবস্থান থেকে একজন বিপ্লবী নেতা হয়ে উঠবার ইতিহাস। তিনি পদত্যাগ করে তার বড় ভাই, যাকে তিনি পিতার মত শ্রদ্ধা করতেন, লিখলেন 'শুধুমাত্র আত্মত্যাগ করবার এবং যন্ত্রণার মাটির উপর দাঁড়িয়ে আমি আমার দেশের মাথা উঁচু করবার জন্য আমরা ব্রত নিতে পারি। এমনটা করতেই আমি ইস্তফা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।[১] ছোট বেলা হতেই সুভাষ বোসের অন্তরে আত্মত্যাগ আর বিপ্লবের চেতনা সুপ্ত ছিল। ওই বয়স হতেই তিনি দেশ নিয়ে ভাবতেন। মাত্র পনের বছর বয়সে তার মাতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মা কত পুত্র আত্মত্যাগী এই স্বার্থপর যুগে নিজেকে আত্মত্যাগী করতে পারে? মা তোমার এ পুত্র কি সে ত্যাগের জন্য প্রস্তুত?'

সুভাষ বসু পদত্যাগের পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সূচিতে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। প্রায় ষোল বছর বিপ্লবের সাথে যুক্ত থেকে বহুবার ব্রিটিশ জেলে বহু বছর বন্দিত্ব কাটিয়ে বহুবার দেশান্তরী হয়ে অবশেষে মহাত্মা গান্ধীর নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন।

নেতাজী সুভাষ বোস জন্মগ্রহণ করেছিলেন উড়িষ্যায় জানুয়ারি ২৩, ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে। পিতা জানকিনাথ বোস কটকে আইন ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। পিতার নয় সন্তানের মধ্যে সুভাষ বোস ছিলেন ষষ্ঠ সন্তান। তাঁর মাতার নাম ছিল প্রভাবতী দেবী। তিনি প্রথমে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ ও পরে ব্রিটেনে স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়াশুনা করেন। ছাত্র হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। ব্রিটেনে থাকাকালীন সময়েই আইসিএস পরীক্ষা দেন এবং চতুর্থ স্থান দখল করেন। নেতাজী কখনই হিন্দু আর মুসলমানের বিভেদকে পাত্তা দেননি। তিনি বলেন, 'ব্রিটিশ শাসকরা হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে রেখেছিল। এটা ছিল এক কৃত্রিম বিভেদ আয়ারল্যান্ডে যেমন ছিল ক্যাথলিক আর প্রটেস্টানদের[২] মধ্যে। এ বিভেদেও আমাদের বর্তমান শাসকদের (ব্রিটিশ) হাত ছিল।' নেতাজী সুভাষ বোস ছিলেন একজন খাঁটি ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি যিনি সমস্ত জীবন হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ মানে নি। তিনি তার

১। Sisir Bose & Sugata Bose ed. An Indian Pilgrim : Subhash Chandra Bose, Oxford Universtity Press, 1997, New Delhi.

২। Ibid p.15

www.pathagar.com

জীবনীতে লিখেছিলেন, 'আমরা যখন হিন্দুস্থানে মুসলিম শাসনের দিকে দেখি, তা মোগলদের সময় হোক অথবা বাংলায় নবাবদের শাসন হোক, দেশ পরিচালনায় হিন্দু-মুসলমান সমানভাবে অংশীদার ছিলেন। তিনি আরও লিখেন শুধু মোগলদের সময়েই নয় নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার প্রধান সেনাপতি ছিলেন হিন্দু যিনি পলাশীর যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু-মুসলমান একসাথে মোগল পতাকার নিচে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। তিনি মনেপ্রাণে হিন্দু-মুসলমানের একতাতেই বিশ্বাস করতেন বলেই আইএনএ-এর প্রধান সেনাপতি হিসেবে জেনারেল শাহ নওয়াজকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তিনি এই উভয় সম্প্রদায়ের দেশ ভারত থেকে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে ব্রিটিশরাজ উৎখাত করতে ব্রতি হয়েছিলেন।

আমরা অনেকক্ষণ গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকের ছবি নিচ্ছিলাম। আমাদের দেখে দোতলার বারান্দায় দাঁড়ানো একজন কর্মচারী বললেন, আপনারা বাইরের ছবি নিতে পারবেন, কিন্তু ভেতরের জাদুঘরের ছবি নিতে পারবেন না। তাকে জিজ্ঞাসা করে টিকিট ঘরের অবস্থান জেনে তিনজন টিকিট কিনে দোতলায় উঠলাম। বেশ বড় টানা বারান্দা। উপরে দাঁড়ানো ভদ্রলোক আমাদেরকে বাঁদিকের প্রথম প্রকোষ্ঠ দেখালেন। বললেন, আপনারা এখান থেকে শুরু করুন। এখানে কোন গাইড নেই তবে প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠে ছবি এবং প্রদর্শিত বস্তুর উপর বিস্তারিত লেখা রয়েছে। বারান্দার উত্তর হতে দক্ষিণে পায়ের ছাপ অঙ্কিত। জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে এখান দিয়েই শেষবারের মত সুভাষ বোস বাড়ি ছেড়েছিলেন এবং সেই প্রস্থানের পথ দেখাতেই এই পদচিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে।

আমরা প্রথম রুমে প্রবেশ করলাম। এ রুমটি ব্যবহার করা হতো বৈঠকখানা হিসাবে। বোস পরিবারের ব্যবহৃত সোফা টেবিল চেয়ার ইত্যাদি সযত্নে পাতা রয়েছে। কামরার একপ্রান্তে চেয়ার সমেত একটি রাইটিং টেবিল। তথ্যে প্রকাশ এটি ছিল সুভাষ বোসের নিজস্ব চেয়ার টেবিল। পরের রুমে পরিবারের ব্যবহার করা বেশ কিছু আসবাবপত্র পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখা। আর উত্তরের সর্বশেষ কামরাটিতে বিশাল উঁচু একটি পালঙ্ক পাতা। তারই পাশে আর একটি পালঙ্ক। প্রথমটি দাদা শরৎবোসের, দ্বিতীয়টি ব্যবহার করতেন সুভাষ বোস। আমরা দোতলা ছেড়ে তিন তলায় উঠলাম। নিচের তলার মতই এখানকার রুমের সংখ্যা। তবে এখানে দেয়ালের চারদিকে সুভাষ বোসের জীবনের বিভিন্ন সময়ের বহু ছবি, পেপার কাটিং আর নিজের লেখা চিঠি পত্রের প্রদর্শনী। আরও রয়েছে আইএনএ বা আজাদ হিন্দ ফৌজের কিছু স্মরণিকা। ছবিগুলো ঐতিহাসিক। কিছু পারিবারিক আর বেশির ভাগ সুভাষ বোসের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের। দুর্লভ মুহূর্তের কিছু ছবি।

কোথাও মহাত্মা গান্ধীর সাথে কলকাতার সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সমাবেশের ছবি,

www.pathagar.com

কোথাও নেহেরু, গান্ধী আর জিন্নাহর সাথে কিছু ছবি। এগুলো সুভাষ বোসের কংগ্রেস জীবনের ছবি।

পরের রুমের এক কোণায় একটি ভিডিও স্ক্রিন লাগানো। সেখানে প্রদর্শিত হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আইএনএ'র মহড়া আর সুভাষ বোসের বিভিন্ন সময়ের ভাষণ। দেয়ালে প্রচুর দুর্লভ ছবি সুভাষ বোসের আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের সামরিক পোশাক পরা। আরেকটি ছবিতে সুভাষ বোসের সাথে জাপানের তৎকালীন সম্রাটের ছবি। তিনি জাপানে গিয়েছিলেন জাপানীদের সহযোগিতা লাভের জন্য। জাপান সহযোগিতা করেছিল আইএনএ গঠনে। রেঙ্গুনে সদর দপ্তর স্থাপনে জাপান সহযোগিতা করেছিল। যাতায়াতের জন্য বিমান দিয়েছিল। জাপান বাহিনীর বার্মা দখলের পর ব্রিটিশ বাহিনীর হিন্দুস্থানী বন্দিদের তুলে দেয়া হয়েছিল নেতাজীর কাছে। যাদের তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজে ভর্তি করেছিলেন। আরেকটি দুর্লভ ছবিতে অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতাদের সাথে সুভাষ বোস আলোচনারত। তিনি মতপার্থক্যের কারণে কংগ্রেস ছেড়ে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে হিন্দুস্থান স্বাধীন করবার ব্রতে ১৯৩৮-৩৯ খ্রিস্টাব্দে স্থাপন করেছিলেন এই অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক।

আরও রয়েছে কয়েকটি ঐতিহাসিক ছবি। নেতাজীর জার্মানী সফর। হিটলারের সাথে সাক্ষাৎ। জার্মান সাবমেরিনে করে সে দেশত্যাগ। রানী ঝাঁসী মহিলা ব্রিগেড পরিদর্শনের ছবি। কামরার এক কোণায় সুভাষ বোসের সামরিক ইউনিফর্ম এবং ব্যবহার্য অন্যান্য দ্রব্যাদি।

আমরা তিনজনে মন্ত্রমুগ্ধের মত কামরায় সজ্জিত ছবিগুলো দেখছিলাম। কামরুল বলল, 'আমার এত কিছু জানা ছিল না। মাত্র নাম শুনেছিলাম। এ সব দেখে মনে হচ্ছে সুভাষ বোস ভারত স্বাধীন করতে পারলে ভারতের চেহারা অন্যরকম হতো। ভারত ভাগ হতো না।'

আমি তার সাথে সায় দিয়ে বললাম, 'কংগ্রেসের সাথে নেতৃত্বের অদৃশ্য টানাটানিতেই সুভাষ বোস বুঝেছিলেন ইংরেজদের সাথে কংগ্রেসের যে সম্পর্ক তাতে সহজে ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে না। ওই সময় কংগ্রেস স্বরাজ দাবি করছিল– যে দাবির সাথে সুভাষ একমত হতে পারেননি।'

তিনি চেয়েছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতা।

কামরুল আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'সুভাষ বসু থাকলে বাংলা কি ভাগ হত?'

'এটাই ইতিহাস। ইতিহাস ঘুরিয়ে দিলে অনেক কিছুই হতে পারতো। হয়ত পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র নাও হতে পারত। তাহলেই বাংলা ভাগের কথা অবান্তর হতো। তবে যা হয়েছে ভালই হয়েছে। সে অবস্থায় আমরা বাংলাদেশ পেতাম না।'

www.pathagar.com

মুকুল শুধু বলল, ইতিহাস ইতিহাসই। আমরা এখন অনেক প্রশ্ন তুলতে পারি, কিন্তু তখন কেমন হতো তা তো কল্পনা মাত্র। বাস্তব এটাই যে, এখন উপমহাদেশে তিনটি স্বাধীন রষ্ট্র।'

আমরা রুমের একেবারে শেষ প্রান্তে একটি ছবির সামনে দাঁড়ালাম। এটাই সুভাষ বোসের শেষ ছবি। তিনি তাইওয়ানের (তখনকার ফরমোজা) বিমানবন্দরে বিমানে চড়ছেন। তারিখ আগস্ট ১৮, ১৯৪৫ সাল। সেদিন থেকে সুভাষ বোসের আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। জাপান রেডিও থেকে প্রচার করা হল আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষ বোসকে বহনকারী বিমানটি দুর্ঘটনায় বিধ্বস্ত হয়ে সুভাষ বোসের মৃত্যু হয়েছে। এখবর সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। খবরটি বিশ্বাস করতে পারেনি সুভাষ বোসের অনুরাগীরা, এমনকি তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় ফিল্ড মার্শাল ওয়েভেলও। ওয়েভেল বললেন, 'এটি জাপানি মিথ্যাচার। সুভাষ বোস রাশিয়ায় থাকতে পারেন।' এই মন্তব্যের পর হতেই নেতাজীর মৃত্যু রহস্য দানা বাঁধতে থাকে।

ভারতের স্বাধীনতার পর সুভাষ বোসের রহস্যজনক অন্তর্ধানের বিষয়ে তৎকালীন ভারত সরকারকে নানা ধরনের বিব্রতকর গুজবের সম্মুখীন হতে হল। এ বিষয়ে উদাসীনতায় অনেকেই কংগ্রেসকে দায়ী করছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের এককালীন সেনাপতি জেনারেল শাহনেওয়াজ খানকে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হল ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে। তখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ভারতের প্রধানমন্ত্রী। কমিটিতে আরেকজন সদস্য ছিলেন সুভাষ বসুর আরেক অগ্রজ ভ্রাতা সুরেশ চন্দ্র বোস। তদন্তে নেতাজীর মৃত্যু নিয়ে কমিটি একমত হতে পারেননি। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে বিজেপি-এর শাসন আমলে আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল। সে কমিটিতে সুভাষ চন্দ্র বোসের ওই সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকবার বিষয়টি নিয়ে নিশ্চিত কিছু না বললেও সুভাষ বোসের বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে বলা হল, জাপানীদের আত্মসমর্পণের আগে নেতাজী রাশিয়াতে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে রাশিয়ার বন্দি শিবিরে থাকতে পারেন। এ বিতর্ক আজও শেষ হয়নি। আজও সুভাষ বোস বেঁচে থাকলে তার বয়স হত ১১৪ বছর। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে সুভাষের বয়স ছিল পঞ্চাশ আর প্রথম কমিশনের তদন্তের সময় সুভাষ বোসের বয়স ছিল তেষট্টি বছর। সুভাষ বোসের কথিত মৃত্যু হয় আটচল্লিশ বছর বয়সে।

আমরা বড় রুমটি ছেড়ে পাশের ছোট রুমটিতে আসলাম। এখানে রাখা কিছু পারিবারিক ছবি। একটি অস্ট্রিয়াতে সুভাষ বোসের স্ত্রী এমিলি সাচেকের সাথে (Emile Sachenk) তাঁর এ বিবাহে একমাত্র কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন যার নাম ছিল অনীতা বোস পাফ (Anita Bose Plaff)। সুভাষ বোসের বিয়ে হয়েছিল প্রেমের ফসল স্বরূপ। অস্ট্রিয়াতে চিকিৎসাধীন থাকাকালে তিনি তাঁর জীবনী লিখতে একজন ইংরেজি ভাষা

www.pathagar.com

জ্ঞানসম্পন্ন সহযোগী নিয়োগ করেছিলেন। পরে তার সাথে প্রণয় এবং পরিণয়।

আমরা ছোট রুম থেকে বের হয়ে নিচে নেমে আসলাম। ওই সময় দর্শনার্থী বলতে আমরা তিনজন আর সেখানে কয়েকজন কর্মচারী। নিচের তলায় ছোট একটি লাইব্রেরি। খুব বেশি বইয়ের সংগ্রহ নেই। রয়েছে একটি সুভেনিয়রের দোকান। সেখানে জানলাম যে, এটি মূলত একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। আমি একটি বই এবং মুকুল একটি সিডি সেট কিনল। কথা ছিল ঢাকায় এর কপি করে তিনজনেই একটি করে সংগ্রহে রাখব। আমরা নেতাজী ভবন থেকে বের হয়ে আসলাম।

কামরুলের একটিই কথা, 'সুভাষ বোস ভারতের সবচাইতে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতা বলেই হয়ত অন্যরা সহ্য করতে পারেনি। হয়ত বাঙালি বলেও তাকে তেমন মূল্যায়ন করা হয়নি।' আমি কামরুলের মতামতের জবাবে বললাম, 'দুটোই হতে পারে'।

আমরা রমেশকে নিয়ে প্রথমে দুপুরের খাবার খেতে পরে বিবিডি বাগ সংলগ্ন চার্চ এভেনিউতে সেন্ট জন গীর্জা দেখতে যাত্রা শুরু করলাম।

রাস্তায় যেতে যেতে লাইব্রেরি থেকে নেতাজীর এ বাড়ি সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য পেলাম তা নিয়ে ভাবছিলাম। নেতাজী শেষবারের মত এ বাড়িতে গৃহবন্দি ছিলেন এবং এখান থেকে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে তিনি বের হয়ে জার্মানীর ইউ টু সাবমেরিনে বার্লিন পৌছেন এবং সেখান থেকে তিনি আবার প্রশান্ত মহাসাগরের কোন এক জায়গা হতে জাপানী সাবমেরিন: ১-২৯ জাপান পৌছেছিলেন। যে ছবিটি আমরা দেখেছিলাম সেখানে পরস্পর দু'খানা ছবিতে নেতাজীকে 'জার্মান যুদ্ধ জাহাজ থেকে জাপানী সাবমেরিনে স্থানান্তর হতে দেখা গিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এ ভবন পরিদর্শন করেন মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন জাপানী প্রধানমন্ত্রী সিনজো এ্যাবে এখানে এসেছিলেন। আমরা এলগিন রোড, বর্তমান নাম লালা লাজপৎ রায়, সরণি ত্যাগ করে আবার চৌরঙ্গির দিকে যাচ্ছিলাম। লাল লাজপৎ রায় সম্বন্ধে আমি আমার বই কত জনপদ কত ইতিহাস-এ উল্লেখ করেছি।

আমরা আবার রাজভবনের সামনে দিয়ে পুরাতন কাস্টমস হাউসের পাশ কাটিয়ে চার্চ এভিনিউতে প্রবেশ করতেই চার্চ হাউসস্ট্রিট আর বর্তমানের কিরণ শংকর রায় রোডের জংশনে গাছপালায় ঢাকা একটি প্রবেশ পথ পেলাম। উপরে লেখা 'সেন্ট জন চার্চ'। সামনে উত্তর-দক্ষিণে চার্চের বিশাল দালান। আমরা পশ্চিম পাশের গেটে প্রবেশ করলাম। আমি এই গীর্জা খুঁজতে গিয়ে সেন্ট পল এবং সেন্ট এনড্রুজ গীর্জাও দেখেছিলাম তার বিবরণ আগেই দিয়েছিলাম।

গীর্জাটি বিবিডি বাগ তথা রাইটার্স বিল্ডিং-এর সন্নিকটে হওয়ায় পুরাতন কাস্টম হাউস ছাড়াও পুরাতন ক্লাইভ রোডের (বর্তমানে নেতাজী সুভাষ রোড)। এককালের

www.pathagar.com

ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে (বর্তমানে ইস্টার্ন রেলওয়ে) এর হেডকোয়ার্টার অতিক্রম করতে হয়েছিল। অনেক স্থাপনার মধ্যে এ দুটো স্থাপনাও ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে দর্শনীয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। ধারে কাছে অত্যন্ত মনোরম আরেকটি বহুতল দালান যেটি এক সময় চার্টার্ড ব্যাংকের প্রধান শাখা ছিল।

বর্তমানের ইস্টার্ন রেলওয়ে হেডকোয়ার্টারের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। এটা ছিল কলকাতার পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ামের একাংশ। এ দালানের মূল ফটকটি এখন যেখানে সেটি ছিল ওই দুর্গের নদীর ধারের ফটক। এখান দিয়েই নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা জুন ২০, ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা আক্রমণকালে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করেন। প্রবেশের পরের দিনই এই দুর্গের পতন হয়।

সেন্ট জন গীর্জায় প্রবেশের পথে আমাদের থামতে হল নিরাপত্তা তল্লাশির কারণে। গেটের রক্ষী আমাদের পরিচয় এবং এখানে আসবার উদ্দেশ্য জানবার পর ট্যাক্সিকে ওইখানে রেখে ভেতরে হেঁটে যেতে অনুরোধ করলে আমরা নেমে পড়লাম। বেশ গাছপালায় ঢাকা এ ধারটা যার কারণে সড়ক থেকে সহজে এ গীর্জাটি দেখা যায় না। এর অবস্থান রাজভবনের কর্মকর্তাদের বাসস্থানের একেবারে লাগোয়া। আমরা ইতিপূর্বেও এ জায়গা অতিক্রম করেছি, কিন্তু গীর্জাটি চোখে পড়েনি। এ গীর্জাটি বেশ পুরাতন, এর নির্মাণশৈলী সেন্ট পল হতে আলাদা। গীর্জার চূড়াটি তেমন উঁচু নয় যে কারণে বিশাল বৃক্ষরাজির মধ্যে ঢাকা পড়েছে। গীর্জাটি ছিল কলকাতার প্রথম মূল গীর্জা। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে বিশপ মডিলটন কলকাতার দায়িত্ব নেয়ার পর হতে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে সেন্টপল নির্মাণ শেষ হওয়া পর্যন্ত এটাই ছিল আদি 'পেরিস চার্চ অব বেঙ্গল।'

আমরা হাঁটতে হাঁটতে গীর্জার পূর্বদিকের মূল দালানে প্রবেশের চওড়া গাড়ি বারান্দার সামনে দাঁড়ালাম। প্রাঙ্গণে অনেক পুরাতন কবর। দক্ষিণ প্রান্তের এক কোণায় শুরু পাকা রাস্তা এবং রাস্তার শেষ প্রান্তে গোলাকৃতির সমাধি সৌধ। এ সৌধটি কলকাতার স্থপতি বলে খ্যাত জব চার্নকের। আমি এ সমাধির খোঁজেই কয়েক জায়গায় ঘুরেছি। পূর্ব প্রান্তে দেয়াল ঘেঁষে বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত ক্যালকাটা ব্ল্যাকহোল মনুমেন্ট। এক সময় ডালহৌসি স্কয়ার বা বিবিডি বাগে ছিল এই মনুমেন্ট। কবে এই মনুমেন্ট এখানে স্থানান্তরিত হয়েছে সে তথ্য জানা নেই। তেমন কোন তথ্যও পাওয়া যায়নি।

চারদিকে দেখে মনে হল এ গীর্জা অনেকটাই গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। কারণ, এই শীতের মৌসুমেও সমগ্র এলাকায় বড় বড় ঘাসে ছেয়ে গেছে। রক্ষণাবক্ষেণের তেমন উদ্যোগ রয়েছে, যেমনটা দেখলাম সেন্ট পল-এ, বলে মনে হল না। গীর্জার দালানের বাইরের রংটিও বেশ বিবর্ণ।

১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের ওয়ারেন হেস্টিংস এবং ধর্মযাজক উইলিয়াম জনসন এই গীর্জা

www.pathagar.com

নির্মাণে উদ্যোগ নেন। বহু ঘটনার পর ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে পুরাতন খ্রিস্টান কবরখানার জায়গায় এ গীর্জার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। অবশেষে তিন বছর পর জুন ২৪,১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট জন-এর নামে গীর্জার উদ্বোধন করা হয়। দিনটি ছিল রবিবার।

সেন্ট জন গীর্জার পাথরের তৈরি, ছাদটি আর সব গীর্জার মত নয়। এর উপরিভাগ অন্যান্য সাধারণ দালানের ছাদের মত সমান। গীর্জার চূড়ায় একটি ঘড়ি লাগানো যা এখনও সচল। উত্তর এবং দক্ষিণ পাশে আরও দু'টি বিশাল আকারের বারান্দা রয়েছে।

আমরা তিনজনে প্রথমে বিতর্কিত ব্ল্যাক হোল মনুমেন্টের দিকে অগ্রসর হলাম। দেখে মনে হল না যে, এ মনুমেন্ট নিয়ে গীর্জার কর্তৃপক্ষ অথবা ভারতীয়রা মাথা ঘামায়। পথে পড়ল ব্রাভনের সমাধি। ওই সমাধি পার হয়ে জব চার্নকের সমাধি সৌধের পশ্চিমে আরেকটি ছোট সৌধ। ওই ছোট সৌধটিই কলকাতার ওই সময়ের সবচেয়ে চর্চিত মহিলা লেডি জনসনের। লেডি জনসন ছিলেন রেভারেন্ড উইলিয়াম জনসনের পত্নী। তিনি বেগম জনসন নামেই খ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর অন্তিম ইচ্ছাতেই এখানে তাকে বিশেষভাবে সমাধিস্থ করা হয়। কারণ, ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দেই এখানকার পুরাতন খ্রিস্টান কবরস্থান বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। তারপরেও শুধুমাত্র এ মহিলার অন্তিম অনুরোধে তার মৃত্যুর পর ওইখানে সমাহিত করা হয়েছিল।

আমরা হাঁটু সমান ঘাসের মধ্য দিয়ে প্রায় বিশ ফুট উঁচু ব্ল্যাকহোল মনুমেন্টের সামনে উপস্থিত হলাম। গোড়ায় একটি প্লাটফরম রয়েছে। যার উপরে এই মূল স্তম্ভটি দাঁড় করানো। স্তম্ভের নিচের দিকে ছয়টি কোণে মার্বেল পাথরের উপরে খোদাই করা বিভিন্ন তথ্য রয়েছে। প্রথমটিতে ব্ল্যাকহোলের সামান্য বিবরণী রয়েছে। এখানে যে তথ্য রয়েছে তাতে জেফেনিয়া হলওয়েলের, ওই সময়ে আদি ফোর্ট উইলিয়ামের দায়িত্বে ছিলেন, সূত্র উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে নবাবের ফৌজ দুর্গ দখলের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এঙ্গলো-ইন্ডিয়ান সৈনিক, কর্মচারী এবং তাদের পরিবারসহ মোট ১৪৬ জন সদস্যকে ১৮×১৪ ফুট আলো বাতাসহীন প্রকোষ্ঠে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। ওই দিন দিবাগত রাত পোহাবার পূর্বেই ১২৩ জন কথিত সদস্য দম বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। পরের দিন লাশগুলো একটি গর্তে ফেলে মাটি চাপা দেয়া হয় এবং বাদ বাকি ২৩ জন জীবিত সদস্যকে মুক্তি দেয়া হয়।

উপরে বর্ণিত বিতর্কিত ওই ঘটনা থেকেই কথিত ব্ল্যাকহোল 'ট্রাজেডি'র জন্ম। এ ঘটনাকে ব্যাপকভাবে প্রচার করে নবাবের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো হয়। এ ঘটনার মাধ্যমে বাংলার শেষ নবাবের চরিত্রে নিরস্ত্র বন্দি এবং নিরীহ পরিবারের সদস্যদের নির্মমভাবে হত্যা করবার অভিযোগের কলঙ্ক লেপন করা হয়।

আমরা মনুমেন্টের গায়ে অঙ্কিত নামগুলো পড়ছিলাম। মনে হয় এখানে ১২৩ জনের সবার নাম উল্লেখ নেই। অনেক নাম সঠিকভাবে পাঠোদ্ধারও করা দুষ্কর।

www.pathagar.com

কালের ছোঁয়ায় অনেক নাম অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমি ইতোপূর্বে কামরুল এবং মুকুল দু'জনকেই এ মনুমেন্টের সংক্ষিপ্ত প্রক্ষাপট বলেছিলাম। তারই জের ধরে কামরুল বলল 'এ ঘটনা কি সত্য।' আমি বললাম, 'যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে'। এগুলোকে বলে 'ফগ' (Fog) অব ওয়ার। যতটুকু নয় তার বেশি প্রচার করে এক পক্ষকে হেয় করা অপর পক্ষকে হিংসাত্মক করে তোলবার প্রয়াস।' আমি আরও বললাম, এ রকম প্রচারণা যুগে যুগে হচ্ছে। ইরাক যুদ্ধের পূর্বে সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে শুধু পারমাণবিক অস্ত্র মজুদের অভিযোগই নয়, বরং আল-কায়দার সম্পৃক্ততার কথাও বলা হয়েছিল। এ সব অপপ্রচার করে মার্কিন সেনাদের দারুণভাবে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়েছিল। সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে আনীত এ অভিযোগের সত্যতা নিয়ে ইতিপূর্বে এবং এখনও শুধু ভারতীয় ঐতিহাসিকরাই নয়, এমনকি ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরাও ভিন্ন মত পোষণ করছেন।

আমি আরও বললাম, সিরাজ-উদ-দৌলা ছিলেন অপরিপক্ক শাসক। তাঁর উচিত ছিল কলকাতা বিজয়ের পর বাংলা থেকে ইংরেজদের উৎখাত করা, তা তিনি করেন নাই বরং হঠকারিদের সাথে সন্ধি করলেন। এটাই তার কাল হল। একবছরের মাথায় ইংরেজদের চক্রান্তে তিনি উৎখাত হলেন আর দু'শ' বছর বাংলা প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পরে ব্রিটেনের কলোনি হয়ে থাকল। অবশ্য এটা আমার মতামত।'

কামরুল বলল 'আমি একমত'।

ব্ল্যাক হোল নিয়ে বহু বিতর্ক রয়েছে। সে বিতর্কের সমাধান আজও ঐতিহাসিকরা করতে পারেননি। শুরু থেকেই বহু ইংরেজ ঐতিহাসিক এ ঘটনা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অনেক প্রশ্ন উঠেছিল। সত্যই কি দুর্গ পতনের পর ১৪৬ জন সদস্যকে দুর্গেই রাখা হয়েছিল? বোধহয় না। আর তা ছাড়া এতটুকু জায়গার মধ্যে এতগুলো মানুষতো দাঁড়াবার জায়গাও পাবার কথা নয়। এ ঘটনার একমাত্র সাক্ষী হলওয়েল। এমনকি হলওয়েলের বক্তব্যের সাথে অন্যান্য সদস্য উইলিয়াম টুক এবং ক্যাপটেন মিলস-এর বক্তব্যেও দ্বিমত পাওয়া যায়। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে মি. এইচ লিটল এ ঘটনাকে 'সবচাইতে বড় মিথ্যাচার' বলে মতামত দিলে এ বিষয় নিয়ে পুনরায় বিতর্ক দেখা দেয়।

যাই হোক, ব্ল্যাকহোল মনুমেন্ট সর্বপ্রথমে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে হলওয়েল নিজ খরচে বর্তমানের লালদীঘি তখনকার ট্যাংক স্কয়ারে নির্মাণ করেন। তিনি দাবি করেন, ওই জায়গাতেই লাশ গর্তের মধ্যে ফেলা হয়েছিল। সেখানে ৪৮ জন ইউরোপীয়দের নাম ছিল। পরে ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর হেস্টিংস-এর হুকুমে এই স্মরণিকা ভেঙে ফেলা হয়। পরে লর্ড কার্জন পুনরায় আসল জায়গা শনাক্ত করেন যা এখন জিপিও-এর পেছনে রয়েছে বলে প্রকাশ। পরে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ওই জায়গায় একটি মনুমেন্ট উদ্বোধন করেন কার্জন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ইতিহাস বিকৃত করবার অভিযোগে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সুভাষ চন্দ্র বোস চলমান আন্দোলনে যখন গতি সঞ্চার করেন, সে সময় এটাকে ওই

www.pathagar.com

সময়কার ব্রিটিশ সরকার নিয়ে আসেন বর্তমান জায়গায়। সুভাষ বোসের প্রেরণায় এ মনুমেন্ট সরাবার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বর্তমান বাংলাদেশের নওয়াবগঞ্জ, ঢাকা জেলার বাসিন্দা জনাব আব্দুল ওয়াসেক মিঞা। অনেকেই হয়ত এ নামের সাথে পরিচিত নন। ব্ল্যাকহোল মনুমেন্ট সরাবার অথবা ভেঙ্গে ফেলবার আন্দোলনে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং ফরওয়ার্ড ব্লক শরিক ছিলেন। এটি ছিল সর্বভারতীয় আন্দোলন।

কামরুল জিজ্ঞাসা করল, পলাশীর এক বছর পূর্বে নবাব বাহিনী কেন কলকাতা আক্রমণ করেছিল।

আমি বললাম সেটাতো বেশ বড় ইতিহাস। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় নবাবের অগোচরে দুর্গ সম্প্রসারণ, ইংরেজদের ঔদ্ধত্য সর্বোপরি নবাবের শাসনে এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ক্রমাগতভাবে ইংরেজদের হস্তক্ষেপ ইত্যাদি। এবং রায় বল্লভের পুত্র কৃষ্ণ দাশ যিনি নবাবের রোষানলে পড়েছিলেন তাকে এ দুর্গে স্থান দেয়া, ঘষেটি বেগমের সাথে ইংরেজদের ষড়যন্ত্র, এসবই কারণ ছিল এ যুদ্ধের। কিন্তু সামরিক ভাষায় যা বলা হয় শত্রুর বিরুদ্ধে Momentum নবাব রক্ষা করেননি হয়ত তার অনভিজ্ঞতাই এর কারণ। আমি আরও বললাম, 'বস্তুতপক্ষে কলকাতা আক্রমণ আর নবাবের এ সাময়িক বিজয়ই নবাবকে বেশি আত্মবিশ্বাসী করে ফেলেছিল। তিনি ঘরশত্রু ভীষণকে চোখে দেখেননি।'

আমরা প্রায় আধাঘণ্টা মনুমেন্টের পাশে দাঁড়িয়ে মনুমেন্ট দেখা শেষ করে জব চার্নকের সমাধির দিকে হাঁটা শুরু করলাম। বড় বড় ঘাসের মধ্যে মাঝে একচিলতে পায়ে চলা পাকা পথ চলে গেছে হাঁটু সমান বাউন্ডারি দেয়া জব চার্নকের সমাধি চত্বরে। চত্বরটি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। এর রক্ষণাবেক্ষণ করছে মিউনিসিপ্যালিটি।

আমরা দেয়ালের ঘেরায় প্রবেশ করলাম। দেখলাম দু'জন পরিচ্ছন্ন কর্মী ময়লা আর শুকনো পাতা পরিষ্কার করে সেগুলো পুড়িয়ে ফেলবার আয়োজন করছে। জব চার্নকের সমাধি সৌধটি সামনে। ছয়কোণা বিশিষ্ট মূল সমাধি সৌধের উপরে ছয়কোণ বিশিষ্ট গম্বুজ ধরনের নির্মাণ। সমাধির ভেতরে প্রবেশের জন্য ছয়টি কোণে ছয়টি দরওয়াজা। উপরের গম্বুজে অনুরূপ ছয়টি খোলা জানালার মত। এগুলো দিয়ে সৌধের ভিতরে দিনের আলো প্রবেশ করে।

ভেতরে ঢুকতেই হাতের ডানদিকে একটি দেয়াল তার গায়ে লাগানো একটি ফলকে তথ্য পড়ে দেখলাম এটি এডমিরাল ওয়াটসনের সমাধি। ওয়াটসনের সমাধিও এখানে এই পুরাতন জায়গাতেই ছিল। গীর্জা তৈরির সময়ও এ জায়গা অক্ষত থেকে যায়। এডমিরাল ওয়াটসনের শিলালিপিটা ছত্রাকের কারণে অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। পাঠোদ্ধার করতে বেগ পেতে হয়। এডমিরাল ওয়াটসনকে ভাইস এডমিরাল হিসাবে পদোন্নতি দিয়ে ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে বৃটেন হতে মাদ্রাজে পাঠানো হয়েছিল। নবাবের হাতে

www.pathagar.com

কলকাতায় পরাজয়ের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ফোর্ট উইলিয়াম তথা কলকাতা পুনঃদখলের জন্য সাহায্যের আবেদন করলে এডমিরাল ওয়াটসনকে আরও কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে কলকাতার উদ্দেশে পাঠানো হয়। সাথে পাঠানো হয় ছোট সেনাদল যার নেতৃত্বে ছিলেন লেফটেনেন্ট কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ। ক্লাইভের বাহিনী ওয়াটসনের জাহাজের কামানের সাহায্য নিয়ে কলকাতা পুনঃদখল করেন। সময় ছিল জানুয়ারি ২, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ। কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া বাহিনীর পুনরাগমন এবং দুর্গ দখলের খবর মুর্শিদাবাদ পৌছতেই ক্রোধান্বিত সিরাজ ফেব্রুয়ারি ৫, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় কলকাতা আক্রমণ করেন, কিন্তু ওই যুদ্ধে সিরাজের বাহিনীর পতন হয়।

এবার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সিরাজকে বাধ্য করে, আলীনগর চুক্তিতে আবদ্ধ হতে। অগত্যা ফেব্রুয়ারি ৯, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ক্লাইভের সাথে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার চুক্তি হয় যা ইতিহাসে আলীনগর চুক্তি হিসাবে খ্যাত। ওই চুক্তির প্রধান বিষয় ছিল যে, ইংরেজদের সাথে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর মোগল সম্রাট ফররুখ শিয়রের যে চুক্তি হয়েছিল সেই মোতাবেক বাংলার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ পণ্যের সরবরাহ শুল্ক মুক্ত রাখতে হবে। সিরাজকে এ চুক্তি মানতে বাধ্য করলেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বসে থাকেনি। এরপরই ষড়যন্ত্রের ডালপালা গজাতে থাকে– যার পরিণতিতে মাত্র চার মাসের মাথায় পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

কলকাতা পুনঃদখলে ওয়াটসন হুগলী বন্দর এবং কিছুদিন পরে ফরাসিদের হাত থেকে চন্দননগর দখল করে নেন। এসব যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এডমিরাল ওয়াটসন নিজ গুণে ক্লাইভের চাইতে বেশি সম্মানিত এবং গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হয়ে উঠেন।

এরপরের ইতিহাস ক্লাইভ আর ওয়াটসনের দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব চরমে উঠে উমি চাঁদকে নিয়ে। উর্মিচাঁদ সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি ক্লাইভের নিকট তার সহযোগিতার জন্য মোটা অঙ্ক দাবি করেন, অন্যথায় ষড়যন্ত্রের তথ্য ফাঁসের হুমকিও দেন। অগত্যা ধূর্ত ক্লাইভ একটি নকল মুচলেকায় উমিচাঁদের দাবি মেনে নেবার ভান করেন। ওই নকল মুচলেকায় এডমিরাল ওয়াটসনকে দস্তখত করতে বললে তিনি নৈতিক কারণে তা প্রত্যাখ্যান করেন।

পলাশীর যুদ্ধে ওয়াটসনের জাহাজের কামান ব্যবহার করা হয়েছিল ক্লাইভ বাহিনীর গোলন্দাজের সহযোগী (artillery) হিসেবে। মীরজাফরদের হঠকারিতার কারণে সহজে জয় হয় ক্লাইভ বাহিনীর। পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর পদ নিয়ে ওয়াটসন আর ক্লাইভের মধ্যে টানাপোড়েনের এক পর্যায়ে ওই সময়কার রীতি অনুযায়ী দু'জনের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধের আহ্বান জানান ক্লাইভ। ওয়াটসন তার নিম্নপদের কর্মকর্তার সাথে বন্দুক যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাননি বলে সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন।

www.pathagar.com

যুদ্ধে ক্লান্তি এবং বাংলার প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে ভগ্ন হৃদয়ে এডমিরাল ওয়াটসন আগস্ট ১৬, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে পূর্ণ মর্যাদায় এখানকার কবরস্থানে দাফন করা হয়। লন্ডনের ওয়েস্টমিনিস্টার এবেতে আমি ওয়াটসনের স্মৃতিফলক দেখেছি। পরে জেনেছিলাম এ স্মৃতিফলক লাগিয়েছিল তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অব ডাইরেক্টরস।

আমি বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে ওয়াটসনের সমাধির শিলালিপিটির পাঠোদ্ধার করলাম। লেখা রয়েছে;

'এখানে চার্লস ওয়াটসন ইসকিউআর ভাইস এডমিরাল অব দি ডাবলিউ এই এর দেহ শায়িত। ইস্ট ইন্ডিজে হিজ ম্যাজেস্ট্রির নৌবাহিনীর কমান্ডার যিনি ১৬ আগস্ট ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ৪৪ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন। তার নিচে লেখা ওয়াটসনের সার্থক অভিযানগুলোর তালিকা। গেরিহা ফেব্রুয়ারি ১৩, ১৭৫৬; কলকাতা পুনঃদখল জানুয়ারি ১১, ১৭৫৭; চন্দননগর মার্চ ২৩, ১৭৫৭ সাল।

ওয়াটসনের স্মৃতিস্তম্ভের পেছনে একেবারেই গায়ে গায়ে লাগোয়া একটি চারতলা দালান যার দেয়াল চুইয়ে পানি ঝরে পড়ছিল। সেখানে দাঁড়ানো অবস্থায় কয়েক ফোঁটা পানি আমার গায়েও পড়ল। পরিচ্ছন্ন কর্মীদের জিজ্ঞাসা করলাম যে, দালানটি কি সরকারি। তারা জানালেন যে, এখানে সরকারি কর্মচারীদের বাস। আমার বুঝতে বাকি রইল না যে, সরকারি দালান বলে এর এহেন করুণ অবস্থা। বাঁয়ে তাকিয়ে দেখলাম মুকুল আর কামরুল জব চার্নকের সমাধির এ প্রান্তে ভিতের গোড়ায় বসানো লোহার প্লেটের উপরে এম্বোসড করা কিছু পড়ছে।

পড়ন্ত বেলা আস্তে আস্তে সূর্যের রশ্মি কমে আসছে। এতক্ষণে পরিচ্ছন্ন কর্মীরা কাজ শেষ করে স্থান ত্যাগ করেছে। চারদিকের গাছপালার কারণে পরিবেশ কিছুটা ভুতুড়ে মনে হচ্ছিল। আমরা মাত্র তিনজন ব্যক্তি এমন এক গোরস্থানে ঘুরছি যাদের সবাই এদেশে অনাহূত ছিল। অনেকেই পরিণত বয়সে, মধ্যবয়সে অথবা তরুণ বয়সে অনেক স্বপ্ন নিয়ে এদেশে এসেছিল। তাদের অনেকে সে স্বপ্ন আশা পূরণ না করেই হয়ত ইহধাম ত্যাগ করেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী এদের অনেকের স্মৃতি চিহ্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তরে। এদের বংশধররা এখন হয়ত খোঁজও করেন না তাদের পূর্বপুরুষদের। অনেকেই হয়ত ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি। কে রাখে কার খবর। আমি ওয়াটসনের স্মৃতিস্তম্ভ থেকে সামনের দিকে অগ্রসর হতে আরেকটি ছোট ফলক দেখলাম। ফলকটির গায়ে লেখা মিডশিপম্যান বিলি স্পেক। তিনি মার্চ ২৪,১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে চন্দননগর যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন। নেহাতই তরুণ। প্রাণ দিতে হল এমন এক জায়গায় যা কোনদিনই তাদের ছিল না। ইতিহাস হয়ত এ তরুণের কথা মনেও করে না।

www.pathagar.com

আমি জব চার্নকের সমাধি সৌধের সামনে এগুলাম। চারদিকে লোহার প্লেটে বহু নামাঙ্কিত। এদের সকলেরই সমাধি ছিল এই গীর্জার চত্বরে। আমরা তিনজনেই জব চার্নকের সমাধির ভেতরে প্রবেশ করলাম। ভেতরে প্রচলিত কোন সমাধি স্তম্ভ দেখলাম না। তবে মাঝখানে চতুষ্কোণ একটি জায়গা চিহ্নিত। এর পেছনে লেখা এখানেই জব চার্নকের কফিন রাখা হয়েছে। তাও প্রায় তিনশত বছর পূর্বে জব চার্নক মৃত্যুবরণ করেন কলকাতায় জানুয়ারি ১০, ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দে। তাকে এখানকার এই পুরাতন কবরস্থানে সমাহিত করা হয়েছিল। জব চার্নকের এই সমাধিতে পিতার কফিনের পাশে তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা মেরীর কফিনও রয়েছে। যে কারণেই চতুষ্কোণটি আয়তনে বড়। দু'জনের নামে এখানে কালো ফলকের উপর লেখা রয়েছে। মেরীর সাথে আরেক কন্যা ক্যাথেরিন হোয়াইটের নামও লেখা রয়েছে। মৃত্যুবরণ করেন ১৬৯৬ অথবা ১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দে। তার স্বামী ওই সময়কার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কলকাতার প্রধান প্রতিনিধি চার্লস আইর (Charles Eyre) সমাধি সৌধটি তৈরি হয় ১৬৯৫ হতে ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। জব চার্নকের আরও দু'কন্যার সমাধি সেন্টজন চার্চের কোথাও ছিল। এখন শুধু ফলক অবশিষ্ট রয়েছে।

আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফলক দু'টির পাঠোদ্ধার করতে চেষ্টা করলাম। আমার কাছে মনে হল ল্যাটিন ভাষায় লেখা। এ ফলক লিখেছিলেন একজন মুসলিম ক্যালিওগ্রাফার যাকে দিল্লী অঞ্চল হতে আনা হয়েছিল। আমি মুকুলকে জিজ্ঞাসা করলাম এ লেখা পড়তে পারছ।

মুকুল বলল, 'আমি অনেক চেষ্টা করলাম কিছু কিছু বুঝলাম কিছু বুঝলাম না। আমি তো এ সব জায়গায় কোনদিন আসিনি। আমি কলকাতার জামাই হয়েও এসব জায়গা দেখিনি শুধু জব চার্নকের নাম শুনেছি। এ দু'দিনে যত জায়গা দেখলাম সেগুলো আমি কখনও দেখিনি। রাইটার্স বিল্ডিং শুধু চিনি।'

'তা আমি টের পেয়েছি।' আমি মুকুলকে বললাম।

'এরকমই হয়। আমরা ঢাকায় থাকি কিন্তু ঢাকার বহু ঐতিহাসিক জায়গা আমি দেখিনি। কামরুলও আলোচনায় যোগ দিয়ে বলল। সেও ঢাকার অনেক জায়গা দেখেনি। আমি তার কথায় সায় দিলাম।

'মুকুল তুমি যেমন কলকাতার জামাই তেমনি জব চার্নকও বর্তমান বিহারের পাটনার জামাই ছিল। আমার কথা শুনে মুকুল বলল 'আচ্ছা কেমন করে সে কি মুসলমান বিয়ে করেনি?'

'এটা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। চার্নকের স্ত্রী মেরীর আদলে হিন্দু মহিলা মুসলমান হয়েছিলেন না খ্রিস্টান হয়েছিলেন স্পষ্ট নয়। আমার কথায় মুকুল বলল, 'এ কেমন কথা'

www.pathagar.com

এমনই তো বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্ন কাহিনী পড়েছি।

জব চার্নক ভারতে আসেন ১৬৫৫/৫৬ খ্রিস্টাব্দে। প্রথমে তিনি পাটনাতে পরে কাশিম বাজারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি হিন্দু সুন্দরী যুবতী বিধবাকে সহমরণের হাত হতে উদ্ধার করে পরে তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদায় রেখেছিলেন। তবে তাকে বিয়ে করেছিলেন কিনা সে তথ্য নিশ্চিত নয়। কারণ, চার্নকের সন্তানদের খ্রিস্ট্রীয় মতে ব্যাপ্টিস করা হয়েছিল কিনা তার তথ্য নেই।

জব চার্নক লন্ডনে জন্মগ্রহণ করলেও তার পিতা রিচার্ড চার্নক লন্ডনে এসেছিলেন ল্যাঙ্কাসায়ার থেকে। জব চার্নক ছিলেন রিচার্ড চার্নকের দ্বিতীয় পুত্র। তার বড় ভাই স্টিফেন চার্নক ছিলেন একজন ধর্মযাজক। জব চার্নক প্রথমে ভারতে আসেন-১৬৫০-৫৩ খ্রিস্টাব্দে মরিস থসন নামক এক ব্যবসায়ীর কর্মচারী হিসেবে। জানুয়ারি ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে জব চার্নক কর্মকর্তা পদে যোগ দেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেঙ্গল সার্ভিসে। সে সুবাদে কাশিমবাজার, হুগলী এবং বালাসোরে কোম্পানির ব্যবসা দেখাশুনা করেছেন।

চার্নক ভারতে আর দশজন ভারতীয়দের বেশ-ভূষাতেই থাকতেন এবং এখানকার ভাষা এবং সংস্কৃতির সাথে একাত্ম হয়ে পড়েন। তৎকালীন ভারতীয়দের নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন 'চানুক সাহেব' হিসেবে। জব চার্নক সহমরণ থেকে যেভাবে হিন্দু বিধবাকে বাঁচিয়ে পরবর্তীতে নিজের স্ত্রী বানিয়েছিলেন সে বিষয় নিয়ে বহু রোমান্টিক গল্প তৈরি হয়েছিল। কিছুটা দেখানো হয়েছিল হলিউডের অন্যতম ক্লাসিক জুলসভার্ন রচিত 'এরাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড' ইন নাইনটি ডেজ (Around the world in Ninety Days) এর একই নামের ছায়াছবিতে। চার্নকের কথিত রাজপুত বিধবা, মারিয়া খ্রিস্টান বা মুসলমান হয়েছিল না সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিল তা আজও রয়ে গেছে বিতর্কিত। কিন্তু চার্নকের সমাধিফলকে ছেলে-মেয়েদের নাম থাকলেও মারিয়া নামের কোন উল্লেখ নেই।

'সেটা নিয়ে এত কথা বলবার কি আছে। চল আগাই।'

মুকুল বলল, 'চার্নকের কথিত স্ত্রী কি মুসলমান ছিল?' আমরা ততক্ষণে জব চার্নকের সমাধি ছেড়ে পূর্বদিকে আরেকটি ছোট কিন্তু আকর্ষণীয় সমাধি সৌধের দিকে হাঁটছিলাম। মুকুলের কথায় আমি বললাম, 'জব চার্নকের উপরে যতটুকু সংক্ষিপ্ত লেখা পড়েছি তার এক জায়গায় এমন বিভ্রান্তিকর তথ্য পাওয়া যায়।'

জব চার্নকের কথিত স্ত্রীর সমাধিতে অনেকে মানত করে মুরগি জবাই করে বলে তথ্য পাওয়া যায়। এ ধরনের রীতি বিহারের পাঁচ পীরের মাজারে হিন্দু-মুসলমান উভয়

www.pathagar.com

সম্প্রদায়ের লোকই অনুসরণ করেন। এ সবের কারণেই অনেকে মনে করেন মুসলমান হলেও হতে পারেন। অথবা হিন্দু হতে মুসলমানও হয়ে থাকতে পারেন। তবে জব চার্নকের সমাধির মধ্যেই তার কথিত স্ত্রীর সমাধিও রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। আর এখানে মুরগি জবাইয়ের ঘটনা ঘটে থাকে। তবে চার্নকের স্ত্রীর সমাধি বেহরামপুরে রয়েছে বলেও তথ্যে প্রকাশ।

দিনের আলো দ্রুত কমে আসছিল। আমরা প্রায় একঘণ্টা এখানে কাটালাম। অল্পক্ষণের জন্য দাঁড়ালাম কাছাকাছি অদ্ভুত এই সমাধি সৌধে। ভেতরে প্রবেশ করে দেখলাম যদিও সেখানে সমাধির চিহ্ন নেই, তবে এক মহিলার নাম লেখা রয়েছে। এই মহিলা ইতিহাসে, বহু নভেলে এবং কলকাতার পত্তনকালের মুখরোচক গল্পের নায়িকার মত আক্ষরিক অর্থে জীবন্ত। এ মহিলার নাম 'লেডি জনসন'। বিখ্যাত হয়েছেন বেগম ফ্রান্সিস জনসন হিসাবে। কেন বা কিভাবে এই ইংরেজ মহিলা বেগম হলেন তার ইতিহাস সিরাজ-উদ-দৌলার ইতিহাসের সাথে জড়িত। এখানে যে তথ্য দেয়া আছে তা অত্যন্ত রোমাঞ্চকর। অনেকটা রূপকথার মত। বেগম জনসনকে এখানে সমাহিত করতে এসেছিলেন তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টো ও তার পারিষদসহ সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিগণ। বেগম জনসনের কথা কিছু পূর্বেই উল্লেখ করেছিলাম।

বেগম ফ্রান্সিস জনসনের সমাধিতে তার সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য দেয়া আছে। বেগম জনসন মৃত্যুবরণ করেন ৮৩ বছর বয়সে ফেব্রুয়ারি ৩, ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেনও ভারতে। যদিও তিনি একবার ইংল্যান্ডে ফিরেছিলেন। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পুনরায় ভারতে ফিরে আসেন। এরপর ইংল্যান্ডে আর ফেরেননি। তার জীবনে বহু বিবাহ ছিল। ছিল বহু প্রেমের ঘটনা। ছিল বেদনা। ছিল আনন্দ। জীবন কাটিয়েছেন মধ্যযুগীয় রাণী বা মোগল বেগমদের মত। বেগম জনসনের সিরাজের (নবাব) মাতা আমিনা বেগমের সাথে হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল বহু পূর্ব হতেই। যে কারণে তিনি বেগম সাহেব নামে অধিক পরিচিত ছিলেন বলে ধারণা করা হয়।

বেগম ফ্রান্সিস জনসনের পিতা ছিলেন এডওয়ার্ড ক্রুক যিনি ছিলেন ওই সময়ে করমন্ডেল উপকূলের সেন্ট ডেবিড দুর্গের গভর্নর, মাতা ছিলেন পর্তুগীজ বংশোদ্ভূত ইসাবেলা বেইজ্যের। এই দুইয়ের সংমিশ্রণে রূপসী ফ্রান্সিস জন্মগ্রহণ করেন করমন্ডেলে ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে। সেখানে বেড়ে উঠলেও ১৩ বছর বয়সে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন কলকাতায় পেরী টেম্পলারের সাথে। পাঁচ বছর পর পেরী টেম্পলার মারা যান। সে ঘরে দু'টি সন্তান শিশু বয়সেই মারা যায়। ফ্রান্সিসের দ্বিতীয় বিয়ে হয় জনৈক জেমস আলথামের সাথে। দ্বিতীয় স্বামী দশ দিনের মাথায় গুটি বসন্তে মৃত্যুবরণ করেন।

দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যুর দু'বছর পর তার রূপে এবং জৌলুসে কাশিমবাজারের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি উইলিয়াম ওয়াটসন-এর সাথে তৃতীয়বারের মত বিয়ের

www.pathagar.com

গাউন পরেন ফ্রান্সিস। কাসিমবাজারে থাকাকালীন সময়েই সিরাজ-উদ-দৌলার মাতা আমিনা বেগমের সাথে ঘনিষ্ঠতা হয়। কথিত আছে প্রায় সময়েই আমিনা বেগমের মেহমান হয়ে মুর্শিদাবাদে যাতায়াত করতেন ফ্রান্সিস ওয়াটসন। এর মধ্যে ওয়াটসন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের গভর্নর নিযুক্ত হলে কলকাতায় চলে আসেন ওয়াটসন পরিবার। সিরাজ ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে দুর্গ আক্রমণ করলে ওয়াটসন দুর্গ ছেড়ে পালিয়ে যান। আর ফ্রান্সিসকে সিরাজ-উদ-দৌলা সম্মানের সাথে পৌঁছে দেন তার মাতার হেফাজতে। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ক্লাইভ আর ওয়াটসন যখন কলকাতা পুনরুদ্ধার করেন তখন ফ্রান্সিস পুনরায় স্বামীর সাথে যোগ দেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভ ফ্রান্সিসকে সিরাজের মাতার সাথে ইংরেজদের সমঝোতার জন্য পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সিরাজের মাতা সাড়া না দেয়াতে সে সমঝোতা হয়নি।

পলাশীর যুদ্ধের দু'বছর পর ওয়াটস্ন পরিবারসহ ইংল্যান্ডে চলে যান। সেখানেই মৃত্যু হয় ওয়াটসনের আর ইংল্যান্ডের আবহাওয়ার সাথে খাপখাওয়াতে পারেননি বলে ফ্রান্সিস পুনঃ প্রত্যাবর্তন করেন কলকাতায় ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে। বয়স তখন ৩৬ বছর। কলকাতায় ১২ ক্লাইভ স্ট্রিটে আবাস গড়ে তোলেন আর আমৃত্যু সেখানেই থাকেন বেগম জনসন।

লেডি ফ্রান্সিস বা বেগম ফ্রান্সিস ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থবারের মত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন কলকাতার এবং এই গীর্জার প্রথম রেভারেন্ড উইলিয়াম জনসনের সাথে, নতুনভাবে পরিচিত হন বেগম জনসন নামে। উইলিয়াম জনসন ছিলেন ফ্রান্সিসের ১৬ বছরের ছোট। তথ্য প্রকাশ, এই বিয়ে মোটেই সুখকর ছিল না। এরই মধ্যে প্রচুর অর্থকড়ির মালিক হয়েছিলেন বেগম জনসন। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে বেগম জনসন উইলিয়াম জনসনকে নিজ খরচে ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে সাহায্য করেন।

ফ্রান্সিস জনসন ৫৯ বয়স হতে একাকী থাকলেও ক্রমেই তিনি কলকাতার অত্যন্ত নামিদামি এবং ওই সময়কার উঁচুস্তরের সমাজের একজন হয়ে উঠেছিলেন। তার বাসস্থানে চলতো রাতভর পার্টি আর পরিণত হতো মিলন মেলায়। সেখানে আসতেন গভর্নর হতে উঁচু পদের কর্মকর্তাগণ আর পার্টিতে যোগ দিতেন ওয়ারেন হেস্টিংস হতে কর্নওয়ালিস, এমনকি ডিউক অব ওয়েলিংটন, আর্থার ওয়েলেসলি প্রমুখ। ফ্রান্সিস জাঁকজমকপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেন। ওই সময়কার সবচাইতে জৌলুসময় এবং পরিপাটি পরিধেয় নারী হিসাবে কলকাতার সাহেব পাড়ার মধ্যমণি ছিলেন। তার খেদমতে ছিল নয় দাসী। তিনি জীবনের সিংহভাগ বাংলায় থাকলেও চলনে বলনে এবং রীতি-নীতিতে ছিলেন একশত ভাগ ইউরোপীয়। তার জীবনী নিয়ে বহু নভেল রচিত হয়েছে। পরিচিত হয়েছেন 'গ্র্যান্ড ডেম অব কলকাতা' (great Dame of Calcutta)

www.pathagar.com

হিসাবে।

আমাদের বেশ সময় লেগেছিল সমাধিতে রাখা বিরাট তথ্য সম্বলিত লিপি পড়তে। সেখান থেকে বের হবার পথে মুকুলকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই মহিলার বৃত্তান্ত পড়ে কি মনে হল।'

'এটাতো বলিউডের সিনেমার গল্প হতে পারে'

'হতে পারে যদি তুমি প্রযোজনা কর' আমি মুচকি হেসে বললাম। কাকে নায়িকা বানাবে' কামরুল মুকুলকে জিজ্ঞাসা করল।

'ক্যাটরিনা কাইফ' ত্বরিত জবাব মুকুলের।

'কাস্টিং-এর কথাটা বৌদিকে যেয়ে বল' কামরুল কিছুটা দুষ্টুমি করে বলল।

'আরে বাপরে ঘরছে নিকাল বাহার করনেকা প্ল্যান আচ্ছা হ্যায়?'

মুকুল হাসি দিয়ে বলল।

আমরা হালকা আলাপ করতে করতে বের হবার পথে গীর্জার দিকে যাবার সময় বড়োসড়ো একটা ছত্রী দেখলাম। ভেতরে বড় একটি স্তম্ভ। স্তম্ভের গায়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাহিনীর বেশ কিছু মৃত অফিসারদের নাম দেখলাম। এদের সবাই অক্টোবর ২৬, ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে রামপুর দখল করতে গিয়ে নিহত হন।

আমরা গীর্জার সামনে হাজির হলাম উত্তরের বারান্দায় (Lady) ডি ক্যানিং-এর বিশাল আকারের সমাধি স্তম্ভটি দেখে গীর্জার অফিসে গেলাম। সেখানে একজন কর্মকর্তার দেখা পেলাম। তার কাছে আমাদের পরিচয় দিয়ে এই ঐতিহাসিক গীর্জার ভেতরটা দেখতে চাইলে তিনি অতি উৎসাহে আমাদেরকে মূল প্রার্থনা ঘরে নিয়ে গেলেন। অসীম গোমেজ নামের এই ভদ্রলোক এই গীর্জার কোষাধ্যক্ষ। অনেকটা সেন্ট পল গীর্জার মত প্রার্থনা ঘর, অনেক পুরাতন স্মৃতি বিজড়িত আসবাবপত্র রয়েছে, সেগুলোর ইতিহাসে পাঠকদের ভারাক্রান্ত করতে চাই না।

গোমেজ আমাদেরকে পশ্চিম দেয়ালে বিশাল এক পেইন্ট দেখিয়ে বললেন, এটি অত্যন্ত দুর্লভ তৈল চিত্র। 'লাস্ট সাপার'। খ্রিস্টানদের জন্য পবিত্র এ দৃশ্য। তিনি জানালেন এর শিল্পী অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম জন জোফানী যিনি নিজে এই অসামান্য তৈল চিত্রটি এই গীর্জাকে উপহার দিয়েছিলেন। এই তৈল চিত্রটি ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই গীর্জায় রয়েছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম আদি 'তৈলচিত্রটি এমনই রয়েছে?'

গোমেজ বললেন, 'না, আমরা প্রয়োজনে নতুন করে টাচ দিয়ে আসছি।'

আমি তাঁকে বললাম, বইতে পড়েছি জোফানী যখন এই চিত্রটি এখানে উপহার দেন, তখন এটা নিয়ে তৎকালীন কলকাতার খ্রিস্ট্রীয় সমাজে দারুণ সমালোচনা হয়েছিল

www.pathagar.com

এই বলে যে, জোফানীর তৈল চিত্রে ওই সময়কার কয়েকজন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের চেহারা ব্যবহার করা হয়েছে? যেমন যিশুর মুখের আদল গ্রীক ধর্মযাজক ফাদার পার্থনিও-এর মত এবং কলকাতার ওই সময়কার নিলামঘরের মালিক তুলোচ-এর চেহারা বসানো হয়েছে সেন্ট জন হিসাবে। পরে তুলোচ এ বিষয় নিয়ে মামলাও করেছেন। সেন্ট জন-এর আসল মডেল হবার কথা ছিল পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট উইলিয়াম কোটস্ ব্লাকিউর?'

'কোন বইতে পড়েছেন' গোমেজ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। ড. ধ্রুবজ্যোতি ভট্টাচার্যের 'ইউরোপিয়ান' ক্যালকাটা নামক বইতে[8]-আমার উত্তর।

'একটু কাচুমাচু হয়ে বললেন, 'আমার জানা ছিল না।' গোমেজ এবার আমাদের বললেন 'চলুন গীর্জার ভেতরে প্রবেশের পথে আমার রুমের উল্টোদিকে যে রুম রয়েছে সেখানে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর অস্থায়ী অফিস আপনাদের দেখাই। ওই রুমটি এই গীর্জার অন্যতম আকর্ষণ।'

আমরা বেশ উৎসাহবোধ করলাম।

'লাস্ট সাপার'-এর তৈল চিত্রটি তখনও আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। যে কোন ধর্মীয় জায়গাগুলোতে আসলে আমি অনেকটা ভাবাবেগে আপ্লুত হই। সৃষ্টিকর্তার কথা বেশি মনে পড়ে। কত আকারেই না মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে কল্পনা করে। এক ঈশ্বরবাদীরা কোন আকারই দিতে পারে না। বিশেষ করে যারা কিতাবে বিশ্বাস করে। আমি ইয়াহুদীদের সাইনাগগে যাইনি, তবে সব চার্চেই এসে যিশুর মূর্তি দেখি। অনেক সময় চেহারার অমিলও থাকে। জোফানীর তৈলচিত্রেও তেমনটি হয়েছে। সবচাইতে বিখ্যাত 'লাস্ট সাপাস্টার এর মুরাল পেইন্টিং রয়েছে ইতালীর মিলান-এ। ওই মুরাল পেইন্টিং পঞ্চদশ শতাব্দীতে এঁকেছিলেন বিশ্বখ্যাত লিওনার্দো দা ভিঞ্চি।

'লাস্টসাপার' খ্রিস্ট ধর্মের বিশ্বাসীদের মতে যিশু ক্রসিফিকশনের আগের রাতে তাঁর বারোজন অনুরাগীদের নিয়ে রাতের খাবার সম্পন্ন করেন তারই চিত্র। ওই দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার আর যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয় পরের দিন অর্থাৎ শুক্রবারে। এ রাতের এ খাবারকে খ্রিস্ট ধর্মীয়রা 'কমিনিয়ন' (Communion) অথবা 'দি লর্ডস্ সাপার' (The Lords supper) হিসাবে উল্লেখ করে উদযাপন করেন।

আমরা গোমেজের সাথে প্রার্থনা হল ছেড়ে গীর্জার মূল দালানে প্রবেশের পথে, গোমেজের অফিসের উল্টোদিকের মাঝারি সাইজের একটি রুমে প্রবেশ করলাম।

আলোর স্বল্পতার কারণে একটু অন্ধকার ছিল রুমটি। রুমের বাতিগুলিও কিছুটা নিষ্প্রভ। ঢুকতেই সবুজ ব্লেজার কাপড়ে আচ্ছাদিত একটি টেবিল। দেয়ালের সাথে লাগানো কিছু বই। বেশ পুরনো সেলফে রাখা বইসহ কিছু দ্রব্যাদি। টেবিলের চারধারে

8। Dr. Dhrubajyoti Banerjea, European Calcutta' p-115-116

www.pathagar.com

কয়েকটি গদি পাতা কাঠের চেয়ার। বই রাখার সেলফের কাছেই অনেকটা ঘি রংয়ের কাপড়ে মোড়া গদি বিশিষ্ট কাঠের চেয়ার। চেয়ারটি অতি সাধারণ হলেও ঐতিহাসিক। রুমের সব আসবাবগুলোই কাঠের তৈরি, তবে প্রায় তিনশত বছর পুরাতন। ডার্ক ব্রাউন বার্নিশ করা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবশ্য সে কারণেই আসবাবগুলো উজ্জ্বল রয়েছে। চেয়ার টেবিল দেখিয়ে গোমেজ বললেন, 'এখানে গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস অস্থায়ীভাবে অফিস করতেন। আর ওই চেয়ারটি দেখছেন সেটি ওয়ারেন হেস্টিংস-এর চেয়ার। তিনি এটা ব্যবহার করতেন।' আমরা কাছে গিয়ে বেশ কিছু ছবি নিলাম। এখানে ছবি নিতে বারণ নেই। চেয়ারের উপরের অংশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতীক চিহ্ন থাকলেও তথ্যে প্রকাশ এ চেয়ারটির মূল মালিক ছিলেন ফ্রান্সের রাজা পঞ্চদশ লুই (Louis XV)। তিনি ১৭১৫ হতে ১৭৭৪ পর্যন্ত ফ্রান্সের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পনের বছর পর ইতিহাসের মোড় ঘুরানো ঘটনা 'ফ্রেঞ্চ রেভ্যুলিউশন' সংঘটিত হয়।

এই গীর্জাতেও আরও অনেক কিছু দেখার ছিল যেগুলোর সাথে ভারতের বৃটিশ বাণিজ্যিক সংগঠন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক অভিযাত্রা হতে সাম্রাজ্য স্থাপনের কুটিল, জটিল, পঙ্কিল আর সুখকর ইতিহাসের অধ্যায় জড়িত। ভারতে সাম্রাজ্য সূচনার এবং কলকাতা রাজধানী শহরে রূপান্তরিত হবার উষালগ্নেই এখানকার সম্পদ, ঐশ্বর্য আর বিলাসী জীবন-যাপনের হাতছানিতে বিশেষ করে কলকাতায় ভিড় জমিয়েছিল মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ভাগ্য অন্বেষাকারীদের দল। সমগ্র ইউরোপে তখন ভারতে আসবার এবং ব্যবসার সূচনা করবার প্রতিযোগিতায় ইংরেজ তোষামোদ স্বাভাবিক বিষয় হয়েছিলো। তারপরে থেমে থাকেনি ফ্রান্স আর ইংল্যান্ডের শতাব্দীর সংঘাত যার প্রতিচ্ছাপ রয়েছে ভারতীয় ইতিহাসেও।

আমরা গোমেজকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে যখন গীর্জা ছাড়লাম তখন সময় বিকেল পাঁচটার কাছাকাছি। আমাদের পাটনার ট্রেন রাত আটটায়। আধাঘণ্টা আগে কলকাতা রেলওয়ে স্টেশনে পৌছাতে হবে। হাতে দু'ঘণ্টার উপরে সময় রয়েছে। এদিকে সেই দুপুরের প্রথম প্রহরে হালকা আহার এতক্ষণে হজম হয়ে গেছে। পেটে কিছুটা ক্ষিধে অনুভব করছি। বাকি দু'জনেরও অনুরূপ অবস্থা। রাতের খাবারের অনিশ্চয়তা রয়েছেই। এসব ট্রেনে খাবার পরিবেশন করা হয় কিনা আমার জানা নেই। মুকুল সঠিক তথ্য দিতে পারল না। কাজেই কোথাও বসে চা নাস্তা খাবার প্রয়োজন দেখা দিল। বিষয়টি আলোচনায় আসলে মুকুল বলল আমরা কফি হাউসে গেলে কিছু খেয়ে নিতে পারব। সে ক্ষেত্রে ট্রেনে খাবার না থাকলেও অসুবিধা হবে না। আমি সায় দিলাম। রমেশও মুকুলকে সমর্থন করে জানালো যে রাস্তাতেই পড়বে কলেজ স্ট্রিট। সময়ও হাতে থাকবে। কলেজ স্ট্রিট থেকে পনের মিনিটের পথ রেলওয়ে স্টেশন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা দ্বিতীয়বারের মত কলকাতার কফি হাউসে এসে উপস্থিত হলাম।

সেই কফি হাউস যেখানে দু'দিন পূর্বে প্রথমবারের মত এসেছিলাম। আজই ওই

www.pathagar.com

টেবিলে বসলাম। এবার অবশ্য টেবিলটি খালি ছিল। ওয়েটার এসে, হয়ত চিনতে পেরেছিল বলে, লম্বা সালাম দিল। মেন্যু থেকে কিছু হালকা খাবারের অর্ডার দিয়ে একটু তাড়াতাড়ি আনতে বললাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের খাবার পরিবেশিত হল। সাথে কফি নিয়ে আসল। 'আজকে বোস আর সরকার বাবুকে দেখছি না' কামরুল বলল। মুকুল উত্তর দিল 'প্রত্যেক দিনই তাঁরা আসেন তা তুমি জানলে কিভাবে?'

আমাদের সংক্ষিপ্ত কথোপকথন শেষ হওয়ার সাথেই সামনের কোণার টেবিল হতে অরবিন্দ সরকার, আগের দিনের পরিচিত, হাসতে হাসতে আমাদের টেবিলে আসলেন। বললেন, আপনাদের দেখেই আমি উঠে আসলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম সত্যেন বোস বাবু কি আজকে আসেননি? সরকার বললেন এখনও আসেনি হয়ত এসে পড়বেন। আমরা তাঁকে আমাদের সাথে হালকা নাস্তায় যোগ দিতে বললে কিছুক্ষণ ইতস্তত করে যোগ দিলেন। মুকুল এবারও আরেক কাপ কফি আনতে বলল।

'আপনারা এ কয়দিন কি কলকাতায় ছিলেন?'

জি, তবে আর কিছুক্ষণ পর আমরা পাটনার উদ্দেশে রওয়ানা হব। কামরুল আমাদের হয়ে উত্তর দিল। এ পর্যায়ে কথোপকথনের দায়িত্ব কামরুলের উপরেই ছেড়ে দিলাম। কামরুল বয়ান করছিল কলকাতার যে সব জায়গায় আমরা গিয়েছি তার ফিরিস্তি। একপর্যায়ে বলল, 'আমরা ভেবেছিলাম দুপুরে আগের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে আপনার বাড়িতে আসব বলে একটু দুষ্টুমির হাসি দিল।' হাসিটা বোধকরি ভদ্রলোক লক্ষ্য করেননি। কামরুলের স্বভাবজাত দুষ্টুমি।

আসলে খুব খুশি হতাম। সরকার বাবুর অতি বিনয়ী উত্তর।

'আপনার ঠিকানাটা সঠিক জানা থাকলে আসতাম। হয়ত এর পরের বার আসব' আমি এ আলোচনা এখানেই শেষ করবার উদ্দেশ্যে বললাম মুকুল ওয়েটারকে ডেকে বিল দিতে বলল। সরকার সাহেব কয়েক মিনিটের কথা বলে পূর্বতো টেবিলে ফিরলেন। এবার কামরুল বলল, ভদ্রলোক মানুষ হয়ত এবার বিলটি আমাদের দিতে দেবেন না।

না অফার করলেও আমরাই দিয়ে দেব। আমি একটু জোরের সাথেই মুকুলকে বললাম।

কিছুক্ষণ পরে সরকার ফিরে আসলেন। ওয়েটার বিল নিয়ে আসলে মুকুল বিল চুকিয়ে দিল। সরকার বাবু শুধু একবার তাকিয়ে দেখলেন। তবে আমাদের সাথে নিচে আসলেন। ট্যাক্সি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আগামীতে কলকাতায় আসলে আমার বাসায় আসবেন।' 'নিশ্চয় আপনাকে ধন্যবাদ' বলে করমর্দন করলাম। তিনি এবারও ঠিকানা বললেন না আর আমরাও জিজ্ঞাসা করলাম না। কলেজ স্ট্রিটের ভিড় ঠেলে রমেশ আমাদেরকে কলকাতা রেলওয়ে স্টেশনে নিয়ে আসলেন।

www.pathagar.com

নয়

থ্রি-টায়ার-গরিব রথ

প্রায় আধঘন্টা হাতে রেখে আমরা উত্তর কলকাতার নতুন রেলওয়ে স্টেশন পৌছলাম। স্টেশনটি উত্তর কলকাতার চিৎপুর এলাকায়। কলকাতা শহরটা গড়ে উঠেছিল হুগলীর দু'পাড়েই, তবে ইস্টার্ন রেলওয়ের স্টেশনগুলো ছিল মূলত পূর্ব পাড়ে। কলকাতায় বর্তমানে চারটি বৃহৎ জংশন স্টেশন রয়েছে, কলকাতা, শালিমার, হাওড়া এবং শেয়ালদাহ। কলকাতা স্টেশন থেকেই ঢাকার ট্রেন চলাচল করে।

আমরা স্টেশনে নেমে রমেশকে ফিরবার পথে স্টেশন থেকে নিয়ে যেতে বলে মুর্শিদাবাদ যাবার জন্য তার ঠিক করা গাড়ির বিষয়টি পুনরায় নিশ্চিত হয়ে ইলেকট্রনিক তথ্য বোর্ড থেকে প্লাটফরমের নম্বর জেনে স্টেশনের ভেতরে প্রবেশ করলাম। দৃশ্যত মনে হয়, এই স্টেশন হতে মূলত মালবাহী ট্রেনই চলাচল করে বেশি। আমরা নির্ধারিত প্লাটফর্মে এসে কলকাতা পাটনা 'গরিব রথ' নামক ট্রেনের অপেক্ষায় রইলাম। যেহেতু আমরা তিনজন তিন বগিতে কাজেই তিনজনকেই আলাদা আলাদা বগিতে উঠতে হবে। আমরা সাব্যস্ত করলাম যে প্রথমেই তিনটি বগির যেটাই পাওয়া যাবে সেটাতে উঠেই অন্যগুলো খোঁজ করে যার যার জায়গায় চলে যাব।

কলকাতা রেলওয়ে স্টেশন আর দশটা রেলওয়ে স্টেশনের মতই। তবে দিল্লীর মত অত ট্রেনের আনাগোনা নেই, নেই যাত্রীদের সে রকম ভিড় হুড়াহুড়ি। তারপরেও রেলওয়ে স্টেশনের পরিবেশটাই আলাদা। আর ভারতের রেলওয়ে স্টেশন সে তো আরও আলাদা। বহু বর্ণ গোত্র ভাষা আর ভিন্ন ভিন্ন আচার-আচরণ দেখবার এবং উপলব্ধি করবার মতন। প্লাটফরমের উপরে কয়েকটি বেঞ্চ লাগানো। সবগুলোতেই যাত্রীরা বসা। কাজেই আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতেই হল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুকুল আশঙ্কা প্রকাশ করল টিকেটে উল্লেখিত ভুল বয়স নিয়ে। কামরুলেরও ওই একই আশঙ্কা। আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'মুকুল দুই নম্বরি করে সিনিয়র সিটিজেনের সুবিধা নিয়েছ। আরও দু'জনেই চুল কালো করে রেখেছ, এবার জেলে যেতে হবে।'

মুকুল হেসে বলল, 'আমি তো ভারতীয় আমার কিছু হবে না। কামরুলের কি হবে?' আমরা কামরুলকে জেলে রেখে যাব। মুকুলের কথায় তিনজনই হাসলাম।

ইতিমধ্যেই ট্রেন চলে এসেছে। সামনেই আমার বগিটি। 'থ্রি-টায়ার' ট্রেনে চড়বার

www.pathagar.com

অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম। এর আগে ভারত সফরে আসলে যে সব ট্রেনে চড়েছি এবং তার অভিজ্ঞতা আমার পূর্বতন বইগুলোতেও রয়েছে। তবে আমার জন্য যে অন্যধরনের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার অপেক্ষা করছিল তা 'থ্রি-টায়ার এসি' ট্রেনে না চড়া পর্যন্ত বুঝতে পারিনি। আমাদের তিনজনের কারও এ ধরনের ট্রেনে সফরের পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। 'গরিব রথ' প্রাক্তন রেলমন্ত্রী ও ভারতের অত্যন্ত পরিচিত রাজনীতিবিদ লালু প্রসাদ যাদবের ভারতীয় রেলওয়েকে দেয়া শেষ অবদান। লালু প্রসাদ অনেক শখ করে নাম রেখেছেন 'গরিব রথ'। গরিবের বাহন এ বাহন শুধু এয়ারকন্ডিশনড-ই নয়, বরং এর টিকেটের দামও তুলনামূলকভাবে বেশি।

আমার নির্ধারিত সিট খুঁজে বের করলাম। এটি লম্বালম্বি জায়গায় অন্যান্য বাংক এর অতিরিক্ত। নিচের সিট। একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষের লম্বা হয়ে শোবার মত স্থান। তার উপরে আরেকটি বাংক। সবচাইতে চমকপ্রদ হল দুটোর মাঝখানে আলাদাভাবে গুটিয়ে রাখা আরেকটি বাংক। এটাই তৃতীয় টায়ার। তার মানে হল নিচের সিটের উপরে আরও দু'টি বাংক। মাঝখানের বাংকে কেউ শুলে নিচের বাংকের যাত্রীকে লম্বালম্বি হয়ে শুয়ে থাকতে হবে। কারণ, উঠে বসবার মত জায়গা নেই। এটাই থ্রি-টায়ার। কোন আলাদা কুপে নেই। বগিটি খোলা এবং প্রত্যেক উপর নিচের বাংকের মধ্যে তৃতীয় বাংক সংযোজন করা হয়েছে। অত্যন্ত কষ্টকর সফর যদিও শুধুমাত্র রাত নয়টার পর মাঝের বাংকের যাত্রী সেটি ব্যবহার করতে পারবেন, তবুও অস্বস্তিকর। সমস্ত ব্যবস্থাই আমার কাছে গবাদি পশুর খোয়াড়ের মত মনে হল। একজন যাত্রীর মুখে শুনলাম যে, ভারতের উচ্চ আদালতে এক রায়ে এ ব্যবস্থা বাতিল করে সমস্ত মেইল ট্রেন থেকে মাঝের বাংক উঠিয়ে নিতে বললেও এই মেইল ছাড়া সবগুলোতে থ্রি-টায়ার বাতিল করা হয়েছে। এটাতে নয় কেন?

তার উত্তর পেলাম পরে।

ইতিমধ্যেই ট্রেন স্টেশন ছাড়া শুরু করেছে। মুকুল তার বগি খুঁজে পেয়েছে। পরেরটাই তার নির্দিষ্ট বগি। কামরুল ফোনে জানালো পেছনের দুই বগি পরে কামরুলের বগি এবং সে তার সিটে বসে গেছে। এদিকে আর আসছে না। আমি আমার সিটে এমন জায়গায় বসা যেখান দিয়ে যাতায়াতের পথ। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ফেরিওয়ালা, খাবারওয়ালা আর যাত্রীদের আনাগোনায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলাম। পুরো বগি ভরা যাত্রী যার যার বাংকে। শুধুমাত্র মাঝখানের বাংকের যাত্রীরা নয়টা বাজার অপেক্ষায় বিভিন্ন জায়গায় বসা। আমার পাশে একজন বসা তিনি আবার রাত একটায় তার গন্তব্যস্থলে নেমে যাবেন। তিনি মধ্য বাংকের যাত্রী। বগিটি ছোটখাটো বাজারের মত হয়ে আছে। রাতের সফর তাই যাত্রীরা যার যার বাক্স পেটারার নিরাপত্তা নিয়েই ব্যস্ত বেশি।

একটু পর মুকুল এসে আমার পাশে বসল। তার ব্যাগটি ওখানে কারও হেফাজতে

www.pathagar.com

রেখে এসেছে। আমার পাশের নিচের সিটে তিন যুবক বসা। উপরে একজন ঈষৎ বয়স্ক ব্যক্তি আধা শোয়া অবস্থায়। হৃষ্টপুষ্ট শরীর। গায়ের শার্টটি খুলে গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরা। হাতে সোনার চেইন, গলায় মাদুলী। নিচের তিন যুবকের সাথে উচ্চস্বরে কথা বলছিলেন। কথায় মনে হল বিহারের বাসিন্দা। কারণ, বিহারের বর্তমান রাজনীতি নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল।

আমি আর মুকুল চুপচাপ শুনছিলাম। এতক্ষণে ট্রেনটি গতি পেয়েছে। জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখলাম কলকাতা শহরের রাতের অপসৃয়মাণ হাজারো নিয়ন আর সোডিয়াম বাতি।

তিনজন যুবকের একজন উপরের ব্যক্তির উদ্দেশে বলে উঠল, 'যমুনা জি' লালু প্রসাদ ট্রেনের নাম রেখেছে 'গরিব রথ'। লালুজি বিহারের গরিব মানুষের সাথে তামাশা করলেন। 'গরিবের গাড়ি এসি আর এত ভাড়া' তার কথার পিঠে আরেকজন যোগ দিয়ে বললেন, 'লালুপ্রসাদের জঙ্গলরাজে এগুলোত মামুলী ব্যাপার। লালু রেলওয়ের জন্য যা কিছু করেছে তা নিতিশ কুমার যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন তখনকার পরিকল্পনা।' উপরের ভদ্রলোক বললেন, 'আরে কাহা নিতিশ কুমার আউর কাহা লালু-রাবরী। নিতিশ কুমারকে আরও দশ বছর থাকতে দেও দেখবা বিহারকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দেবে?' কথাবার্তা হচ্ছিল হিন্দিতে। আমি এই প্রথম বিহারে লালু গং-এর জঙ্গলরাজের কথা শুনলাম। পাটনায় গিয়ে আরও বিস্তারিত শুনছিলাম। অথচ আমার ধারণা ছিল ভারতের রেল বিভাগের উন্নতি লালুর পরিকল্পনা। পরে জানলাম উন্নয়নের পরিকল্পনা করেছিলেন বিহারের বর্তমান চিফ মিনিস্টার মি. নিতিশ কুমার। আমরা বিহারের একটা জঙ্গলরাজের চিত্র নিয়েই যাচ্ছিলাম। নিতিশ কুমার এবার নিয়ে তৃতীয়বারের মত মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। ট্রেনের গতি যতই বাড়ছিল তিনজনের আলোচনার আওয়াজ ততই উচ্চতর হচ্ছিল।

আমার সামনের পথ দিয়ে অবিরাম লোকের যাতায়াতের কারণে আমি আর মুকুল গুটিশুটি হয়ে বসেছিলাম। কিছুক্ষণ বসে থাকতে থাকতে পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে গিয়েছিল। অপরদিকে বিহার আর লালুপ্রসাদের পরিবারতন্ত্রে বিহারের ওই সময়কার পরিস্থিতির বিষয়টি নিয়ে রীতিমত আলোচনায় একটা ঘরোয়া বৈঠকের মত চলছিল।

অল্প কিছুক্ষণ পর নীল রংয়ের গলবন্ধ কোট প্যান্ট আর মাথায় পিকক্যাপ হাতে ছোট রসিদ বই নিয়ে পূর্বাঞ্চল রেলওয়ের টিকিট চেকার এসে হাজির। পথে কয়েকজনের টিকেট দেখতে দেখতে আমাদের সামনে আসলে প্রথমে আমার টিকেটটি বার করে তার হাতে দিলে তিনি টিকেটে পাঞ্চ করে দিলেন। টিকেট চেকার মহোদয় কোন বাক্য ব্যয় করছিলেন না। শুধু হাতের ইশারাতেই কাজ সারছিলেন। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম তার মুখবন্ধ।

www.pathagar.com

মুকুলের টিকেট চাইলে মুকুল টিকেটখানি তার হাতে দিতে দিতে বলল যে ভুলবশত তার বয়স সঠিক লেখা হয়নি কাজেই সিনিয়র সিটিজেন-এর কোন সুবিধা তার পাওয়ার কথা নয়। মুকুল নরমাল টিকেটের জন্য বাড়তি টাকা লাগলে দিতে প্রস্তুত। চেকার সাহেব এবার বিপদে পড়লেন। মুখটাতো এখন তাকে খুলতে হবে। তিনি অদ্ভুত ভঙ্গিমায় মুখের সামনের দিকটা উঁচু করে মুখ খুলে মুকুলকে কিছু বললেন। আমার মনে হল তার মুখে পান জাতীয় কিছু, যে কারণে তিনি বেশি কথা বলতে পারেননি। আর এসি বগি হওয়াতে জানালার সদ্ব্যবহারও করতে পারছেন না। কষ্ট করে বো বো করে যা বললেন তার সারমর্ম হল যে, এই ট্রেনে সিনিয়র সিটিজেন-এর কোন রেয়াত নেই। এমনিতেই ট্রেনের টিকেটের দাম কম কাজেই বাড়তি অর্থ দেবার কোন প্রয়োজন নেই। বয়সটা লিখতে হয় যাত্রীদের তথ্যের ভাণ্ডারে রাখবার জন্য। বয়সের আরও ব্যবহার রয়েছে। একই নামের একের অধিক যাত্রী হলে তাদের শনাক্তকরণের কাজে আসে (কত জনপদ কত ইতিহাস দ্রষ্টব্য)।

টিকেট চেকার মুকুলের টিকেট ফেরত দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলে মুকুলকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভদ্রলোকের মুখে পান ছিল বলে তো মনে হলো না।' মুকুল বলল, 'না পান ছিল না। বিহারে পান খুব কম লোকেই খায়। এখানে চলে 'খইনী'। ওর মুখে খইনী ছিল। সে জন্য কথা বলতে বা মুখের থুথু ফেলতেও পারছিলেন না। আমি বললাম, 'ও তাই। পাটনায় গিয়ে খইনী খেয়ে দেখতে হবে। আমি জীবনে খইনী খাইনি তবে দেখেছি।'

'তাহলে আমি সতেন্দ্রকে বলে রাখব। আমিও কোনদিন খেয়ে দেখিনি। আমিও দেখব,' বলে মুকুল সকালে দেখা হবে বলে বিদায় নিয়ে নিজের বাংকে চলে গেল।

এরই মধ্যে মাঝের বাংক-এর, যা আমার তিন ফুট উপরে পাতা হবে, যাত্রী অন্যান্য কয়েকজনের সাথে বালিশ কম্বল আর চাদরের গাটটি নিয়ে উপস্থিত। বললেন, 'আমি উপরে বিছানা পাতব। আপনি কি বিছানা আনবেন। আনলে পাশের বগির সার্ভিস রুম থেকে নিয়ে আসুন। নেহীত খতম হো যায়েগা?' আবার বললেন, 'পঁচিশ রুপিয়াছে যেয়াদা মত দেনা।' লে বাবা বিছানার ভাড়া পঁচিশ টাকা তাও যদি পাওয়া যায় একটা বালিশের বাইরে এক্সট্রা বালিশের জন্য বাড়তি পাঁচ রুপি দিতে হবে। আমি উঠে গিয়ে বালিশ কম্বল চাদর আর একটা এক্সট্রা বালিশ নিয়ে তিরিশ রুপি দিয়ে এসে দেখলাম ততক্ষণে একতলা দোতলা তৈরি হয়ে গিয়েছে। সবার উপরের বাংকে তিন যুবকের একজন শুয়ে শুয়েই পাশের জনার সাথে সামনে বিগত পাঁচ বছরে বিহারের উন্নতির বিভিন্ন দিক নিয়ে বাকিদের সাথে কথা বলছে।

আমি কোন প্রকারে মাথাগুঁজে বিছানা পাতলাম। চাদর, বালিশের কভার সব কড়কড়া আয়রন করা এবং পরিষ্কার। তাতেই স্বস্তি। তাকিয়ে দেখলাম প্রায় যাত্রীরাই

www.pathagar.com

সাথে করে নিয়ে আসা খাবার সারছে। ফেরি করে খাবার বিক্রিও শেষ। অনুমান করলাম 'গরিবের রথ'-এ টিকেটের সাথে খাবার আসে না যেমনটি অন্যান্য ট্রেনের আপার ক্লাসে দেয়া হয় (কত জনপদ কত ইতিহাস, যমুনা গোমতীর তীর : একটি ভ্রমণ কথা দ্রষ্টব্য।)

ভাগ্যিস কিছু খেয়ে এসেছিলাম আর দুটো পানির বোতল কিনে সাথে নিয়ে এসেছিলাম। কোট খুলে মাথার কাছে রেখে সটান শুয়ে পড়া ছাড়া আর কোন উপায় দেখলাম না। বিচিত্র অভিজ্ঞতা। একবার শুইলে হামাগুড়ি দিয়ে বের হওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমার উপরে আরও দু'জন। এই হল 'থ্রি-টায়ার' ট্রেন। গরিব রথ ততক্ষণে কলকাতার শহরতলী ছাড়িয়ে অন্ধকারের বুক চিড়ে ছুটে চলছিল। সারা রাত ঘুম তো নয় তন্দ্রার মধ্য দিয়ে কাটাতে হবে। চিৎ হয়ে শুয়ে ভাবছিলাম মাঝের বাংক ছিঁড়ে পড়লে নিচে চাপা পড়ে থাকতে হবে। অনেকটা দম বন্ধ হবার মত অবস্থা। লালু প্রসাদের আবিষ্কার থ্রি টায়ার।

মুকুল বলে গেল সতেন্দ্রর সাথে কথা হয়েছে। সকালে নিজেই আসবেন পাটনা স্টেশনে আমাদের স্বাগত জানাতে। পৌছে দেবে কামরুলের সৌজন্যে আয়োজিত নির্ধারিত হোটেলে। হোটেল চানক্যে। রাত প্রায় দশটা বগির ভেতরের বাতিগুলো নিভে গেল। প্যাসেজে হালকা আলো। প্রায় সব যাত্রীই ঘুমের রাজ্যে প্রবেশ করল। এ পাশ ওপাশ করতে করতে বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। ট্রেন চলছে বেশ স্পিডে। সকালে ট্রেন যখন বিহারের রাজধানী পাটনায় পৌছল তখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে মাত্র। সকাল তখন ছয়টা। ট্রেন থেকে তিনজনে প্লাটফর্মে নামতেই দেখা পেলাম হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে অতি পরিচিত সতেন্দ্র সিং। প্রায় চার বছর পর দেখা। দেখতেই 'ওয়েলকাম টু' বিহার বলে জড়িয়ে ধরল। সাথে তার দুজন সহকারী। আমাদের ব্যাগ নিয়ে বাইরে দাঁড়ানো জিপের দিকে রওয়ানা হল। স্টেশন থেকে বের হতে হতে অনেক কথা হল সতেন্দ্রর সাথে। ঢাকার আর গুলশান লেক পার্কে তার সুখকর স্মৃতির কথা বলতে বলতে আমরা গাড়িতে বসে হোটেলের দিকে রওয়ানা হলাম। সতেন্দ্রর অফিসের জিপ। তরুণ চালক। আমরা পাটনার রাস্তায়।

www.pathagar.com

দশ

বিম্বিসারের রাজধানীতে

পাটনা জংশন রেলওয়ে স্টেশনের বাইরে আমাদের দেশের শহরগুলোর মত দৃশ্য। ট্যাক্সি, সিএনজি অটো আর প্যাডেল রিকশার ভিড় আর দোকানপাট, যদিও তখনও খোলেনি। কুলিদের দৌড়ঝাঁপ আর প্রাইভেট গাড়ি নির্ধারিত যাত্রীদের অপেক্ষায়। স্টেশন ছাড়ার মুখেই নজরে পড়ল একপাশে বিশাল সুউচ্চ এক মন্দির। এই মন্দিরটি পাটনার বিখ্যাত হনুমান মন্দির। এখনও মন্দিরের ভেতরে নানা রংয়ের বাতি জ্বলছে। মন্দির বরাবর উত্তরদিকে তিনতলা একটি জামে মসজিদ। এ দুটো স্থাপনাই নতুন তৈরি হয়েছে। দু'ধর্মের দু'টি প্রার্থনার স্থান এত কাছাকাছি আমি যে সব শহরে গিয়েছি তেমনটা দেখিনি। এখানে সহঅবস্থান দেখে ভালই লাগল। বিহারে, বিশেষ করে পাটনায়, অনেক মুসলমান রয়েছে। বস্তুতপক্ষে বিহারের রাজনীতিতে মুসলমান সংখ্যালঘু একটি বড় ফ্যাক্টর।

আমরা রেলওয়ে স্টেশন ছেড়ে হোটেলের দিকে রওয়ানা হলাম। সতেন্দ্র জানালেন যে হোটেল বেশি দূরে নয়। তিনি আরও জানালেন, যেহেতু কামরুলের অনুরোধে এখানকার স্থানীয় ফেন্সিং ফেডারেশন হোটেলের ব্যবস্থা করে ফেলেছিল, সে কারণেই তিনি আমাদের বাসস্থানের উদ্যোগ নিয়েও বাতিল করেছিলেন। তিনি আমাদের জন্য পাটনা চিড়িয়াখানা সংলগ্ন বোটানিক্যাল গার্ডেনের ভেতরে রেস্ট হাউসে ব্যবস্থা করেছিলেন। আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'স্যার একপর্যায়ে আমি চিফ সেক্রেটারিকে বলে আপনাকে গেস্ট করতে চেয়েছিলাম। পরে ভাবলাম আপনি যেভাবে ঘুরতে এসেছেন তা হয়তো তখন সম্ভব হতো না।'

সতেন্দ্রকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, 'ভালই হয়েছে আপনি আমাকে এবং সেই সাথে বাকি দু'জনকেই সেই বিড়ম্বনা থেকে বাঁচিয়েছেন। আমি আমার মত করে ঘুরতে এসেছি। আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে পড়লে সফরটা আনন্দদায়ক হতো না।'

'পাটনা, বিহারের রাজধানী। বিগত বছরগুলোতে এ শহরের অতীত হাল সম্বন্ধে যা শুনেছি তার সাথে বর্তমান বাস্তবের মিল তখনও খুঁজে পাইনি। আমি সতেন্দ্রকে বললাম, 'উইলিয়াম ডালরিম্পলের বই 'এজ অব কালী'তে পাটনা সম্বন্ধে যা পড়েছি তার সাথে বর্তমানের মিল কতখানি। অন্তত যতটুকু আমরা আসলাম তাতে তো

www.pathagar.com

রাস্তাঘাট আশেপাশে ভালই দেখলাম'। 'ওই অবস্থা এখন নেই। নিতিশ কুমারের প্রথম দশ বছরে যে পরিবর্তন এনেছে তার তুলনা ভারতে হয় না'। এই গত পাঁচ বছরের মধ্যে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ভারতের ব্যর্থ রাষ্ট্র বিহারকে দ্বিতীয় দ্রুততম অর্থনীতি হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন। তাকে ভারত সরকার সর্বশ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সম্মানিত করেছে। সতেন্দ্র বেশ উৎসাহ নিয়েই বললেন।

'আমি এর আগেও বিহারে লালু প্রসাদের পিএস হিসাবে কাজ করেছি সেই বিহার আর এখনকার বিহারের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। এবারের নির্বাচনে নিতিশ কুমার তৃতীয় দফা নির্বাচিত হয়েছেন। মজার বিষয় হল সমগ্র প্রচারণায় নিতিশ কুমার প্রত্যেক জনসভায় একটি কথাই তার জনতা দলের (ইউনাইটেড) সপক্ষে বলেছেন। 'আমি যদি গত দশ বছর ভাল কাজ করে থাকি তাহলে আমাকে ভোট দেবেন।' সতেন্দ্র আরও বললেন যে, এবারে বিহারে যে নির্বাচন হয়েছে এ ধরনের নির্বাচন ভারতের স্বাধীনতার পর কখনও হয়নি।

সতেন্দ্র-এর কথাই ঠিক। ইতোপূর্বে বিহারের নির্বাচন নিয়ে তুষ্ট ছিলেন না খোদ ভারতীয় নির্বাচন কমিশন। বিহার মানেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা। আর ব্যালট বাক্স ছিনতাই বুথ দখলের নির্বাচন। এবার চিত্র ছিল উল্টো। নিতিশ কুমার ভারতের একজন অনুকরণীয় ও সফল মুখ্যমন্ত্রী, জয় প্রকাশ নারায়ণের হাত ধরে রাজনীতিতে এসেছিলেন।

আমরা হোটেলের প্রায় কাছাকাছি। এদিকের রাস্তাগুলো চওড়া আর মসৃণ। ঝকঝকে তকতকে। পাটনা ঐতিহাসিকভাবেই এ অঞ্চলের রাজধানী। বিহার একসময় সুবা বাংলার সাথে যুক্ত ছিল। এখানকার শেষ নবাবও ছিলেন সিরাজ-উদ-দৌলা। পাটনা শহর বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন জনপদের শহর। এ অঞ্চল জন্ম দিয়েছে দু'টি ধর্মের, বৌদ্ধ আর জৈন ধর্ম। জৈন ধর্ম বর্তমানে সংকুচিত আর বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসীরা চতুর্থ বৃহত্তম ধর্মাবলম্বী। বৌদ্ধ ধর্ম প্রধান প্রায় সব রাষ্ট্রই এশিয়াতে। পাটনা পৃথিবীর অন্যতম পুরাতন নিরবচ্ছিন্ন জনপদের ইতিহাস। পাটনার ইতিহাস সাক্ষী হয়ে আছে শতাব্দীর পর শতাব্দীতে রাজ্য, রাজা আর রাজধানীর উত্থান আর পতনের। দেখেছে মৌর্য আর গুপ্ত শাসনের উত্থান-পতন। এ অঞ্চল-এ শহর ছিল দিল্লী সালতানাতের অংশ হতে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রধান অঞ্চল। শেরশাহের উত্থান। বাংলার নবাবদের শাসন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হতে বৃটিশ রাজের কালের সাক্ষী। এ শহর দেখেছে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ পরে ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলন। পাটনা বর্তমানে পূর্বভারতের, কলকাতার পর, দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর অন্তত জনসংখ্যার দিক থেকে। গঙ্গা নদীর তীরের এ শহর ইতিহাসের সাক্ষী।

পাটনা ছিল হারিআঙ্কা রাজবংশের রাজধানী 'রাজাগ্রিহা' পরে 'পাটালিপুত্রা'। প্রথম শহর হিসাবে স্থাপিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে। এ পরে নন্দা রাজবংশের রাজা

www.pathagar.com

বিম্বিসার পুত্র অজাতশত্রুর হাতে মারা যান ৪৯৩ খ্রিস্টপূর্বে। অজাতশত্রু পাটালিপুত্রাকে তার রাজধানী করেন। ওই সময় পাটালিপুত্রা বিশ্বের সবচাইতে বড় শহর হিসাবে গণ্য হয়। এরপরে মৌর্যদের সময় পাটালিপুত্রা সমগ্র উপমহাদেশের শক্তি আর শৌর্যের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। চন্দ্র গুপ্ত মৌর্যের সময় পাটালিপুত্রা কেন্দ্রিক রাজ্য বঙ্গোপসাগর হতে আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পাটালিপুত্রা অশোক, চন্দ্রগুপ্তের নাতীর রাজত্বকালে সমগ্র উপমহাদেশের রাজধানী ছিল। তখন ছিল কাঠের শহর। সময় ছিল ২৭৩ খ্রিস্টপূর্ব। চীনের বিখ্যাত পর্যটক ফাহিয়ান ওই সময়ে এখানে আসেন। তারপরে গুপ্তদের পালা। এরপরে দিল্লী সালতানাত। মোগলদের শাসন আর অল্প সময়ের জন্য শাশারামের শেরশাহসূরীর উত্থান। শেরশাহের সময়ে পাটালিপুত্রা পরিবর্তিত হয় পাটনা নামে। শাশারাম পাটনা হতে ১৬০ কি.মি. দূরে। বহু যুদ্ধ হয়েছে এ অঞ্চলে।

আমরা হোটেলে এসে পৌঁছলাম। হোটেল রুমে পৌঁছে গোসল সেরে প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ডাইনিং রুমে নাস্তার জন্য জড়ো হলাম। সতেন্দ্র পাটনাতে একাই থাকেন। থাকেন কাছেই সার্কিট হাউসে। তিনি যোগ দিলেন আমাদের সাথে সকালের নাস্তায়। আজ তার কর্মদিবস এখান থেকে সরাসরি অফিসে চলে যাবেন। আর আমরা নাস্তার পর পরই নালন্দায় যাব। নালন্দা পাটনা থেকে প্রায় পঞ্চান্ন মাইলের পথ। সতেন্দ্র গাড়ি ঠিক করে রেখেছে। সাথে যাবে তার এক এসিসট্যান্ট। অফিস আছে বলে আমাদের সাথে যেতে পারছে না। তবে আগামীকাল আমাদের সাথে বুদ্ধগয়া বা বৌদ্ধগয়াতে যাবেন। অনেক কথাবার্তা হল। ঢাকার স্মৃতিচারণ করলেন সতেন্দ্র। নাস্তা শেষে আমরা নালন্দার পথে রওয়ানা হলাম। সেখানেই দুপুরের খাবার খেয়ে ফিরব।

নালন্দা পৌঁছতে আমাদের প্রায় দেড়ঘণ্টা সময় লাগবে। নালন্দা বিশ্বখ্যাত বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ হিসেবে মৌর্য বংশের সময় হতেই বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও উন্নতি হয়। বর্তমানে এটি একটি দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়েছে। এসব জায়গা এখন সাধারণ ভাষায় বৌদ্ধ বিহার বলে পরিচিত। নালন্দা বিশ্বের সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি। ইতিহাসের তথ্য মোতাবেক বিশ্ববিদ্যালয়টি ১১৯৭ পর্যন্ত চালু ছিল। বিশ্বের বহু দেশ হতে ইতিহাসের ছাত্র, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং পর্যটকদের অবশ্য দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়েছে। একই নামে পাটনায় রয়েছে একটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়।

আমাদের চালক শহর থেকে বের হয়ে হনুমান নগর কলোনি হয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে ৩০ ধরল। রাস্তাটি বেশ চওড়া। প্রচুর যানবাহন। বিশেষ করে বড় বড় ট্রাক ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হতে পাটনায় প্রবেশ করছে। রাস্তার উত্তরধারে গঙ্গানদী। শীতের সময় বলে নদীতে তেমন পানি নেই। পাড়ে বন্যার পানি রোধের জন্য বাঁধ দেয়া হয়েছে। ফতওয়া হয়ে দক্ষিণ দিকে দানে সওয়ান পার হবার পর রাস্তায় গাড়ির বিরাট

www.pathagar.com

যানজট দেখলাম প্রায় এক কিলোমিটার লম্বা হবে। চালক খবর নিয়ে জানালেন যে সামনে একটি ট্রাক উল্টে গেছে। উদ্ধার কাজ চলছে। ওই উদ্ধার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই যানজট ছুটছে না। এ রাস্তায় গেলে আমরা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে পারি তাই গাড়ি ঘুরিয়ে স্টেট রোড ধরতে হবে। তাই করতে হল। আমরা পুনরায় ধানওয়াল নামক বাজারে ফিরে স্টেট হাইওয়ে ৪ ধরে রওয়ানা হলাম। এ রাস্তাটি ন্যাশনাল হাইওয়েের মত বড় না হলেও খুব খারাপ নয়। চালক আমাদের জানালেন এ রাস্তাটি গত পাঁচ বছরে উন্নত করা হয়েছে। এ রাস্তা 'বিহার শরিফ' পার হয়ে এরই উপকণ্ঠে নালন্দায় প্রবেশ করবে।

রাস্তার দু'পাশে কৃষি জমি। প্রচুর সরষে ক্ষেত। এখানে প্রচুর সবজিও উৎপাদন হয়। বিহারের অর্থনীতি বেশির ভাগই কৃষি নির্ভর। বিগত বছরগুলোতে এখানে শিল্প-কারখানায় তেমন বিনিয়োগ হয়নি। লালু-রাবড়ির শাসনকালে বিহারের আইন-শৃঙ্খলার যে পরিস্থিতি ছিল তাতে ভারতীয় শিল্পপতিরা বিহারে অর্থলগ্নী করতে সাহস পায়নি। বিহারের অর্থনীতিতে বড় ধাক্কা আসে যখন বিহার ভেঙে ঝাড়খন্ড রাজ্যের জন্ম হয়। ঝাড়খন্ডে রয়েছে উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ স্টিল মিল। ভকারো টাটা স্টিল। তাছাড়াও আরও অনেক শিল্প-কারখানা। অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। ইদানিং বিহারে অর্থলগ্নী শুরু হয়েছে। টাটা সিমেন্টের অন্যতম বৃহৎ ফ্যাক্টরি স্থাপিত হয়েছে। বিহার শরিফের কাছেই এখন তৈরি হচ্ছে টাটা ট্রাক সংযোজনের প্ল্যান্ট।

প্রায় দেড় ঘণ্টা চলার পর আমরা 'বিহার শরিফ' নামক ছোট শহরের বাইপাস হয়ে নালন্দার কাছাকাছি পৌঁছলাম। বিহার শরিফ নালন্দা জেলার জেলা সদর। বহু পুরাতন একটি জনপদ। গঙ্গার শাখা পামার নদীর তীরে এ শহরটি। এটি একসময় মগধ রাজ্যের রাজধানী ছিল। সময়টি ছিল পাল বংশের রাজত্বকাল। এখানে ওই সময়কার আরেকটি বৌদ্ধ বিহার বা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। যার নাম ছিল উদান্তপুরী। এটি ছিল বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষার অন্যতম বৃহৎ বিদ্যাপীঠ। বলা হয়ে থাকে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি যখন পূর্বাঞ্চলে অভিযান চালান, তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ধ্বংস করেছিলেন। আরও পরে দিল্লীর সুলতানদের শাসন শেষ হলে হুমায়ুন এ অঞ্চল মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি করেন। শেরশাহ সূরী বিহার শরিফ ছেড়ে পাটনাতেই রাজধানী গড়ে তোলেন। এ সমগ্র অঞ্চল ছিল ঐতিহাসিক মগধ রাজ্য যা বর্তমানের বিহার।

আমরা বিহার শরিফের দক্ষিণ প্রান্তে এসে স্টেট রোড ছেড়ে নালন্দা বৌদ্ধ বিহারের দিকে রওয়ানা হলাম। রাস্তার উপরে দিক-নির্দেশনা দেয়া রয়েছে। রাস্তাটি সরু তবে দু'টি গাড়ি পাশাপাশি আসা যাওয়া করতে পারে। দু'পাশে ছোট ছোট গ্রাম। কয়েক কিলোমিটার ভেতরে প্রবেশের পর রাস্তার এক পাশে সারিবদ্ধ প্রচুর বাস দাঁড় করানো

www.pathagar.com

দেখলাম। এগুলো সবই টুরিস্ট বাস। আমরা ঐতিহাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি এসে পড়েছি। প্রচুর ট্যুরিস্ট। ভারতের এবং ভারতের বাইরের প্রচুর বৌদ্ধ ভিক্ষু। এদের অনেকে তিব্বতের উদ্বাস্তু ভিক্ষু যাদের বাস সিকিম রাজ্যের ধর্মশালায়। ক্রমেই ভিড় বাড়তে দেখলাম। দু'পাশে প্রচুর দোকান। বেশিরভাগ দোকানেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জপমালা হতে বুদ্ধের মালা আর অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে সাজানো। ভগবান বুদ্ধের মূর্তি আর সিডি ভিডিও-এর দোকান। নালন্দার ট্যুরের সিডির দোকান রয়েছে বেশ কয়েকটি। ওই সব দোকান হতে ত্রিপিটকের শ্লোক বাজানোর আওয়াজ এক অদ্ভুত ধর্মীয় গুরুগাম্ভীর্য পরিবেশের সৃষ্টি করছে। নালন্দা কোন ধর্মীয় স্থান নয়, তবুও এ জায়গা বৌদ্ধদের কাছে পবিত্র। ঐতিহাসিক তথ্য মতে, খোদ গৌতম বুদ্ধ বহুবার এই নালন্দাতে এসেছেন। তখন এখানে বিশাল আম বাগান ছিল।

গৌতম বুদ্ধের পদধূলির কারণেই এ জায়গা আরও পবিত্রতা পেয়েছে। আরও পরে চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজক হুয়ানজং-এর স্মৃতি যখন দেখতে গিয়েছিলাম সেখানে যে বিশাল তৈল চিত্র রাখা ছিল সে সূত্র মতে গৌতম বুদ্ধ এখানে প্রভাবিকাশ-এর বাগানে থাকতেন। এখানেই গৌতম বুদ্ধ তার প্রধান শিষ্যগণ, উপলী ঘুপাতি; দেঘতেপাষি এবং কাভেতার সাথে নির্মোহ নিয়ে আলোচনা করতেন। এখানে তিনি বহুবার আসাভানাকাঞ্চার-এর সাথে ধর্ম আর জীবন নিয়ে আলোচনা করতেন। গৌতম বুদ্ধ তার জীবনের সায়াহ্নে মগধ ঘুরে শেষবারের মত, নালন্দায় এসেছিলেন। এখানেই সারিপুত্ত গর্জে উঠে গৌতম বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে বললেন, 'বুদ্ধাম শরনাম গচ্ছামি'।

আমরা প্রধান ফটকের পাশে গাড়ি রেখে নামলাম। সতেন্দ্রর স্টাফ এগিয়ে গিয়ে আমাদের দেখিয়ে বললেন যে আমরা সচিব সাহেবের বিদেশি মেহমান কাজেই প্রবেশের জন্য টিকেটের প্রয়োজন হল না। আমি মুচকি হাসলাম কারণ আমাদের দেশের সাথে এ বিষয়ে বেশ সাদৃশ্য রয়েছে বলে। ভেতরে প্রবেশ করলাম। হাতের বাঁয়ে কিছু দূরে দেয়াল ঘেরা দেয়া আরেকটি স্থাপনা। সতেন্দ্রর স্টাফ অজিৎ চন্দ্র জানালেন যে ওইখানে একটি মন্দির রয়েছে যার পাশে 'গরম চশমা' গরম পানির একটি ছোট পুকুর রয়েছে, সেখানে গোসল করলে সব ধরনের চর্ম রোগের উপশম হয়। এমন ঝর্ণা আর পুকুর বহু দেশে আছে। পানিতে সালফারের পরিমাণ বেশি থাকায় নাকি কিছুটা ঔষধের কাজ করে। কিন্তু এর সাথে ধর্মীয় বিশ্বাসটিও যুক্ত হয় যখন এর সন্নিকটে কোন ধরনের ধর্মীয় কেন্দ্র গড়ে উঠে। এমনই এক জায়গার কথা আমি জানি। সেটি পাকিস্তানের করাচি শহর হতে দূরে মঙ্গেপীর বলে এক জায়গায় পীরের মাজারের কাছেই এমন গরম পানির ছোট পুকুর। ওই পুকুরের কারণেই ওই মাজারে হাজার হাজার ভক্ত আসেন গোসল করেন আর পীরের দরবারে মানত করেন। এখানেও ওই

www.pathagar.com

একই অবস্থা।

আমরা এগিয়ে চললাম। পায়ে চলা লাল ইট দিয়ে বাঁধানো পথ। পথের একধারে বসার জন্য বেঞ্চ রয়েছে। দু'পাশে সুন্দর পরিপাটি করে রাখা ঘাসের চত্বর। পায়ে চলা পথের দু'ধারে প্রচুর গাছ আর তার শ্যামল ছায়া। বিহারে ডিসেম্বরের শেষের দিকেও তেমন শীত নেই। কিছু দূরে দেখলাম একদল জাপানী তরুণ-তরুণী ছবি তুলছে। পরনে ঐতিহ্যবাহী জাপানি কালো রঙের কিমোনো, গলায় সোনালী রংয়ে চওড়া বর্ডার। কামরুল এগিয়ে গিয়ে তাদের সাথে কথা শুরু করল। আমি আর মুকুল একটু পেছনে হাঁটছিলাম। ফিরে এসে কামরুল বলল যে এরা টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। এখানে এসেছে গৌতম বুদ্ধের জীবনের উপরে গবেষণার কাজে। এরা বুদ্ধিষ্ট। আমাদের পরিচয় পেয়ে ছবি তুলতে চায়। দাঁড়িয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে ছবি তুললাম টুকটাক কথা হল। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে। এরা সবে মাত্র বৌদ্ধগয়া ঘুরে এসেছে ।

ছবি তোলার পর্ব শেষ হলে আমরা এগিয়ে গেলাম বৌদ্ধ বিহারের প্রবেশ দ্বারে। গেটে প্রবেশের পথে একটি শিলালিপি। এখানকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে যাতে টুরিস্টরা যৎসামান্য পরিচিত হতে পারে এ বিহারের সাথে। আমি দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণটা পড়লাম। আমার যৎসামান্য জ্ঞানভাণ্ডারে সঞ্চয় করলাম বিশাল ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য।

এ জায়গাটির ইতিহাস খ্রিস্টপূর্ব ছয় শতাব্দীর পূর্বের। এখানে জন্মগ্রহণ করেন নির্ভানা সতিপুত্রা, গৌতম বুদ্ধের অন্যতম বিখ্যাত শিষ্য। এ জায়গাটি খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী হতেই ললিতকলা আর শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ক্রমেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এটি বিশ্বের অন্যতম প্রধান তীর্থকেন্দ্র হয়ে উঠে। ভারতের তথা বিশ্বের বহু প্রান্তর হতে এখানে বিদ্যা শিক্ষার জন্য আগমন ঘটে বহু ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তিদের। এদের মধ্যে ছিলেন নাগর্জুনা, আইয়ুরভেদী, ধর্মপাল, সুভেসু, আসাঙ্গা, স্লামাভান্দা, ধরমকীর্তি, বিখ্যাত চীনা পর্যটক হুয়েগ টিসান এবং আইসেন।

গুপ্তদের সময় এখানে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন কুমার গুপ্ত (৪১৩-৪.৪৫৫ খ্রিস্টাব্দে)। এর উন্নতি করেন ইতিহাস খ্যাত রাজাধিরাজ হর্ষবর্ধন (৬০৬-৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে)। আরও পরে পাল বংশ (৮ হতে ১২ শতাব্দী খ্রিস্টাব্দে)। এখানেও বখতিয়ার খিলজির উল্লেখ রয়েছে। আমাদেরকে গাইড জানালেন ওই সময় মাটি দিয়ে অনেক জায়গা ঢেকে দেয়া হয়। পরে ব্রিটিশ রাজের সময়ে (১৯১৫-৩৭ খ্রিস্টাব্দে) খনন করে বের করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভগ্নাংশ। বিভিন্ন বৌদ্ধ মন্দির। এরপরে ভারত সরকার আরও বিস্তীর্ণ অঞ্চল খনন করে সংস্কার করে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে আসে। এখান থেকে উদ্ধার হয় বহু হিন্দু বিগ্রহ। এগুলো সবই এখন রাখা রয়েছে এখানকার জাদুঘরে।

www.pathagar.com

শিলালিপিটি পড়া শেষ হলে আমরা একজন গাইড নিয়ে প্রধান প্রবেশ পথ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। দু'পাশে সুউচ্চ দেয়াল বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ। ছোট ছোট লাল ইটের তৈরি। দেয়াল এবং বিভিন্ন বিদ্যামন্দির একই ইটে তৈরি। তবে সব দেয়াল বা ইটই যে ওই সময়কার তেমন নয়। গাইড আমাদেরকে জানালেন যে সে সব ক্ষয়ে যাওয়া অংশ দেখছি সেগুলো আদি অংশ আর মসৃণ অংশগুলো ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ পুনঃ বিন্যাস করেছে তবে লালমাটির একই মাপের ইট চুন সুরকি দিয়েই গাঁথা হয়েছে। এ কারণেই এগুলো এমন মসৃণ মনে হয়। ভারত এসব পুরাকীর্তি রক্ষার্থে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। দেশে-বিদেশে প্রচুর প্রচারণা করে যার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পর্যটকরা আকৃষ্ট হন। অথচ আমাদের দেশে সমসাময়িক পুরাকীর্তি রয়েছে। সেগুলোর তেমন রক্ষণাবেক্ষণ হয় না। নেই প্রচার। রাজশাহীর পাহাড়পুর, কুমিল্লার বৌদ্ধ বিহারগুলো সমসাময়িক যুগের। কিন্তু প্রচারণা আর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আমরা এগুলো সম্বন্ধে ততটা জানি না। আমাদের দেশের যাতায়াত ব্যবস্থার কারণেও এগুলো দেখার ইচ্ছা থাকলেও হয়ে উঠে না। আমার কিছুটা সুবিধা থাকাতে একবার নওগাঁয়ের পাহাড়পুরের বৌদ্ধ মন্দির এবং বিহার দেখতে গিয়েছিলাম। সেটি উপমহাদেশের অদ্ভুত এক অদ্বিতীয় স্থাপনা। নালন্দার তুলনায় আরও দর্শনীয় কিন্তু সেখানে নালন্দার মত সুযোগ সুবিধা নেই। যাতায়াত কষ্টকর। পর্যটকদের আকর্ষণ করবার মত কোন বাড়তি সুবিধা নেই। বহির্বিশ্বে বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশে নেই তেমন প্রচারণা। এ কারণেই পাহাড়পুর নালন্দার মত বিশ্ব পরিচিত নয়। অথচ সামান্য উদ্যোগে পাহাড়পুর হতে পারত নালন্দার চাইতে দর্শনীয় স্থান। পাহাড়পুরের স্থাপনা অষ্টম শতাব্দীতে তৈরি করেছিলেন ধর্মপাল।

ফিরে আসছি নালন্দাতে। গাইড আমাদেরকে জানালেন যে, এই এলাকার খনন হয়েছে প্রায় তিন কিলোমিটার ব্যাপী। এ স্থাপনার বহু অংশ এখনও মাটির নিচে চাপা পড়া রয়েছে। জনবসতির কারণে সম্পূর্ণ খনন করা সম্ভব হয়নি। তথ্য মতে, এই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল প্রায় পাঁচ কিলোমিটার ব্যাপী। লক্ষ্য করলাম কোথাও কোন ময়লা নেই। নেই কাগজের ঠোঙ্গা ইত্যাদি। ভারতের কোন ঐতিহাসিক সংরক্ষিত স্থানে পানি ছাড়া আর কোন ধরনের খাবার অথবা খাবারের ঠোঙ্গা নিয়ে আসা দণ্ডনীয় অপরাধ।

আমরা আরও ভেতরে একটি সবুজ উদ্যান ঘেরা ছাদবিহীন একটি প্রকোষ্ঠেতে প্রবেশ করলাম। দেয়াল নীল ফলকে লেখা বৌদ্ধ মনাস্টারি নং-১। এর কিছু তথ্য বিবরণ দেয়া রয়েছে। তথ্যে বলা হয়েছে যে এই বিদ্যামন্দির নয় ধাপ বিশিষ্ট। প্রতি ধাপের প্রকোষ্ঠ ব্যবহার হতো শ্রেণীকক্ষ এবং ছাত্রদের বাসস্থান হিসাবে। পানি নিষ্কাশনের জন্য বিস্তৃত ড্রেনগুলো এখনও দেখা যায়। ছিল পানি সংগ্রহের আধার। খাবার তৈরির রন্ধনশালা। ছাত্রদের বাসস্থানে ইটের তৈরি বিছানা পাতবার জায়গা

www.pathagar.com

রয়েছে। রয়েছে লাইব্রেরি প্রকোষ্ঠ আর প্রার্থনা ঘর। এখানের কিছু সংযোজন গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সময়ের। গুপ্ত সাম্রাজের পতনের পর পাল সাম্রাজ্য উত্থান হয় একাদশ শতাব্দীতে। গুপ্ত এবং পাল সাম্রাজ্য ছিল বাংলা কেন্দ্রিক। এখানে আরও বৃহৎ আকারের সংযোজন হয় পাল বংশের অন্যতম শাসক দেবপালের (৮১০-৫০ খ্রিস্টাব্দে) সময়। তিনিই পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের স্থাপনা করেন। যার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি।

আমরা প্রায় তিন কিলোমিটার ঘুরে দেখলাম। প্রচুর ট্যুরিস্ট ইতিমধ্যেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। গাইড আমাদেরকে একটি বড় স্তূপা দেখিয়ে বললেন, 'এখানে ভগবান গৌতম বুদ্ধের আগমন হয়েছিল। তিনি ধ্যান করতেন, শিষ্যদের সাথে মতবিনিময় করতেন এখানে এক আম গাছের নিচে। এখানেই পরে স্তূপা তৈরি হয়। সবই ইতিহাসের কথা, কিংবদন্তির কথা। অনেক সময় গাইডরা একটু অতিরিক্ত বলে থাকেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তিনি কোন প্রাইভেট সংস্থার গাইড কিনা? তিনি বোধ করি আমার কথার সারমর্ম বুঝেছিলেন। বললেন, 'স্যার আমি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের স্বীকৃত গাইড এবং ইতিহাসের ছাত্র।'

আমি হেসে বললাম, 'আপনি তো ইখতিয়ার উদ্দিন খিলজিকে মোগল সিপাহসালার বানিয়েছিলেন।

ওটা ছিল আমার ভুল। অকপটে স্বীকার করলেন আমাদের গাইড। বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ থেকে বের হবার পথে তিনি নিয়ে আসলেন বিশেষ একটি প্রার্থনা ঘরে। ছাদসহ একটি প্রকোষ্ঠ। তিনি জানালেন এখানেই ছাত্রদের অধ্যয়ন পর্ব শেষে পিণ্ডদান করা হতো। আমরা আস্তে আস্তে বের হয়ে আসলাম। আসতে আসতে ভাবলাম আমাদের এ উপমহাদেশ শিল্প সাহিত্য, ধর্ম আর যুক্তিবাদে তখন যতখানি অগ্রসর ছিল তা সে সময়কার ইউরোপও ছিল না।

আবার সেই দোকানের সারির মধ্যে চলে আসলাম। খুব পিপাসা লেগেছিল। সামনের একটি দোকানে তাজা ফলের রস বিক্রি করছে। সবাই দাঁড়িয়ে প্রথমে বিশুদ্ধ মালটার রস পান করলাম। পরে মুকুল কিনল বিহারের ভেলপুরি। বহু চর্চা শুনেছি ভেলপুরির এই প্রথম খেলাম। মুড়ির সাথে চানাচুর, ছোলাবুট সিদ্ধ, শসা আর টমেটো মিক্স করে তৈরি হয় ভেলপুরি। ছিটিয়ে দেয়া হয় বিশেষ মশলাগুঁড়া। স্বীকার করতেই হবে দেখতে উপাদেয় না হলেও এটি একটি মুখরোচক খাদ্য। বেশি করে খেলে এটা দিয়েই পেটভরা যায়। পরে মাটির পেয়ালায় চা পান করে আমরা সামনে আমাদের জিপে উঠলাম। দুপুরের আহার সেরেই আমরা পাটনার উদ্দেশে রওয়ানা হবো। তবে পথে আরও দুটি জায়গা দেখে যাব। এর মধ্যে একটি হল রাজগিরী। যা একসময় অশোকের রাজধানী ছিল। এখান হতেই অশোক রাজধানী পাটালিপুত্রায় স্থানান্তর

www.pathagar.com

করেন।

আমরা জিপে বসলাম। ভিডিও আর সিডি-এর দোকানগুলো থেকে ক্রমাগতভাবে ভেসে আসছিল ত্রিপিটকের শ্লোকের আওয়াজ সাথে 'বুদ্ধাম শরনাম গচ্ছামি'। এরই মধ্য দু'বার সতেন্দ্র চালক রাজুর সাথে কথা বলে বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছিলেন।

চালক রাজু আমাদের জানালেন, 'সাহেব বলেছেন আপনাদেরকে হুয়াজাং (XUAn zang) হিউতে সাং (Hieun-t san) এর মেমোরিয়াল হলটি দেখাতে। কাছেই পথে পড়বে। রাজু আমাদেরকে চীনা পর্যটক হুয়া জাং-এর স্মৃতিতে তৈরি মেমোরিয়াল হলের পথে নিয়ে চললেন।

হুয়া জাং নালন্দাতে অবস্থান করেছিলেন ৬০৩-৬০৪ খ্রিস্টাব্দে। তিনি এখানে, নালন্দাতে, বেশ কিছু সময় কাটিয়ে ছিলেন। তার বর্ণনায় ফুটে উঠেছিল ওই সময়কার ভারতবর্ষের ইতিহাস বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার, প্রসার আর নালন্দার এই বিদ্যাপীঠের বিবরণ। তিনি চীনে ফিরে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের বিষয়ে বিবরণ দেন ওই সময়কার চীনের শাসকদের দরবারে।

আমরা মেমোরিয়াল হলের প্রধান ফটকের সামনে গাড়ি থেকে নামলাম। এখন দুপুরের বিরতি সে কারণে প্রধান ফটকটি বন্ধ। সতেন্দ্রর চটপটে চালক কাম সহযোগী রাজু প্রহরী ডেকে আমাদের পরিচয় দিয়ে সচিব সাহেবের কথা বলাতে চারিদিকে হাঁকডাক পড়ে গেল। হন্তদন্ত হয়ে প্রহরী ফটক খুলে দিলেন। দূরে এককোণায় ক্যান্টিনের পাশে বসা কয়েকজনের মধ্যে একজন কর্মকর্তা এসে অভিবাদন দিয়ে আমাদেরকে স্বাগতম জানিয়ে বললেন যে, এ সময়ে ঘণ্টা খানেক বন্ধ থাকে এ জায়গা। আমাদের সামনেই হুয়া জাং-এর বিশাল মূর্তি তার সামনে নাম লেখা। লেখা রয়েছে এখানে তার অবস্থানকাল। আমরা সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। বিশাল চত্বরের মাঝে চীনা স্থাপত্যের আদলে গড়া হুয়া জাং মেমোরিয়াল হল। আমাদেরকে ওই কর্মকর্তা জানালেন যে, এটা তৈরি হয়েছে চীনের অনুদানে। এখানে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে বৌদ্ধ ধর্মের তাত্ত্বিক শিক্ষার কেন্দ্রও গড়ে তোলা হয়েছিল। মেমোরিয়াল হলটি সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেয়া হয়েছিল ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে। এখানে হুয়া জাং-এর ভস্ম রাখা রয়েছে যা ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে দালাইলামা এবং পঞ্চম লামা তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুকে উপহার দিয়েছিলেন। এখানে আরও রয়েছে হুয়া জাং-এর চীনা ভাষায় অনুবাদ করা ত্রিপিটক। তথ্যে প্রকাশ, হুয়া জাং-এর মাধ্যমে শুধু চীনেই নয় জাপানে এবং কোরিয়ান উপদ্বীপে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার হয়েছিল।

আমরা হুয়া জাং-এর ভাস্কর্যের সামনে দাঁড়ানো। ভাবতে অবাক হতে হয় সুদূর চীন হতে ওই সময় একজন পর্যটকের ভারতে আসা এবং ফিরে যাওয়া কত না দুঃসাহসিক একটা অভিযান ছিল। হুয়া জাং ছিলেন প্রথম দিকের একজন চীনা বৌদ্ধ ধর্মযাজক,

www.pathagar.com

বুদ্ধিজীবী, অনুবাদক এবং পরিব্রাজক। হুয়া ওই সময়ে চিনের তাং রাজ্যের রাজা তাইজং-এর শাসনকালে ফাহিয়ানের ভারত ভ্রমণের বিবরণে প্রভাবিত হয়ে ভারত সফরে তেইশ বছর বয়সে বের হয়ে পড়েন। উদ্দেশ্য ছিল ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশ, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় গুরুদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের। তিনি চীন আর ভারতের সংস্কৃতিতে মেল বন্ধনের জন্য সফর শুরু করে সতের বছর পরে নিজ বাসভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৬০২ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যুবরণ করেন ৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে।

হুয়া জাং পশ্চিমে পাঞ্জাবের তক্ষশীলা এবং পূর্বে পুন্ড্রবর্ধন, বর্তমানে বগুড়ার মহাস্থান গড় পর্যন্ত সফর করেন। তাঁরই প্রদত্ত তথ্যে প্রকাশ তিনি মহাস্থান গড় হতে পাহাড়পুরের (নওগাঁও) সম্রাট অশোকের সময় নির্মিত বৌদ্ধ স্তূপা সোমাপুরা মহাভিরাতেও অবস্থান করেন। এখানে তথ্যে ভুল হতে পারে হুয়া জাং মহাস্থান গড়ে অবস্থান করেন হয়ত এ দুটি জায়গা নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। মহাস্থানগড় বিহার অশোকের সময়ের আর পাহাড়পুর, তথ্য মতে, অষ্টাদশ শতাব্দীর। এরপর আসামের গৌহাটি এবং কামরুপ কামাখ্যা ভ্রমণ করে ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে চীনে ফিরে আসেন। হুয়া জাং ৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

আমরা হুয়া জাং-এর ভাস্কর্য দেখে মেমোরিয়াল হলের পেছন দিকের প্রবেশ পথে যাবার পথে তৎকালীন ভারতবর্ষের বিশাল ম্যাপের সামনে দাঁড়ালে কর্মকর্তা আমাদেরকে হুয়া জাং-এর ভ্রমণ পথের ব্যাখ্যা দিলেন। দু'টি পথ আলাদা রংয়ে দেখানো হয়েছে। একটি ভারতে প্রবেশের অপরটি ভারতবর্ষ ত্যাগের। ম্যাপ দেখা শেষ হলে আমরা উত্তর দিকের দরওয়াজা দিয়ে ভেতরে খালি পায়ে প্রবেশ করলাম। মধ্যম সাইজের উঁচু হলঘর। পূর্ব পাশে হলঘরের মাঝামাঝি পদ্মাসনে উপবিষ্ট ধ্যানরত বৌদ্ধের বিশাল কষ্টি পাথরের মূর্তি। তারই ডান পাশে কাচের ক্যাসকেটে রাখা এই পর্যটকের ভস্ম। চারদিকের দেয়ালে কয়েকটি বিশাল চীনা পেইন্টিং। একপাশে বৌদ্ধের জীবনের বিভিন্ন সময়ের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অপরদিকে হুয়াজাং-এর সফরের বিভিন্ন পরিস্থিতির সময়কার চিত্র রয়েছে। এ সব ইতিহাসের খুঁটিনাটি শুনতে শুনতে কখন প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেল টের পেলাম না। মনে মনে ধন্যবাদ জানালাম সতেন্দ্রকে। তার কারণে এমন একটি জায়গায় আসতে পারলাম। আমি এর আগে হুয়া জাং সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানতাম না। অল্পবিস্তর ফাহিয়ান সম্বন্ধে জানতাম। কত ইতিহাস পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, অন্তত ওই সব ইতিহাস যার অংশীদার আমরা তা ঘরে বসে উপলব্ধি করা যায় না। ঘর হতে বের না হলে জীবনের অনেক অধ্যায়ই বিকশিত হয় না।

আমরা এবার ফিরতি পথে। গাড়িতে বসে ভাবছিলাম এ ইতিহাসের বহু নিদর্শন

www.pathagar.com

আমাদের দেশেও রয়েছে। কিন্তু আমরা সাধারণ পাঠক কতখানিই বা তার খবর রাখি। আমি মহাস্থানগড়ের স্তূপা দেখেছি। সেখানে হুয়া জাং-এর ভ্রমণ সম্বন্ধে তেমন কোন তথ্য পাইনি। পাহাড়পুরেও গিয়েছি। যার বিবরণ আগেই দিয়েছি। এতক্ষণে পেটে যা পড়েছিল তা হজম হয়ে গেছে। ক্ষিধের তাড়নায় রেস্টুরেন্টের খোঁজে থাকতে হবে। দুপুরের খাবারের জন্য আমাদেরকে পথে কোথাও থামাতে বললাম। মুকুল আর কামরুলকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ পর্যন্ত কেমন মনে হল।'

'আমি বিহারে থেকেছি, চাকরি করেছি কিন্তু এগুলো দেখা হয়নি। নালন্দাতেই কোনদিন আসিনি। এখানে না আসলে আর দেখা হতো না।'

মুকুলের কথার পিঠে কামরুল বলল, 'আপনার সাথে না আসলে হয়ত পাটনা থেকেই ফিরে যেতাম।'

'আমিও তোমাদের সঙ্গ আর সতেন্দ্রর সহযোগিতা পেয়ে জায়গাগুলো আনন্দের সাথে দেখলাম। একা একা এ সব জায়গা দেখতে কখনও কখনও 'বোর' হয়ে যেতে হয়। কিছুক্ষণ পর আমরা সাধারণ ধরনের একটা হোটেল কাম রেস্তোরাঁয় এসে পৌছলাম। রাজু গাড়ি থেকে নেমে পেছনের বাঁ দিকের চাকা দেখে বললেন, 'স্যার মনে হয় চাকাটা লিক করছে। আমি চাকা বদলিয়ে লিক সারিয়ে নিয়ে আসি। হয়ত ধারে কাছে কোথাও পেয়ে যাব। আপনারা খেতে খেতেই আমি চলে আসব।' অগত্যা তাকে ছেড়ে দিয়ে আমরা রেস্তোরাঁয় বসে অর্ডার দিলাম। ওয়েটার জানালেন সবজি আর ডাল ছাড়া কিছুই নেই। কারণ, দুপুরের খাবার দুটোর মধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। এর বেশি হয়ত আমরাও খেতাম না। তাই আনতে বললাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজু এসে যোগ দিলেন। তাকেসহ দুপুরের খাবার সেরে আমরা সম্রাট বিম্বিসারের রাজধানী রাজগিরীর উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। পথে যেতে রাজু জানালেন যে, রাজগিরীতে পাহাড়ের উপরে সম্রাট বিম্বিসারের কাঠের প্রাসাদ ছিল। সেখানে এখন বৌদ্ধ স্তূপা বানানো হয়েছে। এই পাহাড়ই নালন্দার সবচাইতে উঁচু জায়গা। রাজু আরও বললেন, সেখানে ক্যাবলকারে যেতে হবে, তবে ক্যাবলকার আধুনিক নয় বেশ পুরাতন মডেলের। হেঁটে উঠা যায়, তবে ঘন্টাখানেক লাগবে আর ক্যাবলকারে দশ হতে পনের মিনিট লাগবে। আরও বললেন, 'সতেন্দ্র সাহেব আপনাদেরকে ক্যাবলকারে করে নিয়ে যেতে বলেছেন।' ক্যাবলকারের কথা শুনে মুকুল বলে উঠল, 'আমি যাচ্ছিনা আপনারা যান। আমি নিচে থাকব। এ ধরনের ক্যাবল কারের কোন সেফটি নেই।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।' বলে কামরুলের দিকে তাকালাম। 'আপনি গেলে আমি যাব।' কামরুল আমার চাহনির উত্তর দিল। 'গুড' তা হলে মুকুল নিচে থেকে যাবে আমরা যাব।' আমার কথায় মুকুল একটু বিব্রত হয়ে আবার বলল, 'হ্যাঁ যদি দেখি সেফ

www.pathagar.com

আছে তাহলে আমিও যেতে পারি।

'বেশ চল ওখানে গেলেই দেখতে পারবে'। আমি মুকুলকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা রাজগিরী গ্রাম পার হয়ে ক্যাবলকার স্টেশনে পৌছলাম। রাজগিরী গ্রামটি ছোট হলেও ঐতিহাসিক। স্থানটি বিহার শরিফের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে। ছোট হলেও টুরিস্টদের পদচারণায় মুখরিত এই গ্রাম। আমরা ক্যাবলকার স্টেশনে পৌছলাম। বেশ কয়েকটি বড় বড় খাবারের দোকান। বিভিন্ন প্রকারের হালকা নাস্তা হতে সবধরনের খাবার পাওয়া যায়। আরেকটু এগুতেই টিকিটঘর। রাজুকে দিয়ে টিকিট করাবার আগে শেষবারের মত মুকুলের সিদ্ধান্ত চাওয়া হল। এবার মুকুল বলল, 'আমিও যাব। ভেবে দেখলাম সবার যা হবে আমারও তাই হবে।' আমি বললাম, 'মুকুল টিকিটের লাইন দেখ আর ক্যাবলকারের সামনে লাইন দেখ শত শত লোক দাঁড়ানো। যদিও ক্যাবলকার প্রথম যুগের তবুও নিরাপদ না হলে এই বাচ্চা বুড়ারা এখানে এভাবে কষ্ট করত?'

'সে জন্যই আমি মত পরিবর্তন করলাম।' মুকুল একটু সাহসী হয়ে উঠলো। ক্যাবলকারের প্রযুক্তির বিষয়টা আমলে নিলে একটু ভয় পাবার কথাই। মোটেও আধুনিক প্রযুক্তি নয় বরং বেশ সেকেলে। সিঙ্গেল স্টিলের চেয়ার ক্যাবলের সাথে যুক্ত। স্টেশন হতে এক প্রকার দৌড়ে বসতে হয়। বসবার সাথে সাথে সামনে একটি লৌহবার লাগিয়ে দেয়া হয় যাতে পড়ে না যায়। চেয়ারটি উন্মুক্ত। পা রাখবার ছোট একটি লোহার বার রয়েছে মাত্র। চলবার সময় দোলনার মত দুলতে থাকে। ক্যাবলকার না বলে ক্যাবল চেয়ার বললেই বোধহয় শ্রেয়।

যাই হোক, লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এক এক করে চেয়ার ল্যান্ডিং স্টেশনে আসছে আর লাফিয়ে লাফিয়ে দর্শনার্থীরা উঠছে। ঘূর্ণায়মান ক্যাবল চেয়ার অনবরত উপর থেকে যাত্রীদের ফেরত নিয়ে আসতে আর সমান্তরাল ক্যাবলে উপরে উঠবার যাত্রীরা রওয়ানা হচ্ছে। আমার সামনের চেয়ারে কামরুল আর আমার পরের চেয়ারে মুকুল। আমি পা লটকানো অবস্থাতেই আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলাম। আমি কয়েকটি দেশে ক্যাবলকারে চড়েছি, কিন্তু এ ধরনের মান্ধাতার আমলের ক্যাবল চেয়ারে এই প্রথম অভিজ্ঞতা। কিছু শংকাতো ছিলই তবুও সাহসী থাকবার চেষ্টা করলাম।

ক্রমেই চেয়ার রাজগিরী পাহাড়ের সুউচ্চ চূড়ায় উঠতে লাগল। একটু ভয় যে লাগছিল না তেমন নয়। তবুও চারদিকে দেখছিলাম। দু'পাহাড়ের মাঝামাঝি পার হবার সময় নিচে দেখলাম প্রায় হাজার খানেক ফুটের খাদ। ডান পাশে দূরে বিশাল মন্দির চত্বর। এটি অন্যতম বৃহত্তম জৈন মন্দির। চারিদিকে সবুজ বনরাশি। আমাদের চেয়ার কার ধীরে ধীরে বৌদ্ধ স্তূপার দিকে উঠছিল। পাহাড়ের চূড়ায় শুভ্র বৌদ্ধ স্তূপা, এর নাম শান্তি স্তূপা। আগেই বলেছি পাটালিপুত্রার পূর্বে এ জায়গাই ছিল মগধের রাজধানী

www.pathagar.com

রাজগিরী।

আমরা প্রায় পনের মিনিট পর শান্তিস্তূপায় পৌঁছলাম। রানওয়ে বা ক্যাবল চেয়ারের এ ধারের স্টেশন হতে প্রায় পঞ্চাশ ধাপ উপরে উঠতে হল স্তূপার চত্বরে পৌঁছতে। শীতের পড়ন্ত বেলা সূর্যের রশ্মি স্নিগ্ধ হয়ে আসছে। বাতাসে কিছুটা কনকনে ভাব। নিচে রাজগিরী বা রাজগীর গ্রাম। এটাই পুরাতন গ্রাম। তথ্যে প্রকাশ, এখানে গৌতম বুদ্ধ বহু সময় কাটিয়েছেন। এখানে বুদ্ধ হিতোপদেশ দিয়েছেন, এমনকি সম্রাট বিম্বিসারকে শিষ্যও বানিয়েছিলেন। ওই গ্রামের কোথাও বুদ্ধকে তার ভাই দেবদত্ত আহত করবার পর বৈদ্য জিভাক তার চিকিৎসা করেছিলেন। জিভাক, বিম্বিসার এবং অজাতশত্রুর ব্যক্তিগত চিকিৎসকও ছিলেন।

এখানেই বুদ্ধের বাণী লিপিবদ্ধ করা হয়। এখানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রথম সমাবেশ হয়েছিল।

আমরা অনেকক্ষণ রাজগিরীর শান্তি স্তূপাতে কাটালাম। বহু পর্যটক, বেশিরভাগই ভারতীয় নর-নারী এবং শিশু। এদের মধ্যে অনেকেই এসেছে জৈন মন্দিরে প্রার্থনা করতে। বেশ কিছু জাপানী টুরিস্টকে দেখলাম। এই স্তূপাটি তৈরি হয়েছিল জাপানী বুদ্ধ সংঘের অনুদানে।

স্তূপার চার কোণায় বুদ্ধের চারটি মূর্তি বসানো। উত্তর পাশে একটু উঁচু পাথরের সারি। কিছুটা দেয়ালের মত। পাথরগুলো আরেক পাশে একটি প্রার্থনা ঘরের মত। প্রচুর ভক্তের আনাগোনায় মুখরিত জায়গাটা। প্রার্থনা ঘরের ভেতর থেকে ত্রিপিটক পাঠের আওয়াজ আসছিল। আসছিল অষ্ট ধাতুর ঘণ্টার আওয়াজ। একটু সামনে গিয়ে তথ্যলিপিতে এই জায়গার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পড়লাম। বৌদ্ধ ধর্মের পবিত্র জায়গা এটি। এখানে পদচারণা হয়েছিল গৌতম বুদ্ধের। একবার নয় বহুবার। ঐখানেই গৌতম বুদ্ধ জীবন চক্রের দ্বিতীয় চাকা স্থাপন করেন। এ কারণে তিনি তিন মাস এখানে অবস্থান করেন। ওই জায়গাটিতে এই প্রার্থনা ঘর। এটি তৈরি করে দিয়েছে জাপানের বৌদ্ধ সংঘ। আমি ফলক পড়ে এতক্ষণে জানলাম এ জায়গার নাম গ্রীধকুত (Griddh koot) পাহাড়ের চূড়া, রাজগীর পাহাড়ের একাংশ। এ সব এলাকাই ছিল মৌর্য সাম্রাজ্যে মগধের সবচাইতে বর্ধিষ্ণু অঞ্চল। ছিল রাজধানী। সম্রাট বিম্বিসার ছিলেন গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক। তার সময়েই গৌতম বুদ্ধ এসব অঞ্চল হতেই বুদ্ধের বাণী ছড়াবার প্রয়াস নেন।

সম্রাট বিম্বিসার, ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথম স্বীকৃত শাসক। তাঁর রাজত্ব কালছিল ৫৪৪-৪৯৩ খ্রিস্টপূর্বে। তিনি হারিআঙ্কা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসের মাধ্যমে পাওয়া যায়। তার প্রতিষ্ঠিত মগধ রাজ্যের রাজধানী ছিল রাজগীর। এই বিম্বিসার-এর পুত্র হলেন অজাতশত্রু যিনি নতুন শহর পাটালিপুত্রা

www.pathagar.com

(বর্তমানের পাটনা)-এর পত্তন করেন। অজাতশত্রু অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন ক্ষমতায় আরোহণের জন্য-এ কারণেই বৃদ্ধ পিতাকে বন্দি করেন। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার নিচের গ্রামের কোথাও পিতারই তৈরি বন্দিখানা রেখেছিলেন। পিতা বিম্বিসার-পুত্র অজাতশত্রুর নিকট একমাত্র প্রার্থনা ছিল যে তাকে এমন জায়গায় রাখা হোক যেখান থেকে তিনি গৌতম বুদ্ধকে এ পাহাড়ে চড়তে দেখতে পান। আমি এখানের এক দর্শনার্থীর সাথে আলাপকালে জিজ্ঞাসা করেছি এ সব জায়গা আছে কিনা বা যাওয়া যায় কিনা। তিনি বলেছিলেন যাওয়া যায় তবে বিশাল পাথর ছাড়া আর কিছুই নেই।

সম্রাট বিম্বিসার পুত্রের হাতে বন্দি হয়ে অপমানের জ্বালায় ওই সময় আত্মহত্যা করেন, যখন পুত্র অজাতশত্রু পিতাকে অপমান করবার অনুশোচনায় ভুগছিলেন।

পিতাকে বন্দি করার মধ্য দিয়ে অপমান করার পর অজাতশত্রুর মন শান্ত ছিল না। তিনি অনুতপ্ত বোধ করছিলেন। অবশেষে যখন পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে মনস্থির করেন সে সময়েই পিতা বিম্বিসার আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার সময় তিনি এই মগধেই পুনর্জন্ম নেবেন বলে তার ইচ্ছা প্রকাশ করে যান। জানি না তিনি পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিনা। তবে বিম্বিসারের আত্মহত্যার প্রায় দু'হাজার বছর পর পুত্রের হাতে আরেক সম্রাট আমৃত্যু বন্দি ছিলেন। তিনি ছিলেন মোগল সম্রাট শাহজাহান। পুত্র আওরঙ্গজেবের হাতে আট বছর বন্দি। বন্দি অবস্থাতেই মারা যান। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত তাজমহল দেখে কাটিয়েছেন। কি অদ্ভুত মিল। ইতিহাসে বিরল।

বিম্বিসারের পরে মগধ শাসন করেন অজাতশত্রু। তিনিও বুদ্ধের সমসাময়িক সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারে যুক্ত ছিলেন। প্রথম জীবনে অজাতশত্রু ছিলেন উগ্র। পিতার মৃত্যু, অজস্র যুদ্ধ বিগ্রহে ক্লান্ত অনুতপ্ত অজাতশত্রু খোঁজেন শান্তি। অবশেষে তিনি হিংসার পথ ছেড়ে গৌতম বুদ্ধের নিবেদিত শিষ্য হিসাবে ধর্ম প্রচারে বহু বৌদ্ধ বিহার আর স্তূপা তৈরি করেন। তিনিই বুদ্ধের দেহাবশেষের উত্তরাধিকারী হন। তার উদ্যোগে প্রথম বৌদ্ধ মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অজাতশত্রুর হাতেই পাটালিপুত্রার গোড়াপত্তন হয়। অজাতশত্রুও তারই পিতার মত পুত্র উদয় ভাদরারের হাতে নিহত হন ৪৫৯ খ্রিস্টপূর্বে। অজাতশত্রুর দুর্গের কিছু অংশ নালন্দা-বিম্বিসার রাস্তা থেকেই দেখা যায়। আমরা সেই রাস্তা দিয়েই পাটনাতে ফিরব।

সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে। আলোর তেজ কম হয়ে আসছে। আমরা ফিরতি পথ ধরলাম। উপর থেকে নেবে ক্যাবলচেয়ার স্টেশনে পৌছলাম। উপর থেকেই দেখা যাচ্ছে সারি সারি চেয়ার দর্শনার্থীদের নিয়ে নেমে যাচ্ছে। নামবার সময় হয়ত অতটা আড়ষ্ট হবে না। তবে চেয়ারে উঠবার কসরত নিয়ে ভাবতে হল। কারণ, আমার সামনের কয়েকজন সঠিকভাবে উঠতে পারেনি বলে চেয়ার চলাচল অল্প সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্টেশনের ছাদে সামনের খুঁটির উপরে বেশ কয়েকটি হৃষ্টপুষ্ট

www.pathagar.com

হনুমান বসা। নির্লিপ্ত কিছু চিবুচ্ছে। আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু ভক্তদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে বিনম্রচিত্তে প্রণাম করতে দেখলাম। হিন্দু ভক্তদের কাছে হনুমান পূজনীয় অবশ্যই। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা তিনজনে পর পর তিনটি চেয়ারে দৌড়ে বসে পড়লাম। চেয়ার তিনখান আমাদেরকে নিয়ে প্রায় পাঁচশত মিটার উঁচু পাহাড়ের চূড়া হতে সমতলের দিকে নিয়ে চলল।

নামতে নামতে হাতের ডানে ছোট একটি গ্রাম যার পাশে বেশ বড় বড় পাহাড়ী পাথরের বেষ্টনী। তথ্যে প্রকাশ এ পাথরগুলো মৌর্য সাম্রাজ্য স্থাপনার পূর্বের দেয়াল ছিল। দেয়ালটি ছিল প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার লম্বা রাজগীর শহরের প্রতিরক্ষার ব্যূহ হিসাবে। আমি নিচের দিকে তাকালাম। মনে হল পাহাড়ের কোলে দণ্ডায়মান গাছগুলোর উপর দিয়ে আমি উড়ে চলছি। ভালই লাগছিল। এ এক অপূর্ব অনুভূতি। আমার পেছনের চেয়ারে মুকুল। উচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করলাম ভয় লাগছে নাকি? উত্তর দিয়ে মুকুল বলল 'একবার যখন উপরে উঠেছি নামতে তো হবেই।'

আমরা নিচে নেমে আসলাম। গাড়িতে বসলে রাজু মোবাইল করে সতেন্দ্রকে জানালেন যে আমরা রাজগীর ছাড়ছি। সময় তখন পড়ন্ত শীতের বিকেল। সামান্য ঠাণ্ডা হাওয়া চলছে। আমরা ছোট রাস্তা ছেড়ে যখন স্টেট রোডে আসলাম তখন অন্ধকার হয়ে আসছে। রাস্তায় তখন অজস্র গাড়ি। রাজু নিজগতিতে পাটনার দিকে রওয়ানা হলেন। প্রায় দেড়ঘণ্টা পরে আমরা আমাদের হোটেল চানক্যতে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা প্রায় সাতটা। গোসল সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। সতেন্দ্র অফিস শেষ করে কামরুলের রুমে আসলে সেখানে গেলে প্রথমবারের মত দেখা হল রামা শংকর প্রাসাদের সাথে, তিনিই পাটনায় আমাদের মেহমানদারি করছেন। অল ইন্ডিয়া ফেন্সিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক। ভদ্রলোক এখানে আমাদের হোস্ট। হোটেল ব্যবস্থা তিনিই করেছেন। সে কথা আগেও বলেছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে ধন্যবাদ জানালে তিনি বিনয়ের সাথে বললেন, নেহী স্যার হাম আপলোগোকে লিয়ে কুছ নেহী কিয়া। সেক্রেটারি সাহাবনে আজ আপকো গাড়ি দিয়া। হামারা গাড়ি ভি তৈয়ার থা।'

মি. রামা শংকর প্রসাদ বিহারের বাসিন্দা। তার নিজের ডিস্টিলারি এবং বিতরণ সংস্থা রয়েছে। একজন সফল ব্যবসায়ী। আলাপে মনে হল এখানকার উচ্চপর্যায়ের রাজনীতিবিদ এবং আমলাদের সাথে যথেষ্ট সখ্যতা রয়েছে। যদিও সতেন্দ্রর সাথে তার এই প্রথম পরিচয়। সতেন্দ্র অত্যন্ত নির্লিপ্ত মানুষ হয়ত সে কারণেই এ ধরনের লোকের সাথে তার তেমন পরিচয় নেই বলেই মনে হল।

রামা শংকর প্রসাদ আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আপনাকে আমরা এ রাজ্যের সরকারি অতিথি করবার চিন্তা করছিলাম পরে সচিব সাহেব মানা করলেন। আমি তো মুখ্যমন্ত্রীজিকে আপনার আগমনের কথা বলতে চেয়েছিলাম। তবে স্যার, আপনি

www.pathagar.com

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে অবশ্যই দেখা করবেন আমি এক্ষণি ব্যবস্থা করছি।'

আমি কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, 'প্রসাদজি আমি একেবারেই ব্যক্তিগত সফরে বন্ধুদের সাথে প্রথমবারের মত বিহারে এসেছি। এভাবে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করা ঠিক হবে না।'

আমার কথা শেষ হবার আগেই প্রসাদ মোবাইলে কারও সাথে বললেন, 'মুখ্যমন্ত্রী পাটনাতে আছেন?' অপর প্রান্ত থেকে কি উত্তর আসল জানলাম না কিন্তু প্রসাদ নিজেই বললেন 'আচ্ছা উনি নেই? হায় হায় আর লালুজি আছেন। আমার বাংলাদেশি মেহমানরা লালুজির সাথে দেখা করবেন। ক্যায়া উহ দিল্লী মে হ্যায়?'

এ যেন নিজের সাথেই কথা বলছেন। প্রসাদ মোবাইল ছেড়ে বললেন, 'স্যার দুঃখিত, দু'জনের কেউই পাটনায় নেই।'

আমি মুচকি হাসলাম। সতেন্দ্রর দিকে তাকালাম তার মুখেও এক চিলতে অর্থবহ হাসি। যা বুঝবার বুঝে নিলাম। প্রসাদ হয়ত আমাদেরকে তার প্রভাবের যৎসামান্য পরিচয় দিতেই এত কিছু করছিলেন। এতদিনে আমাদের দেশে আমি এ রকম দেখে অভ্যস্ত।

এবার প্রসাদজি বললেন, 'স্যার কেমন মনে হল পাটনা আর বিহার?'

আমি বললাম, 'যা এতদিন শুনেছি আর ডালরিম্পলের বর্ণনায় পড়েছি তার উল্টো চিত্র দেখলাম।'

'দশ বছরে নিতিশ কুমারজি বিহারের চেহারা পাল্টিয়ে দিয়েছেন।' প্রসাদজি বেশ গর্বের সাথেই বললেন।

'জি! আমি ট্রেনে এরকমই শুনেছি।'

এবার সতেন্দ্র বললেন, 'হ্যাঁ এটা ঠিক। আমি এর আগেও বিহারে ছিলাম।

সেই বিহার আর আজকের বিহার এক নয়।'

আমিও ভাবছিলাম একজন শীর্ষনেতা সঠিক নেতৃত্ব দিলে অল্প সময়েই একটি দেশ বা একটি রাজ্যের চেহারা বদলিয়ে দিতে পারেন।

'স্যার বিহার একসময়ে ছিল গুণ্ডা রাজ আর প্রাইভেট বাহিনীর স্বর্গরাজ্য। দশবছরে আশি হাজার গুণ্ডা আর দুষ্কৃতকারী জেলে গিয়েছে। প্রাইভেট বাহিনী বিলুপ্ত করা হয়েছে। এই পাটনায় সন্ধ্যার পর মহিলারা বের হতেন না। এখন দেখুন রাতেও মহিলারা স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করছেন।' প্রসাদ একগাদা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। আমরা মুগ্ধ শ্রোতার মত তার কথা শুনলাম।

'কাল সকালে আপনারা গয়া যাচ্ছেন। আমি গাড়ি যোগাড় করে রেখেছি।' বললেন

www.pathagar.com

প্রসাদ।

আমরা তাকে ধন্যবাদ জানালাম। মুকুল বলে উঠল, 'প্রসাদজি আমার তো মনে হয় পশ্চিম বাংলার চাইতে বিহার এগিয়ে গিয়েছে।

প্রসাদ বললেন, 'আমারও এমনই মনে হয়।'

রাত বেশ হয়ে গিয়েছিল। দিনের ক্লান্তি আর পেটের ক্ষিধের কারণে আসর ভাঙতে হল। আজ আর বাইরে নয় হোটেলের রেস্তোরাঁইতে খাবার জন্য আমরা আসর ছেড়ে উঠলাম। প্রসাদকে আমাদের সাথে খেতে বললাম। তিনি জানালেন কাল সকালেই তিনি দিল্লী যাবেন। তাই আমাদের সঙ্গ দিতে পারছেন না বলে দুঃখিত। আমরা প্রসাদকে এক পশলা ধন্যবাদ জানিয়ে রেস্তোরাঁর দিকে রওয়ানা হলাম। সতেন্দ্রও আমাদের সাথে রাতের খাবারে যোগ দিলেন।

আগামীকাল আমরা বুদ্ধগয়াতে যাব। পরের দিন সন্ধ্যায় গরিব রথে কলকাতায় ফিরব। সতেন্দ্রর দু'দিনের ছুটি। কাজেই তিনিও আমাদের সফর সঙ্গী হবেন আর পরের দিন ট্রেনে উঠিয়ে দেয়া পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন। আর সকালে সতেন্দ্র আমাদের সাথে প্রাতঃভ্রমণে যাবেন। সতেন্দ্র ঢাকাতেও গুলশান পার্কে প্রতিদিন হাঁটতেন। এখানেও প্রতিদিন সকালে প্রাতঃভ্রমণ জারি রেখেছেন। রেস্তোরাঁতে অনেক গল্প হল। ঢাকার স্মৃতি রোমন্থন হল। আলোচনা হলো সতেন্দ্র-র দিল্লী বদলি হয়ে যাওয়া আর আমাদের আজকের অভিজ্ঞতার।

রেস্তোরাঁয় খাবার শেষ করে যে যার রুমে চলে আসলাম। লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। কাচের বিশাল জানালার একপাশ পর্দা গুটানো। বাইরের আলো রুমে এসে পড়ছে। বাইরে পাটনা শহরের বাতি জ্বল জ্বল করছে। দূরে নিয়ন বাতির হোর্ডিং একবার নিভছে একবার জ্বলছে। বিহারে কোন লোডশেডিং এ পর্যন্ত দেখিনি। সকালে উঠতে হবে। সকালে হাঁটবার কাপড় চোপড় বের করাই ছিল। ঢাকার গুলশান লেক পার্কের আলমের দেয়া প্রাতঃভ্রমণের ট্রাউজার বের করতেই আলমের কথা মনে পড়ল। আমাদের সাথে আলম থাকলে ভালই হতো। কিন্তু ভদ্রলোক নিজের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত যে ইচ্ছা থাকলেও বাইরে বেড়াবার জন্য আমাদের সঙ্গ দিতে পারেন না।

ইতিমধ্যেই বাসায় কয়েকবার কথা বললাম। আজকের অভিজ্ঞতা আর রাজগীরের ইতিহাস ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে গেলাম।

www.pathagar.com

এগার

'বুদ্ধাম শরনাম গচ্ছামি'

সকালে মুকুলের ফোনে ঘুম ভাঙল। বাইরে তখনও অন্ধকার। মুকুল জানালো সতেন্দ্র নিচে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তারা দু'জন তৈরি হচ্ছে আমি তৈরি হয়ে নিচে আসলেই প্রাতঃভ্রমণে যাবে। আমি তাড়াতাড়ি বাথরুমের কাজ সেরে নামাজ পড়ে তৈরি হয়ে নিচে আসলাম। সবাই নিচে লবিতে। রিসিপশনে একজন ডেস্কের পেছনে ঢুলুঢুলু চোখে তখনও ঝিমুচ্ছে। গেটের কাছে গেটম্যান টুলে বসা। আমরা বের হতেই উঠে দাঁড়ালো বলল, 'গুড মর্নিং সাহেব।' আমরা তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সতেন্দ্রর গাড়িতে চড়ে পাটনার চিড়িয়াখানা এবং বোটানিক্যাল গার্ডেনে পৌঁছলাম। ততক্ষণে দিনের আলো ফুটে উঠেছে। বেশ বড়োসড়ো পাটনা বোটানিক্যাল গার্ডেন। শীতকাল কাজেই গাছের পাতা কিছুটা বিবর্ণ। প্রচুর গাছ আর তার ফাঁকে চিড়িয়াখানার জন্তু জানোয়ারের খাঁচা। মনে হল তখনও বেশির ভাগ জন্তুর ঘুম ভাঙেনি।

পায়ে হাঁটা পথে প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর সতেন্দ্র আমাদেরকে বিশাল গাছের উপরে গাছঘর দেখিয়ে বললেন এটি হানিমুন কটেজ। এখানে দু'টি রুম রয়েছে। এতে রয়েছে বাথরুম আর ছোট একটি কিচেন। দেখলাম তাই। পানি উপরে উঠাবার মেশিন আর পাইপ। সতেন্দ্র বললেন যে, তিনি বহু বছর পূর্বে যখন বিহারে ছিলেন এখানে সস্ত্রীক একরাত কাটিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলাম এ জায়গা রাতে কতখানি নিরাপদ। তিনি জানালেন যে, এখানে বহু নৈশ প্রহরী বিশেষ করে সশস্ত্র ফরেস্ট গার্ড নিয়োজিত থাকে তাই নিরাপত্তার অভাব নেই। ততক্ষণে দেখলাম প্রচুর স্বাস্থ্য সচেতন নর-নারী হাঁটতে এসেছেন। সতেন্দ্র জানালেন সকাল নয়টা পর্যন্ত প্রাতঃভ্রমণের জন্য উন্মুক্ত থাকে। পরে টিকেট কেটে চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করতে হয়। পরে আমরা বোটানিক্যাল গার্ডেনের রেস্ট হাউসে চা খেয়ে হোটেলে ফিরলাম। সকাল দশটায় বুদ্ধগয়ার দিকে যাত্রা করব। পৌছতে দু'ঘণ্টা সময় লাগবে। দুপুরে সেখানে খাবার সেরে পাটনায় ফিরব।

আমরা, সতেন্দ্রসহ নাস্তা করে প্রায় দশটার দিকে মি. প্রসাদের প্রেরিত জিপ নিয়ে বুদ্ধগয়ার দিকে রওনা হলাম। বুদ্ধগয়াতেই (বৌদ্ধদের তীর্থস্থান) বোধি বৃক্ষের নিচে আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে গৌতম বুদ্ধ নির্মোহ লাভ করেছিলেন। সেখান

www.pathagar.com

থেকে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধে পরিণত হন। বুদ্ধগয়ার সাথেই প্রায় লাগোয়া হিন্দুদের অন্যতম পবিত্র তীর্থস্থান 'গয়া'। দুটো জায়গাই ফল্গু নদীর তীরে এবং গয়া শহর সংলগ্ন। বুদ্ধগয়াতে প্রতিদিন ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে তীর্থযাত্রী ও পর্যটকরা ভিড় করেন। অপরদিকে গয়াতে হিন্দু তীর্থযাত্রী আর পর্যটকদের ভিড় লেগেই আছে। এ কারণেই গয়া শহরটি ভারতের অন্যতম তীর্থশহর বলে গণ্য করা হয়।

আমরা আমাদের গাড়ির চালকের সাথে পরিচিত হলাম। সুঠাম দেহী। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। স্থানীয় বাসিন্দা, তাই রাজনীতি আর বিহারের ভৌগোলিক অবস্থান কিছু ইতিহাসের বিষয়ে বেশ সচেতন। অনর্গল কথা বলতে ভালবাসেন। নাম সঞ্জিব। জিপ চলতেই ক্যাসেটে হিন্দী সঙ্গীত ছেড়ে দিলেন। একবার সতেন্দ্র বন্ধ করতে বললে অল্পক্ষণের জন্য বন্ধ করে পুনরায় চালু করলেন। আমি সামনের কো-ড্রাইভারের সিটে পেছনে তিনজন। আমরা গঙ্গানদী বরাবর ন্যাশনাল হাইওয়ে ৩০ ধরে শহরের উদ্দেশে বের হলাম। সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে স্টেট হাইওয়ে ২ দিয়ে স্টেট হাইওয়ে ৬৯ ধরলাম।

রাস্তাটি কয়েক বছর আগে সংস্কার করা হয়েছে। কোথাও কোথাও উঁচু নিচু হলেও মোটামুটি মসৃণ। রাস্তার দু'পাশে বিস্তীর্ণ ক্ষেত।

বেশিরভাগ ক্ষেতেই অড়হর, মসুর ডাল আর সরষের আবাদ। কোথাও কোথাও শীতকালীন সবজি যা সচরাচর শীতে আমাদের দেশেও চাষ হয়। দূরে গ্রাম তবে বেশ ফাঁকা। তেমন শ্যামল নয়। কাঁচা, পাকা গ্রাম্য বাড়ি। প্রতি বাড়িতেই পোষ্য পশু। বেশির ভাগ মহিষ তবে মাঝে মধ্যে বৃহদাকারের গরু ঘরও দেখা যায়। রাস্তাটি এঁকে বেঁকে মাঝে মধ্যে ছোটখাটো বাজারের মধ্যদিয়ে চলে গেছে। আমরা পাটনা হতে দক্ষিণ দিকে চলছি। গয়া এবং বুদ্ধগয়া পাটনা থেকে প্রায় একশত কিলোমিটার দক্ষিণে।

আমাদের গাড়ি চালক সঞ্জিব বেশ কথা বলতে পারেন। তার কথাবার্তায় মনে হল তিনি রাজনীতি নিয়ে বেশ মাথা ঘামান। এ পর্যায়ে তিনি বললেন, 'স্যার এই যে রাস্তা দেখছেন পাঁচ বছর আগেও রাস্তাটা এত ভাল ছিল না। আমরা এ রাস্তায় গাড়ি চালাতেই চাইতাম না। দু'ঘন্টার রাস্তায় প্রায় তিন ঘণ্টা লেগে যেত।' অনবরত বলেই চলেছেন নিতিশ কুমারের গুণগান আর লালু প্রসাদের গুণ্ডা রাজের কাহিনী। এ সময় আমরা ছোট একটি গ্রাম্য বাজারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। দু'পাশে গ্রামের কাঁচা বাজারসহ অন্যান্য মনোহরী দোকান। কাঁচাবাজার খুলেছে। অন্যান্য দোকানগুলো খুলি খুলি করছে। দু'পাশে বাড়িঘর, বেশির ভাগ মাটির তৈরি। মাটির দেয়ালে গোবরের টিকা। শুকাতে দেয়া হয়েছে । ব্যবহার হবে জ্বালানি হিসাবে। বহু আগে আমাদের দেশের গ্রামেও এ চিত্র দেখা যেত। এখন অনেক কমেছে। 'স্যার ইয়ে গাও দেখ রাহে হ্যায়? এ গ্রামটি

www.pathagar.com

ছিল মাওবাদীদের আখড়া।' আমি বললাম, বলেন কি? পাটনা শহরের এত কাছে?

'জ্বি হুজুর।' এখানে দিনের বেলাও পুলিশ আসতো না। আর এখন দেখেন আমরা দিব্যি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি। কত ট্যুরিস্ট এখন এ রাস্তায় যাতায়াত করছে!

আমি বললাম, 'এখন কিভাবে সম্ভব হল। বিহারের পুলিশ চরিত্র বদলালো কিভাবে?'

সঞ্জিব বললেন, 'স্যার নিতিশ কুমারের সরকার আসার পর পুলিশে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বহু পুলিশ চাকরি হারিয়েছে। অদক্ষ অফিসারদের প্রমোশন বন্ধ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে মাসের পর মাস পুলিশের সাথে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন (নিতিশ কুমার) 'মরো ইয়া মারো' (মর না হয় মারো)। মাওবাদীদের সোজা পথে আসতে সময় দিয়ে অভিযান পরিচালনা করেছেন। বাস সাফ হো গ্যায়া।'

আমি বললাম, 'এখন কি পুলিশ উচ্চবর্ণের ঠাকুরদের প্রাইভেট বাহিনীর সাথে বন্দুক যুদ্ধে লিপ্ত হয়।'

'নেহী স্যার এখন তো ওই রকম নেই। এটা বেশি ছিল লালুর সময়। লালুতো 'যাদব' নিচ জাতের ছিলেন তাই এ সব উচ্চবর্ণের লোকেরা তাকে পরোয়া করতো না। আমি কি যাদবদের সাথে কখনও একসাথে খানা খাব? মোটেই না।'

আমি বললাম, কিন্তু লালু রাবরী (লালুর পত্নী রাবরী নিজেও মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন) যখন মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য যাদবরা ওই সময়ে ক্ষমতায় ছিল তখন কি উচ্চবর্ণের লোকেরা তাদের কাছে কাজে যেত না?'

সঞ্জিব বললেন, 'জি অফিসে মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী হতে পারে কিন্তু নিজের গ্রামে অথবা অন্যান্য গ্রামে উচ্চবর্ণের মানুষ এদের ছায়াই মাড়াবে না।'

বুঝলাম বিহারে যাতপাতে বিভেদ অত্যন্ত প্রকট। আরও আধাঘন্টা চলার পর আরেকটি গ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। গ্রামের মাঝখানে একটি সরু খাল। এখন অবশ্য পানি কম। খালের দু'পাড়েই গ্রামের সীমানায় বিস্তীর্ণ চাষাবাদ। খালের অপর প্রান্তে বেশ কিছু উঁচু দেয়াল দেয়া পাকা বাড়ি। মনে হল অবস্থাসম্পন্ন লোকের বাস হবে। গ্রাম ঠিক বলা যায় না। বেশ দূরেও একটা ছোট শহরের মত। খাল পার হতে হতে সঞ্জিব বললেন, 'স্যার এটা জাহানাবাদ ডিস্ট্রিক। এক সময়ে গয়া ডিস্ট্রিকের অংশ ছিল। এখন আলাদা ডিস্ট্রিক্ট হয়েছে। আপনি রনভীর সেনার কথা বলেছিলেন। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে রাবরী দেবীর রাজত্বে এখানে যে হত্যাযজ্ঞ হয়েছে সেটা নিয়ে দিল্লীতে ওই সময়কার কংগ্রেস এবং লালুর আরজেডি-এর সাথে কোয়ালিশনের সরকার পতনের মুখে ছিল। সঞ্জিব তার বক্তব্য অব্যাহত রেখে ঘটনার বিস্তারিত বলে চললেন আর আমরা শুনছিলাম।

www.pathagar.com

'স্যার যে গ্রাম আমরা ওপারে ছেড়ে এসেছি ওটার নাম লক্ষ্মীপুর বাথ গ্রাম। কসবা শংকর বিগা, নারায়ণপুর। এ পাড়ে দলিতদের বাস। এখানকার জমিগুলো এরাই চাষ করতো। জানুয়ারি ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের সকালে সরিষা ক্ষেতে বাচ্চারা খেলা করছিল। ওপার থেকে কিছু সংখ্যক একই বয়সের উচ্চবর্ণের বাচ্চারা এসে এদের বাধা দিয়ে বলে এ জমি তাদের ঐখানে দলিতদের থাকতে দেয়া হবে না। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে দলিতদের বাচ্চারা বেদম প্রহার করে শংকর বিগার সিংদের বাচ্চাদের। ওরা দৌড়ে পালিয়ে যায়। সারাদিনে আর কোন ঘটনা ঘটেনি।'

আমি বললাম, 'মুকুল শুনছ। সতেন্দ্র তুমি জানতে।'

'হ্যাঁ, জানতাম তবে ডিটেল জানি না।' সতেন্দ্র বললেন। মুকুল বলল– 'আমি কোথা থেকে জানব!'

আমি সঞ্জিবকে বললাম, 'তারপরে কি হল?'

সঞ্জিব যেখানে থেমেছিলেন সেখান থেকে শুরু করে বলতে লাগলেন, দিনে কিছু হল না কিন্তু স্যার রাত দুপুরে যখন সমগ্র গ্রাম ঘুমে, সে সময়ে হঠাৎ একশত হতে দেড়শত রনভীর সেনার দল সমস্ত গ্রাম ঘেরা দিয়ে লুটপাট, বাচ্চা হতে বুড়ি মহিলাদের ধর্ষণ আর গুলি করে হত্যা করে। গ্রামের বহু ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। হত্যা করে প্রায় অর্ধশতাধিক আবাল বৃদ্ধ বণিতাকে। 'সারা গাও শ্মশান বনগিয়া থা।' সমস্ত গ্রাম খালি হয়ে যায়। দলিতরা পুলিশের কাছে গিয়েও প্রতিকার পায়নি। পুলিশ আসে পরেরদিন দুপুরে। উল্টা পুলিশ রিপোর্টে কাহিনী লিখল যে, এই গ্রামে সবছিল নক্সালাইট আর নাক্সালাইটদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে জাহানাবাদের মানুষ আক্রমণ করে দু'পক্ষের গোলাগুলিতে এ সব নক্সালাইটরা মারা যায়। সঞ্জিব দূরে আমাদের দেখিয়ে বললেন যে ওইদিকে জাহানাবাদ শহর। আমি বললাম, 'তারপরে কি হল?' রাবরী দেবী জানতে চাননি এত বড় হত্যাযজ্ঞ তাও দলিতদের? আরজেডি (RJD) তো দলিতদেরই দল?'

'আরে স্যার রাবরী দেবী পুলিশকে কি বলবেন। ওনার ভাই আর পাপ্পু যাদব উচ্চবর্ণের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতড়িয়েছেন। পুলিশ চলত পাপ্পু যাদবের ইশারায়। পাটনা শহরে সুন্দরী যুবতী ঘরের বের হলেই কিডন্যাপ হয়ে যেত। কিডন্যাপাররা সোজা পাপ্পু যাদবের বাড়িতে নিয়ে যেত পুলিশের সাধ্য ছিল না উচ্চবাচ্য করবার।'

আমি হা করে শুনছিলাম, কারণ লালুর অনেক কীর্তিই টেলিভিশন আর ভারতীয় সাময়িকীতে পড়েছি, কিন্তু এ ধরনের জঙ্গলরাজ ছিল তা ভাবতেও পারিনি। ভারতীয় রেলওয়ের উন্নতির কৃতিত্বও আমি মনে করতাম লালু যাদবের। এখনতো সরজমিনে শুনছি অন্য কথা। পুরো ঘটনাই শুনলাম। সঞ্জিব আরও বললেন, 'স্যার শেষমেষ রাম

www.pathagar.com

বিলাস পাসওয়ান সাহেব 'রাবরী সরকার হটিয়ে প্রেসিডেন্ট রুল দাবি করলেন। এরই এক মাসের মাথায় গয়া জেলার সেনদানী গ্রামে একই কায়দায় বারোজন দলিতদের হত্যা করল। এগুলো নিয়েই আরজেডি বিপদের পড়ল। পরে কিছু লোক এরেস্ট হয়েছিল। সঞ্জিব বললেন, স্যার বিহার ছিল জঙ্গলরাজ। রাবরী দেবী তার তিন বোন রসগোল্লা দেবী, পান দেবী আর গোলাবজামুন দেবীরা কম যায়নি।'

আমরা খুব আগ্রহ নিয়ে তার কথা চুপচাপ শুনে গেলাম। আমরা এতক্ষণে গয়া শহরের প্রায় কাছাকাছি। দূরে কঠিন শিলাপাথরের পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। পাহাড়ের গায়ে সবুজের চিহ্ন মাত্র নেই। বাঁ পাশে শুকনো বালি ভরা নদী। এরই নাম ফল্গু নদী। এই নদী দক্ষিণ দিকে ঘিরে রেখেছে গয়া এবং বুদ্ধগয়াকে। আমি ফল্গু নদী কখনও দেখিনি, এই প্রথম দেখলাম নদীর উপরিভাগে কোন পানি নেই পানি নিচে প্রবাহিত হয়। উপরে লাল মোটা বালি। অনেক ট্রাক বালি উঠাচ্ছে। তার নিচে স্যাঁতস্যাঁতে পানির আভাস দেখা যাচ্ছে। ক্রমেই সামনে পাহাড় আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে সম্পূর্ণ তাম্রবর্ণের পাহাড়রাজি।

এই পাহাড়গুলোর বৈদিক নাম রয়েছে। এগুলো মঙ্গলা গৌরী, সিরিঙ্গা সান, রামশিলা এবং রাহাসোন। এগুলোর মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হয় নিলাঞ্জনা বা ফল্গু নদী। এমন নয় যে এখানে পানি থাকে না। বর্ষার সময়ে প্রচুর পানি থাকে। শীতের মৌসুমে উপরের পানি শুকিয়ে যায়। এ নদীর তীরেই গয়া আর বুদ্ধগয়া। জনশ্রুতি রয়েছে গৌতম বুদ্ধ 'নির্ভান' লাভ করবার পর এই নদীতেই স্নান করেছিলেন।

আমরা গয়া শহরের উপকণ্ঠে হাতের বাঁয়ে গয়াঘাট দেখতে পেলাম। বহু মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছিল। সঞ্জিব বললেন, 'স্যার বাঁয়ে গয়া আর বুদ্ধগয়া শহর পার হয়ে। শহরের ভিতরে প্রবেশ করতে করতে দেখলাম বিশাল আকারের প্রচুর বট আর অশত্থ গাছ। চির সবুজ পাতা। আমাদের চালক গাছের দিকে প্রণাম করে গাড়ি চালাতে চালাতে বললেন, 'স্যার এখানে ভগবান রামজি আর সীতা মাইয়া এসেছিলেন এ নদীতে স্নান করতে। নদীতে নামতে গেলে নদী সীতা মাইয়ার সাথে বে-আদবী করেছিল আর পাহাড় চেয়ে চেয়ে দেখছিল। সীতা মাইয়া নদী আর পাহাড়কে বদদোয়া দেন। সেই হতে এই নদীতে পানি নেই আর পাহাড়ে কোন গাছ হয় না। একমাত্র বটগাছ সীতা মাইয়াকে প্রণাম করেছিল যে কারণে এ গাছের পাতা কখনই মরে না। বট গাছ অক্ষয়।'

আমরা শহরের মধ্যে প্রবেশ করলাম। ছোট শহর। বেশ পুরাতন দেখলেই তেমন মনে হয়। গলিগুলো বেশ ঘিঞ্জি। হঠাৎ কানে আসল জোহরের আজান ধ্বনি, সামনে দেখলাম এক বিশাল মসজিদ। আমি একটু আশ্চর্য হয়ে সঞ্জিবকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে মসজিদ?' সঞ্জিব বললেন, 'এখানে বেশ কয়েকটি মসজিদ আছে। এই

www.pathagar.com

মসজিদটি প্রায় দুই শত বছর পুরাতন আর এটাই এ অঞ্চলের সবচাইতে বড় মসজিদ। রাস্তায় একটা বোর্ড লক্ষ্য করেছেন। ওটা এক বিখ্যাত সুফি বাবার দরগাহ। বিথো শরিফ। দরগাহ্‌টি একটু ভেতরে যে জন্য দেখতে পাননি। ওই দরগাহটি বাবা মখদুম সৈয়দ শাহ সাহেবের। এখানে অনেক মুসলিম আছে। স্যার সামনে গলিতে ওই যে ঘরটি দেখেন ওটি মরহুম অভিনেত্রী নার্গিস দত্তের বাবার বাড়ি।'

'তাই নাকি। এখন কেউ থাকে না?'

'হয়ত থাকে। তবে আমি সঠিক বলতে পারব না।' সঞ্জিবের উত্তর।

'এখানে সঞ্জয় দত্ত কখনও এসেছেন? হ্যা স্যার গয়াতে আসলে নানা বাড়িতে যান। বহু বছর আগে এসেছিলেন বলে শুনেছি। এরপরে এসেছেন কিনা জানিনা। সঞ্জিব বলেন।

আমরা গয়া শহর ছেড়ে প্রায় দশ কিলোমিটার দক্ষিণে আসলাম। চোখে পড়ল প্রচুর বাস, প্রাইভেটকার আর অন্যান্য গাড়ির ভিড়। দেশ-বিদেশের বহু লোক। এরা সবই ভক্ত দর্শনার্থী। আমরা বুদ্ধগয়াতে চলে এসেছি। এখানে প্রচুর বট আর অশত্থ গাছের সারি। অনেক গাছের বয়স অনুমান নির্ভর, শত বছরের উপরে। সঞ্জিবকে জিজ্ঞাসা করলাম 'এত গাড়ি কোন রাস্তা দিয়ে আসল?'

'স্যার ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে এখানে আসে। বিদেশি পর্যটকদের গাড়ি ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে আসে। স্টেট রোড দিয়ে আসে না।'

আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। সামনে একটু উঁচু রাস্তা। ঠিক তার একটু নিচে বিশাল লম্বা দেয়াল দিয়ে ঘেরা কম্পাউন্ড। বহু বটসহ অন্যান্য গাছের ফাঁক দিয়ে দৃশ্যমান সুউচ্চ বৌদ্ধ মন্দিরের চূড়া এটাই মহাবোধি– মন্দির। এখানেই গৌতম বুদ্ধ 'নির্ভান' লাভ করেন। এ কারণেই বুদ্ধগয়া এবং মহাবোধি মন্দির বিশ্বের সকল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের নিকট মহাপবিত্র স্থান।

আমরা উঁচু রাস্তার উপরে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার একপাশে মহাবোধি মন্দির চত্বরে প্রবেশের প্রথম স্তরের বিশাল ফটক আর তার উল্টোদিকে বহু খাবারের দোকান মোটেল আর বিভিন্ন দ্রব্যাদির বিপণী বিতান। রাস্তার দু'ধারেই বিভিন্ন ভঙ্গিতে ধ্যানরত গৌতম বুদ্ধের মূর্তি তার নিচে ত্রিপিটকের শ্লোক। কামরুল বলে উঠল, এখানে বিদেশিদের মধ্যে পূর্ব এশিয়ার ভক্তইতো বেশি দেখা যাচ্ছে।

কামরুলের কথার জবাবে সতেন্দ্র বললেন, 'বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পূর্ব-এশিয়াতেই বেশি। চীনের তিব্বত থেকে ভক্তরা এখানে আসেন।'

আমি দেখলাম স্যাফরন রংয়ের কাপড় গায়ে মাথা কামানো বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু ভেতরে প্রবেশ করছেন। অনেকে অতি অল্প বয়সের। এদের চেহারা দেখে চীনা

তিব্বতী বলে মনে হচ্ছিল। সতেন্দ্র আমার ভুল ভাঙলেন। বললেন চীনা তিব্বত থেকে এসময়ে খুব কম আসে। তবে এদের বেশির ভাগ সিকিমের ধর্মশালার বাসিন্দা। প্রসঙ্গত: বুদ্ধগয়াতে বিমানবন্দর রয়েছে যেখানে ভক্তদের নিয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে সরাসরি বিমানে আসতে পারে।

প্রধান ফটক দিয়ে প্রচুর লোক ভেতরে প্রবেশ করছেন। আমরা চারজন তাদের অনুসরণ করে ভেতরে ঢুকলাম। সামনে আরেকটি স্বল্প উচ্চতার সাদা দেয়াল। দেয়াল জুড়ে বৌদ্ধ ধর্মের শ্লোক আর মুরাল। সেখান থেকে প্রায় বিশ থেকে বাইশ ধাপ নিচে সবুজ ঘাসের বিশাল চত্বর এবং তার মাঝে দাঁড়ানো মহাবোধি মন্দির। মন্দিরটি গোড়ার ব্যাস হতে আনুপাতিক হারে উপরের ব্যাস কমাতে উপরে চূড়াসহ দাঁড়িয়ে আছে। তারই পেছনে বিশাল বোধি গাছ। অনেকটা অশত্থগাছের মত। তারই নিচে ধ্যানরত গৌতম বুদ্ধ নির্ভান লাভ করেছিলেন।

আমরা উপরের পাকা চত্বরের বাঁ দিকে দেখলাম বহু মানুষ লাইনে দাঁড়ানো। বড় একটি লাইনে স্কুলের ইউনিফরম পরিহিত বহু শিক্ষার্থী। এখানে সবাই শান্তিপূর্ণভাবে পায়ের জুতা খুলে বড় একটি ঘরে রেখে যাচ্ছেন। বড় গ্রুপের জন্য আলাদা বড় ব্যাগের ব্যবস্থা আছে যাতে গ্রুপের জুতা এক সাথে রাখতে পারে।

আমাদের দেখে একজন গাইড এগিয়ে আসলেন। তিনি বললেন যে, তিনি আমাদের বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলো দেখাবেন এবং তিনি একজন স্বীকৃত গাইড। তিনি আমাদের জুতা খুলে বিশেষ ব্যবস্থায় রেখে দিয়ে আমাদের সঙ্গ নিলেন। একটু সামনে এসে প্রথমেই বোধি মন্দিরের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরে সিঁড়ি ভেঙে নিচে আসতেই ধর্মীয় চিহ্ন খোদাই করা সম্পূর্ণ পাথরের নির্মিত মন্দির চত্বরে প্রবেশের ধর্মীয় গেট দেখিয়ে বললেন, 'এ কলামটি এখানে স্থাপন করেছিলেন সম্রাট অশোক, এখন থেকে প্রায় দু'হাজার চারশত বছর পূর্বে, এর নাম অশোক পিলার গেট।

আমাদের গাইড ভদ্রলোক বেশ চটপটে। অশোক পিলার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি মন্দিরের বিবরণ দিতে লাগলেন। মন্দিরের মূল প্রবেশ দ্বারের বাঁয়ে একটি আলাদা ছোট কিন্তু মূল মন্দিরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘর। মন্দিরের ভেতরে প্রবেশের জন্য শত শত ভক্তের হুটাপুটি। ভেতরের পরিসরে স্থানসংকুলান হচ্ছিল না। তবুও প্রবেশের চেষ্টা আর একই দরজা দিয়ে ভক্তদের বের হবার প্রচেষ্টায় মোটামুটি ধাক্কাধাক্কির দৃশ্য দেখলাম।

এ সম্পূর্ণ স্থাপনাটি ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ। চৌকোণা মন্দিরের প্রধান দালানটির চারকোণায় মুলাচূড়া সদৃশ চারটি ছোট চূড়া রয়েছে। মন্দিরটি সম্পূর্ণভাবে ধুসর রংয়ের স্যান্ডস্টোনে তৈরি।

www.pathagar.com

গাইডের বর্ণনা মতে, আনুমানিক ২৫০ খ্রিস্টপূর্বে সিদ্ধার্থ গৌতমের নির্ভান প্রাপ্তি এবং গৌতম বুদ্ধে রূপান্তরিত হবার ২৫০ বছর পর মৌর্য সাম্রাজ্যের ভুবন খ্যাত সম্রাট অশোক বুদ্ধগয়াতে আগমন করেন। তিনি বুদ্ধের ধ্যানস্থানের তীর্থে এসে এখানে একটি মন্দির স্থাপন করতে উদ্যোগী হন। একই সাথে বোধিগাছের নিচে হীরার মসনদ তৈরি করেন। এ জায়গাটি 'বজ্রাসন' নামে অধিক পরিচিত। সম্রাট অশোক নির্ভান লাভের জায়গাটি চিহ্নিত করে রেখে যেতে চেয়েছিলেন। এই মহাবোধি মন্দিরের স্থাপনা সম্রাট অশোক করেছিলেন বলে কথিত। তবে মন্দিরের অবয়ব পরে পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে পরিবর্তন করা হয়। তবে আমাদের গাইড মন্দিরের চূড়ার যে অংশটি অপেক্ষাকৃত হালকা রংয়ের, ওই অংশটাই অশোকের তৈরি আদি অংশ দাবি করলেন। তিনি আরও জানালেন, উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এ মন্দিরকে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে আসে। গাইড আরও বললেন যে, বর্তমান কাঠামোর পূর্বে শুধুমাত্র পিরামিড আকারের মন্দির ছিল। সেটি ছিল কুশান সাম্রাজ্যের সময়ে। সময় দ্বিতীয় শতাব্দী।

গাইড ভদ্রলোক অনবরত এ জায়গার ইতিহাস আর গৌতম বুদ্ধ সম্বন্ধে বলতে বলতে মন্দিরে, চারপাশের পাকা চত্বরে নিয়ে আসলেন। আমরা মন্দিরের ডানদিক থেকে পেছনের দিকে আসলাম। ডানপাশে রূপালী রংয়ের রেলিং দেয়া, তার উপরে বিভিন্ন দেশের টাঙ্গানো বড় চাদরের পাশে বসা দু'জন বৌদ্ধভিক্ষু মন্ত্র জপছিলেন। আমরা মন্দিরের পেছন দিকে আসলাম। জায়গাটি আলাদাভাবে ঘেরা দেয়া। ঢুকতেই আরেকটি পাথরের সিংহ দরওয়াজা। মধ্যখানে পাথরের বেদির মাঝে বিশাল বোধি গাছ (অশত্থ গাছ)। গাইড বললেন, এই সেই জায়গা যেখানে বসে দিনের পর দিন মাসের পর মাস ধ্যান করতে করতে 'নির্ভান' লাভ করেন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা মনে করেন এ জায়গাটি পৃথিবীর নাভি সম। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন যে, এ পবিত্র গাছের নিচে বা আশপাশে এ গাছটি ছাড়া আর কোন বৃক্ষ জন্মায় না। এ জায়গার ধর্মীয় নাম 'বোধিমান্দা।'

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন 'কল্পার' শেষ লগ্নে যখন পৃথিবী ধ্বংস হবে তখন এ জায়গাটি সর্বশেষে ধ্বংস হবে আর পুনর্জাগরণে প্রথম জাগ্রত হবে। জনান্তিকে বিশ্বাস যে, যেদিন গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল সেদিনই এই গাছের জন্ম। এবার গাইডকে কামরুল জিজ্ঞাসা করল, 'এ গাছ কি আড়াই হাজার বছর পুরাতন?'

না তা নয়। সম্রাট অশোক মন্দির বানাবার সময় আদি গাছটি কেটে ফেলেন এবং তিনটি চারার মধ্যে একটি এখানে রোপণ করে আর দু'টি তিনি শ্রীলঙ্কাতে পাঠান। বলা হয়, এ গাছটি অশোকের সময়ের গাছের তৃতীয় প্রজন্ম। এখানে যে বেদিটি দেখছেন এটি 'অশোকবেদি'। দেখলাম বেদির একপ্রান্তে কাচের ঘেরা একটি শোকেস যেখানে

www.pathagar.com

বেশ কিছু দ্রব্যাদি রাখা। একটি পাথরের উপরে বেশ বড় বড় পায়ের ছাপ, গাইড আমাদের জানালেন যে পায়ের ছাপগুলো গৌতম বুদ্ধের।

আমরা 'সমবোধি' মন্দিরের উত্তর প্রান্তে মানে ডান পাশে। বোধি গাছের বেদি হতে পায়ের ছাপ (সিমেন্ট দিয়ে তৈরি পায়ের ছাপ) মন্দিরের মাঝামাঝি এসে থেমে গেছে। গাইড জানালেন, গৌতম বুদ্ধ নির্ভান লাভ করবার পর গাছের বেদি ত্যাগ করে এখান পর্যন্ত এসেছিলেন। এ জায়গাটির নাম 'চানকামানা'। বুদ্ধের স্মরণে এখানে ভক্তরা মোমের বাতি জ্বালিয়ে থাকেন। তখনও বহু ভক্ত সেখানে দাঁড়িয়ে মোমবাতি জ্বালাচ্ছিলেন।

গাইড আমাদেরকে বললেন, 'ধ্যানের প্রথম সপ্তাহ গৌতম বুদ্ধ বোধি গাছের নিচে কাটান। দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি বোধি গাছের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে দাঁড়িয়েছিলেন।' গাইড আমাদের সেই চিহ্নিত জায়গাটি দেখালেন যেখান থেকে বুদ্ধ এ কাজটি করেছিলেন। এ জায়গাটির নাম 'অনিমেশলোচন স্তূপা'। এখানে গৌতম বুদ্ধের দাঁড়ানো অবস্থায় একটি মূর্তি গাছের দিকে মুখ করা অবস্থায় স্থাপিত রয়েছে। গাইড আরও বললেন, গৌতম বুদ্ধের যে পায়ের পাতা অঙ্কিত রয়েছে লক্ষ্য করে দেখবেন গোড়ালীর অংশে সামান্য চিহ্ন রয়েছে। বিশ্বাস করা হয় যে তিনি যখন এখানে পায়চারী করছিলেন তখন প্রতি পায়ের ছাপে পদ্মফুল গজিয়েছিল। এ জায়গার নাম 'রত্নচা কারমা'। আমরা নিঃশব্দে তার বিবরণ শুনছিলাম।

আমরা গাইডের পেছনে পেছনে মন্দিরের সামনের দিকে মানে পূর্বদিকে যাচ্ছিলাম। মন্দিরের সামনে এসে গাইড জিজ্ঞাসা করলেন যে আমরা ভেতরে যাব কিনা? তিনি জানালেন, ভিতরে বুদ্ধের বিশাল মূর্তিসহ অন্যান্য ধর্মীয় আচার আচরণের বিষয়গুলো রয়েছে। আমরা ভেতরে যেতে চাইলাম না। কারণ, এ ভিড় ঠেলে শুধুমাত্র দেখবার জন্য যেতে চাইলাম না।

গাইড আমাদেরকে পাশের ছোট মন্দিরের ভেতরে নিয়ে আসলেন। সেখানে কিছু দ্রব্যাদি রাখা আর একটি চিত্রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বুদ্ধের জন্মের দৃশ্য। গাইড আমাদেরকে বললেন, 'এ সব দ্রব্যাদি গৌতম বুদ্ধের মায়ের ব্যবহার্য জিনিসপত্র।'

গৌতম বুদ্ধের জন্মনাম ছিল সিদ্ধার্থ গৌতম। পিতা ছিলেন কপিলাবস্তুর সম্রাট সুদ্ধোধনা আর মাতার নাম রাণী মহামায়া বা মহামায়া দেবী। সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করেছিলেন লুম্বিনি, বর্তমানে নেপাল-ভারতের সীমান্তে। তবে জায়গাটি নেপালের ভেতরে।

গৌতম বুদ্ধের জন্ম সাক্কিয়া সম্প্রদায়ে যে সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন সিদ্ধার্থ গৌতমের পিতা। অল্প বয়স হতেই যুবরাজ সিদ্ধার্থ ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। প্রাসাদের

www.pathagar.com

বাইরে মানুষের সুখ-দুঃখ, জরা আর মৃত্যু প্রত্যক্ষ করতে করতে সিদ্ধার্থ খোঁজ করতে থাকেন এ সব জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায়। খুঁজতে থাকেন আত্মার শুদ্ধির উপায়। ক্রমেই তিনি পরিবার থেকে মানসিকভাবে দূরে সরে যেতে থাকলেন। পিতা-মাতা সন্তানের পরিবর্তন দেখে সংসার ধর্মে বাঁধতে চাইলেন। ষোল বছর বয়সেই গৌতমের সাথে বিয়ে হয় যশোধারা নামক নিকট আত্মীয়ের সাথে। আরও তের বছর সিদ্ধার্থ কাটান পুত্র রাহুল আর পরিবারের সাথে। তাকে প্রস্তুত করা হয় পিতার স্থলাভিষিক্ত হতে। কিন্তু সিদ্ধার্থ জাগতিক ঐশ্বর্যে আকৃষ্ট হতে পারেননি। তিনি তখনও আত্মার মুক্তির উপায় খুঁজছিলেন।

সিদ্ধার্থের গৌতম বুদ্ধ হবার বহু কিংবদন্তি রয়েছে। এমনি একটির কথা মনে পড়ছিল। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ ব্যাকুল চিত্তে এক মধ্যরাতে প্রাসাদের ছাদে চুপচাপ বসে ভাবছিলেন। হঠাৎ দেখলেন ওই ছাদে এক মেষ পালক কিছু খুঁজছেন। সিদ্ধার্থ আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন প্রাসাদের ছাদে মেষ পালক এলো কোথা হতে এবং খুঁজছেনই বা কি? তার পরিচয় জানতে চাইলে মেষ পালক পরিচয় দিয়ে বললেন যে তার মেষের পাল হারিয়ে গেছে। তিনি এই রাজপ্রাসাদের ছাদে খুঁজতে এসেছেন? রাজপুত্র সিদ্ধার্থ মেষ পালককে বললেন যে, তিনি নেহাৎই মূর্খমানুষ' তিনি (সিদ্ধার্থ) বললেন, 'আপনি কি মনে করেন আপনার মেষগুলো চারণভূমি ছেড়ে গভীর রাতে এখানে এসেছে আর আপনি সেগুলো রাজপ্রাসাদের ছাদে পাবেন? এত অলৌকিক কথাবার্তা। মেষ খুঁজতে হলে ছাদে নয় আপনাকে জঙ্গলে যেতে হবে। আপনি এখানে সময় নষ্ট করছেন।' উত্তরে মেষ পালক বলেছিলেন, 'প্রাসাদের ছাদে মেষের পাল যদি পাওয়া না যায় তাহলে আপনি আত্মার যে মুক্তি খোঁজ করছেন তা এই রাজ্য ঐশ্বর্য আর আরাম আয়েশের জীবনে কীভাবে পাবেন।' মেষ পালক যেমনি এসেছিল তেমনি চলে গেলে সিদ্ধার্থ মেষ পালকের কথায় যেন মুক্তির পথ খুঁজে পেলেন। সত্যই রাজপ্রাসাদে থেকে তিনি কিভাবে মুক্তির পথ খুঁজে পাবেন? সে রাতের ঘটনা সিদ্ধার্থের জীবনের মোড় পরিবর্তন করে দিল। এরপর সিদ্ধার্থ হঠাৎ করে প্রাসাদ ত্যাগ করলেন।

সিদ্ধার্থ প্রাসাদ ত্যাগ করে মগধের রাজধানী রাজগীরে ভিক্ষা করতে থাকেন। সম্রাট বিম্বিসার তাঁর বংশ পরিচয় এবং আধ্যাত্মিক শক্তির আভাষ পেয়ে রাজত্ব উপহার দিতে চাইলেন। সিদ্ধার্থ তখন নির্ভান লাভের পথে। বিম্বিসারকে কথা দিলেন নির্ভান লাভের পর তিনি মগধে ফিরে আসবেন। সিদ্ধার্থ, পরে গৌতম বুদ্ধ, কথা রেখেছিলেন।

আমরা ছোট মন্দির থেকে বের হবার পথে কিংবদন্তির এ কাহিনীর কথা জিজ্ঞাসা করলে সতেন্দ্র জানালেন যে, তিনিও এ কাহিনী পড়েছেন। ছোট মন্দির থেকে বের হবার পথে দেখলাম দোরগোড়ায় দু'জন তিব্বতী ভিক্ষু নিচে বসে মন্ত্র পড়ছেন আর

www.pathagar.com

একপাত্র হতে ছোট ছোট রঙ্গিন পাথর অন্যপাত্রে রাখছেন। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে ছবি নিতে নিতে নিচু স্বরে গাইডকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে এনারা কি করছেন?'

গাইড বললেন, 'এখানে এ মন্দিরের সামনে এভাবে বসে হয়তো কোন পাপমোচন করছেন। কতবার মন্ত্র পড়ছেন সেটা গণনার জন্য এক পাত্র হতে অপর পাত্রে পাথরগুলো স্থানান্তর করছেন।'

আমরা হাঁটতে হাঁটতে অশোকের নির্মিত ফটক দিয়ে বের হয়ে দক্ষিণ দিকে মন্দিরের মূল চত্বরের প্রান্তে এক বিশাল দীঘির পাড়ে পৌঁছলাম। দীঘির উভয় প্রান্তে বিরাট এক ঘাট বাঁধানো। প্রচুর ভক্ত জড়ো হয়ে প্রদীপ ভাসিয়ে দিচ্ছেন। দীঘির মাঝখানে ফুটন্ত পদ্মফুলের উপরে বসা ধ্যানরত গৌতম বুদ্ধের মূর্তি। বিরাট এক সাপের ফণা গৌতম বুদ্ধের মাথার উপরে ছায়া দেবার সাথে সাথে পাহারাও দিচ্ছে।

গাইড জানালেন, এ পুকুরের ঠিক মাঝখানে ঠিক এমনিভাবে গৌতম বুদ্ধ ধ্যান করতেন। আমরা চারজনই চুপচাপ গাইডের কথা শুনলাম। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বের কথা। বিশ্বাসই আনে ভক্তি।

আমরা আস্তে আস্তে মহাবোধি মন্দির ত্যাগ করে বের হয়ে আসার পথে নিজের নিজের জুতা নিয়ে গাইডকে একশত রুপি দিয়ে বের হয়ে আসলাম। আমরা চুপচাপ হাঁটছিলাম। ভাবছিলাম ওই সময়ে এ জায়গা গহীন জঙ্গল ছিল। নদীর কারণে হয়তো কিছু বসতি থাকলেও থাকতে পারতো।

গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন আনুমানিক ৪০০ খ্রিস্টপূর্বে। তাঁর জন্ম নিয়েও বহু কিংবদন্তি রয়েছে। তিনি তার ধর্মের যে প্রধান বিষয় অহিংসা পরম ধর্মের বাণী প্রচার করেছিলেন তা আজ বিশ্বের কোণায় কোণায় পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু তারই অনুসারীরা কি পেরেছে অহিংস থাকতে?

দুপুর হয়ে গিয়েছে। খাবার খেয়ে আমাদের এবার ফিরবার পালা। আমরা পা বাড়ালাম রেস্তোরাঁর খোঁজে। পাশের ক্যাসেটের দোকানগুলো থেকে ভেসে আসছিল 'বুদ্ধাম শরনাম গাচ্ছামি।'

গৌতম বুদ্ধ বোধিগাছের নিচে 'নির্ভান' লাভ করবার দু'বছর পর ফিরে গিয়েছিলেন কপিলাবস্তুতে পরিবারের সাথে দেখা করতে। সাথে তার বেশ কিছু শিষ্য। শিষ্যরা কপিলাবস্তুতে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বুদ্ধের বাণী প্রচারের সাথে সাথে খাবার ভিক্ষা করছিলেন। এমনটি শুনে পিতা সুদ্ধোধনা পুত্রকে বললেন 'আমরা মহামাসতা যোদ্ধা জাতি। আমাদের কোন যোদ্ধা ভিক্ষা করেনি। ভিক্ষা করা আমাদের সংস্কৃতি নয়।' গৌতম বুদ্ধ উত্তরে বলেছিলেন, 'আমি জানি এটা রাজপরিবারের সংস্কৃতি নয়, এটা বুদ্ধের পরম্পরার সংস্কৃতি। হাজার হাজার বৌদ্ধ এ পথে চলছে। তারা ভিক্ষুক নয় তারা

www.pathagar.com

ভিক্ষু।'

আমরা হাঁটতে হাঁটতে ছোট একটি রেস্তোরাঁয় এসে পৌঁছলাম। দুপুরের খাবার খেয়ে পাটনায় ফিরবার জন্য সঞ্জিবের গাড়িতে বসলাম।

গাড়িতে বসেই সতেন্দ্রের নির্দেশে আমাদেরকে বৌদ্ধের সর্ববৃহৎ প্রতিকৃতি দেখাতে নিয়ে চললেন। রাস্তার দু'পাশে বিভিন্ন দেশের স্থাপিত বৌদ্ধ মন্দির। প্রত্যেক মন্দিরের সামনেই প্রচুর ভক্তের সমাগম। এর মধ্যেই দেখলাম বাংলাদেশ সরকারও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্য মন্দির বানিয়েছেন। দেখে ভালই লাগল। অন্তত বাংলাদেশের রং এবং বাংলাদেশের পতাকার দেখা পেলাম।

আরও কিছুদূর এগুতেই রাস্তার পাশে দেয়াল দিয়ে ঘেরা এক চত্বর যার মাঝে স্থাপিত বুদ্ধের বিশাল এক ধ্যানরত ভাস্কর্য। এখানেও প্রচুর ভক্ত। চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করছে। আমি উপমহাদেশ তথা থাইল্যান্ডে বুদ্ধের বহু ভাস্কর্য দেখেছি কিন্তু এ বিশাল আকারের আর দেখিনি। আমরা গাড়ি থেকে নামলাম না। সতেন্দ্র বললেন, এ জায়গা থেকেই গৌতম বুদ্ধ 'নির্ভান' লাভের পর নদীতে স্নান করেছিলেন। এটাই ভারতে গৌতম বুদ্ধের সবচাইতে বড় ভাস্কর্য।

আমরা ফিরতি পথে। মুকুল সতেন্দ্রকে বলল 'আরে আমরা বিহারের বিশেষ মিষ্টি লিটি খেলাম না। খেলামনা খইনী। দুটোই চেখে দেখতে হবে। সতেন্দ্র বললেন, 'দেখি রাস্তায় লিটি পাওয়া যায় কিনা। আর খইনী তোমরা খেতে চাইলে পাটনার খইনী দিব। খেয়ে মাথা ঘুরিয়ে পড়বে নাতো?

মুকুল বলল, 'আগে খইনী চেখে তো দেখি।' সঞ্জিব এবার ক্যাসেট বন্ধ করে রেডিও লাগালেন। রেডিওতে নতুন ছায়াছবি 'তিসমার খাঁ-এর জনপ্রিয় গান 'শিলা কি জওয়ানী' চলছিল আর সাথে শুনাচ্ছিল এই ছবির প্রযোজক ফারাহ খানের সাক্ষাৎকার। হঠাৎ মুকুল সতেন্দ্রকে বলল 'আমরা রাতে পাটনাতে এই ছবি দেখতে চাই।' সাথে সাথে কামরুল সায় দিল। এতক্ষণ কামরুল নাক ডেকে ঘুমুচ্ছিল আর তার মোবাইলে এসএমএস-এর অনবরত আওয়াজ হচ্ছিল। মুকুল তাকে জিজ্ঞাসা করল যে কোথা থেকে এত ম্যাসেজ আসছে? কামরুল কয়েকটা পড়ে বলল, 'এগুলো মোবাইল কোম্পানির পয়সা কামাবার ফন্দি। মেসেজ আসছে ফোনে বোম্বের সিনেমার নায়িকাদের সাথে কথা বলবার অফার।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম। 'এগুলো এয়ারটেল-এর মত কোম্পানি করবে?' 'স্যার আপনি ওই নম্বরে ফোন করতেই ডাবল চার্জ নিবে হয় রেকর্ড করা আওয়াজ শোনাবে, না হয় ওই রকম গলায় ওই নাম্বার থেকে অন্য কেউ কথা বলবে। কথা বলে আপনার পয়সা উঠাবে।' কামরুল অনেকটা সবজান্তার মত গড়গড় করে বলে গেল। এরপর

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ পরপরই ম্যাসেজের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল।

ইতিমধ্যেই সতেন্দ্র পাটনায় তার কোন কর্মচারীর সাথে কথা বলে সিনেমা দেখার বন্দোবস্ত করে ফেললেন। বললেন টিকেট হয়ে গেছে। হোটেলে গিয়ে তোমরা সাড়ে আটটার মধ্যে বের হতে পারলে আমরা বাইরে খেয়ে রাতের শো দেখতে পারব। সময় তখন বিকেল পাঁচটা। আমরা ন্যাশনাল হাইওয়ের কাছাকাছি। অন্ধকার হয়ে আসছে। ছোট একটি গ্রাম্য বাজারে থামলাম। গ্রাম্য বাজারের চায়ের দোকানে চা খেতে ঢুকলাম। সামনে কাচের আলমিরায় কয়েক ধরনের মিষ্টি সাজানো। মুকুল লিটি নামক মিষ্টি চাইলে প্লেটে শুকনা গোল, অনেকটা লাড্ডুর মত দেখতে, মিষ্টি নিয়ে আসল। একটা খেয়ে দেখলাম, শুকনা খাবার খেতে ভালই লাগে। মুকুল জানালো যে লিটি ছাতু দিয়ে তৈরি। এক সময় ছাতু বিহারের অন্যতম প্রধান খাবার ছিল। এখন তেমন অবস্থা নেই। এখন প্রচুর শস্য উৎপাদন হয়। বিহারীদের এখন প্রধান খাবার ভাত আর রুটি।

চায়ের পর্ব শেষ করে আমরা পুনরায় যাত্রা শুরু করলাম। সঞ্জিব সারা রাস্তা একাই কথা বলে চলেছিলেন। তার কথার ভাণ্ডার যেন শেষ হচ্ছে না। এক পর্যায়ে বললেন, 'স্যার মাত্র দশ বছর আগে এ সময় এ রাস্তায় মানুষ আর গাড়ি দেখা যেত না। এ সব বাজার সন্ধ্যার আগেই বন্ধ হয়ে যেত। এখন সে অবস্থা নেই। আপনারা কত স্বচ্ছন্দে নেমে চা খেলেন আর আমরা নির্বিঘ্নে গাড়িতে চলছি।' আমার বুঝতে বাকি রইল না সে সঞ্জিব আমাদের মত শ্রোতা পেয়ে তার মনের সুখে লালু প্রসাদের সময়ের 'জঙ্গল রাজ-এর' কথা তুলে ধরছেন।

গাড়ি চালাতে চালাতে সঞ্জিব দূরে ছোট একটি গ্রামের টিম টিমানো বাতিগুলোর দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন 'স্যার এই এলাকায় ভূমিহারাদের বসত। এরা ছিল দারুণ বিপদে? আমি বললাম 'কেন?'

'স্যার এরা দলিতদের চাইতে বেশি কষ্টে আছে। সঞ্জিবের মতে ভূমিহারারা এমন এক গোষ্ঠী যারা নিজেরাও জানে না এই জাতপাতের ভেদাভেদে তারা কোথায়।'

সঞ্জিব বললেন যে, সম্রাট অশোকের সময় মগধের উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরা সম্রাটের সাথে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। এরা হিন্দু ধর্মকে বিসর্জন দিয়েছিল। সময় তখন আনুমানিক ৩০০ খ্রিস্টপূর্ব। এরপরে যখন ভারত থেকে বৌদ্ধদের বিতাড়িত করা হয় তখন এদেরকে আর হিন্দু সমাজে স্থান তো দেয়া হয়ইনি সে সাথে তাদের ব্রাহ্মণ হবার সব সুযোগ সুবিধাও হরণ করা হয়। এরা নিজেদের ব্রাহ্মণ পরিচয় দেয় ঠিকই কিন্তু আজও উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে এরা অপাংক্তেয়। আমরা সঞ্জিবের কথা হা করে শুনছিলাম। একবিংশ শতাব্দীতেও আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতে জাতপাত নিয়ে এত বিভেদ আর তিক্ততা? ভূমিহারাদের হরিজনরাও ঘৃণা করে। বিচিত্র দেশ এই ভারত।

www.pathagar.com

আমি সঞ্জিবকে জিজ্ঞাসা করলাম, লালুত নিজেই ছোটা জাতের ছিল। সেও কি ভূমিহারাদের জন্য কিছু করেনি? সঞ্জিব বললেন, যে গ্রাম দেখেছেন সেখানে দাঙ্গায় প্রায় সত্তর ভূমিহারাকে হত্যা করা হয়েছিল। লালুজি সপ্তাহ খানেক পরে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন তিনিও ছোট জাতের, কিন্তু নিজের প্রচেষ্টায় বড় হয়েছেন। ভূমিহারারাও তেমন হতে পারে। এসব বলার সময় ভূমিহারারা লালুকে ভাগিয়ে দিয়েছিল। তারপর লালুজি আর এ মুখো হননি।'

আমরা হোটেলে পৌঁছলাম। সঞ্জিব আমাদের সিনেমা হলে নিয়ে যাবেন এবং পরে রাতে হোটেলে পৌঁছে দেবেন। আগামীকাল তিনিই আমাদেরকে রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছে দেবেন। সতেন্দ্র সঞ্জিবকে নিয়ে সার্কিট হাউসে গেলেন। আটটার দিকে আসবেন আমাদের নিয়ে যেতে। আমি রুমে যেতে যেতে সঞ্জিবের কথা ভাবছিলাম। পেশায় গাড়ি চালক। চাকরি করেন রেন্ট-এ-কার কোম্পানিতে- কিন্তু বিহার আর বিহারের রাজনীতির বেশ খোঁজ-খবর রাখেন। ভাবছিলাম সঞ্জিবের মত লোকও জাতপাত নিয়ে এত সচেতন?

প্রায় দেড় ঘন্টা পর সঞ্জিবসহ সতেন্দ্র আসলেন। আমরা রাতের খাবার খেতে নিচে নামতেই বাইরে প্রসাদজিকে তার জিপ থেকে নামতে দেখে চমকিত হলাম। তার সাথে পুলিশের পোশাক পরা বডিগার্ড, কামরুল অনেকটা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার সাথে পুলিশ গার্ড?' প্রসাদ উত্তর দিলেন যে, তিনি বিহার রাজ্যের সিআইপি (CIP), তাই তিনি বডিগার্ড পেয়েছেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে আজ সকালে তার দিল্লী যাবার কথা। তিনি কি দিল্লী যান নাই। প্রসাদ বললেন যে সকালে তিনি যাননি। আগামী দিন সকালে যাবেন। তাকেও আমাদের সাথে আসতে বললে তিনি কাজ আছে বলে চলে গেলেন।

আমরা সিনেমা হলের কাছে একটি রেস্তোরাঁয় খাবার খেয়ে সিনেমা দেখতে হলে গেলাম। সবাই ক্লান্ত এর চাইতে বেহুদা ছবি আমি সচরাচর দেখিনি। ক্যাটরিনা কাইফের উত্তেজক নৃত্য আর 'শীলা কি জওয়ানী' গানের পর চারজনেই মধ্য বিরতি পর্যন্ত নাক ডাকিয়ে ঘুম। বাকি অর্ধেকও ঘুমিয়ে কাটালাম। ছবির আদি অন্ত কিছুই দেখলাম না। ছবি শেষে মুকুল শুধু একটা শব্দই বের করল 'বকওয়াজ'। রাতে বিছানায় যেতে বেশ দেরি হয়েছিল। সকালে হাঁটতে যাওয়া হবে বলে মনে হয় না। ঘুমের একটা নির্দিষ্ট সময় আছে সে সময় পার হলে ঘুমকে বাগে আনতে বেশ কসরত করতে হয়। চোখে ঘুম আনবার অনেক উপায় আছে বলে অনেক পড়েছি। তারই একটি উপায় অবলম্বন করে আমি বুদ্ধগয়ার আজকের ভ্রমণ নিয়ে চোখ বন্ধ করে ভাবছিলাম। কানে অহরহ বাজছিল, 'বুদ্ধাম শরনাম গচ্ছামি, ধারমাম শরনাম গচ্ছামি; সাহাং শরনাম গচ্ছামি।' বুদ্ধের এই মন্ত্র মনে করতে করতে কখন ঘুমিয়েছি বলতে পারব না।

www.pathagar.com

বার
পাটালিপুত্রা হতে পাটনা

সকালে আর হাঁটতে গেলাম না। আজকের দিনটি আমরা পাটনাতেই কাটাবো। সন্ধ্যায় ট্রেন। সেই গরিব রথ। রিটার্ন টিকেট কাটাই ছিল। এবার আমাদের তিনজনকে তিন বগিতে যেতে হবে। কারণ একই, এক বগিতে জায়গা পাওয়া যায়নি।

সকালে নাস্তা সেরে সতেন্দ্রর সাথে সঞ্জিবের গাড়িতে বের হলাম। আগের দিন আমি সতেন্দ্রকে বলেছিলাম যে আমার তিনটি জায়গা অবশ্যই দেখতে হবে। তিনটি জায়গা হল কিলা হাউস বা জালান হাউস, পাটনা জাদুঘর আর পাটালিপুত্রা আঘাম কূয়া। পাটনা শহরের একপ্রান্তে মগধের ঐতিহাসিক শহরের সামান্যতম চিহ্ন রয়েছে। সেখানে আছে একটি বিশাল কূয়া। ইতিহাস খ্যাত আঘাম কূয়া। সম্রাট অশোক তার রাজত্ব সুসংহত করতে নিরানব্বই ভাইকে হত্যা করে এই কূয়ার মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন। সম্রাট অশোক তখনও বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেননি। ওই সময় তিনি ছিলেন নৃশংস নৃপতি। কলিঙ্গের যুদ্ধের পর অশোকের জীবনের মোড় ঘুরে যায়।[১]

জালান হাউস বা কিলা হাউস সম্বন্ধে প্রথম দিনেই পাটনার এক পত্রিকায় পড়েছিলাম যে বাড়িটি একটি প্রাইভেট জাদুঘর। অনেক দুর্লভ বস্তুর সমাহার রয়েছে। রয়েছে প্রায় দেড়শত বছর পুরাতন ঢাকার ইতিহাসখ্যাত মসলিন কাপড়ের এক থান। বাড়িটি প্রায় দুই শত বছর পুরাতন। তৈরি হয়েছিল শেরশাহ সূরীর পাটনা দুর্গের ভেতরের প্রাঙ্গণে। দুর্গটির সামান্য অংশ এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। বাড়িটি গঙ্গা নদীর একেবারে পাড় সংলগ্ন। দুর্গের উপরে নির্মিত বলেই স্থানীয়দের নিকট 'কিলা হাউস' নামে অধিক পরিচিত।

আমি সতেন্দ্রকে বলেছিলাম এ তিনটি জায়গার বাইরে যা দেখাবেন তাই দেখব। কিলা হাউসের বিষয়ে সতেন্দ্র জানালেন যে, যেহেতু বাড়িটি প্রাইভেট সম্পত্তি এবং জালানিরা বংশ পরম্পরায় বাস করছেন, তাই তিনি তাদের অনুমতি চেয়ে রাতেই একজনকে পাঠিয়েছিলেন। তারা আমার কথা শুনে অনুমতি দিয়েছেন। বর্তমানে জালান পরিবারের তৃতীয় প্রজন্ম অদিতি জালান বাড়িটিতে থাকেন। অবশ্য পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা শহরের অন্য জায়গায় আধুনিক বাড়িতে থাকেন।

১। লেখকের 'কত জনপদ কত ইতিহাস' পৃষ্ঠা ৬৮

www.pathagar.com

সতেন্দ্র জানালেন যে, প্রথমে তিনি আমাদেরকে গঙ্গা নদীর উপর গান্ধী সেতু দেখাবেন এবং সেখান থেকে স্পিড বোটে গঙ্গা নদীর মাঝে একটি চর রয়েছে সেখানে নিয়ে যাবেন। ওখানে তারই সচিবালয়ের তত্ত্বাবধানে চলছে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এবং রেসকিউ অপারেশনের ট্রেনিং। সেখান থেকে জালান হাউস কাছে তাই পরবর্তীতে ওখানে নিয়ে যাবেন। পরে জাদুঘরে যাবার পথে শিখদের দশম গুরু গোবিন্দ সিং-এর জন্মস্থান গুরুদুয়ারা হরমন্দির সাহেব-এ নিয়ে যাবেন। আঘাম কূয়াতে যাব সবার শেষে।

আমরা সতেন্দ্রর সফরসূচি মোতাবেক সঞ্জিবকে নিয়ে রওয়ানা হলাম। নাস্তার পরই আমরা হোটেল ছেড়ে দিয়েছি তাই আমাদের ব্যাগ ইত্যাদি সঞ্জিবের গাড়িতেই রাখলাম। আমরা পাটনা শহরের মধ্য দিয়ে গঙ্গার তীরে এসে পৌঁছলাম। শীতের গঙ্গা পাড় অনেক নিচে নেমে গেছে। গঙ্গার তীরে পাটনা শহর। এ পাশটা নদী থেকে বেশ উঁচুতে। অনুমান করা যায় যে ভরা মৌসুমে নদীর পানি হয়ত শহরকে তেমন প্লাবিত করে না। ওপারটা অপেক্ষাকৃত নিম্নাঞ্চল। ওধারে শহরের কোন চিহ্ন নেই। দূরে উঁচু চিমনি দেখে মনে হল প্রচুর ইটের ভাটা। নদীর পানি বেশ স্বচ্ছ। তেমন দূষিত মনে হল না।

সতেন্দ্র আমাদের জন্য আগেই স্পিড বোট তৈরি করে রেখেছিলেন। নদীর তীরে ব্রিজের নিচে আমাদেরকে অভ্যর্থনা করবার জন্য কয়েকজনকে নিয়োজিত করে ছিলেন। এরা সবাই 'জলক্রীড়া' বা সুইমিং ফেডারেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী। এদের মধ্যে ছিলেন উপেন্দ্র কুমার বিহার জলক্রীড়া সমিতির সাধারণ সম্পাদক। মধ্যগড়নের শ্যামলা ভদ্রলোক। চুল ব্যাক ব্রাশ করা। হাতে বেশ কয়েকটি আংটি। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। সতেন্দ্র পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমরা রেসকিউ অপারেশনের ট্রেনিং-এর জন্য এ সমিতিকে নিয়োগ দিয়েছি। এরাই আমাদের প্রশিক্ষক দিয়ে সাহায্য করছেন। আমাদের প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে রয়েছে পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স আর ফায়ার ব্রিগেডের সদস্য।

সতেন্দ্র আরও জানালেন যে, প্রশিক্ষণ মূলত পানিতে ডুবা থেকে উদ্ধার করা এবং উদ্ধারের পর করণীয় বিষয়ের উপর। কারণ, বর্ষায় এখানে বন্যা আসলে বহু লোক ডুবে যায় এমনকি নৌকা আর ফেরি ডুবে গেলে উদ্ধার কাজ করার বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আমরা একটু ঘুরে ওই মাঝের চরে যাব যেখানে এখন প্রশিক্ষণ চলছে।

আমরা স্পিড বোটে চড়লাম। বোটটি প্রথমে আমাদেরকে মহাত্মা গান্ধী ব্রিজের নিচে দিয়ে পূর্ব দিকে ঘুরিয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দিকে নিয়ে চলল। মুকুল সাঁতার জানে না তাই তাকে লাইফজ্যাকেট পরতে বললে কিছুটা ইতস্তত করে বলল, 'আরে সবার যা হবে আমারও তাই হবে।' এখানে তো রেসকিউ টিম রয়েছে।

www.pathagar.com

'তুমি ডুবলে অসুবিধে নেই। তুমি তো তোমার দেশেই ডুববে। আমরা তো বিদেশি। আমরা ডুবলে খবরের কাগজে বিদেশি ডুববার খবর বড় করে ছাপবে।' কামরুলের চট মন্তব্য। সবাই হাসলাম। মুকুলকে নিয়ে বেশ কৌতুক শুরু হল।

গঙ্গা নদীতে তেমন পানি নেই। একেবারেই শান্ত। এই নদীই ফারাক্কা হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। যেতে যেতে উপেন্দ্র কুমার বললেন, 'এই ব্রিজের নাম মহাত্মা গান্ধী সেতু'– ভারতের অন্যতম দীর্ঘ ব্রিজ প্রায় ৫,৫৭৬ মিটার (প্রায় সাড়ে পাঁচ কি. মি.) দৈর্ঘ।

আমরা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পৌঁছলাম। ধু ধু বালুরচর কোথাও কোথাও সামান্য ঘাস। শীতের রোদ তেমন প্রখর নয়, তবুও কিছুটা গরম অনুভব করলাম। জনাবিশেক শিক্ষার্থী। সবাই প্রায় একই বয়সের যুবক। সুঠামদেহী। একজন প্রশিক্ষক কিভাবে ডুবন্ত মানুষকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হয় তার উপরে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। আমাদের জন্য কয়েকটি চেয়ার পাতা। কিছুক্ষণ বসলাম। এরই মধ্যে উপেন্দ্র কুমার চা আর চিপস-এর বন্দোবস্ত করলেন। চা পান শেষে প্রায় আধাঘণ্টা কাটিয়ে আমরা ফিরবার প্রস্তুতি নিলাম। সতেন্দ্র দাঁড়িয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে আমাদের পরিচয় তুলে ধরে আমাকে কিছু বলতে বললেন। অগত্যা আমি কিছুটা ইংরেজি কিছুটা হিন্দি মিলিয়ে এ ধরনের প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরলাম। আমাদের দেশের নদী আর বন্যার কথা বললাম। মোটামুটি একটা নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখলাম। এখন ঝট বক্তব্য রাখতে অসুবিধা হয় না। আমরা বাঙালিরা কথাতে বেশ পটু আর এসব ক্ষেত্রে বক্তব্য রাখতে এতদিনে অভ্যস্ত হয়েই পড়েছি। কাজেই পূর্ব প্রস্তুতি না থাকলেও কিছু বলা যায়। বক্তব্য শেষে সবার কাছ থেকে বিদায় দিয়ে স্পিড বোটে পাটনার পাড়ে ফিরলাম।

এদিকের পাড়ে উঠতে উঠতে দেখলাম ছোটখাটো একটি সভার মত। চেয়ার টেবিল পাতা। সামনে দুই শত সাধারণ মানুষ বসা। কোন একজন বক্তব্য দিচ্ছেন। ভাবলাম হয়ত কোন রাজনৈতিক সভা হচ্ছে। সতেন্দ্র বললেন যে, এটা কোন জনসভা নয়। মৎস্যজীবী সংগঠন এ নদীতে লাইসেন্স প্রাপ্ত জেলেদের এ মৌসুমে মাছ ধরবার বিভিন্ন আইন-কানুন নিয়ে মতবিনিময় করছেন। বিষয় হল কি ধরনের মাছ ধরা যাবে বা যাবে না। সেগুলোর চর্চা হচ্ছে। এটা বিহার সরকারের নির্দেশে এ ধরনের মতবিনিময় সভার আয়োজন। জানি না আমাদের দেশে এ ধরনের সভা হয় কিনা। আমাদের দেশেও বছরের নির্দিষ্ট সময়ে কিছু কিছু মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকে বিশেষ করে ইলিশ মাছের প্রজননের সময়ে।

আমরা তীরে উঠে এসে গাড়িতে উঠবার সময়ে উপেন্দ্রকুমার তিনটি প্যাকেট নিয়ে এসে আমাদের হাতে দিয়ে বিনীতভাবে বললেন, 'স্যার আমাদের তরফ থেকে সামান্য উপহার। দয়া করে গ্রহণ করবেন।' আমি অভিভূত হলাম। তাকে ধন্যবাদ জানালাম।

www.pathagar.com

তিনি জানালেন যে ওই প্যাকেটে বিহারের হস্তশিল্পের তৈরি একটি করে বিছানার চাদর রয়েছে। আমরা তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে জালান হাউসের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম।

সঞ্জিব জানালেন যে, জালান হাউসে যেতে হলে আমাদেরকে পাটনার পুরাতন অংশ দিয়ে যেতে হবে। তিনি আমাদেরকে শহরের নতুন অংশ দিয়ে নিয়ে যাবার পথে সতেন্দ্রর নির্দেশে পথের উপরে বিশাল এক গোলাকার আকৃতির ঘরের সামনে নিয়ে আসলেন। আমরা নামলাম। সতেন্দ্র বললেন যে, এটি পাটনার একটি দর্শনীয় বস্তু। উপরে চড়বার সিঁড়ি রয়েছে। বেশ উপরে। ওখান থেকে পুরো পাটনা শহর দেখা যায়। বিশাল আকৃতির এ গোলঘর। এ নামেই পরিচিত। এখান গোল ঘরের চারদিকে উদ্যান উন্নয়নের কাজ চলছে।

গোলঘরটি প্রায় আড়াই শত বছর পুরাতন। ১২৫ মিটারের প্লিন্থ্ এরিয়ার উপর ২৯ মিটার উচ্চ এ ঘরটি তৈরি করা শেষ হয়েছিল ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া গভর্নর কাউন্সিলের নির্দেশে। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর তত্ত্বাবধানে। এর প্রেক্ষাপট ছিল ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময়। স্মরণকালের ইতিহাসে এতদঞ্চলে ওই দুর্ভিক্ষই ছিল ভয়াবহ। প্রায় এক কোটি লোক না খেয়ে মারা গিয়েছিল। ইতিহাসে এটিকে ৭০-এর মন্বন্তর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ওই সময়ের পর এ গোলঘর ব্যবহৃত হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্য গুদাম হিসাবে। এখানে ১,৪০,০০০ টন খাদ্য মজুদ রাখা যেত। এ ঘরটি তৈরি করবার দায়িত্বে ছিলেন ব্রিটিশ আর্মির ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন জন গারস্টিন। গুদামের এক পাশে কালো পাথরের উপরে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রয়েছে। এর সামনেই পাটনার সবচাইতে বড় ময়দান 'গান্ধী ময়দান'। যে রাস্তা দিয়ে আমরা এসেছি তার নাম একজিবিশন রোড। সতেন্দ্র জানালেন এ গুদাম বা গোলঘরটি পাটনার অন্যতম দর্শনীয় স্থান। আমি তাকে বললাম, 'লিফট লাগালে এখানে চড়তে সুবিধা হতো। তিনি জানালেন যে, এ জায়গার উন্নয়ন পরিকল্পনায় এ বিষয়টি রয়েছে।'

আমরা গোলঘর ছেড়ে গান্ধী ময়দানের পাশ দিয়ে পুরাতন পাটনায় প্রবেশ করলাম। উপমহাদেশের পুরাতন শহর যেমন হয় পাটনার এ অংশটিও তেমনি। রাস্তাগুলো খুব চওড়া নয়। কোন রকমে দুটো গাড়ি চলতে পারে। প্রচুর রিকশা আর দু'পাশে পুরাতন ধাঁচের নড়বড়ে বাড়িঘর। দরওয়াজা কাচা কিলা 'পার হয়ে' 'সিটি চক' হয়ে আমরা কথিত কিলা হাউস বা জালান হাউসের গেটে প্রবেশ করলাম। বাড়িটির দুটি অংশ। একাংশে নতুন একটি দালান অপর অংশটি পুরাতন দালান। এ অংশের প্রাসাদতুল্য বাড়িটি চুনসুরকি সিমেন্টের মিশ্রণে তৈরি। বিশাল গাড়ি বারান্দা। সামনে লন আর তার মাঝে একটি ফোয়ারা। এখানেই একসময় ছিল হিন্দুস্থানের ইতিহাস খ্যাত পাঠান বংশের সম্রাট শেরশাহ সূরীর কেল্লা। কেল্লার মাত্র একটি বুরুজ রয়েছে

www.pathagar.com

বাড়িটির পশ্চিম পাশে গঙ্গা নদীর কোল ঘেঁষে। বাড়িটি একেবারে গঙ্গা নদীর উপরে, তবে নদী হতে বাড়ির চত্বর পর্যন্ত দেয়াল দিয়ে বাঁধা দেখেই সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, একসময় এটি ছিল কেল্লার ভিত। নদীর ঠিক তীরে লনের পূর্বপাশে একটি ছোট তবে আধুনিক দালান-এটি জালানদের বিশেষ মেহমানদের থাকবার জন্য বানানো রেস্ট হাউস। বাড়িটি প্রথম দর্শনেই মনে হবে একটি জাদুঘরের মত। ব্রিটিশ শাসনের সময়ে তৈরি এর স্থাপত্য নকশা। সামনের দরজাটি অত্যন্ত দর্শনীয়। আমরা গাড়ি নিয়ে বিশাল গাড়ি বারান্দায় এসে নামলাম। আমাদের অভ্যর্থনার জন্য বাড়ির একজন কর্মচারী অপেক্ষায় ছিলেন।

আমরা চারজনে নেমে আসলে তিনি অভ্যর্থনা জানিয়ে দরজায় প্রবেশের পূর্বে আমাদেরকে জুতা খুলবার অনুরোধ জানালেন। বাড়িটি দোতলা, এখনও জালান পরিবারের সদস্যরা বাসস্থান হিসাবে ব্যবহার করেন। নিচের কয়েকটি বিশাল রুম যার মধ্যে ড্রইং রুমও রয়েছে। তবে যেহেতু নিচের সব রুমই এন্টিকে ভর্তি তাই এ ড্রইং রুমটি বিশেষ অতিথি ছাড়া ব্যবহার হয় না। কর্মচারী বললেন, 'স্যার এ বাড়িতে বর্তমানে থাকেন অদিতি জালান। তিনি আমাকে এ প্রাইভেট জাদুঘর দেখাতে বলেছেন। অদিতি জালান কিছুক্ষণ পর আপনাদের সাথে মিলিত হবেন।' আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম। করিডোর থেকেই সংগ্রহশালা শুরু হয়। করিডোরের একমাথায় ভিক্টোরিয়ান স্টাইলের সিঁড়ি উঠে গিয়েছে দোতলায়। আর সামনে বেশ একটু জায়গা সেটি এক সময় ব্যবহার হতো বলরুম হিসেবে।

জালান হাউস বা কিলা (কেল্লা) হাউসের এবং এই ব্যক্তিগত সংগ্রহশালার গোড়াপত্তন করেছিলেন রাধাকৃষ্ণ জালান।

আর কে জালানের (রাধাকৃষ্ণ) পূর্বপুরুষরা ছিলেন রাজস্থানের বাসিন্দা। আর কে জালান ব্যবসায়িক সূত্রে বর্তমান বিহারের বাসিন্দা হন। এই বাড়িটির আদি মালিক ছিলেন গয়ার নবাব। এর পূর্বে এটি ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে। আর কে জালান, অদিতি জালানের প্রোপিতামহ, জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে এবং এ জায়গা খরিদ করেন ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরপরই আর কে জালান এই ঐতিহাসিক জায়গার মালিক হন একেবারেই এক ঘটনাচক্রে। এই বাড়ি এবং এই ঐতিহাসিক জায়গা কেনার পর হতেই আর কে জালান খ্যাতির শিখরে উঠেন।

আর কে জালানের এই সম্পত্তি কেনার পেছনে ছোট ঘটনা রয়েছে। আর কে জালান আর গয়ার নবাব ট্রেনে একই বগিতে পাটনার উদ্দেশ্যে সফর করছিলেন। দু'জনের সাথে পরিচয় হয় এবং আলাপচারিতার এক ফাঁকে নবাব সাহেব পাটনায় তার সফরের কারণ খুলে বলেন। নবাব সাহেব বহুদিন থেকে পাটনার সম্পত্তি বিক্রি করতে চাইছিলেন। কিন্তু মনমত খরিদ্দার না পাওয়াতে তিনি কিছুটা হতাশ হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

অনেকেই এই সম্পত্তি কিনতে চায়নি কারণ জনশ্রুতি ছিল যে জায়গাটি ভুতুড়ে। এখানে অতীতে বহু মানুষ খুন হয়েছিল।

নবাব সাহেব পাটনায় পৌঁছলে তিনি তার বাহন না পেয়ে বিচলিত হলেন। নবাবকে অসহায় দেখে আর কে জালান নিজের বাহনে নবাব সাহেবকে এখানে পৌঁছে দেন। এই সম্পত্তিটি দেখে আর কে জালান নির্দ্বিধায় খরিদ করতে আগ্রহী হলেন। পরে ৩০,০০০ রুপি দিয়ে বাড়িসহ সমগ্র জায়গাটি খরিদ করে নেন। জালান এমন একটি জায়গার মালিক হলেন যেখানে এক সময় প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় ভারতের বহু সম্রাট, রাজা/মহারাজারা বাস করেছিলেন। এরপর হতেই আর কে জালান পিছে ফিরে তাকাননি। ওই সময়ে ব্রিটিশ ভারত সরকারের সাথে ব্যবসায়িক এবং সামাজিক সান্নিধ্যের মধ্য দিয়ে জালান পাটনার অন্যতম নাগরিক হয়ে উঠেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর রসদ যোগানে সহযোগিতা এবং অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্য ব্রিটিশ সরকার আর কে জালানকে 'দিওয়ান বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

ক্রমেই আর কে জালান ব্রিটেনের শাসকগোষ্ঠীর সান্নিধ্য লাভ করেন। তাকে তৎকালীন ব্রিটেনের রাজা পঞ্চম জর্জের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে ব্যক্তিগতভাবে নিমন্ত্রণ করে লন্ডনে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে রাজা ষষ্ঠ জর্জ এবং ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাজপোষেও আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন। ওই সময় থেকেই শখের বশে সংগ্রহ শুরু করেন তৎকালীন ও ঐতিহাসিক দ্রব্যাদি। নিজ বাড়িতে গড়ে তোলেন ছোটখাটো জাদুঘর। ভারত স্বাধীন হবার পর পণ্ডিত নেহেরু এবং রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ এ বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। অভিভূত হয়েছিলেন আর কে জালানের সংগ্রহশালা দেখে। পণ্ডিত নেহেরু দু'বার এসেছিলেন। প্রথমবার তিনি একটি চেয়ারের হাতলে পা রেখে উঁচুতে রক্ষিত একটি জার্মান ঘড়ি দেখতে গিয়ে হাতল ভেঙে ফেলেছিলেন। সেই চেয়ারটি তেমনিভাবে এখনও রক্ষিত রয়েছে সংগ্রহের তালিকায়। জালানদের এই ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় রয়েছে ভারতসহ বিশ্বের বহু জায়গা হতে সংগৃহীত বহু দুর্লভ বস্তু। রয়েছে মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সুলতান, মোগল আর ব্রিটিশ শাসন আমলের দুর্লভ সব ঐতিহাসিক দ্রব্য। সংগ্রহশালায় রয়েছে ইউরোপের বহু দ্রব্য। সংগৃহীত আছে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের মুদ্রা। রয়েছে বহু মূল্যবান পেইন্টিং আর পারস্যের গালিচা। কয়েকটি সংগ্রহ রীতিমত চমকপ্রদ। এর মধ্যে রয়েছে ঢাকার মসলিনের থান; টিপু সুলতানের পালকি, সম্রাট আকবরের নবরত্ন সভার অন্যতম রাজা বীরবলের রূপার তৈরি তৈজসপত্র, খাবার প্লেট ইত্যাদি। আরও রয়েছে মোগল সম্রাটদের জন্য তৈরি বিশেষ চীনা মাটির প্লেট। এ প্লেটগুলোতে খাবার পরিবেশন করা হতো এরই মাধ্যমে পরখ করা হতো বিষক্রিয়া যুক্ত খাবার। প্লেটে বিশুদ্ধ খাবার না থাকলে ফাটল ধরতো প্লেটে। এমনি ফাটল ধরা প্লেট রয়েছে সংগ্রহশালায়। আমাদেরকে পরে অদিতি

www.pathagar.com

জালান জানিয়েছিলেন যে পণ্ডিত নেহেরু এর সত্যতা যাচাই করতে চেয়েছিলেন। সে কারণেই আর্সেনিক মেশানো খাবার রাখা হয়েছিল একটি প্লেটে, ওই প্লেটটিতেই ফাটল ধরেছিল।

আমরা করিডোরে রক্ষিত দ্রব্যাদি বিস্মিত নয়নে দেখতে দেখতে প্রথম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলে অদিতি জালান এসে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। মধ্য তিরিশের কোঠায় বয়স। গায়ে আচকান আর সাদা চুড়িদার পাজামা পরা অত্যন্ত বিনয়ী অদিতি জালান নিজে সংগৃহীত দ্রব্যাদির বিবরণ দিতে দিতে দেখাচ্ছিলেন। তিনি জানালেন, তার প্রোপিতামহের সময় হতে এসব ঐতিহাসিক দ্রব্যাদির সংগ্রহ যেভাবে শুরু হয়েছে তা এখনও অব্যাহত রয়েছে। আরও বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি রয়েছে স্টোর রুমে। তিনি বললেন যে, সর্বসাধারণের জন্য এ সংগ্রহশালা উন্মুক্ত নয়। গতরাতে সতেন্দ্র-এর অনুরোধ এবং আমাদের পরিচয় পেয়েই তিনি রাজি হয়েছেন আমাদেরকে দেখাবার জন্য। আমি তাকে আমাদেরকে এই সম্মান দেবার জন্য ধন্যবাদ জানালাম। তিনি জানালেন যে, তিনি দুন স্কুলে পড়াশুনার সময় কয়েকজন বাংলাদেশি ছাত্রের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন, তবে তিনি সঠিক নাম মনে রাখতে পারেননি।

অদিতি জালান জানালেন যে প্রথমবার পণ্ডিত নেহেরু যখন এ বাড়িতে আসেন তখন তাকে রাজা বীরবলের তৈজসপত্র ব্যবহার করে এবং ওই রূপার প্লেটে খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল। নেহেরু প্রথমে একটু ইতস্তত করলেও ওই খাবার খেয়েছিলেন। তিনি মোগল প্লেটের কাহিনীও শুনালেন। আমি বললাম যে এ ধরনের প্লেট ঢাকার লালবাগ কেল্লার জাদুঘরে দেখেছি।

অদিতি আমাদেরকে একটি রাজকীয় পালঙ্ক দেখিয়ে বললেন যে, এটি ব্যবহার করতেন ফ্রান্সের এক সময়কার রাজা তৃতীয় নেপোলিয়ন। ফ্রান্সের রাণী ম্যারি ক্রুটোনিটের ব্যক্তিগত দ্রব্যাদি রক্ষিত একটি শোকেস দেখালেন। রাণী এনটোনিয়া যোশেফ জোহানা ছিলেন ষোড়শ লুইয়ের স্ত্রী তারও ব্যবহৃত কিছু দ্রব্যাদি দেখালেন। আরও দেখালেন ফ্রান্সের আরেক রাজা দ্বিতীয় হেনরির ব্যক্তিগত ক্যাবিনেট। রাজা দ্বিতীয় হেনরি ফ্রান্স শাসন করেন ১৫৪৭ হতে ১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি আমাদেরকে দেয়ালে টাঙ্গানো তিনটি মোগল তরবারি দেখিয়ে বললেন 'মধ্যেরটি সম্রাট আওরঙ্গজেবের আর বাকি দু'টি তারই নাতী বাংলার সুবেদার আজিম-উস-সান-এর।'

পরের রুমে যাবার পূর্বেই আমি অদিতিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনাদের সংগ্রহে ঢাকার মসলিন রয়েছে সেটা কি এখানে কোথাও আছে? দেখতে পাব?'

অদিতি একটু বিস্মিত হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এ কাপড়ের কথা জানলেন কিভাবে। এটাতো আমরা বাইরে রাখি না। আমার প্রোপিতামহের সংগ্রহ সম্পূর্ণ থান। পুরাতন এবং অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য বলে সাধারণত আমরা আগ্রহী না হলে

www.pathagar.com

দেখাই না।' আমার এ তথ্যে আমার সাথের সবাই কিছুটা বিস্মিতও হল।

আমি বললাম, 'আজ সকালেই পাটনা টাইমস-এর সংস্কৃতি পাতায় আপনার এবং এ বাড়ির সংগ্রহশালার বিবরণ দিতে গিয়ে ঢাকার মসলিনের উল্লেখ করেছে।' অদিতি মৃদু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ বেশ কিছুদিন আগে একজন সাংবাদিক এসেছিলেন বটে।' পরে তিনি নিজে স্টোরে গিয়ে অতি সযত্নে রাখা কাপড় দিয়ে মোড়ানো একটি প্যাকেট থেকে বের করলেন জগৎ বিখ্যাত ঢাকাই মসলিন। কিছুটা বিবর্ণ তবে সত্যিই অদ্ভুত এক কাপড়। অদিতি জানালেন যে, পুরো থানের ওজন মাত্র সাড়ে তিন আউন্স। পুরো থানটি একটি রিং-এর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করানো যায়। তবে এখন সে চেষ্টা করেন না কারণ থানটি বেশ পুরাতন বলে।

আমি বললাম, 'মি. অদিতি আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনি আমাদেরকে এ কাপড় দেখিয়ে সম্মানিত করেছেন। বাল্যকাল থেকে শুনেছি আর ইতিহাসে পড়েছি কিন্তু কখনই এমনভাবে দেখব তা ভাবিনি।' অদিতি আমার কথার উত্তরে একটা অমায়িক হাসি দিলেন মাত্র।

আমরা বহুক্ষণ ধরে প্রতিটি দ্রব্য দেখলাম। দেখলাম সমুদ্র গুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত-১ এবং স্কন্দাগুপ্তের রাজকীয় সীল (Seal)। তিনটি রুম দেখা শেষ হলে যে সোফায় বসালেন সেটি অষ্টাদশ শতাব্দীর আসবাব ফ্রান্স থেকে সংগ্রহ করা। অদিতি জানালেন যে, সময় সময় সোফার কাপড় বদলানো হয় মাত্র। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে চা আর তিন প্রকারের মিষ্টি জাতীয় খাবার পরিবেশন করলেন। অদিতি নিজে চা বানাতে বানাতে বললেন, 'খাবারগুলো বাসায় তৈরি। আমরা বাইরের খাবার পরিবেশন করি না। আপনাদের উপলক্ষেই এগুলো তৈরি করা।' চায়ের সাথে অতি যত্নে তৈরি সন্দেশ জাতীয় মিষ্টি খেলাম। আমরা অদিতির আতিথেয়তায় অভিভূত হলাম। পরে জালান হাউসের বিখ্যাত ভিজিটরস বইতে সকলেই মতামত দিয়ে সই করলাম। পাতা উল্টিয়ে দেখলাম বহু বিখ্যাত ব্যক্তির নাম, মতামত আর দস্তখত রয়েছে। আমি আমার মন্তব্যে লিখেছিলাম। আমি অভিভূত হয়েছি।

আমরা চা পান শেষে বাইরে লনে আসলাম। সঞ্জিব তার গাড়ি নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে চা নাস্তা শেষ করছিলেন। অদিতি ফোয়ারার মাঝে একটি ভাস্কর্য দেখিয়ে বললেন, 'এই স্ট্যাচুটা দেখছেন এটি ব্রিটেনের এবং তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের রাজা পঞ্চম জর্জ। আপনারা বোধ করি জানেন যে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এনার উদ্দেশ্যেই ওই কবিতা রচনা করেছিলেন।' আমরা চুপ রইলাম। অদিতি আরও বললেন যে, এ মূর্তিটি স্বাধীনতার পর স্টেট এসেম্বলির সামনে হতে সরিয়ে ফেললে তারা সংগ্রহ করে এখানে নিয়ে আসেন।

আমি জালান হাউস ছাড়বার পূর্বে টয়লেট ব্যবহার করতে চাইলে আমাকে নদীর

www.pathagar.com

ধারের গেস্ট হাউসে নিয়ে আসলেন একজন কর্মচারী। কয়েকধাপ নিচের গেস্ট হাউসটির ভেতরে ঢুকলে মনে হয় সম্পূর্ণ দালানটি পানির উপরে ভাসছে। শোবার রুমের জানালা দিয়ে গঙ্গা নদীর পূর্ণ দৃশ্য দেখা যায়। কর্মচারী জানালেন, এটি তৈরি করা হয়েছিল নেপালের প্রয়াত রাজার আগমনের সময়। তিনি একরাত এখানে থেকেছিলেন। এখানে রাজপরিবারের এক সদস্যের বিবাহও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আরেক সদস্যের রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে এ বাড়ি নিয়ে নানা ধরনের গুজবের পুনঃজন্মও হয়েছিল।✦

আমরা অদিতি জালানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পুরাতন পাটনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে শিখ সম্প্রদায়ের অন্যতম তীর্থস্থান গুরুদুয়ারা হরমন্দির সাহেবে উপস্থিত হলাম। এ জায়গাটিতেই শিখদের দশম গুরু গোবিন্দ সিং-এর জন্ম হয়েছিল। গোবিন্দ সিং ছিলেন নবম গুরু তেগ বাহাদুর সিং-এর পুত্র। শিখদের নবম গুরু তেগ বাহাদুর সিং-এর দিল্লীর চাদনী চকে শিরোশ্ছেদ করা হয়েছিল সম্রাট আওরঙ্গজেবের আদেশে। সেখানেই পরে তৈরি হয়েছিল একটি গুরুদুয়ারা শিসগঞ্জ সাহেব।[১]

গুরুদুয়ারার সামনে প্রচুর ভক্ত। শিখদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরা। এদের মধ্যে অনেকের কোমড়ে গোঁজা কৃপাণ (এক প্রকার ছুরি) আর হাতে রঙ্গিন কাপড়ের খাপযুক্ত তলোয়ার। এরা হলেন খালসা সেনা। খালসারা শিখদের ধর্মীয় সেনা। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গুরু গোবিন্দ সিং যার জন্মস্থান রয়েছে এই গুরুদুয়ারার চত্বরে। আমি ইতিপূর্বে কখনই শিখদের প্রার্থনাস্থানে যাইনি। দিল্লীর চাদনী চকের তেগবাহাদুরের জন্য যে গুরুদুয়ারা রয়েছে, সেখানে যাবার ইচ্ছা থাকলেও যাইনি। যায়নি যেহেতু আমি এ রকম জায়গায় দর্শনার্থীদের যাবার রেওয়াজ জানতাম না বলে। এখানে সতেন্দ্র আমাদের আসবার কথা বলে রেখেছেন তাই ভিতরে যেতে উৎসাহিত হয়েছি।

মন্দিরের সামনের গেট দিয়ে গাড়ি ভেতর নিয়ে গেলেন সঞ্জিব। সেখানে দাঁড়ানো মন্দির কমিটির কয়েকজন সদস্য। কামরুল নামতে চাইল না। অগত্যা আমি মুকুল আর সতেন্দ্র গাড়ি থেকে নামলাম। আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন মি. অজিদ চন্দ্র বরসী, তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি করেন। তার সাথে মি. ত্রিলেকে সিং যিনি রামবিলাস পাসওয়ানের দল এল পি-এর সদস্য। সাথে আরও অনেকে ছিলেন। সতেন্দ্র আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমরা কিছু দূর গিয়ে জুতা খুলে মাথায় রুমাল দিয়ে মাথা ঢাকলাম। আরেকটু এগুতেই দেখলাম পাত্রে পানি রাখা। ভক্তরা পানিতে পা দিয়ে ধুয়ে নিচ্ছেন। আমরাও তাই করলাম। পা ধুয়ে মন্দিরের প্রবেশ পথে এগুলাম। মি. ত্রিলোক সিং বললেন যে এটা গুরু গোবিন্দ সিং-এর বাড়ি ছিল। গুরু গোবিন্দ সিং-এর পিতা

১। লেখকের 'কতজনপদ কত ইতিহাস' পৃষ্ঠা ২৫১-২৫২.

✦ জালান হাউসের বিবরণ নেয়া হয়েছে, কিলা হাউস এন্ড জালান কালেকশন নামক 'হ্যান্ডবুক' থেকে।

www.pathagar.com

গুরু তেগসিং-এর হত্যার কাহিনী বলতে গেলে আমি জানালাম যে ওই ইতিহাস আমার পরিচিত এবং আমার একটি বইতে উল্লেখ রয়েছে। ত্রিলোক সিং আমার কথা শুনে বেশ খুশি হলেন বলে মনে হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন বাংলাদেশে শিখ সম্প্রদায় রয়েছে কিনা? আমি জানালাম বাঙালি শিখ ধর্মাবলম্বী বাংলাদেশে আছে এমনটা আমার জানা নেই। তবে ভারতসহ পৃথিবীর বহু দেশ থেকে অনেকেই বিভিন্ন কাজে বাংলাদেশে আসেন।

আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম। মেঝের সম্পূর্ণটা কার্পেট মোড়ানো। সামনের বেদিতে তখ্‌ত যার উপরে গ্রন্থসাহেব রাখা। আর তার সামনে গুরুর স্থান যার সামনে বসে দু'জন শিখ গুরু চামর দুলাচ্ছেন। এখানে ভক্তরা এসে প্রথমে প্রণাম করেন, তারপর এগিয়ে গিয়ে দ্বিতীয়বার প্রণাম করেন গ্রন্থসাহেবের সামনে। সেখানে বসা প্রধান গুরু বা পুরোহিত। সাথে আরও কয়েকজন ভক্তদের মিষ্টি জাতীয় খাবার বিতরণে ব্যস্ত। ত্রিলোক সিং এগিয়ে প্রধান পুরোহিতের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি উঠে এসে আমাদের সাথে করমর্দন করলেন তবে বেদি থেকে নিচে নামলেন না। লম্বা চওড়া গুরুর মাথায় ঐতিহ্যবাহী রঙ্গিন পাগড়ি। মুখ ভর্তি লম্বা সাদা দাড়ি আর গোঁফ। শিখ ধর্মের পাঁচ 'ক' তার শরীরে। পাঁচ ক হল, কেশ, কখনই কাটা হয় না। কঙ্গনা হাতের তামার বালা, জন্ম হতেই ধারণ করতে হয়। কাচ্ছা, জন্ম হতেই পরতে হয়। কাঙ্গি, ছোট চিরুণী চুলে গাঁথা আর কৃপাণ, বিশেষ ধরনের ছুরি সাথে রাখতে হয়। তবে ছুরি এখন আর সব সময় থাকে না শুধুমাত্র কোন উৎসবে রাখা হয়। মহিলারা চুল খোলা রাখলেও পুরুষেরা সব সময়ই পাগড়ি অথবা বিশেষ আচ্ছাদন দ্বারা চুল ঢেকে রাখেন। প্রধান পুরোহিত আমাদের সাথে করমর্দন করবার পর গলায় একটি রঙ্গিন কাপড় ঝুলিয়ে দিলেন আর হাতে দিলেন এক প্যাকেট রেউরী জাতীয় মিষ্টান্ন।

মি. ত্রিলোক সিং তখ্‌তের উপরে লটকানো একটি তলোয়ার আর কৃপাণ দেখিয়ে বললেন, 'ইয়ে চিজ গুরু গোবিন্দ সিং জিকে হ্যায়।' পরে তিনি আমাদেরকে তখ্‌তের ঠিক পেছনে নিয়ে আসলেন। পেছনে একটি ছোট কুঠরির মত। সম্পূর্ণ ফরাসটি লাল কাপড়ে ঢাকা। একটি লাল রংয়ের বাল্ব জ্বালানো। সামনে রেলিং দেয়া। অনেক মহিলা পুরুষ ভক্ত সামনের ফরাসে সাষ্টাঙ্গে (শুয়ে) প্রণাম করছেন। মি. ত্রিলোক সিং বললেন, 'এ জায়গাতেই গুরু গোবিন্দ সিংজি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখতের ভেতর দিয়েও এ জায়গায় আসা যায়।' আমরা নিঃশব্দে তাঁর কথা শুনছিলাম। তিনি দেয়ালে কয়েকটি তীর এবং একটি ধনুক দেখিয়ে বললেন যে এগুলো গুরুর ছেলেবেলার খেলার সামগ্রী। গুরু তীর নিয়ে খেলতে ভালবাসতেন। পরিণত বয়সে গুরু ভাল তীরন্দাজ ছিলেন।

গুরু গোবিন্দ সিং জন্মগ্রহণ করেছিলেন ডিসেম্বর ২২, ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে। মৃত্যুবরণ করেন অক্টোবর ৭, ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দে। মাত্র দু'দিন আগে এখানে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে

www.pathagar.com

বিশাল আয়োজন এবং বিশেষ প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি শিখ ধর্মের শেষ মানব গুরু। তিনিই গুরু গ্রন্থ সাহেব লিখিত আকারে প্রবর্তন করেন এবং গ্রন্থ সাহেব প্রবর্তনের মাধ্যমে শিখদের গুরুর সমাপ্তি টানেন।

গুরু গোবিন্দ সিং ছিলেন একজন যোদ্ধা। তিনি তার জীবদ্দশায় মোগল এবং অন্যান্য হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ করেন। এক পর্যায়ে মোগলদের রোষানল থেকে তাকে রক্ষা করেছিলেন দুইজন পাঠান রাজা। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের শেষ জীবনে তিনি গুরু গোবিন্দ সিং-এর সাথে বিবাদ মিটাতে চেয়ে গোবিন্দ সিং-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন। গুরু গোবিন্দ সিং রাজিও হয়েছিলেন, কিন্তু আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হলে গোবিন্দ সিং-এর সাথে বিবাদের মীমাংসা হতে পারেনি। কথিত আছে যে গুরু গোবিন্দ সিং-এর ভূমিষ্ঠ হবার এবং একজন ধর্মীয় গুরু হবার বিষয়টি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন পাঞ্জাবের একজন মুসলমান সুফী পীর।

ত্রিলোক সিং গুরু গোবিন্দ সিংজির জীবন বৃত্তান্ত আমাদেরকে শুনাতে শুনাতে তখ্‌তের এককোণায় একটি কূয়ার সামনে নিয়ে আসলেন। তিনি বললেন যে এটিই ছিল এখানকার একমাত্র কূয়া এবং ছিল পরিবারের সম্পত্তি। তবুও এখান থেকে গ্রামের মহিলারা পানিতে নিতে আসতেন। গোবিন্দ সিংজি বাল্যকালে নটখটে ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি তীর ধনুক নিয়ে খেলতেন। প্রায় সময়েই তিনি মহিলাদের পানিভরা কলসি লক্ষ্য করে তীর চালাতেন আর কলসি ভাঙতেন। একবার কয়েকজন মহিলা বিরক্ত হয়ে তাঁর মাতাজির কাছে নালিশ নিয়ে গেলে তিনি বলেন যে অনেক কলসির ভেতরে সাপ উঠে আসে এবং তিনি দেখতে পান বলেই ওই সব কলসিতে তীর মারেন।

আমরা ত্রিলোক সিংজির বয়ান একাগ্র চিত্তে শুনলাম। আমরা আস্তে আস্তে পুনরায় তখ্‌তের কাছে এসে প্রধান পুরোহিতকে ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়ির কাছে পৌঁছলে সেখানে মোটামুটি ছোটখাটো ভিড় জমল। ততক্ষণে খবর রটে গেল যে বাংলাদেশ থেকে একজন মন্ত্রী গুরুদুয়ারা দেখতে এসেছেন। আমি তাদের ভুল ভাঙিয়ে নিজ পরিচয় দিলে তারা আরও খুশি হয়ে বললেন যে, তারা বাংলাদেশ সম্বন্ধে জানেন এবং ওখানে সব সম্প্রদায়ের মানুষ যেভাবে সম্প্রীতির সাথে থাকেন তাও তারা জানেন। আমাদের দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু খোঁজ-খবর রাখেন। মনে হল এরা সবাই গুরুদুয়ারা কমিটির সাথে সম্পৃক্ত।

আমরা সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে গুরুদুয়ারা থেকে বের হলাম। আমি কামরুলকে বললাম, 'তুমি অনেক কিছুই মিস করলে।' 'কামরুল বলল, 'আসলে আমি বুঝতে পারিনি এখানে কি দেখবার আছে।' সতেন্দ্র বললেন, 'গেলে ভাল হতো'। আমি সবার কথাই বলেছিলাম। আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'আমার মনে হয় আওরঙ্গজেব

www.pathagar.com

আমাদের মত লোকের পাল্লায় পরেই গুরু গোবিন্দ সিং-এর পিতার শিরোচ্ছেদ করেছিলেন। এ জন্যই কামরুল ভয়ে যায়নি।' কামরুল মুচকি হাসল। সতেন্দ্র বললেন, 'আমরা আগে দুপুরের খাবার খেয়ে নেই তারপর পাটনা জাদুঘরে যাব।'

সঞ্জিবকে পুরাতন শহর থেকে বের হয়ে দক্ষিণ ভারতীয় এক রেস্তোরাঁয় নিতে বললেন সতেন্দ্র। কিছু দূরে গিয়ে সঞ্জিব জ্যামের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সঞ্জিব বললেন, 'স্যার সামনে পুলিশ রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। চকের ওধারে যেতে দিচ্ছে না। আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন?'

সঞ্জিব পাশে দাঁড়ানো এক পুলিশ কনস্টেবলকে জ্যামের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানালেন যে, মুখ্যমন্ত্রী নিতিশ কুমারজি সিটি চকের মসজিদ পরিদর্শন করে পাশে পীর বাবার মাজারে ফুল ছড়াতে আসছেন। সে কারণেই রাস্তা সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে। আমি সতেন্দ্রকে বললাম, 'আমার মনে হয় নিতিশ কুমার পাটনাতেই ছিলেন এর মধ্যে তিনি দিল্লীতে যাননি।' সতেন্দ্রকে কেন একথা বলছি বুঝতে পেরে স্মিত হেসে বললেন, 'প্রসাদজি আমাদেরকে হয়ত বোকা বানাচ্ছিলেন। এরা এমনই শো অফ করেন। আমি এগুলো দেখে শুনে অভ্যস্ত।' আমি বললাম, 'আমার অভিজ্ঞতা আরও বেশি। বাংলাদেশে এগুলো অহরহ হয়। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নাম ভাঙাতে আমাদের দেশের এ ধরনের লোকেরা অত্যন্ত পটু। সতেন্দ্র বললেন, 'ইধার ভি একই হাল হ্যায়।' কিছুক্ষণের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ির বহর চলে গেলে সঞ্জিব আমাদেরকে কথিত রেস্তোরাঁর উদ্দেশ্যে নিয়ে চললেন।

আমাদের যাবার কথা ছিল দক্ষিণ ভারতীয় এক রেস্তোরাঁয়, কিন্তু সামনেই পড়ল রাজস্থানী খাবারের রেস্তোরাঁ। মত পরিবর্তিত হল। কামরুল বলল, 'চলুন রাজস্থানী খাবারই খেয়ে নেই। আমরা সবাই সম্মত হলাম। রেস্তোরাঁটি জাদুঘরের কাছেই। কাজেই খাবারের পর আমাদেরকে বেশি দূর যেতে হয়নি। মেনু দেখে সহজ খাবার রাজস্থানী বিরিয়ানী খাওয়ার সিদ্ধান্ত হল। দুপুরের খাবার শেষ করে আমরা পাটনা জাদুঘরের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। পথেই সতেন্দ্র মোবাইলের মাধ্যমে খবর পেলেন যে, কিছুক্ষণ আগে রাজগীর তথা নালন্দা জেলায় প্রায় ৫ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। কেন্দ্রস্থল নেপালের সীমান্তে যেখানে রিক্টার স্কেলে মাত্রা ছিল ৬.৫। সতেন্দ্র ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সচিব। কাজেই তিনি ডিস্ট্রিক প্রশাসনকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে ত্বরিৎ গতিতে প্রতিবেদন ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানাতে বলে সাথে রাখা ল্যাপটপ খুলে বসলেন।

আমরা বিদ্যাপতি মার্গ-এ পাটনা জাদুঘরে পৌঁছলে সতেন্দ্র বললেন যে, তিনি গাড়িতেই থাকছেন। কারণ, তিনি জেলা প্রশাসনের প্রতিবেদনের অপেক্ষায় রয়েছেন। প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে তাকে বিভিন্ন জায়গায় মতামতসহ তাঁর প্রতিবেদন

www.pathagar.com

পাঠাতে হবে। অগত্যা আমরা সতেন্দ্রকে বাইরে রেখেই পাটনা জাদুঘরে প্রবেশ করলাম। জাদুঘরটি চার তলা বেশ বড়। সামনে বিশাল সবুজ ঘাসের চত্বর। জাদুঘরের সামনের চত্বরে রাখা রয়েছে বেশ কিছু মধ্যযুগীয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন সাইজের কামান।

আমরা প্রথমে বাঁয়ের গ্যালারিতে প্রবেশ করলাম। এখানে প্রাচীন ভারতের, প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ হতে মৌর্য, গুপ্ত এবং কুশান সাম্রাজ্যের সময়ের বহু দুষ্প্রাপ্য পোড়া মাটি, পাথরের মূর্তিসহ ওই সময়কার হাঁড়ি-পাতিল-বাসন ইত্যাদি রাখা রয়েছে। বারান্দায় বিশাল এক গাছের ফসিল যার বয়স আনুমানিক তিন হাজার বছর বলে উল্লেখ রয়েছে। আমরা নিচের গ্যালারিগুলো দেখা শেষ করে উপরের তলায় উঠলাম। উপরে উঠে কামরুলকে পেলাম না। আমার সাথে মুকুল। মুকুলকে কামরুল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে সে ও সদুত্তর দিতে পারল না। অবশেষে কামরুলকে বাদ দিয়েই আমরা দোতলায় উঠে প্রথম গ্যালারিতে সম্রাট বিম্বিসার আর পুত্র অজাতশত্রুর পাটালিপুত্রার পুনঃগঠিত নকশা দেখছিলাম। পাটালিপুত্রা ৪০০ খ্রিস্টপূর্বে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম নগরী ছিল। অজাতশত্রুর শহরের উপরেই গড়ে উঠেছে আধুনিক শহর পাটনা। আজকের বিহার ছিল ঐতিহাসিক মগধরাজ্য। সম্রাট অশোকের সময় জনসংখ্যার দিক থেকে এই শহর বিশ্বের সর্ববৃহৎ শহর ছিল। ওই সময় জনসংখ্যা ছিল ১,৫০,০০০ হতে ৩,০০,০০০।

সাম্রাজ্য, ইতিহাস আর ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত বর্তমান রাজ্য বিহার বা প্রাচীন মগধ। মানব সভ্যতার ইতিহাসে বর্তমান শহর পাটনা আর বিহার একমাত্র অঞ্চল যেখানে নিরবচ্ছিন্ন জনপদ ছিল। এখানে উত্থান আর পতন হয়েছে সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য। উত্থান আর পতন হয়েছে মহাপরাক্রমশালী সম্রাটদের। বিস্তীর্ণ আর বিভিন্ন রাজ্য অঙ্গিভূত হয়ে ভারতবর্ষ নামে বিশাল জনপদের সৃষ্টি হয়েছে। পাটালিপুত্রা কেন্দ্রিক যে রাজ্য গড়ে উঠেছিল এক সময়ে তার ব্যাপ্তি ছিল চট্টগ্রাম হতে হিন্দুকুশ বা আজকের আফগানিস্তান পর্যন্ত।

এ অঞ্চলের ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে নন্দা, মৌর্য, সুংগা, গুপ্ত আর পাল সাম্রাজ্যের অধ্যায় দ্বারা। এরই ধারাবাহিকতায় মুসলিম সুলতান, মোগল, বাংলার নবাব আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের ইতিহাসের দ্বারা সমৃদ্ধ। এখানের ইতিহাস বিশ্বের মানব সভ্যতার ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে।

সম্রাট বিম্বিসার, অজাতশত্রু, চন্দ্রগুপ্ত আর অশোক দি গ্রেট। এরপর শের শাহসূরী আর বাংলার নবাব আলীবর্দী খান এবং শেষ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা এরা সবাই বিশ্ব ইতিহাসের অংশ। এদের সবার পদচারণ হয়েছে এ অঞ্চলে।

শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তপাত আর নৃশংসতার যুদ্ধের বিবরণেই এ জনপদের ইতিহাস

www.pathagar.com

বিধৃত তেমন নয়। এখান থেকে মানব সভ্যতায় যুক্ত হয়ে অহিংসা আর ত্যাগের বাণী। জন্ম হয় গৌতম বুদ্ধের। বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে বৌদ্ধধর্ম। অহিংসার বাণী ছড়িয়েছিলেন মহাভীর, জৈন ধর্মের অন্যতম প্রবক্তা (খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৯-৫২৭)। মহাভীরও ছড়িয়েছিলেন অহিংসার বাণী। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন ইন্দো-আর্যদের আগমনের আগেই জৈন ধর্ম এখানকার মাটি হতে জন্মগ্রহণ করে। দু'টি ধর্মই ছিল অনেকটা সমসাময়িক। জৈন ধর্ম বর্তমানে সংকুচিত আর ৩৬০ মিলিয়ন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রয়েছেন পৃথিবীর আনাচে কানাচে। এখানে আসেন সীতা মাইয়া আর রামচন্দ্র। জন্ম নেন গুরু গোবিন্দ সিং।

এখানেই উত্থান হয় ইতিহাসখ্যাত বহু ব্যক্তিত্ব যাদের কর্ম আজকের আধুনিক সমাজকেও প্রভাবিত করে যাচ্ছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন চানক্য, বাৎসায়ন যিনি কামসূত্র রচনা করেছিলেন। রয়েছেন পানিনি আর আসবাঘোষ। স্বাধীন ভারতে বহু খ্যাতিমান ব্যক্তিদের উত্থানও এখান থেকে। এদের মধ্যে রয়েছেন স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ আর ভারতের রাজনৈতিক গুরু জয়প্রকাশ নারায়ণ। আজকের ভারতের ক্রিকেটের ওয়ার্ল্ড কাপ বিজয়ী ক্যাপ্টেন মহেন্দ্র সিং ধোনী।

আমরা পাটালিপুত্রা গ্যালারি ছেড়ে মৌর্য সাম্রাজ্যের গ্যালারি হতে গৌতম বুদ্ধের ছোট গ্যালারিতে গেলাম। এখানে একটি পাত্রের মধ্যে রাখা রয়েছে গৌতম বুদ্ধের দেহের ভস্ম। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য মহাপবিত্র এ ভস্ম। তবে এখানে কাউকে কোন ধরনের প্রার্থনা করতে দেখিনি। আমরা পরবর্তী গ্যালারিতে আসলাম যেখানে আরও বহু ভাস্কর্য রয়েছে। পাশের গ্যালারিতে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্ত্রপাতি রাখা রয়েছে। রয়েছে মধ্যযুগের যুদ্ধে ব্যবহৃত ঢাল-তলোয়ার দর্শনীয় সামগ্রীর মধ্যে।

তিন তলার গ্যালারিতে রয়েছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন স্থির চিত্র কিছু নথিপত্র ইত্যাদি। রয়েছে ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের কিছু নথিপত্র আর তাকে দেয়া সম্মাননা। এর উপরের তালাগুলো বন্ধ। একজন কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানালেন যে এ জাদুঘরে প্রায় বিশ হাজার দর্শনীয় দ্রব্যাদি রয়েছে। তবে বহু দ্রব্যাদি স্টোরে রয়েছে, কারণ, গত কয়েক বছর ধরে জাদুঘরের সংস্কার হচ্ছে। আরও জানালেন যে, লালু-রাবরী শাসনের সময় জাদুঘর ভীষণভাবে উপেক্ষিত ছিল। দর্শনার্থীর সমাগমও কম হতো। সন্ধ্যার আগেই বন্ধ করতে হতো। তাঁর ভাষ্য মতে, এখন প্রচুর দর্শনার্থী প্রতিদিন আসেন বিশেষ করে স্থানীয় এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তর থেকে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা আসেন। আসেন ইতিহাসের গবেষক এবং বিদেশি পর্যটকগণ। দেখলাম দর্শনার্থীদের মধ্যে স্কুলের এবং কলেজের বহু ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে।

আমি আর মুকুল জাদুঘর দেখা শেষ করে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত ইন্দো-ইসলামিক ধাঁচের দালানটি ছেড়ে গাড়ির কাছে এসে দেখলাম সতেন্দ্র তখনও ল্যাপটপ নিয়ে ব্যস্ত।

www.pathagar.com

আর কিছু দূরে কামরুল আমগাছের নিচে দাঁড়িয়ে স্কুলের শিক্ষার্থীর সাথে খোশগল্পে মগ্ন। আমাদের দেখে একগাল হেসে বলল, 'আপনাদেরকে না পেয়ে আমি আগেই চলে এসেছি। এই তরুণীটির পিতা একজন সার্ভিং কর্নেল। এখন রয়েছে কাশ্মীর অঞ্চলে। সে মায়ের সাথে এখানেই থাকে। তাই আর্মির জীবনযাপন নিয়ে কথা বলছিলাম।'

সতেন্দ্র তার ল্যাপটপ বন্ধ করে বললেন, 'আমার কারটিও এসে গেছে। ভাবছি আমরা দু'জন কারে যাই আর আপনারা দু'জন সঞ্জিবকে নিয়ে আসতে পারেন।

সময় তখন বিকেল চারটা। আমাকে সঞ্জিব সকালেই জানিয়েছিলেন যে আঘাম কুয়া এখান থেকে বেশি দূরে নয়, তবে জ্যাম হতে পারে। তবুও তিনি আমাদেরকে নিয়ে যাবেন। আমাদেরকে স্টেশনে পৌঁছতে হবে সন্ধ্যা আটটার মধ্যে।

আমরা রাস্তায় কোন রেস্তোরাঁয় বসে এককাপ চা খেয়ে তার পরে যেতে পারি। সতেন্দ্রর প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করল কামরুল।

'চা খেতে গেলে দেরি হবে। বরং আমরা আঘাম কূয়া দেখবার পর চা খেলে ভাল হয় না?' আমার কথা শুনে এবার মুকুলও যোগ দিয়ে বলল যে আগেই চা খেয়ে নেয়া ভাল। সময় পাওয়া যাবে। অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে রাজি হতে হলো।

সতেন্দ্রর কার আগে আর আমি আর মুকুল সঞ্জিবের সাথে অনুসরণ করছিলাম। আমি মুকুলকে বললাম, পাটালিপুত্রার যে সামান্য অংশ বাকি আছে তার মধ্যে এই আঘাম কূয়া নামক স্থানটি আমার দেখার খুব ইচ্ছা। এত দূর এসেছি মৌর্য বংশের ইতিহাসের অন্যতম নৃশংসতার স্থান না দেখে ফিরে গেলে আফসোস থাকবে।' মুকুল অবশ্য বলেছিল যদিও সে এ জায়গা সম্বন্ধে আগেও জানতো না, এখনও তেমন জানে না তবে সে যেতে ইচ্ছুক। হঠাৎ করেই সঞ্জিব বলে উঠলেন, 'স্যার ওখানে গিয়ে ফিরতে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। এখন রাস্তায় ভিড় তার উপরে ওই জায়গায় বড় বাজার এবং বিশাল বাসস্ট্যান্ড। প্রায় দুই কিলোমিটার হেঁটে যেতে হবে। সময় লাগবে।'

আমি তার কথায় কিছুটা হতভম্ব হয়ে বললাম, 'আপনি তো এতক্ষণ এসব কথা বলেননি। এখন এই নতুন তথ্য হাজির করছেন। ঠিক আছে আপনি যেতে না চাইলে আমি সচিব সাহেবের গাড়ি নিয়ে যাব। হাঁটতে হলে হাঁটব। চা খাবার দরকার নেই।' কেন যেন আমার গতবারে আগ্রায় ছোটখাটো দুর্ঘটনা এবং সে কারণে ফতেহপুর সিক্রি যেতে না পারা এবং পরে আমার ওই সফরের সঙ্গী ছোট পুত্র সাফাকের মন্তব্যের কথা মনে পড়ল।[২] আমি আর কথা বাড়ালাম না। মুকুল নিশ্চুপ। হ্যাঁও না আবার 'না'ও না।

আমরা একটা রেস্তোরাঁর সামনে আসলাম। কামরুল আর সতেন্দ্র ভেতরে চায়ের

২। লেখকের 'যমুনা গোমতীর তীরে : একটি ভ্রমণ কথা' পৃষ্ঠা-১৬৮।

www.pathagar.com

অর্ডার দিয়ে দিয়েছে। কামরুল বলল, আজ সময়ও কম আর সমস্ত দিনের ক্লান্তিতে যেতে ইচ্ছে করছে না। ওটা বাদই থাকুক।'

সতেন্দ্র সায় দিলেন। মুকুল চুপ।

'ঠিক আছে তোমরা থাক এখানেই, যদি সঞ্জিব না যেতে চায় আমি অন্য গাড়ি নিয়ে যাই ফিরে এসে তোমাদেরকে এখান থেকেই নিয়ে যাব।' আমার দৃঢ়তায় সবাই একটু নড়েচড়ে বসল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। সতেন্দ্র বললেন, 'ঠিক আছে আমরাও যাই তবে তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নেই।'

আমি বসলাম। চা পরিবেশন করলে তাড়াতাড়ি চা শেষ করে আমি আর মুকুল সঞ্জিবের গাড়িতে আর সতেন্দ্র কামরুলকে নিয়ে আমাদের অনুসরণ করছিল।

রাস্তায় তেমন ভিড় ছিল না তবে রাজেন্দ্রনগর রেলওয়ে ইয়ার্ড ওভার পাসে উঠবার পর কিছু ভিড়ে পড়তে হয়েছিল। গাড়ি চলছিল বেশ কম গতিতে। সঞ্জিব বললেন, 'মনে হয় সামনে জ্যাম রয়েছে। আমাদেরকে এ জায়গা পাস করবার পর ফ্লাইওভারের নিচ দিয়ে যেতে হবে। হয়ত সেখানে ভিড় পেতে পারি।' সঞ্জিবের কথা শুনে মনে হল তিনি হয়ত তখনও ভাবছিলেন আমি হয়ত হতাশ হয়ে ফিরে যেতে বলব। আমি কিছুই বললাম না। তিনি আপন মনে কথা বলতে বলতে পাস পার হয়ে ফ্লাইওভারের নিচে আসলেন। প্রায় পনের মিনিট চলবার পর আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'সামনে বাসস্ট্যান্ড। আজ এতনা ভিড় নেহী হ্যায়। আমি সামনে তাকিয়ে দেখলাম বাসগুলো দু'পাশে সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। চলার রাস্তা পরিষ্কার। বাসস্ট্যান্ড পার হতে হতেই দূরে বাজার দেখিয়ে বলল, 'ওই যে বাজার তারপরেই আঘাম কূয়া।'

'তাহলে আরও সামনে যেতে থাকেন।' আমি সঞ্জিবকে বলাতে তিনি এতক্ষণে বুঝলেন যে আমি নাছোড়বান্দা।

এরপর সঞ্জিব আর কোন বাক্য ব্যয় করলেন না। নিয়ে আসলেন ওখানের শীতলা মন্দিরের প্রধান ফটকে। বললেন, 'এই ফটক দিয়েই ভেতরে শীতলা মন্দিরের পেছনে আঘাম কূয়া পাবেন। আপনাদের কপাল ভাল আজকে ভিড় ছিল না আপনাদের হাঁটতে হয়নি।' আমি মুচকি হাসলাম। এতক্ষণে এই টালবাহানার কারণটি কিছুটা আঁচ করলাম, ফিরতি পথে মুকুল কারণ পরিষ্কার করেছিল।

আমরা গেট পার হয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। হাতের বাঁয়ে একটি বাঁধানো উঁচু বেদি। এক পাশে নিচে নামবার সিঁড়িসহ বর্গাকারের চৌবাচ্চা। খুব গভীর নয়। ডানে আরেকটি উঁচু বেদি। বেশ কয়েকটি বড় বড় পাথর রাখা। পাথরগুলো দেখে মনে হল কয়েক সহস্র বছর পুরাতন।

সামনে চারতলা মন্দির। অনেকটা পিরামিডের মত উপরে উঠে গিয়েছে।

www.pathagar.com

দোতলার উপর থেকে প্রথমে বারোটি; তিনতলায় ছয়টি, চারতলায় চারটি আরও উপরে চারটি খোলা জানালা। মন্দিরের একাংশ পুরোহিতের থাকবার জায়গা আর সামনে পূজার স্থান। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। মন্দিরে চলছিল আরতী। এই মন্দিরটিই শীতলা মন্দির। এখানে শীতলা বা নয় মাথা ওয়ালা সাপের পূজা করা হয়। ভেতরে বেশ কিছু নর-নারী মনে হল অর্চনা করছেন।✦

আমরা মন্দিরের পেছন দিকে আসলাম। সামনে পাথর দিয়ে বাঁধানো একটি বেদি তার মাঝখানে প্রায় ছয়ফুট উঁচু বেশ পুরু গোল দেয়ালে ঘেরা একটি কূয়া। দেয়ালে ছয়টি জানালার মত। জানালাগুলোতে লোহার জালি দেয়া। একটি ফলকে লেখা 'আঘাম কূয়া'।

আঘাম কূয়ার ফলকের পাশে আরেকটি ফলক লেখা। ওই লেখার সারমর্ম হল যে, এখানে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে বহু নারী কূয়াতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহনন করেছে। ওই আত্মহনন বন্ধ করবার জন্য বিহার সরকারের নির্দেশে কূয়ার উপরিভাগে লোহার জালি দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। বন্ধ করা হয়েছে পাশ দিয়ে পানি উঠাবার খিরকিগুলোও।

আমরা চারদিক ঘুরে আঘাম কূয়া দেখলাম। এই সেই জায়গা বা কূয়া যেখানে সম্রাট অশোক তার রাজত্বকে বিদ্রোহের হাত হতে নিষ্কণ্টক করতে একে একে হত্যা করেন নিরানব্বই সহোদর এবং জ্ঞাতী ভাইদের। সম্রাট অশোক তার যৌবনে ছিলেন এক নৃশংস যোদ্ধা। কলিঙ্গের যুদ্ধ তার ঐতিহাসিক প্রমাণ।[৩] এ জায়গাটি ছিল অশোকের কয়েদখানা। এখানে বহু বন্দি হত্যা করা হয়েছিল ওই সময়ে। এখন সন্ধ্যা নামতেই এখানে ভুতুড়ে পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এখানে মন্দির গড়ে উঠে মাত্র কয়েক দশক পূর্বে। এখন পুরোটাই মন্দির চত্বর।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। আমরা আঘাম কূয়া ছেড়ে ফিরবার পথে সামনের বেদিতে চারটি পাথর খণ্ড দেখতে গেলাম। এগুলো মৌর্য শাসনের সময়ে পাটালিপুত্রার এক মন্দিরের পিলার ছিল বলে শনাক্ত করা হয়েছে আর চৌবাচ্চাটি ছিল মন্দিরের ভক্তদের ব্যবহারের জন্য। এখানে অতি সন্নিকটে পাটালিপুত্রার আরও কিছু নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু সময়ের অভাবে সেখানে আর যাওয়া হয়নি। আঘাম কূয়া স্টেট হাইওয়ের এবং গান্ধী মার্গ-এর জংশনে।

এবার আমাদের ফিরবার পালা। আঘাম কূয়া দেখার মধ্য দিয়ে শেষ হল বিহার তথাপ্রাচীন মগধ রাজ্যের সবচাইতে উল্লেখিত স্থানগুলো সফর। স্টেশনে যাবার পূর্বে সতেন্দ্র আমাদেরকে সার্কিট হাউসে নিয়ে যাবেন। সেখানে গোসল সেরে কোথাও সামান্য কিছু খেয়ে স্টেশনে পৌছব। সার্কিট হাউসেই শেষ হবে সঞ্জিবের সাথে

৩। লেখকের 'কত জনপদ কত ইতিহাস' পৃ: ৬৮

✦ গুটি আর জলবসন্ত যাতে না হয় সে জন্য এ পূজা দেয়া হয়।

www.pathagar.com

আমাদের সফর। আমরা সার্কিট হাউসে যখন পৌছলাম তখন সন্ধ্যা ছয়টা। আধাঘণ্টার মধ্যেই আমরা বের হয়ে পড়ব।

আঘাম কূয়া থেকে ফিরবার পর সতেন্দ্র-এর রুমে গিয়ে বসে আমরা চা পান করছিলাম তখন সতেন্দ্র বললেন, 'স্যার আপনার উদ্যম আর দৃঢ়তা দেখে আমি অভিভূত। আমরা সকলেই চেয়েছিলাম আঘাম কূয়ায় না যেতে। কারণ, সবাই বেশ ক্লান্ত ছিলাম। এমন কি সঞ্জিবকেও বলেছিলাম আপনাকে নিরুৎসাহিত করতে। কিন্তু আমরা পারলাম না আপনাকে আটকাতে। এখন মনে হয় ভালই হল আমারও হয়ত এমন ঐতিহাসিক জায়গা দেখাই হতো না। আমাদের প্ল্যান কাজ করল না।'

আমি হেসে বললাম, 'আমি যে কিছুটা টের পাইনি তা নয়। আঘাম কূয়া যাকে বলা হয় তলাবিহীন কুয়া বহু ইতিহাসের সাক্ষী, সেটা না দেখে বিহার ত্যাগ করলে আমার মনে আফসোস থেকে যেত।' তার পরে বললাম, 'সতেন্দ্র আমি জার্মানির শহর ডুসেলডর্ফে গিয়েছিলাম শুধু একটি 'বিয়ার শপ' দেখবার জন্য যেখানে বসে যে টেবিলে নক্সা রেখে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বেলজিয়াম আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল। বন থেকে সকালে গিয়ে আবার ওই দিনই ফিরে এসেছিলাম। কাজেই বুঝতেই পারেন ঐতিহাসিক জায়গার প্রতি আমার আকর্ষণ।' সত্যেন মাথা নাড়লেন। কামরুল আর মুকুল বলল, 'আমরাও অনেক কিছু দেখলাম আর শিখলাম। আপনার সাথে না আসলে এসব জায়গায় আসা হতো না।' আমি চা পান শেষ করে বাক্য ব্যয় না করে গোসল করতে সতেন্দ্রের বাথরুমে গেলাম।

আমরা সবাই তৈরি হয়ে নিচে এসে সঞ্জিবকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিলাম। বিদায়কালে সঞ্জিব অনেকটা আবেগ প্রবণ হয়ে বললেন 'স্যার কোন অপরাধ করলে মাফ করে দেবেন।' আপনাদের সাথে দু'দিন কাটিয়ে ভালই লাগল। অনেক বিষয়ে আপনাদের কাছ থেকে জানলাম।' আমি বললাম, 'আপনার কাছ থেকেও আমি অনেক কিছু জানলাম। ভাল থাকবেন।'

সঞ্জিব বললেন, 'আপনি শাশারাম, শেরশাহের মসজিদ আর কেল্লা দেখতে চেয়েছিলেন। আরেকদিন থাকলে আমি নিয়ে যেতাম।'

'বহুত শুকরিয়া' বলে তার হাতে আমরা কিছু বখশিশ দিয়ে বিদায় দিলাম।

সতেন্দ্র আমাদের হালকা নাস্তা খাওয়াবার জন্য পাটনার একমাত্র ঘূর্ণায়মান রেস্তোরাঁতে নিয়ে চললেন। সতেন্দ্র জানালেন যে আমাদের সাথে আরও দু'জন মেহমান যোগ দেবার কথা রয়েছে। এই রেস্তোরাঁ শুধু পূর্ব ভারতেরই নয়, এ পর্যন্ত সর্বভারতে সবচাইতে বড় ঘূর্ণায়মান রেস্তোরাঁ। আমরা রেস্তোরাঁয় পৌছে সতেন্দ্র-এর মেহমানদের না পেয়ে কিছু হালকা নাস্তা আর চা-এর অর্ডার দিলেন। রেস্তোরাঁটি গান্ধী ময়দানের

www.pathagar.com

নিকট. পাটনার সর্বোচ্চ ১৮ তলা বিসকোমাও ভবনের উপরে। আমরা যেখানে বসলাম সেখান থেকে পাটনা শহরের একাংশ দেখা যাচ্ছিল। রেস্তোরাঁটি অত্যন্ত ধীরগতিতে ঘুরছিল। অনুসন্ধানে জানতে পারলাম যে, পুরো এক পাক শেষ করতে একঘন্টা সময় লাগে। সতেন্দ্র পাটনার রাতের দৃশ্য দেখাতে দেখাতে রেলওয়ে স্টেশনও দেখিয়ে বললেন, আমাদের হাতে দেড় ঘন্টা সময় আছে। আমরা এখানে পঁয়তাল্লিশ মিনিট কাটাতে পারি।

প্রায় দশ মিনিটের মাথায় খাবার চলে আসল। শেষ হল আমাদের আহার পর্ব। আমরা রেস্তোরাঁ ত্যাগ করে পাটনা সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশনের দিকে রওয়ানা হলাম।

www.pathagar.com

তের

আবার গরিব রথে

পাটনা সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশন। ভারতের অন্যতম বৃহত্তম রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে গণ্য করা হয়। সতেন্দ্রর গাড়ি স্ট্যান্ডে আসার পরেও আমাদের হাতে প্রায় আধাঘন্টা সময় ছিল। কাজেই খুব তাড়াহুড়া অনুভব করিনি।

স্টেশনের সামনে বিশাল হকার মার্কেট। কামরুল মাফলার কিনতে চাইলে হকার মার্কেটের দোকানগুলোতে ঢু মেরে দেখলাম তেমন পছন্দসই পেলাম না বলে আমরা ফিরে আসলাম। হকার মার্কেটে এ হেন দ্রব্য নেই যা পাওয়া যায় না। সস্তা জামা কাপড় হতে শুরু করে শুকনো খাবার নানা ধরনের বিস্কুট ইত্যাদি।

আমরা হকার মার্কেট ছেড়ে নিজেদের ব্যাগ ইত্যাদি নিয়ে প্লাটফরম খোঁজ করে চিহ্নিত স্থানে দাঁড়ালাম। ঘোষক জানালেন গরিব রথ আধাঘন্টা লেট হবে। কাজেই হাতে আরেকটু বাড়তি সময় পাওয়া গেল। বাড়তি সময় পাওয়া গেলে কি হবে প্লাটফরমে কোথাও বসার জায়গা খালি নেই। বহু যাত্রী বিভিন্ন ট্রেনের অপেক্ষায়। এবার আমরা তিনজন তিন বগিতে সফর করব। তবে সবাই নিচের বার্থেই জায়গা পেয়েছে। মুকুল বলেছিল যে, বয়স পঞ্চাশ হলেই এ সব ট্রেনে পারতপক্ষে নিচের বার্থেই টিকেট দেয়া হয়। মাঝের বার্থে তো বটেই উপরের বার্থে উঠা বেশ কষ্টকর।

ভারতীয় রেল ব্যবস্থা বিশ্বের বৃহত্তম রেল ব্যবস্থা।[১] হবেই না কেন একশত বিশ কোটি লোকের দেশ। রেল যাতায়াত সবচাইতে সস্তা এবং দূরপাল্লার সবচাইতে নির্ভরযোগ্য বাহন। মেইল ট্রেনগুলো মোটামুটি সময়মত চলে তবে অন্যান্য ট্রেনের বেশির ভাগই লেট চলে।

ট্রেন আসার সময় হয়ে গেছে। যাত্রীরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন। ইতিমধ্যেই আরও বহু ট্রেন স্টেশন ছেড়ে গিয়েছে তারপরেও যাত্রী সংখ্যা কমেনি। এখন যারা রয়েছেন তাদের বেশির ভাগই গরিব রথ-এর যাত্রী।

ট্রেন এসে দাঁড়ালে সতেন্দ্র আমাদের সাথে আমার বগিতেই উঠলেন। উঠে দেখলাম বগি অর্ধেক যাত্রীতে ভর্তি। সতেন্দ্র আমাদের বললেন যে, রাজেন্দ্রনগর স্টেশন

১। লেখকের 'কত জনপদ কত ইতিহাস' পৃষ্ঠা ১৪৭-১৪৮

www.pathagar.com

থেকে উঠলে ট্রেনেই বিশ্রাম নেয়া যেত। আমি সহজেই আমার বার্থটি পেলাম। একজন যাত্রী বসা ছিলেন, সরে গিয়ে জায়গা দিলেন। সামনে একজন যাত্রী দেখে অনুমান করা যাচ্ছিল না কত বয়স হবে। পাতলা ছিপছিপে গড়ন। চোখে চশমা। ট্রাউজার আর গায়ে বেশ ভারী সুয়েটার পরা। বয়স আনুমানিক সত্তরের কাছাকাছি ভেবেছিলাম, পরে তিনি জানিয়েছিলেন তার বয়স বাহাত্তর।

সতেন্দ্র প্রায় পনের মিনিট আমাদের সাথে ছিলেন। নয়টার কাছাকাছি সময়ে সতেন্দ্র আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে বললেন, 'ঢাকায় সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন। এরপর দিল্লীতে আসলে দেখা হবে।' আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ভাবীকে সালাম দেবেন। আমার মিসেস ভাবীর সাথে পরিচিত হয়ে বেশ খুশি হয়েছেন। আমি বললাম ঢাকায় অবশ্যই আসবেন। আপনার আতিথেয়তা আমরা ভুলব না। আমাদের আগমনের কারণে আপনার ছুটি বিঘ্নিত হওয়ায় আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।'

'না না, ছুটিতে আমি পরেও যেতে পারব- কিন্তু এই দুটো দিন সবাই মিলে হৈ চৈ করলাম বেড়ালাম এ আনন্দ সব সময় তো পাব না।' সতেন্দ্র-এর কথা শেষ না হতেই মুকুল বলল 'আর ওই যে শীলা কি জওয়ানী' যে দেখলা ওটা ভুলে গেলা।'

সতেন্দ্র হেসে বললেন, 'হামনে একেলা দেখা আওর তোম লোগ আখ বন্দ করকে রাখা থা?'

কামরুল যোগ দিয়ে বলল, 'তুমি দুই চোখ দিয়ে দেখছ আর আমরা চোখের ফাঁক দিয়ে দেখেছি।

'আরে সতেন্দ্র এত বাজে ছবি কেন দেখলাম? মুকুলের মন্তব্য। এবার সতেন্দ্র বিদায় নিয়ে নিচে নেমে গেলেন। ট্রেন আস্তে আস্তে পাটনা স্টেশন ত্যাগ করতে লাগল। মুকুল আর কামরুল যার যার বগি খুঁজতে চলে গেল।

আমি আমার বার্থের জানালার কাছে বসে দেখছিলাম পাটনা শহরের আলোরছটা। আস্তে আস্তে ট্রেনের গতি বাড়ছিল আর গতিতে পেছনে ফেলে আসছিল একদার পাটালিপুত্রা বর্তমানের পাটনা।

বিহার, পুরাতন মগধ। এক নিরবচ্ছিন্ন জনপদের ইতিহাস সমান গতিতে আমার স্মৃতি টাইম মেশিনে নিয়ে যাচ্ছিল। এখানেই উত্থান হয়েছিল হিন্দুস্থানের অন্যতম সফলতম শাসক শের শাহ্ সূর। এখানেই চৌশার যুদ্ধে (জুন ২৬, ১৫৩৯) বাবরের পুত্র হুমায়ুনের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে কায়েম হয়েছিল পাঠানদের সংক্ষিপ্ত সাম্রাজ্য। হিন্দুস্থানের ইতিহাসের বিশাল অধ্যায়ের স্বল্প সময়ে হলেও শের শাহ্ সূর তার প্রজ্ঞা আর প্রশাসনিক দক্ষতার কারণে ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে আছেন।

www.pathagar.com

এখানে এই জনপদ বিহারে অক্টোবর ২২, ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনারা মোগল সম্রাট শাহ্ আলমের সহযোগী ওউধের নবাব সুজাউদ দৌলা আর বাংলার তৎকালীন নবাব মীর কাশেমের বাহিনীকে পরাজিত করেছিল। এখানের বক্সারের যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সাম্রাজ্য স্থাপনে সমগ্র বাংলা বিহার উড়িষ্যা দিওয়ানী হাতে পেয়েছিল।

বক্সারের যুদ্ধ সম্বন্ধে সংক্ষেপে না বললেই নয়। কারণ, পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তৎকালীন বাংলা তথা ভারতবর্ষে পা রেখেছিল। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধ কোম্পানিকে ভারতে রাজত্ব কায়েমের সুযোগ করে দিয়েছিল। এ যুদ্ধের পরেই কোম্পানি ভারত শাসনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মেতে উঠে।

মীরজাফর গদিতে বসবার পর হতে উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন যে তিনি ইংরেজদের হাতের পুতুল মাত্র। যে শর্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মীরজাফরের সামনে রেখে নবাবী দিয়েছিল সেগুলো পূরণ করতে গিয়ে বাংলার তথাকথিত নবাব নিঃস্ব হচ্ছিলেন। মীরজাফর তার আত্মীয়ের সাথে একবার ষড়যন্ত্র করে মসনদে বসেছেন। কাজেই ষড়যন্ত্র তার ধমনিতে বইছিল। গোপনে ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে ইংরেজদের বিরুদ্ধে নৈকট্য গড়ে তুলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। অবশেষে ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল ইংরেজ বাহিনী।

চিনসুরার যুদ্ধে ওলন্দাজদের পরাজিত করল ইংরেজ বাহিনী। মীরজাফরকে গদিচ্যুত করে আরও কঠিন শর্তে তারই (মীরজাফর) জামাতা মীর কাশেম আলী খানকে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার গদিতে বসতে দিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।

মীর কাশেম প্রথম দিকে কৃতজ্ঞচিত্তে ইংরেজ তোষণ করতে গিয়ে ভাণ্ডার উজাড় করে দিলেন। অতিরিক্ত অর্থ জোগান দিতে গিয়ে প্রজাদের উপর একপ্রকার জোরজুলুম করে এবং কোষাগার খুলে ইংরেজদের অর্থ যোগান দিয়েও চাহিদা মিটাতে পারলেন না। অগত্যা বর্ধমান, মেদেনীপুর আর চট্টগ্রামের কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে হল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে। এত সব করেও বাংলার শৃঙ্খলিত নবাব ইংরেজদের তুষ্ট করতে পারলেন না। মীর কাশেম ষড়যন্ত্রের আর স্বাধীনতার মর্ম হাড়ে হাড়ে টের পেলেন। তিনি বৃটিশ রক্তচক্ষুর আড়াল হতে চাইলেন। বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ হতে বিহারের মুঙ্গের-এ স্থানান্তরিত করলেন।

মীর কাশেম নিজস্ব বাহিনী গঠন করলেন। যোগাযোগ শুরু করলেন ওউধ-এর নবাব সুজা-উদ- দৌলা আর দিল্লীর ওই সময়কার মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের সাথে। তিনজনই ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে একে অপরের সহযোগী হবার অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন। এরই প্রেক্ষিতে বাংলার নবাব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদত্ত

www.pathagar.com

বিনাশুল্কে ব্যবসার বিষয়টি পুনঃবিবেচনা করে ট্যাক্স ধার্য করলেন। বিরোধ বাঁধল ইংরেজ বণিকদের সাথে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নবাবের হুকুম সরাসরি নাকচ করে দিল। রাগে-দুঃখে আর অপমানে স্থানীয় ব্যবসায়ীদেরও শুল্ক কর মওকুফ করলেন নবাব মীর কাশেম।

প্রমাদ গুনতে শুরু করল কোম্পানি। শুরু হল মীর কাশেমের বাহিনীর সাথে ছোটখাটো বিবাদ আর সংঘর্ষ।

১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে অতর্কিতে হামলা করে মীর কাশেমের বাহিনী পাটনায় কোম্পানির অফিস আর কারখানা গুঁড়িয়ে দিলেন। এক পর্যায়ে বহু ইউরোপীয়ানদের কাশেম বাহিনীর হাতে প্রাণ হারাতে হল। প্রাণ হারাতে হল ইংরেজ রেসিডেন্টকে (?)। এরই প্রেক্ষিতে ইংরেজ বাহিনী পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি নিলে মীর কাশেমের সাথে যোগ দেন ওউধ-এর নবাব সুজা-উদ-দৌলা এবং মোগল সম্রাট শাহ আলম। অক্টোবর ২২, ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বিহারের বক্সার-এ সংঘটিত হল যুদ্ধ। শক্তিতে বেশি হলেও বক্সারের এ যুদ্ধে পরাজিত হতে হলো এই ত্রিশক্তির বাহিনীকে।

বক্সারের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের চুক্তি হয় যা ইতিহাসে আল্লাহাবাদ (এলাহাবাদ) চুক্তি নামে উল্লেখিত। ওই চুক্তি অনুযায়ী সমগ্র বাংলা বিহার উড়িষ্যার দিওয়ানী (কর ধার্য ও আদায় করবার) অধিকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপর ছেড়ে দেয়া হল। বিনিময়ে ওউধ-এর নবাবের নিকট হতে আল্লাহবাদ আর কররা ছাড়া অন্যান্য জায়গা দ্বিতীয় শাহ আলমকে দেয়া হল। সাথে বাংলা প্রান্তরের কর হতে মাসে সাড়ে চার লক্ষ রুপী দেবার প্রতিশ্রুতি করা হল। বিহার সীমানা পর্যন্ত মোগলদের কর্তৃত্ব মেনে নেয়া হল। সুজা-উদ-দৌলাকে ওউধ-এর বেশির ভাগ ছেড়ে দেয়া হল। আর বাংলার মসনদ হতে মীর কাশেমকে সরিয়ে মীরজাফরকে নতুন শর্তাবলীর আওতায় পুনরায় মসনদে বসানো হল।

মীর কাশেম প্রথমে আশ্রয় নেন ওউধ-এ। পরে ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে ভাগ্যাহত নবাব দিল্লীতে অগোচরে মৃত্যুবরণ করেন। শেষ জীবনে ইংরেজ কোম্পানি ভরণপোষণের জন্যে যৎসামান্য খরচ দিলেও ভাল কাটেনি মীর কাশেমের।

পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার দিওয়ানী পাবার পর হতে ইংরেজ কোম্পানি বিশাল ভারতে সাম্রাজ্য করবার স্পৃহা পেয়েছিল। সূত্রপাত হল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের। এখানে পাটনায় নবাব আলীবর্দী খানকে নাতি সিরাজ-উদ-দৌলার বিদ্রোহের মোকাবেলা করতে হয়েছিল। ইতিহাস এখানে জীবন্ত।

হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ করে বিপরীত দিক থেকে পাস করে যাওয়া আরেকটি

www.pathagar.com

মেইল ট্রেনের শব্দে ইতিহাসের সফর ছেড়ে বর্তমানে ফিরে আসলাম। ভারতের বহু জায়গায় ডাবল ট্রেন লাইনের ব্যবস্থা রয়েছে। যে কারণে দ্রুতগামী ট্রেনগুলোকে ক্রসিং এর জন্য বিভিন্ন জংশনে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হয় না। আমি তখনও জানালার কাছে বসে বাইরে দূরে জ্বলতে থাকা বাড়িঘরের অপসৃয়মাণ বাতিগুলো দেখছিলাম।

বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিহারের দু'দিনের কথা ভাবছিলাম। সতেন্দ্র সিং-এর কথা মনে হল। বর্তমানে দিল্লীর গুরগাঁওতে ফ্ল্যাট কিনেছেন। সেখানে তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা থাকেন। কয়েক বছর পূর্বে প্রাতঃভ্রমণের সুবাদে ঢাকায় পরিচয়। সেই সূত্রেই যৎসামান্য ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। এরপর যখনই আমি দিল্লীতে গিয়েছি সতেন্দ্র পরোক্ষভাবে আমার খোঁজ-খবর নিয়েছেন। এমনকি বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াতের জন্য গাড়ির ব্যবস্থাও করেছেন। মাত্র কিছুদিন পূর্বে তার স্ত্রী দিল্লীতে আমার স্ত্রীর সাথে দেখাও করেছেন। আর এই দু'দিন সতেন্দ্র আমাদেরকে শুধু সঙ্গই দেয়নি, যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন যাতে আমাদের কোন ধরনের অসুবিধা না হয়। যদিও আমাদের হোটেল কামরুলের মাধ্যমে রামাকৃষ্ণ বন্দোবস্ত করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সত্যেনের সুবাদেই আমরা বেশ কিছু জায়গায় অধিকতর সহজে যেতে এবং মর্যাদা পেয়েছি। সত্যেন সত্যই অপূর্ব মানুষ। বন্ধুবৎসল এবং চাপা স্বভাবের হলেও প্রাণবন্ত। সত্যই এ ধরনের মানুষ দেশেই সচরাচর পাওয়া যায় না বিদেশ তো দূরের কথা। সত্যেন উত্তর প্রদেশের মানুষ ঢাকার আতিথেয়তা ভুলতে পারেনি।

ট্রেন পাটনা ছেড়ে বিস্তীর্ণ অন্ধকার অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মধ্যে দূরে গ্রামের বাতি ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। আমার সামনের ভদ্রলোক সাথের টিফিন ক্যারিয়ার বের করে রাতের খাবার খেতে লাগলেন। আমি চোখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। আমার পাশে বসা ভদ্রলোক উঠে বিছানা আনতে গেলেন। আমিও তাকে অনুসরণ করে পঁচিশ রুপি দিয়ে বিছানা নিয়ে আসলাম। এসে দেখলাম সামনের ভদ্রলোক পরম আয়েশে রুটি চিবুচ্ছেন। প্রায় যাত্রীকেই সাথে করে নিয়ে আসা খাবার খেতে দেখলাম।

একটু পরেই কামরুল এসে হাজির হল। বলল, 'আমি যেখানে আছি সেখানে আমার বার্থে পুরো এক পরিবার বসে আছে। আর আধাঘণ্টা পর নেমে গেলে আমি শুয়ে পড়ব। মুকুলের সাথে যোগাযোগ হয়েছে?' আমি বললাম না। কামরুল মুকুলকে ডাকল। মুকুল কিছুক্ষণ পর এসে হাজির। বলল, 'আমি যেখানে আছি সেখানে সব শুয়ে পড়েছে। আমি মাথা উঠিয়ে বসতে পারছি না। টিকিট চেকার আসলেন। টিকেট দেখলেন। কোন বাক্য ব্যয় করলেন না। চলে গেলেন। প্রায় নয়টা বাজে। দু'জনই যার যার বগিতে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর পাশে বসা ভদ্রলোক কোন বাক্য ব্যয় না করে মাঝের সংযুক্ত বার্থ খুলে বিছানা করতে শুরু করলেন। আমি বুঝলাম এমন আরাম করে

www.pathagar.com

বসার সময় শেষ। হয় আমাকে বিছানা করে শুয়ে পড়তে হবে না হয় ঘাড় বাঁকা করে বসে থাকতে হবে। এ এক ভাল যন্ত্রণা। বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

সামনের ভদ্রলোক নিজের বিছানাটা দক্ষ হস্তে বিছিয়ে নিলেন। তাঁর কপালটা বেশ ভাল। কারণ, তৃতীয় যাত্রী একজন মহিলা চলছেন পরিবারের সাথে। পরিবারের সদস্যরা বগিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সাথে দু'টি সন্তান। কাজেই তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন অন্য যাত্রীদের সাথে বার্থ অদল বদল করে সকলকে কাছাকাছি আনতে। তিনি আংশিক সফল হলেন। কথাবার্তায় মনে হল দক্ষিণ ভারতের বাসিন্দা। অনেককে দেখলাম বগির ভেতর দাঁড়িয়ে কাপড় বদলাতে।

আমার সামনের ভদ্রলোক বিছানা পাতা শেষ করলেন। দেখলাম তিনি তার বাক্সটি খুললেন। বের করলেন একটি কাপড়ের ব্যাগ। ব্যাগটি বিছানার উপর রাখতেই 'ঝন ঝন' আওয়াজ করে উঠল। মনে হল মধ্যযুগীয় কোন রাজ খাজাঞ্চী স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার ভর্তি ব্যাগ ছুড়ে মারছেন। আমি ছোট বেলায় এ রকম দৃশ্য দেখতাম। আমার বাবার কর্মস্থলে কর্মচারীদের বেতন দিতে ট্রেজারি থেকে কাগজের নোটের সাথে ছোট ছোট ব্যাগে ধাতব মুদ্রা নিয়ে আসতেন। কোন ব্যাগে ফুটো পয়সা, কোন ব্যাগে এক আনা, চার আনা, আধুলি ইত্যাদি। বাবার বেতনটি নেয়া হলে আমরা দুই ভাই এক পয়সা অথবা দুই পয়সার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতাম। মাঝে মধ্যে এক আনাও পেয়ে যেতাম। এক আনা পেলে সেদিন আমরা রাজা। এক পয়সা করে খরচ করতাম। কিনতাম একছটাক বাদাম অথবা লাঠিওয়ালা আইসক্রীম।

ফিরে আসলাম ভদ্রলোকের বাক্সের গল্পে। তিনি তার বাক্সটি সযত্নে বন্ধ করলেন অনেকটা স্লো মোশনে। এতক্ষণে আমার উপরের দু'জন শুয়ে পড়েছেন। বাঁকা হয়ে বসতে বসতে আমার ঘাড় ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই। সামনা সামনি দু'বার্থের মাঝের জায়গা এত কম যে একজন বিছানা করতে থাকলে বা অন্য কিছু করতে থাকলে একই সময় অপর পাশের যাত্রীকে অপেক্ষা করতেই হয়।

ভদ্রলোক এবার তার বাক্সখানি বার্থের নিচে লোহার পায়ার কাছে নিয়ে গেলেন। খুললেন ব্যাগ। আমি অধীর আগ্রহে ঘাড় কাত করে বসে অপেক্ষা করছিলাম ওই ব্যাগ থেকে কি বের করেন তাই দেখতে। তিনি আস্তে আস্তে বের করলেন স্টেইনলেস স্টিলের প্রায় তিন ফুট লম্বা এক চেইন বা শিকল। সাথে পিতলের একটি মজবুত তালা। আমি অবাক হয়ে দেখছি যা ইতিপূর্বে কখনও দেখি নাই এমন দৃশ্য। তিনি চেইন বের করে তার বাক্সের হাতলে ঢুকিয়ে দু'পেঁচ দিয়ে লোহার খুঁটির সাথে বেঁধে তালা লাগালেন। তার অভিব্যক্তি দেখে মনে হল যে, তিনি তার প্রধান কাজটা সারলেন। যেহেতু তার উপরের যাত্রী এখনও ফেরেননি তাই তিনি বসে রইলেন।

এবার আমি বিছানা পেড়ে আমার ব্যাগ বার্থের নিচে রেখে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়বার

www.pathagar.com

আগে সামনের ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় করবার লোভ সামলাতে পারলাম না। পরিচিত হলাম ভদ্রলোকের নাম মি. শক্তি প্রসাদ। বিহারের বাসিন্দা। যাচ্ছেন কলকাতা। এক সময়ে ইস্টার্ন রেলওয়েতে চাকরি করতেন। বর্তমানে তিনি রেলওয়ের সাথেই ঠিকাদারী করেন। তিনি রেলওয়ে স্টেশনের ইলেকট্রিক্যাল সাইডের ঠিকাদারী করেন। তার নিজস্ব অফিস রয়েছে পাটনা, দিল্লী, কলকাতা আর মুম্বাইতে। এক ছেলে এক মেয়ে। দু'জনেরই বিয়ে হয়েছে। আধা ডজন নাতি-নাতনী রয়েছে। নিজে বিপত্নীক। তিনি পরিচয়ের ফাঁকে তার বয়স জানাতেও ভুললেন না। বয়স ৭২ বছর। এ জগতে বহু বর্ণচোরা মানুষ রয়েছেন যাদের দেহের আর চেহারার গড়নে বয়স অনুমান করা কঠিন। শক্তি প্রসাদ তাদের একজন মনে হল।

আমি বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে কসরত করছিলাম আমার কোটকে নিরাপদে রাখতে। কারণ, আমার যাবতীয় মূল্যবান যা রয়েছে ওই কোটের পকেটে। এমনকি আমার ডিজিটাল ক্যামেরা আর মোবাইলও কোটের পকেটে। শক্তি প্রসাদ বোধহয় খেয়াল করছিলেন। বললেন, 'ভাইয়া আপনি আপনার মূল্যবান জিনিসগুলো ব্যাগে রাখুন আর ব্যাগটি মাথার নিচে রাখতে পারলে রাখুন না হয় কোলের কাছে রাখুন।'

আমি ভাবছিলাম ভদ্রলোকের উপদেশ শুনব না আমি আমার মত করেই এই খোলা বগিতে ঘুমাবো। আমি তো মাসে পনের দিন এ ধরনের বগিতেই সফর করি। কখনও দিল্লী কখনও মুম্বাই। এই যে দেখুন চেইন দিয়ে বেঁধে রেখেছি। ব্যাস এখন নিশ্চিন্তে ঘুমাবো। ব্যাটা চোর আমার বাক্স নিতে গেলে অনেকক্ষণ টানাটানি করতে হবে, বললেন, শক্তি প্রসাদ।

'আপনার অভিজ্ঞতাই হয়তো আপনাকে এ ধরনের ব্যবস্থার পথ দেখিয়েছে। সবাই কি এ ধরনের পন্থার কথা চিন্তা করে। চেইন কিনবার এবং এর ব্যবহারও আমিই এই প্রথম দেখলাম। এ ধরনের চেইন পাওয়াও হয়তো যায় না।'

আমার এ মন্তব্য শুনে তিনি বললেন, 'আরে নেহি সাহাব। ইন্ডিয়ার প্রত্যেক রেলওয়ে স্টেশনের বাইরে আপনি এ ধরনের স্পেশাল চেইন পাবেন? আপনার দেশে হয়তো এত চোর নেই। ইয়েত চোরোকো স্বর্গরাষ্ট্র হ্যায়। উপর সে নিচেতক সব চোর হ্যায়।' শক্তি প্রসাদ বেশ রোষের সাথে বললেন। আমি বললাম, 'এই ট্রেনে চোর আসে কিভাবে।'

'আরে ভাইয়া চোরেরা টিকিট কেটেই উঠে। যাত্রী হয়ে ট্রেনে চাপে। এইত গত মাসে আমি মুম্বাই যাচ্ছিলাম। আমার সামনে এক বিয়ের বর যাত্রীর একাংশ ছিল। বাক্স পেটরা যেনতেন ভাবে রাখলে আমি তাদের চেইন কিনে আনতে বললাম। তারা উত্তরে বলেছিলেন যা হবে ভগবান দেখবে। সকালে উঠে দেখে স্বর্ণালঙ্কারসহ তিনটি বাক্স গায়েব? তারপরে কান্নাকাটি করে কি হবে।'

www.pathagar.com

'চোর নামল কিভাবে?'

একটু হেসে বললেন, 'ট্রেন আউটার সিগন্যাল স্লো হলে নেমে যায় না হয় লাফ দেয়।'

'তাহলে ট্রেনের লোকেরও কিছুটা কারসাজি থাকে?'

'হ্যাঁ, এবার আপনি বিষয়টি ধরতে পেরেছেন। আরে স্যার এখন তো হিন্দুস্থান মে চোরোকা জমানা চল রাহা হ্যায়।' শক্তি প্রসাদ আবার রোষের সাথে বললেন।

'কিন্তু আপনাদের যে টিকেট ব্যবস্থা তাতেও চোর সহজে ধরা পড়বার কথা।'

শক্তি প্রসাদ আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'চোররা কি সঠিক তথ্য দিয়ে টিকেট কাটে। ভারতের মানুষের কোন পরিচয়পত্র আছে যে খুঁজে বের করতে পারবে। তার উপরে চোরা রেলওয়ে পুলিশ। ঠিকই জানে কারা এর সাথে যুক্ত। কিন্তু কই, চুরি তো হচ্ছে?'

উপমহাদেশের পুলিশ একই রকম মনে হয়। কারণ, আইনতো ব্রিটিশ আমলেরই রয়ে গেছে।'

শক্তি প্রসাদ বললেন, তবে ইন্ডিয়ার মত এত দুর্নীতিবাজ নয়। আপনি সালমান খানের 'দাবাঙ্গ' দেখুন। কোন পুলিশ কর্মকর্তা প্রতিবাদ করেছে? মামলা ঠুকেছে? তাহলে বুঝুন।

'ওই ছবিতে যা দেখানো হয়েছে চিত্র এরকমই কি?'

'প্রায় এরকমই। কেন প্রকাশ ঝাঁ, তিনি তো পাটনার বাসিন্দা। তিনি বিহারের এবং উত্তর প্রদেশের পুলিশের উপর ভিত্তি করে 'গঙ্গাজল' নামের যে ছবি বানিয়েছিলেন সে ছবি তো বিহারে বহুবার দেখানো হয়েছিল। কোন প্রতিবাদ শুনেছেন? আমার মনে হয় আপনার দেশের পুলিশ এখান থেকে অনেক ভাল।'

আমি বললাম, 'তাইতো মনে হয়। অন্তত ওই সব ছবি দেখে।'

এবার শক্তি প্রসাদ তুললেন লালুর জঙ্গল রাজের কথা। আমি বললাম যে বিহারে যেখানে গিয়েছি সেখানেই এই একই কথা শুনেছি। তাহলে বিজেপি সরকার কংগ্রেস সরকার কিছুই করল না? উত্তরে শক্তি প্রসাদ বললেন, 'বিজেপি'র ছিল ভোটের ভয় আর কংগ্রেস সরকারে ছিল মহাচোরদের সমাবেশ। এখনও তো তাই।'

'বলেন কি মনমোহন সিং তো পরিষ্কার মানুষ।' আমি বললাম,

'ওই মনমোহন সিংকে দেখিয়েইতো চলছে। আর মনমোহন সিং জি তো পুতুল। সোনিয়া যেদিকে নাচায় সেদিকে নাচে।'

'সোনিয়া সম্বন্ধে তো আমরা খারাপ কিছু শুনিনি' বললাম। এবার প্রসাদ জানালেন, তাহলে কদরোসকির বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করেন না কেন। বফোরস-এর টাকা

www.pathagar.com

কোথায় গেল? আর টেলিকমে কি ধরনের চুরি হচ্ছে তা তো এখনও প্রকাশ পায়নি।'

'রাহুল সম্বন্ধে কি ধারণা?' জিজ্ঞেস করলাম।

'আমরা কি মোগল প্রেতাত্মার সাম্রাজ্যে আছি? বংশ পরম্পরায় আমরা শাসিত হবো? রাহুল যদি প্রধানমন্ত্রী হন তবে তিনি হবেন সবচাইতে অদক্ষ প্রধানমন্ত্রী। এক মায়াবতীই উসসে সাম্ভালা নেহি যাতা। বাকিদের কথা তো বাদ দিলাম।'

এবার তাকে অন্যপ্রসঙ্গে নিয়ে আসলাম, 'আপনি এ বয়সেও নিজে এত দৌড়াদৌড়ি করেন কেন, আপনার ছেলে আপনাকে সাহায্য করে না?'

'হ্যাঁ করে। তবে কাজ করছি বলেই কিন্তু আমি সুস্থ রয়েছি। আমার ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ কিছুই নেই। আমি নিরামিষাশী। প্রতিরাতে দুটো রুটি একটু সবজি খাই আর দুধের সাথে চ্যবনপ্রাশ খাই। সকালে অথবা বিকেলে হাঁটি। এভাবে সফর করতে আমার বেশ ভালই লাগে। যা কামাই করি ভগবানের আশীর্বাদে ভালই আছি।' দেখলাম ভদ্রলোক বয়সের তুলনায় বেশ সজীব এবং সজাগ। যেভাবে তিনি চেইন দিয়ে বাক্স বাঁধলেন অমন দৃশ্য আর কখনও দেখব কিনা জানি না।

বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যেই প্রসাদ সাহেবের উপরের যাত্রী মধ্যবয়সী ভদ্র মহিলা অবলীলাক্রমে আমার বার্থের এককোণায় পা রেখে মধ্যের সংযুক্ত বার্থে শুয়ে পড়লেন। প্যাসেজের উপরে একটি বাতি ছাড়া বগির বাতিগুলো নেভানো হয়েছে। আমি শক্তি প্রসাদকে বললাম, 'আপনি ঘুমাবেন না? রাত তো অনেক হল।'

'জ্বি। আপনার সাথে কথা বলে ভালই লাগল।'

আমি বললাম, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এই গরিব রথ-এ এবং থ্রি-টায়ারে না চড়লে এ অভিজ্ঞতা হতো না।

মি. শক্তি প্রসাদ এক সময়ে পাটনা রেল ডিভিশনের অবসরপ্রাপ্ত রেল ইন্সপেক্টর, বর্তমানে ঠিকাদার, অনেক কথাই বললেন। সবই তার এই দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা। তবে তার সব কথাই যে অগ্রাহ্য করবার মত তেমন নয়। ভারত বিশ্বের বিস্ময়কর রাষ্ট্র। একদিকে যেমন ভীষণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী অপরদিকে অগণিত ধনী সমাজ। বিহারের গ্রামগুলোতে বিজলী নেই অপরদিকে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষিত হচ্ছে। একদিকে যেমন দুর্নীতি বাড়ছে অপরদিকে বেড়েছে প্রবৃদ্ধি। সব মিলিয়েই ভারত এক বিচিত্র দেশ, ভারতের ইতিহাস বিশ্বের সবচাইতে বর্ণাঢ্য ইতিহাস।

আমি মাথা উঠিয়ে জানালার বাইরে দেখার চেষ্টা করলাম। ভেতরে আলো কম থাকায় বাইরে বেশ দেখা যাচ্ছে। চাঁদের সামান্য আলোতে এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। দূরে অপসৃয়মাণ আলোগুলো। পাতলা কুয়াশা ঢাকা নিঃশব্দ রাত। ভেতরে বেশির ভাগ যাত্রীরা নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছেন। আর অন্ধকারের বুক চিড়ে ছুটে চলছে 'গরিব রথ' পশ্চিম বাংলার রাজধানী, এককালের ইউরোপীয় শহর কলকাতার দিকে।

www.pathagar.com

চৌদ্দ

পলাশীর প্রান্তরে

সকাল ছয়টায় গরিব রথ কলকাতা স্টেশনে পৌছল। যাত্রীরা হুড়োহুড়ি করে নামছিল। রাতে ভাল ঘুম হয়নি। চোরের আতঙ্কে থাকতে হয়েছে। বিদেশ বিভুঁইয়ে টাকা পয়সা হারানো বা চুরি যাওয়া সবচাইতে মারাত্মক। কারণ, অচেনা জায়গায় কারও কাছে কর্জ করবার মত থাকে না। পাসপোর্টের চাইতে টাকা পয়সাই বিদেশে সবচাইতে মূল্যবান। তার উপরে শক্তি প্রকাশ যে বর্ণনা দিলেন এবং নিজের বাক্স যেভাবে পাগলা শিকল দিয়ে বাঁধলেন তাতে আরও শংকিত হয়েছিলাম। মনে মনে ভাবলাম এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। এমন অভিজ্ঞতা সচরাচর হবার নয়।

শক্তি প্রসাদ বাক্সখানা নিজে তুলে আমার সাথে করমর্দন করে আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। একটু পরেই মুকুল এসে হাজির। বলল, রমেশ বাইরে চলে এসেছে আর কামরুল নেমে বাইরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। এই প্রযুক্তির বিশ্বে বহু নতুন নতুন উপকরণ তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম মোবাইল। আগে এ ধরনের স্টেশনে কেউ আগে ভাগে নেমে গেলে তাকে খুঁজে পেতেই সমস্যা হতো। এখন মোবাইলের কল্যাণে কোন সমস্যাই হয়নি। তাই কামরুলকে খুঁজে পেতে যেমন সমস্যা হয়নি, তেমনি সমস্যা হয়নি রমেশ এবং তার ট্যাক্সি খুঁজে পেতে।

পূর্বেই নির্ধারিত ছিল যে আমরা কলকাতা পৌছে মুকুলের গড়িয়াহাটা ফ্ল্যাটে গিয়ে সকালের পর্ব সারব। পরে রমেশের নির্ধারিত ট্যাক্সিযোগে মুর্শিদাবাদের দিকে রওয়ানা হবো। রাত মুর্শিদাবাদ কাটিয়ে পরের দিনে কলকাতায় হোটেলে রুম নিয়ে শেষ রাতটা কাটাবো। সে পরিকল্পনা মোতাবেক রমেশ আমাদেরকে গড়িয়াহাটা মুকুলের স্টুডিও ফ্ল্যাটের দিকে নিয়ে চলল।

সকালের রাস্তা। গাড়ি চলাচল তেমন শুরু হয়নি। প্রায় পনের মিনিট পর আমরা গড়িয়াহাটা মুকুলের ফ্ল্যাটটিতে আসলাম। দেখেই মনে হল বহু দিন গৃহকর্ত্রী এখানে নেই। মুকুল মাত্র দু'দিন এখানে রাত কাটিয়েছে। আমরা পর্যায়ক্রমে গোসল সেরে কাপড় বদল করে মুর্শিদাবাদ যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম।

মুর্শিদাবাদ কলকাতা হতে প্রায় আড়াইশ' কিলোমিটার উত্তরে। আমাদের কুষ্টিয়া এবং রাজশাহী সীমান্ত বরাবর। যেতে হবে নদীয়া, পলাশী, বহরমপুর এবং

www.pathagar.com

কাশিমবাজার হয়ে মুর্শিদাবাদ, এককালের বাংলা বিহার, উড়িষ্যার রাজধানীতে।

আমরা তখনও নাস্তা করিনি। কথা ছিল প্রথমে কোথাও নাস্তা করব। মুকুল বলল যে পথে পড়বে শেরে পাঞ্জাব ধাবা সেখানেই নাস্তা সারব। রমেশ আমাদেরকে উত্তর কলকাতার উপকণ্ঠে এনে নামালেন। সেখানে অপেক্ষা করছিল প্রাইভেট নাম্বার যুক্ত সাদা রংয়ের এম্বেসেডর কার। কারের চেহারা দেখে বেশ পুরাতন মনে হলেও রমেশ বললেন গাড়িটি চার পাঁচ বছর পুরাতন। তিনি আরও জানালেন যে, ট্যাক্সিতে কলকাতার বাইরে দূরপাল্লার যাত্রী বহন আইনত করতে পারে না বলে এই ব্যবস্থা। যেহেতু গাড়িটি প্রাইভেট হিসাবে রেজিস্ট্রি করা তাই দূরপাল্লায় যেতে কোন অসুবিধে নেই। আমরা মাঝ বয়সী ড্রাইভারের সাথে পরিচিত হলাম। নাম লক্ষ্মন। বাড়ি বিহারে। রমেশের বাড়ির কাছাকাছি। ভাড়া ইত্যাদি আগেই নির্ধারিত ছিল। কাজেই সে বিষয়ে নতুন করে আলোচনার প্রয়োজন ছিল না।

আমরা রমেশের ট্যাক্সি ছেড়ে লক্ষ্মনের গাড়িতে উঠলাম। আমি আর কামরুল পেছনে আর সামনে মুকুল। গাড়ি স্টার্ট করতেই যেন বেল্টে আওয়াজ শুরু হলে আমি চালককে জিজ্ঞাসা করলাম যে তিনি এ গাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন কিনা? উত্তরে লক্ষ্মন বললেন, 'ভাববেন না। গাড়ি ঠিকঠাকই আছে তবে বহুক্ষণ পর স্টার্ট দিলে অমন আওয়াজ করে। কিছুক্ষণ চললে ঠিক হয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করলাম তিনি আমাদের ঠিকমত নিয়ে যেতে পারবেন? হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলে আমি বললাম যে প্রথমে আমরা নাস্তা সারব আর রাস্তায় পলাশীতে থামব। পলাশী যাবার কারণেই সড়ক পথে যাত্রা অন্যথায় ট্রেনেই যেতাম।

লক্ষ্মন আমাদের নিয়ে রওয়ানা হলেন। সব মিলিয়ে বহরমপুরে আমরা বিকেল পাঁচটার দিকে পৌঁছব বলে চালক আমাদেরকে জানালেন। এর মধ্যে রাস্তায় আমাদের দুপুরের খাবার পরিকল্পনাও রয়েছে। প্রায় আধাঘণ্টা পর কলকাতার বাইরের দিকে শেরে পাঞ্জাব ধাবাতে পৌঁছলাম। ধাবাটি বন্ধ পেলাম। কাজেই যেখানে থামা হলো না। আরও কিছু দূরে একটা যেনতেন রেস্তোরাঁয় বসে নাস্তা সেরে পুনরায় রওয়ানা হলাম। এবার শহর ছেড়ে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে হাইওয়ে ধরল। হাইওয়ে দেখে আমি নিরাশ হলাম সিঙ্গেল ক্যারেজ রোড অনেকটা আমাদের হাইওয়ের মত। ভারতের উত্তর প্রদেশে যে ধরনের আধুনিক রাস্তা দেখেছি তার ধারে কাছেও নয়। মনে হল আমরা ঢাকা-টাঙ্গাইল সড়কে যাচ্ছি। কোথাও কোথাও রাস্তায় খানাখন্দকে ভর্তি। রাস্তার পাশের দোকান আর বাজারের অবস্থান দেখে মনে হল যে আমরা বাংলাদেশেই রয়েছি। তবে এ রাস্তা বেশ ব্যস্ত। উত্তর পূর্ব-ভারতে যাবার অন্যতম সড়ক। তুলনামূলকভাবে আমাদের হাইওয়ের রক্ষণাবেক্ষণ অনেক ভাল।

এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার বহুলাংশের দুর্দশা দেখে মুকুল বলল যে, ন্যাশনাল হাইওয়ে

www.pathagar.com

নয় বলে এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। যেহেতু রাজ্য সরকার ফ্রি ওয়ের জন্য জমি দেয়নি সে কারণে এ রাস্তা ন্যাশনাল হাইওয়েতে রূপান্তরিত করা যায়নি। রাস্তায় বাস আর অন্যান্য যানবাহন ছাড়াও প্রচুর ট্রাকের চলাচল হয়। এগুলোর প্রধান গন্তব্য 'উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে। আমরা হুগলী নদী পার হয়ে উত্তর দমদমের ভেতরে দিয়ে উত্তরে যাচ্ছিলাম। পথে উত্তর কলকাতার শহরতলী। রাস্তার দু'ধারেই একেবারে রাস্তার উপরে এসব জায়গার বাজারগুলো। বাজারের সামনে বাংলাদেশের হাইওয়ের মতই চিত্র। প্রচুর রিকশা ভ্যান যেমনটা দেখা যায় আমাদের দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে। বাজারের কোথাও খোলা আকাশের নিচে কাঁচাবাজার। শীতের মৌসুমের শাক-সবজিতে ভরপুর। আমরা ঘন্টাখানেক চলার পর বারাসাত পার হয়ে স্টেট হাইওয়ে ৩৪ ধরলাম। রাস্তার দু'পাশে খোলা আবাদীজমি। দূরে গ্রাম। ঘরগুলো কাঁচা পাকা অনেকটা আমাদের গ্রামের ধাঁচের। দু'পাশের বিস্তীর্ণ জমি হলুদ সর্ষে ফুলের চাদরে ঢাকা। মৃদু মন্দ বাতাস ফুলগুলোর উপর দিয়ে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। রাস্তার দু'পাশে বিভিন্ন ধরনের বড় বড় গাছ।

আমরা কলকাতা ছেড়েছি প্রায় তিন ঘন্টা–দুপুর তখন প্রায় একটা। এর মধ্যে দু'বার বিভিন্ন কারণে যাত্রা বিরতি করতে হয়েছে। প্রায় তিন ঘন্টা পর পৌঁছলাম কৃষ্ণনগর বাসস্ট্যান্ডে। এখানে ছোটখাটো একটি বাজার বেশির ভাগই খাবারের দোকান। কৃষ্ণনগর যাবতীয় মিষ্টান্নের জন্য বেশ বিখ্যাত। বাসস্ট্যান্ডের পাশে থামতেই কয়েকটি রেস্তোরাঁ থেকে দুপুরের খাবার খেতে ডাকাডাকি শুরু হল। আমরা পান্থ তীর্থ নামের খোলা রেস্তোরাঁ বেছে নিলাম। আশা করেছিলাম হয়ত ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডের মত বড় এয়ারকন্ডিশনড রেস্তোরাঁ পাব এই ঐতিহাসিক শহর কৃষ্ণনগরের সন্নিকটে। তেমন কোন রেস্তোরাঁই এখানে নেই। তবুও পান্থতীর্থ রেস্তোরাঁটি ওই পরিবেশে একেবারেই খারাপ নয়।

আমরা রেস্তোরাঁতে ঢুকতেই এক ছোকরা গোছের ওয়েটার দৌড়ঝাঁপ দিয়ে তার কাঁধে রাখা ময়লা চিটচিটে গামছা দিয়ে একটি টেবিল মুছে দিল। দোকানে ঢুকতেই পাশে কাউন্টার। রেস্তোরাঁর মালিক নিজেই পরিচালনা করেন। কাউন্টারের কাঁচের ঘেরা অংশটিতে মিষ্টান্নের বাহার। কাউন্টারের উপরে লেখা 'কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত স্বরভাজনা'। এ ধরনের মিষ্টান্ন আগে আমার চোখে পড়েনি। খাইনি তো বটেই।

কৃষ্ণনগরের পূর্বদিকে আমাদের দেশের ছোট শহর জীবননগর। যদিও সরাসরি যোগাযোগ নেই কিন্তু কৃষ্ণনগর থেকে একটি রাস্তা পূর্ব-দক্ষিণ পূর্ব দিকে যশোহর সীমান্তে বয়রা পর্যন্ত গিয়েছে।

আমাদের মধ্যে বাকপটু কামরুল দোকানিকে জানান দিল যে, আমরা বাংলাদেশ হতে এসেছি যাব মুর্শিদাবাদ। বাংলাদেশের নাম শুনে দোকানি বিগলিত হাসি দিয়ে

www.pathagar.com

বললেন, 'ও বাংলাদেশ থেকে এসেছেন দাদারা?' 'আমার নাম শুশান্ত দেব। আমার ঠাকুরদার বাড়ি ছিল মেহেরপুরে। মনে হল কামরুল এবার তার দেশের লোক পেয়েছে। হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমার বাড়ি কুষ্টিয়া। একসময়ে মেহেরপুরও কুষ্টিয়ার অংশ ছিল। এখন মেহেরপুর আলাদা জেলা।

'দাদা একটু স্বরভাজা চেখে দেখুন। আমার স্বরভাজা আপনাদের হাইকমিশনার সাহেবের খুব পছন্দ। আমি প্রায়ই তার জন্য কলকাতাতে পাঠাই।'

আমি বললাম, 'হাইকমিশনার নয় একজন ডেপুটি।'

'ওই হল, আমাদের জন্য বাংলাদেশের হাই কমিশনার। বড় ভাল মানুষ। এদিকে আসলে এখানে আসবেনই আর স্বরভাজা নেবেনই।'

'আমরা নেব তবে এখন নয়। যাবার পথে।' আগাম ঘোষণা দিয়ে কামরুল দু'টুকরো মুখে পুরল। মুকুলও পিছিয়ে ছিল না। আমাকেও এক টুকরা দিলে আমি সামান্য চেখে দেখলাম বেশ সুস্বাদু। তিনশত রুপি কেজি। শুশান্ত বললেন যে, প্রায় পাঁচ থেকে ছয় কেজি দুধ থেকে এক কেজি সর বের হয়। দুধকে জ্বালিয়ে ঘন করে তৈরি হয়। সর এবং সেই সরভাজা হয় ঘিয়ের উপরে। দেখতে অনেকটা ডিমের পুডিং-এর মত। কামরুল শুশান্তকে আমাদের দেশের মিষ্টির উপর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে দিল। পরে শুশান্ত বললেন, 'আপনারা কি খাবেন? আমার এখানে রুই মাছ আর ভাতও পাবেন। পাবেন সবজি আর আলু পালকের সবজি।

কামরুলের ভাত খাবার বাসনা হল। আমি আর মুকুল আলু-পালক, ঘনডাল আর রুটির অর্ডার দিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসলাম। খাবার সেরে বিল পরিশোধ করতে গেলে শুশান্ত বললেন, 'দাদারা ফিরবার পথে এখানে খাবার খেয়ে যাবেন। বড় মাছ আনিয়ে রাখব।' জিজ্ঞাসা করলে শুশান্ত জানালেন যে পলাশী এখান থেকে এক ঘণ্টার পথ।

প্রায় ঘণ্টাখানেক যাত্রা বিরতির পর আমরা কৃষ্ণনগর ছাড়লাম। কৃষ্ণনগর শহরটি পশ্চিমদিকে আরেকটু ভিতরে। শহরের পশ্চিম দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ভাগিরথী নদী। এই ভাগিরথী নদীই একসময় কলকাতা হতে মুর্শিদাবাদ সংযোগের অন্যতম পথ ছিল। বিশেষ করে মধ্যযুগে যখন আধুনিক যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল না।

রাস্তার দু'পাশে শাশ্বত বাংলার গ্রাম্যচিত্র। দু'ধারে বড় বড় গাছ। বেশির ভাগ বট-পাকুর আর কৃষ্ণচূড়া। আমরা এসব দৃশ্য দু'চোখ ভরে দেখছিলাম। কামরুলের নাসিকা গর্জন তখন তুঙ্গে। সামনে বসে মুকুল মাঝে মাঝে ঝিমুচ্ছিল। আমার কাজ ছিল আবোল তাবোল কথা বলে মুকুল আর লক্ষ্মনকে জাগিয়ে রাখা। মুকুল বেশি কথা বলতে পারছিল না কারণ তার মুখ ভর্তি পান পরাগ। মুকুল কলকাতা আসার পর থেকে এই দ্রব্যটি অনবরত চিবিয়ে যাচ্ছে। ঢাকায় অবশ্য তার গিন্নি সুমিতার ভয়ে খায় না।

www.pathagar.com

অবশ্য সচরাচর পাওয়াও যায় না। আমিও যে বাদ ছিলাম তেমনও নয়। এতখানি পথ কিছু তো একটা করতে হবে।

ক্রমেই সূর্যের তেজ কমে আসছিল। প্রায় ঘন্টা খানেক পর আমরা পলাশীতে পৌঁছলাম। হাইওয়ে হতে পশ্চিম দিকে একটি সিঙ্গেল রাস্তা চলে গিয়েছে। ছোট একটি দিক-নির্দেশনা। লেখা পলাশী। পলাশী এখন ছোট একটি গ্রাম। প্রায় পনের মিনিট চলার পর রাস্তাটি শেষ হল ভারতীয় পিডব্লিউডি-এর ছোট ডাকবাংলোর সামনে। এ পর্যন্তই পাকা পথ। তারপরে ছোট ছোট কয়েকটি গ্রামের দিকে চলে গিয়েছে ধুলোয় ভরা মেঠো গ্রাম্য পথ। আমরা যেখানে নামলাম তার সামনে একটি মনুমেন্ট। ছোট আকারের স্থাপনা লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা দেয়া। ডাকবাংলাটির মূল ফটক বন্ধ। ভেতরে প্রচুর গাছ গাছালি। এর মধ্যে কয়েকটি বিশাল আম গাছ। এগুলো মনে হয় বহু পুরাতন। একই ধরনের গাছ দেখেছি মেহেরপুরের মুজিবনগরে যেখানে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম এবং যুদ্ধকালীন সরকার গঠিত হয়েছিল।

পলাশীর সাথে মুজিবনগরের কেমন যেন একটি যোগসূত্র রয়েছে। এখানে জুন ২৩, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিরাজের পরাজয়ের মধ্যদিয়ে শুধু বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্ত যায়নি, পদানত হবার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল সমগ্র ভারতের। আর মুজিবনগরের (প্রাক্তন বৈদ্যনাথতলা) আম্রকাননে উদয় হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের সূর্যের এপ্রিল ১৭,১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে। পলাশীর দুইশত তের বছর দশ মাস পর।

সাধারণত মনে করা হয় যুদ্ধ হয়েছিল পলাশী আম্রকাননে। আসলে তা নয়। পলাশীর প্রাঙ্গণে তেমন আম্রকানন দেখিনি। বলা হয় থাকে ওই সময়ে এখানে ছিল জঙ্গল আর পলাশ ফুলের গাছ। যে কারণে এ জায়গার নাম পলাশী। তবে আম্রকানন ছিল গ্রামের পুকুরপাড়ে যেখানে ক্লাইভের বাহিনী সমবেত ছিল। এখন সে গ্রামের অনেক বিবর্তন হয়েছে। আম্রকানন আর নেই। বাংলার তথা ভারতের এবং ব্রিটিশ ইতিহাসে পলাশী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যুদ্ধ আর স্বাধীনতার অবসান এবং নতুন সাম্রাজ্যের পত্তনের ইতিহাস।

আমরা মনুমেন্টের চত্বরের সামনে দাঁড়ালাম। যেখানে একটি স্তম্ভের উপরে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব হিসেবে পরিচিত সিরাজ-উদ-দৌলার আবক্ষ মূর্তি বসানো রয়েছে। মাথায় নবাবী মুকুট। চত্বরের উত্তর দিকে একটি ছোট গ্রাম্য চায়ের দোকান। একজন স্থানীয় কেউ চা খাচ্ছিলেন। অদূরেই একটি চাপকল আর তার পাশে একটি শ্বেতপাথরের ফলক লাগানো রয়েছে। ফলকটিতে বাংলায় লেখা, 'পরদেশ গ্রাসীদের বিজয় স্তম্ভ নয়, সিরাজ, মীরমদন, মোহন লালের নাম হোক অক্ষয়; ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান পিপলস ফোরাম, ২৫০তম বর্ষ পলাশী দিবস ২৩ জুন ২০০৭' ফলকটি উন্মোচন করেছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস এমপি। মূল স্তম্ভের গায়ে ইংরেজিতে লেখা

www.pathagar.com

PLASSEY, 23 June 1757'। দেখে মনে হল ওই স্তম্ভটি ব্রিটিশ ভারতের সময়ের। তবে তার সামনে সিরাজের আবক্ষ মূর্তি আর স্মৃতি ফলকটি একই দিনে উন্মোচিত।

আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। মনে হল ভারত সরকার অথবা পশ্চিমবাংলা সরকার এ ইতিহাসের তেমন কোন গুরুত্ব দেয়নি। হালে এখানে যতটুকু সংযোজন করা হয়েছে তা এই উপমহাদেশের তিন দেশের জনগণের পক্ষ থেকে তাও যথেষ্ট নয়। অবহেলিত এই ট্রাজিক স্থানটি।

আমরা চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে চা পান করলাম। চা পান শেষে মুকুলের মতামত নেবার জন্য জিজ্ঞেস করলাম ইতিহাসের এমন গুরুত্বপূর্ণ স্থানটির এ অবস্থা কেন। রাস্তা না থাকার মত। আশপাশে বসবার বা ঘুরে দেখবার কোন জায়গা নেই। অবহেলিত কেন?'

'দেখ চৌত্রিশ বছর বাম সরকার বাংলা শাসন করছে। তারা ইতিহাসকে মূল্যায়ন করে নাই।' মুকুল কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলল।

'আর কিছু দেখবার আছে না আমরা ফিরব।' কামরুল চা পান শেষে আমাকে জিজ্ঞেস করল।

'কামরুল এতদূর এসেছি পলাশীর প্রান্তর দেখতে। এই যে কলকাতায় বিভিন্ন জায়গায় ঘুরলাম। ভারতের দু'শত বছরের ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস পড়লাম। দ্বিখণ্ডিত বাংলার ইতিহাস এতগুলো বছর পড়লাম যার উৎপত্তি হয়েছিল এখান থেকে। এখানের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। সে জায়গা না দেখে মুর্শিদাবাদে যাবার কোন মানে হয় না।

কামরুল আমার কথায় চুপ হয়ে গেল। 'এখানে যুদ্ধ কোথায় হয়েছিল। পলাশীর প্রান্তরটি কোথায়?' 'আমি দোকানিকে জিজ্ঞাসা করলাম। 'আপনারা সামনে (পশ্চিমে) চলে যান। সেখানে বাঁধের উপরে উত্তর দক্ষিণে রাস্তার উপরে দাঁড়ালে ওই জায়গা দেখতে পারবেন। সেখানে কয়েকটি স্তম্ভ বানানো রয়েছে। আর কিছুই নেই।'

আমরা দোকানির কথা মত এগিয়ে গেলাম। গ্রামের মেঠো পথ। তাও আবার শীতের শুষ্ক মৌসুম। রাস্তায় প্রচুর ধুলোবালি। সেগুলো মাড়িয়েই আমরা এগুচ্ছিলাম। বাঁধের কাছে যেতেই একজন সাইকেল আরোহীকে পেলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'পলাশীর যুদ্ধ ক্ষেত্রটি কোথায়।' তিনি আমাদেরকে আরেকটু সামনে নিয়ে এসে দূরে মাঠের মধ্যে একটি স্থাপনা দেখিয়ে বললেন, 'ওই যে সাদা তিনটি স্তম্ভ দেখছেন ওটাই যুদ্ধক্ষেত্র।'

'যাবার কোন রাস্তা আছে?'

'তেমন রাস্তা নেই, সামনের গ্রাম পর্যন্ত গিয়ে আপনাদের শস্যক্ষেতের আইল ধরে যেতে হবে, বললেন সাইকেল আরোহী। আমরা তার পথ নির্দেশনা মত বাঁধ থেকে

www.pathagar.com

নেমে সামনের ছোট গ্রামের দিকে অগ্রসর হলাম।

ছোট গ্রাম নাম তার পলাশী। দু'ধারে কলার গাছ। আছে কয়েকটি খেজুর গাছ, বাঁশঝাড় আর শিমের বাগান। দু'পাশে বিভিন্ন ধরনের জংলী গাছ, লতাপাতা। রাস্তার উপরে মা মুরগী তার বিশাল আকারের সন্তানাদির বহর নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। আরেকটু সামনে এগুতেই ছোট মজা পুকুর। পানি নেই বললেই চলে। চাষযোগ্য জমি। হয়তোবা আখ জাতীয় কিছু ছিল এখন কাটা হয়ে গিয়েছে। আমরা চওড়া আইল ধরে এগিয়ে গেলাম। সব মিলিয়ে প্রায় দেড় কিলোমিটার হেঁটে আসতে হলো।

আমরা স্মৃতিস্তম্ভের প্রায় কাছাকাছি। পাশে কয়েকটি খেজুর ও নাম না জানা গাছ। সামনে বিস্তীর্ণ চাষ করা জমি। এ অঞ্চলের অন্যতম প্রধান ফসল ইক্ষু। পলাশীতে ভারতের বৃহৎ শিল্প উদ্যোক্তা খৈতান গ্রুপের একটি বিশাল চিনিকল রয়েছে। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে খৈতান গ্রুপ এ জায়গার নাম পরিবর্তন করে রাখতে চেয়েছিল খৈতাননগর। কিন্তু স্থানীয় জনগণ এবং প্রেসের চাপে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাম পরিবর্তনের অনুমোদন দেয়নি। অনুমোদন দিলে আর ইতিহাস সচেতন মানুষের প্রতিবাদ না হলে হয়তো পলাশী হারিয়ে যেত ইতিহাসের পাতা হতে। আমরাও হয়ত খুঁজে পেতাম না এ জায়গা।

আমরা স্মৃতিস্তম্ভগুলোর সামনে এসে পৌঁছলাম। ছোট দেয়াল ঘেরা একটি পাকা চত্বরের উপরে পাশাপাশি সিমেন্টের তিনটি স্তম্ভ। মনে হয় বেশি দিন হয়নি এগুলো এখানে দাঁড় করানো হয়েছে। স্তম্ভের বেদিটি লাল রংয়ের। মনে করিয়ে দেয় এখানে ঘটে যাওয়া রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের কথা। ভেতরে শুকনো ঘাস আর পাতা পড়ে নোংরা হয়ে আছে। পেছনে দূরে সবুজ গাছে ঘেরা মূল পলাশী গ্রাম। তার আরও পশ্চিমে ভাগিরথী নদী। কালের সাক্ষী হয়ে বহমান। আজ থেকে তিনশত বছর পূর্বে নদীটি আরও কাছে ছিল। এখানে নদীর একটি লুপ ছিল। যা এখন নেই। আমরা কিছু ছবি তুলছিলাম। আমাদের দেখে পাশের গ্রামের একজন যুবক এগিয়ে আসলেন। নাম হরিপদ দাস বললেন, এখানে মাঝে মধ্যে বাবুরা আসেন পিকনিক করতে। অনেকে আবার শুধু জায়গাটি দেখতে আসেন। তিনি এ জায়গার গুরুত্ব জানেন। তার আফসোস এ জায়গার আরও উন্নতি করা যেত। হয়ত আরও অনেকে আসতেন। আমাদের পরিচয় আর বাংলাদেশের নাম শুনে বেশ খুশিই হলেন। সাহায্য করলেন ছবি তুলতে। ছবি তোলার পর্ব শেষ হলে আমি বেদির গোড়ার ফলকটি পড়লাম। তাতে লেখা রয়েছে,

'এখানে বকসী মীর মদনের নির্দেশে আর নওয়াব সিরাজ-উদ-দৌলার তত্ত্বাবধানে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। এখানেই জুন ২৩, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে বেলা দুটায় যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুবরণ করেন তোপখানা প্রধান বকসী মীর মদন, বাহাদুর আলী খান, রাইফেল বাহিনীর এবং নওয়াব সিং হাজারি তোপখানার ক্যাপটেন। এ স্তম্ভটি ভারতের

www.pathagar.com

স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে নদীয়া জেলার নাগরিক কাউন্সিলের উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছে ১৯৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দে।" এই স্মৃতি ফলকটি না থাকলে যুদ্ধক্ষেত্রটি অনুধাবন করা কঠিন হয়ে পড়ত। কারণ, প্রায় তিনশত বছর পূর্বের সেই পলাশী এখন আর নেই।

ফলকটি পড়া শেষ হলে সামনের তিনটি স্তম্ভের গায়ে লেখা নামগুলো পড়লাম। মধ্যের উঁচু স্তম্ভের গায়ে লেখা রয়েছে 'সাহসী এবং অনুগত বকসী মীর মদন' যিনি ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছেন মীর মদন নামে। অপেক্ষাকৃত ছোট উচ্চতার স্তম্ভে বাহাদুর আলী খানের, আর একই উচ্চতার দক্ষিণ স্তম্ভের গায়ে নওয়াব সিং হাজারির নাম লেখা। স্তম্ভের আকারেই বলে দেয় যে এখানকার যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বকসী মীর মদন। তিনি ছিলেন সিরাজের অন্যতম সিপাহসালার বা সেনাপতি।

আমরা বেদি থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। মুকুল ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ছবি তুলছিল। আমার ক্যামেরার চার্জ শেষ হয়ে যাওয়াতে মোবাইলের ক্যামেরা ব্যবহার করছিলাম। কামরুলের ক্যামেরা হরিপদের হাতে। তিনি সাহায্য করছেন আমাদের ছবি তোলার পর্বে। ছবি তোলার পর্ব শেষ হলে আমি পশ্চিমে দূরের গ্রামের দিকে তাকালাম। দাঁড়ালাম পাশের এক গাছের নিচে। গ্রামের সামনে বিস্তীর্ণ খোলা মাঠ। মাঠে সর্ষের চাষ। হলুদ ফুলে ছেয়ে গেছে সম্পূর্ণ মাঠ। অদূরেই ভাগিরথী নদী।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে এই পলাশীর প্রান্তর যেখানে এক গাছের নিচে আমি দাঁড়ানো, এখানে ছিল বহু ধরনের গাছ-গাছালিতে ভরপুর। দূরে পলাশী গ্রাম যা এখনও সেখানে দাঁড়িয়ে দেখা যায়। সেখানে ওই সময় ছিল ঘন আম্রকানন আর তার সামনে ছিল একটি বড় পুকুর। এখনও আছে কিনা জানি না কারণ সময়ের অভাবে সেখানে যাওয়া হয়নি। ওই সময়ে গ্রামটি ভাগিরথী নদী হতে প্রায় ১,১০০ গজের দূরত্বে ছিল। ভাগিরথীর পাড়ে আম বাগানের অপর প্রান্তে ছিল নবাব আলীবর্দী খাঁ-এর শিকার বাড়ি। শিকার বাড়িটির চারপাশে দেয়াল ছিল। উপরে উঠলে খালি চোখেই দূর-দূরান্ত দেখা যেত।

জুন ১৭, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ বাহিনী কুট-এর কাছাকাছি পাটুলিতে পৌঁছল।

পাটুলির সন্নিকটে ভাগিরথীর পশ্চিমপাড়ে ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ কুট দুর্গ সিরাজের বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। কুট দুর্গ দখল না করলে নদীর পূর্বপাড়ে সেনানিবাস হতো মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। ক্লাইভের পরিকল্পনায় কুট দখলের উপরেই নির্ভর করেছিল পলাশীতে সৈন্য সমাবেশ।

সৈন্যদের নিয়ে এসেছিল এডমিরাল ওয়াটসন। এর দু'দিন পর জুন ১৯, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির বাহিনীর মেজর আয়ার কুটের সেনাদল বিনা বাধায় কুট দুর্গ দখল করে নিয়েছিল। সিরাজের বাহিনী কোন প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেনি। কোম্পানির

www.pathagar.com

বাকি বাহিনীর সদস্যরা সে রাতেই কুট-এ পৌঁছে গিয়েছিল। এখানে ক্লাইভ বাহিনী দু'দিন অপেক্ষা করে।

কোম্পানির বাহিনীর ইউরোপীয় সদস্যের বাহিনীর পাটুলীতে পৌঁছার পর কুট দখল করবার পরদিন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা মতিঝিল থেকে তার বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হয়ে তার পরের দিন, জুন ২১, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশী পৌঁছলেন। সন্নিবেশিত করলেন তার বাহিনীকে। তখনও ক্লাইভের বাহিনী ভাগিরথীর অপর তীরে। যদিও ক্লাইভের অন্যান্য সেনাপতিরা নবাবের বাহিনীর প্রস্তুতি দেখে যুদ্ধ না করবার মতামত দিলেও তথাপি ক্লাইভ যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলেন। অন্যান্য ইংরেজ সেনাপতিরা জানতেন না যে ক্লাইভ মতিঝিল হতে নবাব বাহিনীর আগমনের পূর্বেই মীরজাফরের সাথে যোগাযোগ করে বিশ্বাসঘাতকতার নিশ্চয়তা পেয়েছিলেন।

জুন ২২, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ। দিনে প্রচুর বৃষ্টি আর ভ্যাপসা গরম সত্ত্বেও ভাগিরথী পার হয়ে ক্লাইভ মাঝ রাতে পলাশীতে পৌঁছলেন। অবস্থান নিলেন আম্রকাননে আর অগ্রগামী সৈন্যদের রাখলেন বড় পুকুরের পাড়ে। স্থাপনা করলেন তোপখানা। সকালে দূরবীন দিয়ে ক্লাইভ দেখলেন নিজেরই অজান্তে নবাবের বাহিনীর ঘেরার মধ্যে চলে এসেছেন, নবাবের সাথে বিশাল বাহিনী ক্লাইভের বাহিনীর প্রায় পাঁচগুণ। ক্লাইভ দ্বিতীয়বার ভাবলেন। দোটানায় পড়লেন। তাঁবুতে একা বসে কিছুক্ষণ ভাবলেন যদি মীরজাফর তার পরিকল্পনায় সাড়া না দেন তবে ক্লাইভের রণে ভঙ্গ দেয়া ছাড়া আর কোন গতি থাকবে না। সিদ্ধান্ত নিতে হলে এখনই। কারণ, তিনি জানেন এ যুদ্ধে পরাজয় বরণ করলে এর দায়-দায়িত্ব তাকে শুধু একাই নিতে হবে। তিনি ভাল করেই জানেন যে, এ যুদ্ধে পরাজিত হলে নবাব ইংরেজদের বাংলা হতে সমূলে উৎখাত করবেন। ক্লাইভ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যে খেলায় তিনি মেতেছেন তার শেষ দেখে ছাড়বেন। ফিরে যাবার পথ নেই। সিদ্ধান্ত নিলেন যুদ্ধের। বাকিটা তার কূটচাল আর ভাগ্যের উপরে ছেড়ে দিলেন।

আমি পলাশীর প্রান্তরে নাম না জানা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে হারিয়ে গেলাম ইতিহাসে। মনে হল আমি কোন এক বৃহৎ পলাশ গাছের নিচে দাঁড়ানো। সামনে কিছুটা খোলা জায়গা। দূরে চারদিকে পলাশ আর আম গাছের বেষ্টনী। পিছনে নবাবের ফৌজ। তারিখ ২৩ জুন, ফৌজের সামনের সারিতে সারি সারি কামান বসানো। তার পেছনে রাইফেল বাহিনী আর দু'পাশে অশ্বারোহী বাহিনী। পেছনে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা স্বয়ং। অর্ধবৃত্ত আকারে নবাবের বিশাল বাহিনী। যার দক্ষিণ বাহুতে প্রধান সেনাপতি মীরজাফর আলী খানের বাহিনী। উত্তরের বাহুতে রাজা রায় দুর্লভ রাম। অর্ধচন্দ্রাকার বৃত্তের মাঝখানে ইয়ার লতিফ খান। আর সামনে, হয়তো আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে, মীর মদনের তোপখানার মূল বাহিনী। তারই সামনে মীর মদনের

www.pathagar.com

সওয়ার। বাঁয়ে মানে দক্ষিণ দিকে সেন্ট ফ্রাইস সিনফ্রে নেতৃত্বে ফরাসী তোপখানা। মীর মদনের সাথে ছিল পাঁচ হাজার সওয়ার আর তিপান্নটি বিভিন্ন আকারের কামান। মোহনলালের অধীনে ছিল সাত হাজারের পদাতিক বাহিনী। সামনে নদীর লুপের দক্ষিণে ক্লাইভের বাহিনী। নবাবের বিশাল বাহিনীর কথিত সদস্যরা যারা অর্ধ চন্দ্রাকারের মধ্য ছিল তার সংখ্যা ছিল প্রায় 'পঁয়তাল্লিশ হাজার। আগেই যেমন বলেছি এদের নেতৃত্বে ছিলেন তিনজন– মীরজাফর, রাজা রায় দুর্লভ আর ইয়ার লতিফ।

ইংরেজ বাহিনীর প্রধান ছিলেন কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ। ইংরেজ বাহিনীর প্রথম ডিভিশন, ১ম মাদ্রাজ ইউরোপিয়ান রেজিমেন্ট, কমান্ডার ছিলেন মেজর জেমস কিলপ্যাট্রিক, ২য় ডিভিশনের কমান্ডার ছিলেন মেজর আলেকজান্ডার গ্রান্ট, ৩য় ডিভিশনের কমান্ডার আইর কুট, ৪র্থ ডিভিশনে মেজর জর্জ ফ্রেডরিক গান আর সাথে ১ম বেঙ্গল নেটিভ ইনফেনট্রি।[১]

নবাবের বাহিনীর শক্তি এবং বিশ্বাস এমন ছিল যা অল্প সময়ের মধ্যেই ক্লাইভের বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে ঠেলে দিতে পারতো ভাগিরথীর অথৈ জলে। কিন্তু ইতিহাস তেমন বলে না। পঁয়তাল্লিশ হাজার সদস্যের বাহিনী নিয়ে ইতিহাসের কুখ্যাত মীরজাফরের নেতৃত্বে বাকি দু'জন ঠাঁয় দাঁড়িয়ে ছিলেন যখন মীর মদন আর মোহন লাল ফরাসী কামানের গোলার শব্দে হামলা করলেন ক্লাইভ বাহিনীর উপর।

ক্লাইভ অপেক্ষা করছিলেন সামনের বিশাল দীঘি আর জঙ্গলের মধ্যে। অপেক্ষায় ছিলেন মীরজাফরের সংকেতের। সকাল আটটায় ফরাসী বাহিনীর কামান দাগার মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছিল যুদ্ধ। মীর মদনের কামানের গোলার আঘাতে ক্লাইভের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হবার উপক্রম হল। পেছনে নদীর পার হতে এডমিরাল ওয়াটসনের যুদ্ধজাহাজ রক্ষিত কামান গর্জে উঠছিল প্রতিউত্তরে। সকাল সাড়ে আটটার দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাহিনী কিছুটা পিছে হটল।

আমি গাছের নিচে দাঁড়ানো। মনে হল আমার হাতে দূরবীক্ষণ যন্ত্র। দাঁড়িয়ে দেখছি পলাশীর হঠকারী যুদ্ধ। যেমন দেখছিলেন সিরাজ। মনে হল আমার চারদিকে যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিক আর কামানের কান ফাটানো আওয়াজ। দূরে কোম্পানির বাহিনীর সৈনিকদের মধ্যে জান বাঁচানোর জন্যে দৌড়ঝাঁপ।

প্রায় তিন ঘণ্টা চলল কামানের গোলাগুলি। মীর মদনের বাহিনী, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে, কিছু দূর অগ্রসর হয়ে থেমে গেল। কিছু সময়ের জন্য থেমে গেল যুদ্ধের রণদামামা। ফুরিয়ে আসল নবাবের তোপখানার গোলা। পেছন থেকে আরও গোলা আনতে হবে। পেছনে যেখানে গোলা মজুদ করা ছিল সেগুলো ছিল

১। Malleson George B' The Decisive Battes of India from 1746-1819. PP-48-49

www.pathagar.com

মীরজাফরের তত্ত্বাবধানে। জুন মাসের বাংলা। ওই দিন সকালে মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছিল। কামানের গোলাগুলোকে ঢেকে রাখা হয়নি। পানিতে ডুবে গেল মজুদ গোলা। হয়ে গেল অকেজো। তখনও ক্লাইভ মীরজাফরের সংকেতের জন্য অপেক্ষায়রত। নবাব ছুটছেন সৈন্যদের অবস্থানের একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্তে। সিরাজ তরুণ কিন্তু যুদ্ধে তিনি আগেও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বুঝে উঠতে পারছিলেন না কি হচ্ছে বা হতে যাচ্ছে। তিনি পর্যায়ক্রমে কুচক্রী তিনজনের সাথেই যোগাযোগ করলেন। তিনজনেই নবাবকে আশ্বস্ত করলেন। জানালেন তারা সঠিক সময়ের অপেক্ষায় রয়েছেন।

হতাশ মীর মদন তোপখানার কামান ছেড়ে সওয়ার এবং তার সহযোগীদের নিয়ে পূর্ণ আক্রমণের প্রস্তুতি নিলেন। অপরদিকে থেমে থেমে কামান দাগা হচ্ছে ওয়াটসনের নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ থেকে। যুদ্ধ থমকে দাঁড়ালো। ক্লাইভ পরিকল্পনা করলেন দিন পার হলে মধ্যরাতে নবাবের বাহিনীর উপর আক্রমণ করবেন। তার অধীনে সৈন্যদের বিশ্রাম দিলেন।

আমি এখনও গাছের নিচে দাঁড়ানো। মনে হল আমার দু'পাশে মীর মদনের সওয়ার। মদন লাল ভাবলেন কোম্পানির বাহিনীর সেনারা শ্রান্ত। হয়ত বৃষ্টিতে তাদের কামানের গোলাও ভিজে গেছে। কিন্তু তেমন হয়নি ক্লাইভ গোলার ভাণ্ডার তেরপাল দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন।

মীর মদন, দেশভক্ত বীর, আক্রমণ করলেন। পিছে ফিরেও তাকালেন না যে তার ডাকে মীরজাফর বাহিনী সাড়া দিয়েছে কিনা। মীর মদন এগুলেন। ওই সময়েই কোম্পানির বাহিনী কামান আর রাইফেলের ব্যবহারে বৃষ্টির মত গোলা আর বুলেট নিক্ষেপ করতে লাগল। আমাকে ছাড়িয়ে গেলেন মীর মদন। অল্প দূরে এগুতেই মীর মদন গুলি খেয়ে গুরুতর আঘাত পেয়ে পড়ে গেলেন। গুরুতর আঘাত পেলেন তার সহযোগী আরও দু'জন। যাদের নাম এখানে লেখা রয়েছে। আহত মীর মদন আর তার দু'সহযোগীকে লুটিয়ে পড়তে দেখে সওয়ার বাহিনী পিছু হটে গেল। মীরজাফরের বাহিনী আক্রমণ অব্যাহত রাখতে সহযোগিতা না করে পিছু হটলেন। পিছু হটলেন সৈন্যসামন্ত নিয়ে বাকি দু'জন। নবাবের সৈন্যরা জায়গা ছেড়ে উঁচু ভূমির পেছনে চলে আসল। নবাব ডেকে পাঠালেন মীরজাফরকে। সিরাজ মীর জাফরের পায়ের কাছে নিজের শিরোস্ত্রাণ রেখে বললেন, 'আপনি আমার মুরুব্বী। প্রধান সিপাহসালার দেশের এই বিপদের সময়ে অতীত ভুলে আপনি দেশের জন্য শত্রুর মোকাবেলা করুন। আমি প্রয়োজনে সিংহাসন ছেড়ে দেব। তবু বিদেশিদের হাতে দেশ তুলে দিবেন না।' মীরজাফর নবাবকে আশ্বস্ত করতে কোরআন ছুঁয়ে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন।

কিন্তু হঠকারী মীরজাফর কোরান ছুঁয়ে নেয়া শপথ ভঙ্গ করলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ক্লাইভের বাহিনীর মোকাবেলা করলেন না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। দাঁড়িয়ে রইলেন

www.pathagar.com

রাজা রায় দুর্লভ আর নবাব হবার দুরাশা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ইয়ার লতিফ (লুতফ)। তিনজনের সাথে পঁয়তাল্লিশ হাজার সৈনিক। সময় ছিল দুপুর একটা, জুন ২৩, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ।

জুন ২৩, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের দুপুরে মীর মদনসহ তিনজন মৃত্যুবরণ করলেন। বিকেলে মীরজাফরের সংকেত পেলেন ক্লাইভ। সন্ধ্যা পর্যন্ত পলাশীর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। সিরাজ প্রমাদ গুণলেন। তার সবচাইতে বিশ্বস্ত সিপাহসালার আর নেই। অন্যান্য সৈনিকরা মীরজাফরের সাথে যোগ দিল।

সিরাজ সন্ধ্যার অন্ধকারে কিছু সংখ্যক দেহরক্ষী নিয়ে পলাশী ছেড়ে মুর্শিদাবাদের পথে রওয়ানা হলেন।

মীরজাফর আসলেন ক্লাইভের তাঁবুতে হাত মেলালেন। ক্লাইভকে মনে করিয়ে দিলেন তার প্রতিজ্ঞার কথা। মীরজাফর শোধ নিবেন সিরাজের হাতে তার অপমানের।

জুন ২৩, প্রায় মধ্যরাতে সিরাজ পৌছলেন মুর্শিদাবাদে। ততক্ষণে পরাজয়ের খবর পৌছে গেছে বাংলার রাজধানীতে। জুন ২৪, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে যখন বাংলায় পরাধীনতার সূর্য উদয় হল তখন বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর তার বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলেন মুর্শিদাবাদে। বীরদর্পে বিকেলের দিকে প্রবেশ করলেন মুর্শিদাবাদে।

আমি তখনও দাঁড়িয়ে। মনে হচ্ছিল ইতিহাসের এ অধ্যায় আমার সামনেই ঘটে গিয়েছে। এখন সেই পলাশী আর আম বাগান নেই। এখানে কোথাও ছিল নবাবের শিকারবাড়ি যার ৪০০ গজ উত্তরে বড় আকারের পুকুর ছিল, প্রায় নদীর ধারে। নদী অনেকটা সরে গিয়ে বর্তমান অবস্থায় রয়েছে। হরিপদকে জিজ্ঞাসা করলাম গ্রামটিতে পুরাতন কোন পুকুর রয়েছে কিনা। তিনি বললেন, ‘একটা পুকুর রয়েছে তবে কত পুরাতন তা জানিনে। আমি দূরের ওই গ্রামে বেশি যাই না। তবে এখানে আসতে যে মজা পুকুরটি দেখছেন এটা বহু শত বছর পুরাতন। তবে এত ইতিহাস আমার জানা নেই।’

আমার মনে হলো যে উঁচু বাঁধমত জায়গা দিয়ে আমরা এসেছি সেটাই হয়তো এক সময়ের উঁচু ঢিবি যেখানে ছিল মীর জাফরের সৈন্যরা। আর এখানের এই মজা পুকুরের ধারেই অবস্থান নিয়েছিল ফরাসী কামান বাহিনী। সেইদিন ফরাসী বাহিনীর সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। মাত্র পঞ্চাশজন সেনা নিয়ে এখানে ছিলেন লেফটেন্যান্ট সেন্ট ফ্রাইস সিনফ্রে।

ফরাসীরা নবাবের সাথে সহযোগিতা বাড়াতে থাকেন চন্দন নগর ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত হতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিনিয়ে নেবার পর হতে। প্রায় সাত বছর লেগেছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলার একচ্ছত্র এবং সরাসরি শাসক হতে। এই কয়টা বছর ব্রিটিশ ইতিহাসে উল্লেখিত হয়েছে সাত বছরের যুদ্ধ (Seven years of war) হিসাবে। এতগুলো বছর এবং তারপরেও উনবিংশ শতাব্দীতেও

www.pathagar.com

তৎকালীন ভারতে ব্রিটিশ আর ফরাসীদের মধ্যে আধিপত্যের লড়াই হয়েছে। যেমন হচ্ছিল ইউরোপে আর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিযোগিতা হচ্ছিল উপনিবেশ তৈরিতে। ফরাসীরা চন্দননগর হারাবার পর শুধুমাত্র পন্ডিচেরী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। আরেক প্রান্তে ছিল ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।

আমরা আস্তে আস্তে পলাশীর যুদ্ধের প্রান্তর ছেড়ে মেঠো পথে ফিরছিলাম। কামরুল আর মুকুল একটু জোরে সামনে হাঁটছিল। হরিপদ আমার সাথে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'স্যার আমি এখানে কলা আর সবজির বাগান করি। পেছনে আমার বাড়ি একটু জলপান করে যাবেন।' একবার মনে হচ্ছিল ঘুরে আসি। সূর্য পড়ন্ত ছিল। আমাদের আরও পথ যেতে হবে। অন্ধকারে সড়ক যাত্রা আমি বিশেষ পছন্দ করি না। তাই হয়ত হরিপদের গ্রামে যাওয়া হলো না। গেলে হয়ত কিছু ঐতিহাসিক তথ্য অথবা যুদ্ধক্ষেত্রের কিছু অংশের ঘটনা অনুধাবন করতে পারতাম। হরিপদ আমাদের সাথে উঁচু বাঁধ পর্যন্ত আসলেন। তাকে বিদায় দিয়ে আমি লালমাটির এ বাঁধটিকে ভাল করে দেখলাম। মনে হল এটি কৃত্রিম বাঁধ নয়। একসময় মাটির ঢিবি ছিল। হয়ত সেটাকেই কেটে বাঁধের মত করা হয়েছে। এখানেই ছিল মীরজাফর, ইয়ার লতিফ আর রাজা রায় দুর্লভ। ইংরেজদের সাথে ষড়যন্ত্রের প্রথম খলনায়ক ইয়ার লতিফ ছিলেন নবাবীর দাবিদার, কিন্তু ধূর্ত বেনিয়া ব্রিটিশ প্রশাসকরা ঠিক করে রেখেছিল মীরজাফরকে। জাফরকেও এই আশ্বাস দিয়েই বিশ্বাসঘাতকতা করতে উৎসাহিত করে।

আমি ঢিবিতে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে ক্ষণিকের জন্য তাকালাম। দূর দিগন্তে সূর্য ডুব দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছিল। জানতে ইচ্ছা হচ্ছিল যে ২৩, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের সেদিন সূর্য উঠেছিল কিনা? না বাংলার আকাশ সেদিন দুর্যোগের ঘনঘটা মেঘে আচ্ছাদিত ছিল। ইতিহাস বলে সেদিন অপরাহ্নের আগে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল। আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। হয়তো সূর্য দেখতে চেয়েছিল না এমন হঠকারী যুদ্ধ আর তিন কুচক্রীদের।

আমি বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে। উত্তর দিক হতে এ রাস্তা দিয়ে একজন সাইকেল আরোহী এদিকেই আসছে। দূর হতে মনে হল পলাশীতে নবাবের পরাজয়ের পর ক্লাইভের সাথে মীর জাফরের সাক্ষাৎ করবার খবর নিয়ে ওমর বেগ ছুটছেন।

ওমর বেগের সাথে মি. স্ক্রাফটনকে ক্লাইভ পাঠালেন মীরজাফরকে সসম্মানে দাদাপুরে নিয়ে আসতে। মীরজাফর জুন ২৪, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রত্যুষে দাদাপুর পৌছুলে ক্লাইভ তাকে বাংলা, বিহার আর উড়িষ্যার নবাব বলে অভিবাদন আর গার্ড অব অনার দিলেন। মীরজাফর নিশ্চিন্ত হলেন যে ইয়ার লতিফ নয়, তিনিই হবেন বাংলার নবাব।

ইয়ার লতিফ যুদ্ধ শেষ হবার আগেই বুঝতে পারলেন তার নবাব হবার ইচ্ছায় ইংরেজরা বাদ সেধেছে। ইংরেজদের চোখে দু'জনার তুলনায় মীরজাফর এগিয়ে

www.pathagar.com

ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া ছাড়াও মীরজাফর সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের হবার সাথে সাথে বাংলার নবাব পরিবারের সদস্যও ছিলেন। ছিলেন সিরাজের নিকটতম আত্মীয়। তবে জগৎশেঠ যখন ষড়যন্ত্র শুরু করেন তখন ক্লাইভকে ইয়ার লতিফ খানের সুপারিশ করেছিলেন। সে অনেক কথা। ইতিহাস সচেতন বাঙালি মাত্রই জানার কথা।

আমি ধীর পদে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পলাশী স্তম্ভের কাছে চলে আসলাম। আবার সেই চায়ের দোকানের সামনে। মুকুল আর কামরুল আরেক পেয়ালা চায়ের আদেশ দিলে দোকানি বিগলিত হাস্যে চা বানিয়ে হাতে দিল। চায়ে চুমুক দিলাম ঠিকই কিন্তু আমার দৃষ্টি ছিল সিরাজের আবক্ষ মূর্তির উপরে। হতভাগ্য নবাব। প্রতারিত হলেন নিজের অনেক কাছের লোকের দ্বারা। তরুণ নবাব আবেগের বশবর্তী হয়ে মীরজাফরকে যেদিন দ্বিতীয়বার প্রধান সেনাপতি বানালেন, সেদিন তিনি করলেন দ্বিতীয় ভুল। নবাব প্রথম ভুল করেছিলেন যখন চন্দন নগরে ইংরেজদের সাথে চুক্তি করে ক্লাইভের চাপের মুখে ফরাসীদের বাংলা ছাড়তে বললেন। ফরাসীদের প্রধান সেনাপতি মশিয়েল (Law) দ্রুত বাংলা ছাড়ছিলেন। বেশির ভাগ ফরাসী সেনারা বাংলা ছাড়ছিল, মুর্শিদাবাদে রয়ে গিয়েছিল যৎসামান্য সৈনিক আর কয়েকটি কামান। ফরাসীরা সিরাজকে আগেই ইংরেজদের মতলব বলে দিয়েছিল। তারা ছিল নবাবের বিপদের অংশীদার। কিন্তু সিরাজ ভুল করে ইংরেজদের ফাঁদে পা দিলেন।

আমরা চা পান শেষ করে লক্ষ্মনের গাড়িতে চড়ে পলাশী ছেড়ে বহরমপুরের দিকে রওয়ানা হলাম। আর মাত্র একঘণ্টার পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছে যাব বহরমপুরে। ঢাকা থেকেই কামরুল ঠিক করেছিল আমরা ভারতীয় পর্যটনের মোটেলে থাকব। কলকাতায় কোন একজনকে এ ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন কামরুলের পরিচিত আরেক ভারতীয় যার নামও ছিল মুকুল, মুকুল রায় চৌধুরী, যার পরিচয় আগেই দিয়েছি। তিনি তখন ঢাকায় অবস্থানরত ছিলেন। তিনি এসেছিলেন আসাদুজ্জামান নূরের চ্যানেল দেশ টিভিতে 'কোন বনেগা ক্রোড়পতি' বা 'হু ওয়ান্টস টু বিকাম মিলিওয়ানিয়ারের' সত্ত্বে প্রস্তুতকৃত 'কে হবেন কোটিপতি' অনুষ্ঠানের পরামর্শক হিসাবে। তারই একটি সিম নিয়ে এসেছিলাম এবারের সফরে।

আমরা হাইওয়ে ধরে উত্তর দিকে চলছি। আমি বাইরে তাকিয়ে। চোখ যতদূর যায় দেখছিলাম। পলাশী ক্রমেই পেছনে ফেলে আসছি। ভাবছিলাম মানুষ যখন কুচক্রী হয়ে উঠে, হয়ে উঠে স্বার্থপর তখন আপন-পর গোত্র, ধর্ম, দেশ সবকিছুই হয় গৌণ। মুখ্য হয়ে থাকে স্বার্থ আর নিজস্বতা। বিবেক বিসর্জিত হয়। ঈমান হয় পদলুণ্ঠিত। মীরজাফর তেমনই করেছিলেন।

মীর মদন এবং তারই জামাতা বাহাদুর আলী খান যুদ্ধে আহত হয়ে মারা যাবার পর যখন মীরজাফর, রাজা রায় দুর্লভ সৈন্যদের নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে, তখন নবাব বুঝতে পারলেন যে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে। তিনি মীরজাফরকে ডেকে

www.pathagar.com

পাঠালেন। সিরাজ শিরোস্ত্রাণ মীরজাফরের পায়ের কাছে রেখে বললেন, 'মীরজাফর আলী খা আপনিই বাংলার নবাব হন, তবুও বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করুন।' মীরজাফর সিরাজকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন ছুঁয়ে শপথ করেছিলেন। কিন্তু তারপরেও মীরজাফর শুধু বিশ্বাসঘাতকতাই করেননি সিরাজকে হত্যাও করিয়েছিলেন। তবে মীরজাফরের শেষ জীবনে এ বিশ্বাসঘাতকতার ফলও ভোগ করেছিলেন।

মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়টি ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল প্রায় একই ধরনের ইতিহাসের আরেক অসহায় সম্রাটের কথা। যিনি প্রাসাদ ষড়যন্ত্র আর বিশ্বাসঘাতকতার কারণে ইংরেজদের রোষানল হতে নিজেকে বাঁচাতে পারেননি। পারেননি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিজয়ের সূর্য দেখাতে। ঘটনা ঘটেছিল পলাশীর ঠিক একশত বছর পর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ছিলেন হিন্দুস্থানের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জাফর।[২]

আমার ইতিহাসে সফর হঠাৎই থেমে গেল যখন দেখলাম লক্ষ্মন হাইওয়ের বিরাট জ্যামের কারণে ট্যাক্সি থামিয়ে বললেন, 'স্যার সামনে বিরাট জ্যাম। ওপাশ থেকে কোন গাড়ি আসছে না। হয়ত কোন গণ্ডগোল হয়েছে।' লক্ষ্মন কথাগুলো বলে নেমে পাশে দাঁড়িয়ে সামনে দেখবার চেষ্টা করে বললেন, 'কিছু বুঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে বহুক্ষণ থেকে জ্যাম লেগে আছে, বেশ কয়েক কিলোমিটার লম্বা মনে হয়।' তখন বেলা শেষ সূর্যের আলো নেই বললেই চলে। জ্যাম দেখে মনে হল ঠিক যেন আমাদের দেশের পরিস্থিতি। মাঝে মধ্যে ঘটে যাওয়া আরিচা ঘাটের জ্যামের মত।

এতক্ষণে কামরুল গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বলল, 'আমরা কি পৌঁছে গেলাম।' এই এক লোক যে গাড়িতে অকাতরে ঘুমাতে পারে। পলাশী ছাড়বার পর হতে ঘুমে বিভোর। তবে তার হাতের মোবাইলে অনবরত ম্যাসেজ বা এসএমএস আসা বন্ধ ছিল না।

'আমরা এখনও ত্রিশ কিলোমিটার দূরে দাঁড়িয়ে আছি। তোমার কোন খবর আছে?' মুকুল খোঁচা দিয়ে কথা বলল আমাদের পাশের কাঁচা অংশ দিয়ে একটা জিপ বেশ সামনে গিয়ে আটকে গেল। লক্ষ্মনও তার গাড়ি নিয়ে জিপের অনুসরণ করে কাঁচা অংশ দিয়ে কিছুদূর গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। এখানে এখন দু'টি লাইন। ওপাশ থেকে এক দুটো টেম্পো আসছে। পেছনে জ্যাম আরও বাড়ছিল। পাশেই এক ট্রাক দাঁড়ানো। ট্রাক ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলে সে কিছুই বলতে পারল না কেন এ জ্যাম। সামনে একটা চায়ের স্টল। কিছু লোক সেখানে জটলা পাকাচ্ছে। কামরুল বলল, চলেন চা পান করি।

আমরা তিনজনেই নামলাম। ভাবলাম এ জ্যামের কারণও জানতে পারব। আমরা

২। লেখকের 'যমুনা-গোমতীর তীরে : একটি ভ্রমণ কথা': পালক পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১১।

www.pathagar.com

চায়ের স্টলের সামনে এসে তিন কাপ চায়ের জন্য বলে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম কেন এই জ্যাম। ইতিমধ্যে সামনের দিক থেকে এক সাইকেল আরোহী এসে দাঁড়ালেন। জ্যামের কারণটি সাইকেল আরোহীকে জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি জানালেন যে সামনে পেট্রোল পাম্পের অপরদিকে একটি ব্যাংক উদ্বোধনে এসেছিলেন ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী প্রণব মুখার্জি। ব্যাংক উদ্বোধনের পর পাবলিক মিটিং হয়েছিল। ওই মিটিং শেষ হলে প্রণব মুখার্জী স্থান ত্যাগ করবার পর মিটিং-এর উপস্থিত জনতা রাস্তা পার হবার সময় এক টেম্পো জনতার উপর চড়ে গেলে দু'জন মারা যান। এ ঘটনায় কিছু ভাংচুর হয়েছে। কাছের ফাঁড়ি থেকে পুলিশ এসেছিল কিন্তু তারা কিছুই করতে পারেনি। উত্তেজিত জনতা রাস্তা বন্ধ করে ডিএম (জেলা প্রশাসক) আর স্থানীয় বিধায়ক (এমএনএ)কে ঘটনাস্থলে আসবার দাবি করছে। ডি এম পৌঁছেছেন কিন্তু বিধায়ক এখনও আসেননি। তিনি রওয়ানা হয়েছেন। আসলে হয়ত কিছু একটা মীমাংসা হবে।

ভদ্রলোকের বিবরণ শুনে মনে হল এ যেন বাংলাদেশের চিত্র! এতটুকু তফাৎ নেই। সাইকেল আরোহী বললেন যে, হাইওয়েতে টেম্পো বন্ধ করবার দাবি বহুদিনের কিন্তু কেউ এসব কথা শুনছে না। আমিও দেখলাম এখানকার টেম্পোগুলো চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের তথাকথিত 'চাঁদের গাড়ির' মত। ভেতরে যাত্রী যতই থাকুক বাইরে লটকানো সমপরিমাণ। এগুলো আশপাশের গ্রামে চলাফেরা করে। চলে হাইওয়েতেও। অগত্যা কি করা। তিনজনেই চায়ের দোকানের সামনে পাতানো বেঞ্চে বসে পড়লাম। সূর্য তখন ডুবে গেছে। শীতের বিকেল তাড়াতাড়ি অন্ধকারও নেমে আসছিল। আশপাশে গুটি কয়েক দোকান। ইতিমধ্যেই দোকানের বাতি জ্বলে উঠছিল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক আমরা জ্যামে আটকাছিলাম। পরে জ্যাম ছাড়লে আমরা ধীরগতিতে বিশাল গাড়ি বহরের পেছনে পড়ে ওই গতিতেই চলছিলাম। দু'পাশেই প্রায় পাঁচ থেকে সাত কিলোমিটার জ্যাম হয়েছিল। লক্ষ্মন দু'একবার ওভারটেক করবার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হলে তাকে ওভারটেক করতে বারণ করলাম। আমরা প্রায় ঘণ্টাখানেক পর গোরাবাজার পার হয়ে বহরমপুর শহরের ভিতরে প্রবেশ করলাম। প্রবেশের মুখে বিএসএফ-এর বিশাল ক্যাম্প। এখান হতেই পরিচালনা করা হয় ভারত আর উত্তর বাংলাদেশের সীমান্তে বিএসএফ-এর কার্যক্রম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে তাই শহরের রাস্তাঘাট ইত্যাদির অবস্থান সহজে বুঝা যাচ্ছিল না।

তবে শহর দেখে মনে হল এটি পুরাতন শহর। দালান কোঠা দেখে অনুমান করা যায় যে বেশির ভাগ স্থাপনাই ব্রিটিশ শাসনের সময়ের তৈরি। বহরমপুর। মুর্শিদাবাদের জেলা সদর এই শহর। তবে অবকাঠামোর অভাবে ঐতিহাসিক শহর ও জেলা মুর্শিদাবাদের সরকারি অফিস এখানেই রয়েছে। বহরমপুর হতে মুর্শিদাবাদ মাত্র ত্রিশ কিলোমিটারের পথ। বহরমপুর হতে কাশিমবাজার হয়ে যেতে হয়ে মুর্শিদাবাদে।

www.pathagar.com

আমরা সামান্য খোঁজাখুঁজি করে সরকারি পর্যটন মোটেলে এসে পৌঁছলাম। আমাদের জন্য দু'টি রুম রাখা হয়েছে বলে জেনেছিলাম। রিসিপশনে খোঁজ নিয়ে জানলাম স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির কোন এক কর্মচারী আমাদের নামে একটি রুমই বুক করেছেন। যেহেতু দায়িত্বটি ছিল কামরুলের তাই সেই তৎপর হয়ে উঠল। একরুমে তিনজন কিভাবে থাকব তা নিয়ে গবেষণা চলল কিছুক্ষণ। কামরুল কলকাতায় মুকুলের (রায় চৌধুরী) কন্টাক্টকে যোগাযোগ করলে তিনি জানালেন যে, যেহেতু তিনি কলকাতায় আছেন তাই দায়িত্ব দিয়েছিলেন তারই ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তিকে। তিনি ওই ব্যক্তিকে আমাদের কাছে আসতে বলবেন। আমরা যেন একটু অপেক্ষা করি।

আমরা অপেক্ষা করতে গিয়ে রুমটি দেখতে চাইলাম। রুমের বিন্যাসে কোনভাবেই তিনজন থাকবার মত নয়। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম বরং অন্য কোন হোটেলেই যেতে হবে। ইতিমধ্যেই কথিত ব্যক্তি হাজির হলেন। তিনি জানালেন ওই একরুমই পাওয়া গিয়েছিল তাই তিনি রেখেছেন। তার কথায় আমরা আশ্বস্তবোধ করলাম না। অনেক আলোচনার পর সাব্যস্ত হল আমরা এখানে থাকছি না বরং হোটেলের খোঁজ করি। দায়িত্ব নিল কামরুল। কামরুল সতিশ নামক ওই ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে হোটেলের খোঁজে বের হল। আমি আর মুকুল রয়ে গেলাম। প্রায় পনের মিনিট পর কামরুল মোবাইলে জানালো যে একটি হোটেলে সতিশ নিয়ে এসেছে। খুব সুবিধার নয় আর চার্জও অত্যধিক। তবে সানসাইন হোটেল নামক আরেকটি নতুন হোটেল হয়েছে শহরের উপকণ্ঠে বাসস্ট্যান্ডের সন্নিকটে আমরা সেই হোটেলেই যাব বলে জানালে কামরুল প্রায় বিশ মিনিট পর ফিরে এলো। আমরা সানসাইন হোটেলের দিকে রওয়ানা হলাম।

কামরুল তার দেরি হবার কারণ জানালো। বলল সতিশ খুব সুবিধার লোক মনে হল না। ওই হোটেলের সাথে তার কোন যোগসূত্র রয়েছে। কারণ, বারংবার বলছিল এর চাইতে ভাল হোটেল বহরমপুরে নেই। এবং মোটেলে আসবার পর সতিশ বলেছিল যে, সে রুমের নির্ধারিত ভাড়া দিয়ে দিয়েছে কাজেই মোটেল ছাড়তে হলে তাকে ওই টাকা ফেরত দিতে হবে। কামরুলও কম যায় না। কোলকাতায় ফোন করে সব জানালে মুকুলের (রায় চৌধুরী) জানাশোনা ভদ্রলোক জানালেন যে কামরুল যেন কোন টাকা না দেয়। সতিশ মিথ্যা কথা বলে কিছু টাকা হাতাতে চাইছে। এ সমস্যা সমাধান করতে গিয়েই ফিরতি পথে তার দেরি হয়েছে।

আমরা বহরমপুর কোর্ট রেলওয়ে স্টেশন পার হয়ে হাইওয়ে ৩৪-এর কাছাকাছি সানসাইন হোটেল পেলাম। নতুন হোটেল। আমরা দুটো রুম নিয়ে লক্ষ্মনের রাত কাটাবার ব্যবস্থা করে রুমে গেলাম। সারাদিনের ক্লান্তি। রাতের খাবার হোটেলে সেরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

www.pathagar.com

পনের

ষড়যন্ত্রের শহর কাশিমবাজার

ভোরে নাস্তা সেরে হোটেলের পাট চুকিয়ে মুর্শিদাবাদের উদ্দেশে বের হয়ে পড়লাম। মুর্শিদাবাদ যেতে ঘণ্টাখানেক লাগবে। আর মুর্শিদাবাদের প্রধান আকর্ষণ হাজারদুয়ারী প্রাসাদ এবং প্রাসাদ জাদুঘর খুলবে বেলা দশটায়। এখন সকাল সাতটা। কাজেই আমাদের হাতে সময় রয়েছে। যেহেতু আমরা শহরের দক্ষিণে তাই উত্তর দিকে যেতে হলে শহরের মধ্যদিয়েই যেতে হবে। শহরের খানিক অংশ দেখা হবে।

বহরমপুর শহর প্রথম দর্শনেই মনে হল এটি ব্রিটিশ রাজের তৈরি শহর। তবে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে শহরটি ছিল নেহাতই গ্রাম। ওই সময় গোরাবাজার এলাকায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়িক দফতর ছিল। বহরমপুরের গুরুত্ব বাড়ে পলাশীর যুদ্ধের পর। এখানেই ক্লাইভ তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে ডেরা বাঁধেন। সেই থেকে কলকাতার বাইরে বহরমপুর হয়ে উঠে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বৃহত্তর সেনা ছাউনি। ক্রমেই ভাগিরথী নদীর তীরে গড়ে উঠে এই মিলিটারি টাউন। তবে এখন এখানে তেমন বড় ভারতীয় সেনা ছাউনি নেই। যা আছে তাহলো বিএসএফ হেডকোয়ার্টারস।

বহরমপুর শহরটি অনেকটা রাজশাহী শহরের মত। তবে ব্রিটিশ শাসনামলের বহু স্থাপনা রয়েছে যেগুলো আজও সরকারি দপ্তর হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিশাল পুলিশ লাইন। রয়েছে প্রচুর পুলিশ ব্যারাক। বহরমপুরেও ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহিরা স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে বহরমপুর প্রথম মিউনিসিপ্যালিটির মর্যাদা পায়। আমরা বঙ্গখ্যাত বহরমপুর কলেজের সামনে দিয়ে কাশিমবাজারের দিকে যাচ্ছিলাম। কাশিমবাজার হয়ে যেতে হয় মুর্শিদাবাদে। কলেজটি ১৫০ বছর পুরাতন। প্রথম স্থাপিত হয়েছিল ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে। এ শহরটি সিল্কের জন্য বিখ্যাত। যেমন বিখ্যাত রাজশাহী। দু'টি শহরই প্রায় একই সূত্রে গাঁথা। সিল্কের কারণেই এ শহরের আরেক নাম 'সিল্ক সিটি'। যেমনটা রাজশাহীও পরিচিত।

আমরা প্রায় আধাঘণ্টা পর কাশিমবাজার মোড়ে এসে পৌঁছলাম। এখান হতে পূর্বদিকে কাশিমবাজার রেলওয়ে স্টেশন পার হলে কাশিমবাজারের ঐতিহাসিক শহরে যাওয়া যায়। পশ্চিম দিকে যে রোডটি গিয়েছে তার নাম কাজী নজরুল ইসলাম সরণি।

কাশিমবাজার আমাদের যাত্রা পথে তেমনটা আমার ধারণায় ছিল না। আমি

www.pathagar.com

লক্ষ্মনকে কাশিমবাজার শহরের দিকে যেতে বললাম। কামরুল জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে কি দেখবার আছে?' মুকুলেরও বোধহয় ওই রকমই কিছু বলবার ছিল।

'এখান থেকেইতো ইংরেজদের ষড়যন্ত্র শুরু'। উভয়কে উদ্দেশ্য করে বললাম। এ শহরেই প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ছিল। ছিল নীলকুঠি আর রাজ-রাজাদের বসবাস। এখানে ইংরেজদেরও আগে ডাচ বা ওলন্দাজরা ঘাঁটি গেড়েছিল বাংলায় ব্যবসার উদ্দেশ্যে। ইংরেজদের আধিপত্য শুরু হলে ওলন্দাজরা সংকুচিত হতে থাকে।' কামরুল আর মুকুল চুপ করে আমার যৎসামান্য তথ্য শুনছিল।

'এখানে শুধু নীলকুঠি বা নীলের ব্যবসা কেন্দ্র ছিল তেমন নয়, ব্যবসা ছিল বাংলার রেশমের বা সিল্কের। এখানকার সিল্ক যেত ব্রিটেন হয়ে ইউরোপে। নবাব আলীবর্দী আর সিরাজের সময়ে এখানকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান ছিলেন মি. ওয়াটসন। যার নাম বাংলার পতনের সাথে অঙ্গাঙ্গি জড়িত। বেশ কয়েকবার মারাঠা লুট করেছিল এই শহর। এ অঞ্চলে এরা পরিচিত ছিল 'বর্গী' হিসাবে। আর ওলন্দাজরা পরিচিত ছিল 'হার্মাদ' হিসাবে।' দু'জনই আমার বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনছিল।

নবাব আলীবর্দী খাঁ-এর বেশির ভাগ সময় কেটেছে বর্গীদের হামলা ঠেকাতে। বর্গীরা বহুবার হামলার চেষ্টা করেছিল রাজধানী মুর্শিদাবাদে। লুট করেছিল মুর্শিদাবাদের শহরতলী।

আমরা কাশিমবাজার শহরে প্রবেশ করলাম। শহর বলা বোধহয় সঠিক নয় তবে খুবই ছোট একটি জনপদ। ঘরবাড়িগুলো দেখলেই মনে হয় শত শত বছর পুরাতন। বেশ কিছু নতুন বাড়িঘর রয়েছে। পুরাতনের সাথে নতুনের সংমিশ্রণ। কিছুদূর এগুতেই আমাদের চোখে পড়ল একটি রোড সাইন যার উপরে লেখা 'ওল্ড ডাচ সেমিটারি' পুরাতন ডাচ কবরস্থান। আমার উৎসাহ আরেকটু বাড়ল। সামান্য যেতেই দেয়ালে ঘেরা বহু পুরাতন কয়েকটি সমাধি দেখলাম। তথ্যে প্রকাশ এখানে রয়েছে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান কর্মকর্তা আর তার সহধর্মিণীর সমাধি। রয়েছে বহু ডাচ সৈনিক ও কর্মচারীদের সমাধিও। ভেতরে ঢুকতে পারলাম না কারণ, প্রবেশ পথটি তালামারা। স্থানীয় একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, এখানে পৌরসভার নিয়োজিত একজন কেয়ারটেকার আছেন তবে তিনি সাধারণত আরও পরে আসেন। আমার আর দেয়ালের ভেতরে যাওয়া হলো না। আরো এগুতেই আরেকটি ফলক দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে যে সামনে ব্রিটিশ সেমিটারি। ওই সেমিটারিটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বহু কর্মকর্তাদের অন্তিম স্থান। এ সেমিটারিতে যাবার পথে উত্তর দিকে একটি দেয়ালে ঘেরা সাদা রংয়ের ছোট মসজিদ দেখলাম। মসজিদটি এখনও ব্যবহার হয়। সেখানে স্বল্প সময়ের জন্য নেমে দেখতে ভেতরে প্রবেশ করলাম। ছোট মসজিদ। সামনে বহু পুরাতন বিশাল এক আমগাছ। মসজিদটি তিন গম্বুজের। সামনে

www.pathagar.com

দু'টি ছোট মিনার। সম্পূর্ণ সাদা রংয়ের দূর হতে মনে হয় সম্পূর্ণটা সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি। মসজিদের সামনে তিনটি পুরাতন কবর। কবরের পরিচিতি হয় উর্দু না হয় ফার্সিতে লেখা। পাঠোদ্ধার করতে পারলাম না। বের হবার পথে স্থানীয় একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম যে এই মসজিদটি কোন সময়ের তৈরি। উত্তরে বললেন যে সে সঠিক বলতে পারবেন না, তবে শুনেছেন যে প্রায় তিনশ' বছর পুরাতন, বর্তমানে স্থানীয় মুসলমানরা নামাজে ব্যবহার করেন।

আমরা মসজিদ ছেড়ে বের হয়ে সেমিটারি খুঁজতে একজন দোকানিকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানালেন সামনে গেলে রাজবাড়ি পাওয়া যাবে তার কিছু দূরে পেছনে ওই পুরাতন সেমিটারি রয়েছে। কিছু দূরে যেতে সামনের ফলকে কাশিমবাজার রাজবাড়ির দিক-নির্দেশনা দেখলাম। কয়েক মিনিট পরেই আমরা বিশাল এক রাজবাড়ির ফটকের সামনে হাজির হলাম। ফটকের পাশে একটি নীল রংয়ের সাইনবোর্ডে লেখা 'কাশিম বাজার রাজবাড়ি স্থাপনা ১৭৪০ খ্রিঃ, দর্শনের সময় সকাল ১০টা হতে বিকেল ৫টা।' মনে হল আমরা ঠিক সময়েই এসেছি। তখন সময় প্রায় ১০টা।

আমরা ঈষৎ খোলা গেট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। গেটের কেয়ারটেকার জানালেন যে ভেতরে দেখতে চাইলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। আমি এখানে ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায়ের গন্ধ পেলাম। মনে মনে বললাম এ জায়গা না দেখে কিছুতেই মুর্শিদাবাদ যাচ্ছি না। আমরা গেট সংলগ্ন একটি বেকারিতে ঢুকে কিছু খেয়ে অপেক্ষায় রইলাম।

এই রাজবাড়ির প্রথম পুরুষ অযোধ্যা রাম রায়। এই অযোধ্যা রাম রায় ইংরেজদের সাথে এখানেই রেশমের ব্যবসা শুরু করেন। রায় বংশের এই পুরুষ প্রথমে ব্যবসা করতেন পদ্মাতীরের পিরোজপুরে। বর্গীদের হামলা আর নিরাপত্তাহীনতার কারণে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে কাশিমবাজারে ব্যবসা স্থানান্তরিত করেন। এখানেই তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে রেশম সরবরাহ করতেন। উল্লেখ্য, ওই সময় পূর্ববঙ্গ ছিল রেশম চাষের বৃহত্তর স্থান। এই রেশমের ব্যবসা করেই অল্পদিনের মধ্যেই কপাল খুলে গেল। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে তৈরি করলেন ৩০ বিঘার উপরে এই রাজবাড়ি।

কাশিমবাজারের আরেক রাজবাড়ি এখান থেকে আরেকটু এগিয়ে যার প্রথমপুরুষ ছিলেন মহারাজ কৃষ্ণকান্ত নন্দীসার যার উদ্যোগে এবং ডাচ বা ওলন্দাজ, ফরাসী এবং ইংরেজদের বদৌলতে কাশিমবাজার রেশম বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়। এদের স্বার্থ ক্রমেই ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে।

আমরা যে বেকারিতে দাঁড়িয়েছিলাম সেটাও রাজবাড়ির প্রধান ফটক লাগোয়া বাড়িরই একাংশ। বেকারির নাম 'সুগার এন্ড স্পাইস'। পশ্চিম বাংলার কলকাতাসহ বহু

www.pathagar.com

শহরে এদের শাখা রয়েছে। এ বেকারি চেইন রায় বাড়ির বর্তমান প্রজন্মের অন্যতম ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান।

কিছুক্ষণ পর কেয়ারটেকার আমাদেরকে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করবার অনুমতি দিলেন। বললেন, 'বাড়ির ভেতরে ঢুকবার প্রধান পথ বৈঠকখানার ভেতর দিয়ে। তবে এখন সিঁড়ির সংস্কার চলছে তাই আপনাদেরকে পেছনে মন্দিরের পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে যেতে হবে।

'কোন গাইড পাওয়া যাবে দেখাবার জন্য'? আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

'সে রকম গাইড তো নেই তবে বাড়িতে যারা দেখভালের জন্য নিয়োজিত তারাই আপনাদের দেখাবে।' বললেন কেয়ারটেকার।

আমরা পেছনের দিকে গেলাম। হাঁটতে হাঁটতে কাশিমবাজার, কাশিমবাজার কুঠি, সিরাজের বিরুদ্ধে মি. ওয়াটসন-এর সাথে মীরজাফর, রাজা রায় বল্লভ, উমিচাঁদ আর জগৎ শেঠদের এ বাড়ির সাথে সম্পৃক্ততা এবং ষড়যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম। বিবরণ শুনে কামরুল বলে উঠল, 'ও' তাহলে আমরা বিশ্বাসঘাতকদের আস্তানায় এসেছি।

আমি বললাম, 'হ্যাঁ তাই, তবে যেহেতু এ বাড়ি এখনও রায় বংশের হাতে রয়েছে তাই এসব আলোচনা পরে করলেই ভাল।' আমার কথা শুনে কামরুল আপাতত চুপ রইল।

আমরা পেছনের দরজার কাছে যেতে যেতে রাজবাড়ির জরাজীর্ণ একাংশের সামনে একজন শ্মশ্রুমণ্ডিত ধুতি পরা ভদ্রলোককে দাঁড়ানো দেখলাম। বয়স ষাটোর্ধ্ব। এগুলে অভিবাদন করে বললেন যে তার নাম তারেকশ্বর। ছোট নাম তারা। তারা বাবু বললেন তিনি একসময়ের রাজপরিবারের কুল পুরোহিতের আত্মীয়। তিনিও এই পরিবারের কর্মচারীদের একজন। বর্তমানে তিনিই বাড়ির কেয়ারটেকার হিসাবে নিয়োজিত।

যথারীতি কামরুল আমাদের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিতবোধ করল না। মনে হল তারা বাবু আমাদের পরিচয় পেয়ে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। বললেন একসময় তাঁর ঠাকুরদার-বাবা ছিলেন ঢাকার বাসিন্দা। পরে তিনি মুর্শিদাবাদ চলে আসেন।

তারা বাবু আমাদেরকে সুবিশাল উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা বাড়ির বিশাল আঙ্গিনায় প্রবেশ করাবার পূর্বেই আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে এ পোড়া অংশটিতে কি ছিল? তিনি জানালেন 'এটিই ছিল এই জমিদার বাড়ির মূল অংশের নাচঘর। আরেকটি ভেতরে আছে যা আমি আপনাদের পরে দেখাব।'

কামরুল হঠাৎ ইতিহাসবিদ হয়ে উঠল বলল, 'আসলে এই রাজবাড়ি বিশ্বাসঘাতকদের তাই না ?'

www.pathagar.com

তারা বাবু প্রথমে থমকে গেলেন। পরে আস্তে আস্তে বললেন, 'দেখুন আমি রায় বাড়ির অন্ন খাচ্ছি। তবে আপনার কথাই ঠিক। এখানে প্রথমে ওয়াটস্‌ন সাহেব পরে কাশিমবাজারে আগত ওয়ারেন হেস্টিংস, মীরজাফর আলী খান গং প্রথম ষড়যন্ত্র শুরু করেন। আমি যতটুকু জানি আপনাদের বলব আর দেখাবো।'

আমি কামরুলকে নিচু স্বরে বললাম, 'তাকেই বলতে দাও। প্রয়োজনে আমি তাকে সূত্র ধরিয়ে দেব। ভদ্রলোক মনে হয় এ বাড়ির ইতিহাসের সাথে বিশেষভাবে পরিচিত।'

তারা বাবু আমাদেরকে বিশাল এক পুকুরের সামনে নিয়ে আসলেন। বললেন, 'এ পুকুরের ঘাটলা দেখছেন? আদি ঘাটলা তবে ইদানিং সম্পূর্ণ বাড়ির সাথে সংস্কার করা হয়েছে। আর এর উল্টোদিকে যে বিশাল সিংহ দরওয়াজা দেখছেন যেখানে রয়েছে বিভিন্ন গাছ-গাছালির বাগান। যেখানে ছিল অযোধ্যা রাম রায়ের সময়ের তৈরি মন্ত্রণা কক্ষ বা প্রাইভেট চেম্বার। অযোধ্যা-রাম রায়ের মৃত্যুর পর ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস যখন কলকাতা হয়ে কাশিমবাজারের রেশম এবং সুতাকলসহ দায়িত্বে আসেন তখন জমিদার হলেন অযোধ্যা রায়ের পুত্র দীনবন্ধু রায়। মূলত দীনবন্ধু রায়ের বাড়িতেই বসত ইংরেজদের আড্ডা। এখান থেকে চক্রান্তের শুরু।'

আমরা দেখলাম পেছনে প্রচুর জায়গা। তেমন পরিষ্কার করে রাখা নয়। ঘাসগুলো বড় বড় হয়ে গেছে। বাড়ির সংস্কার হচ্ছে। তারা বাবু জানালেন, বাড়িটি ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এক রকম পরিত্যক্তই ছিল। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে এ বাড়িকে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। হাতের ডানে দেখলাম বিশাল মন্দির-তারা বাবু জানালেন, প্রায় আড়াই শত বছর ধরে ঐখানে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

আমরা পেছন দিক হতে আস্তে আস্তে বেশ কয়েকধাপ বড় বড় সিঁড়ি পার হয়ে অন্দরমহলের বিশাল বারান্দা দিয়ে বৈঠকখানায় প্রবেশ করলাম। ছাদের উচ্চতা হবে প্রায় পনের ফুট। সম্পূর্ণ বাড়িটি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপিয়ান স্টাইলে বানানো। ভেতরে বাইরে সাদা রং। খড়খড়ি যুক্ত বড় বড় জানালা আর দরজা। উপরে ছাদের মাঝ বরাবর বেলজিয়াম ক্রিস্টালের বিশাল ঝাড় বাতি। দেয়ালের চারদিকে অষ্টাদশ আর উনিশ শতকের কর্তাদের বড় বড় পোট্রেট রয়েছে। রয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাদের পেইন্টিং। সবচাইতে চমকপ্রদ পেইন্টিং ছিল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর শিকার করবার সময়ের একটি তৈল চিত্র তবে অনেকের মধ্যে হেস্টিংসের সদৃশ্য একজনকে শনাক্ত করা যায়।

পোট্রেট পেইন্টিং দেখে মনে হল এই পোট্রেটটি রায়বাড়িতে প্রজন্ম পরম্পরায় সযত্নে রক্ষিত। হবেই বা না কেন কাশিমবাজার তথা কলকাতার বহু ধনাঢ্য হিন্দু ব্যবসায়ীরা কোম্পানির বদৌলতে সমাজের শিখরে উঠেছিলেন।

www.pathagar.com

তৎকালীন বাংলার নবাবশাহীর বিরুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সাহায্য করবার যথাযথ পুরস্কার পেয়েছিলেন। কাশিমবাজারে রায় আর নন্দীরা সরাসরি ওয়ারেন হেস্টিংস-এর বদান্যতা পেয়েছিলেন। সে কারণেই এই ধরনের বন্দনা। তবে বর্তমানে এ ধরনের পেইন্টিংকে ইতিহাসের সাক্ষী হিসাবেই দেখতে হবে।

এক পাশের দেয়ালে লটকানো রয়েছে ব্রিটিশ রাজের একটি সনদ। সনদটি স্বাক্ষর করেছিলেন তৎকালীন ভাইসরয় এবং গভর্নর জেনারেল লর্ড দ্বিতীয় এলগিন। সনদটি আদি এবং দেয়া হয়েছিল বাবু আশু তোষনাথ রায়কে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে যখন প্রথমবার রাজা উপাধি দেয়া হয়। ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয়ের সীল রয়েছে সনদে। অপর দেয়ালে আরেকটি সনদ আশুতোষ নাথ রায়ের পুত্র বাবু কমলারঞ্জন রায়কে প্রদেয়। এ সনদের মাধ্যমে সদাশয় ব্রিটিশ ভারতীয় সরকার বিংশ শতাব্দীতে রাজা উপাধি দিয়েছিলেন।

এ সনদ দুটো দেখাবার সময় তারা বাবু বললেন, 'এই যে সনদ দু'টি দেখছেন এতেই প্রমাণ পাচ্ছেন যে, রায়বাড়ি বংশ পরম্পরায় ইংরেজদের কত কাছে ছিলেন। আপনারা যখন সামনে দিয়ে বের হবেন আমি দেখাবো এ রাজবাড়ির প্রতীক। হুবহু ব্রিটিশ রাজের প্রতীক। মুকুটটিও একই ধরনের। তবে সিংহ আর বাঘ দু'টির আকার ছোট কারণ এগুলো নেটিভ।'

কামরুল আবার বলে উঠল, 'এত বড় বিশ্বাসঘাতকদের কাহিনী' তারা বাবু বললেন, 'এখানে কত বিশ্বাসঘাতকদের কাহিনী শুনবেন। পুরো কাশিমবাজার জুড়ে রয়েছে বিশ্বাসঘাতকদের নিদর্শন। আরও যখন দেখবেন তখন আরও কিছু জানাবো।'

তারা বাবু আমাদেরকে রায় বংশের বিভিন্ন সময়কার বর্ণনা দিয়ে বললেন, 'এদের জমিদারী ছিল পূর্ববঙ্গে। রংপুর, সরাইল ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। আপনাদের ওই জায়গাগুলোতে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে এই রায় বাড়ির অর্থে। আপনাদের দেশের আশুগঞ্জের বাজার প্রতিষ্ঠা করেন অন্নদা প্রসাদ রায় এবং তার সহধর্মিণী আন্নাকালী দেবী।' তারা বাবু 'আমাকে হেস্টিংস-এর শিকারের তৈল চিত্রটি দেখিয়ে বললেন, 'হয়ত পূর্বপুরুষদের পাপমোচন করতেই এই জনহিতকর কাজ করেছেন পরের প্রজন্ম। আপনাদের হয়ত জানা নেই যে, রাজা কমলারঞ্জন রায় তার মাতা সরোজিনী দেবীর নামে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রতিষ্ঠা করেন– সরোজিনী গার্লস হাইস্কুল। শুনেছি সেখানে পড়াশুনা করেছিলেন আপনাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।'

আমি বললাম, 'তাই নাকি। এই প্রথম শুনলাম। 'আমার জানা ছিল না'।

তারা বাবু বললেন, 'শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সঙ্গীত গুরু ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের যে বসত বাড়িটি আছে সেটিও দিয়েছিলেন কমলারঞ্জন। বর্তমানে

www.pathagar.com

রায়বাড়ির মশাল বহন করছেন কমলারঞ্জনের একমাত্র পুত্র প্রশান্ত কুমার রায়। তিনি প্রায় বাহাত্তর বয়সের, এদিকে খুব একটা আসেন না। তবে তাঁর পুত্র পল্লব রায় বর্তমানে ওষুধ ব্যবসায়ের সাথে জড়িত। আর মাতা সুপ্রিয়া রায়ই প্রতিষ্ঠা করেন 'দ্য সুগার এন্ড স্পাইস' নামক বেকারি চেইন।

তারা বাবু এবার আমাদেরকে বৈঠকখানা হতে পাশের একটি শোবার ঘরের মধ্য দিয়ে নিয়ে আসলেন নীলঘরে। বৈঠকখানা ছাড়বার আগে দেখলাম ভিক্টোরিয়া স্টাইলের বনেদি আসবাবপত্র আর সোফা, যেগুলো কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে ধুলোবালি মুক্ত রাখতে। তারা বাবু বলেছিলেন এসব আসবাবপত্র ব্যবহার হয়েছিল সত্যজিৎ রায় নির্মিত রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের চিত্ররূপ 'ঘরে বাইরে'-এর চিত্রগ্রহণের জন্য।

আমরা বিশাল এক হলঘরে আসলাম। হলঘরটি রাজবাড়ির পূর্বপ্রান্তের বাহু। সম্পূর্ণ বাড়িটি তিন বাহু আকারের। পশ্চিম প্রান্তের ঘরগুলো বন্ধ। সেগুলোই রাজ পরিবারের অন্দরমহল।

আমরা হলের মাঝে দাঁড়ানো। দক্ষিণ দিকে একটি স্টেজ আর মেঝে ঝকঝকে সিমেন্ট করা। দু'পাশে বিশাল আকারের পিলারের সারির উপর বারান্দা। হলঘরের জানালা আর দরজায় রঙিন কাচ বসানো। হলঘরের পরিচয় দিয়ে তারা বাবু বললেন, 'এই হল খাস নাচঘর'-নীলকক্ষ। এটা অত্যন্ত ঐতিহাসিক জায়গায়। এখানে ওয়াটসন, হেস্টিংসসহ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হোমরা-চোমরারা আসতেন, বসত পানাহার আর নাচ গানের আসর। আসতেন জগৎ শেঠ, রায় বল্লভ আর উমিচাঁদরা। এখানেই সূত্রপাত হয় সিরাজ তথা বাংলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। এখান থেকেই ওয়াটসন সাহেব রাজাদের পালকি চড়ে মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলেন মীরজাফরের সাথে চুক্তি করতে। মীরজাফর কোরআন ছুঁয়ে শপথ করেছিলেন ইংরেজদের সহায়তার বিনিময়ে নবাবী পাবার লোভে। তারা বাবু থামলেন আমাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'বাঈজীদের মধ্যে আসতেন আলেয়া। খবর নিয়ে ফিরতেন সিরাজের কাছে। সিরাজ প্রথমদিকে বিশ্বাস করতেন না।

আমি তারা বাবুকে থামিয়ে বললাম, 'কিন্তু যতদূর আমি জানি আলেয়া ছিল কাল্পনিক চরিত্র তাই নয় কি?'

তারা বাবু বললেন হবে হয়ত। তবে মোহন লাল একজন মহিলাকে এখানে পাঠাতেন যার অবাধ বিচরণ ছিল নবাব মহলে। অনেকে মনে করে এই সুন্দরী এবং বিদূষী মহিলা ছিলেন মোহনলালের আত্মীয় বা বোন। খোশবাগে এ নামের একটি কবর রয়েছে হয়ত তাকে ঘিরেই 'আলেয়া চরিত্রের জন্ম।' আমি বললাম, 'আমার এ বিষয়ে খুব জ্ঞান নেই। এ ইতিহাস বড় জটিল। আমি আপনি যেভাবে বলছি ততো সহজ ছিল না।

www.pathagar.com

'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমরা তো সহজ ইতিহাসটুকুই পড়েছি। জটিলতার ভেতর যাইনি।'

'আসলে সিরাজের আলীবর্দীর স্থলাভিষিক্ত হওয়া নিয়েই তো তার খালা ঘসেটি বেগমের সাথে দ্বন্দ্ব বাঁধে। সেখান থেকেই তো ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত। যার থেকেই বাংলার রাজনীতিতে যোগ হয়েছে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। আরেক শব্দ কাশিমবাজার ষড়যন্ত্র।' কি বলেন তারা বাবু।

তারা বাবু বললেন, 'হয়ত তাই। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র তো কোন নতুন অধ্যায় নয়।'

'আসলে এরাই ছিল রাজাকার।' কামরুল নতুনভাবে বিশ্বাসঘাতকদের একাত্তরের বাংলাদেশের রাজাকারদের সাথে তুলনা করল। তারা বাবু কোন মন্তব্য করলেন না।

আমরা প্রাসাদের বাইরে চলে আসলাম। গেটের কাছে যেতে যেতে তারা বাবুকে বললাম, 'পুরাতন ম্যাপে দেখা যায় এখানে ভাগিরথী নদীর লুপ ছিল যা এই প্রাসাদের সামনে দিয়ে প্রবাহিত হতো।'

'হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন। ওই নদীর নাম ছিল কাশিমবাজার নদী। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে এই লুপে বাঁধ দিয়ে নদীকে এখান থেকে তিন মাইল সরিয়ে দেয়া হয়। এ নদীর কারণেই এখানে গড়ে উঠেছিল রেশমের ব্যবসা আর সুতার কারখানা। আপনারা আরও পূর্ব দিকে গেলে দেখতে পাবেন কারখানার ভগ্নাংশ আর কোম্পানির কুঠি। এই পুরোটাই কাশিমবাজার কুঠি।'

আমরা তারা বাবুকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে কাশিমবাজারের রায়দের রাজবাড়ি ত্যাগ করলাম। লক্ষ্মমনকে পুরাতন ব্রিটিশ সেমিটারির দিকে যেতে বললাম। কামরুলকে বললাম, 'কেমন বুঝলে?'

'সত্যিই আপনার সাথে না আসলে এসব রাজাকারদের জায়গা দেখা হতো না।' কামরুলের উত্তর।

মুকুল বলল, 'একদম ঠিক আছে।'

কিছুক্ষণ পর আমরা আরেকটি রাজবাড়ির সামনে আসলাম। তবে এর সিংহ দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। সামনে দাঁড়ানো একটি ট্রাক। চালককে জিজ্ঞাসা করলাম 'এটা কি কান্তা বাবু বা মহারাজ কৃষ্ণকান্ত নন্দীর প্রাসাদ? চালক বললেন, অতটা তো জানিনে বাবু তবে এটা নন্দীদের প্রাসাদ এতটুকু শুনেছি'। কান্তা বাবু ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের দেওয়ান।

'কোম্পানির কুঠি কোন দিকে?' জিজ্ঞাসা করলাম। 'ওই যে ওই দিকে বড় বড় গাছ আর জঙ্গলের মধ্যে যে ভাঙ্গা দালান দেখছেন ওখান থেকেই শুরু।' উত্তরে বললেন

www.pathagar.com

চালক মহোদয়।

'আর পুরাতন খ্রিস্টান কবরস্থান?'

ওধার দিয়ে যে রাস্তা গিয়েছে তার শেষ মাথায় একটি ক্লাবঘর পাবেন। তার পাশেও সেমিটারি (খ্রিস্টান কবরস্থান) চালক হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

আমি প্রাসাদের সামনের খোলা মাঠের পশ্চিম দিকে দেখলাম বড় বড় গাছের আর লতাপাতার ফাঁক দিয়ে একটি দালানের ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। সেটাই একসময় ছিল কোম্পানির অফিস বা কুঠি আর তার পেছনে সুতার কারখানা। আমরা ট্রাক চালকের নির্দেশিত পথ ধরে কথিত ক্লাবের দিকে রওয়ানা হলাম। সরু রাস্তা। রাস্তার পশ্চিম দিকে দেয়ালের ভগ্নাংশ। ভেতরে বড়োসড়ো প্রাসাদের মত একটি দালানের ধ্বংসস্তূপ। সামনের চৌহদ্দিতে লতাপাতা আর নাম না জানা জংলী গাছের জঙ্গল। অনুমান করা যায় যে এটাই সেই কারখানা যা পরে পরিত্যক্ত হয়েছিল। এখানেই মি. উইলিয়াম ওয়াটসের দপ্তর ছিল। মি. ওয়াটসই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাউন্সিলের অনুমোদনের পর বাংলার সিংহাসন হতে সিরাজ-উদ-দৌলাকে হটিয়ে মীরজাফর আলী খানকে তার স্থলাভিষিক্ত করবার এক ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা করেছিলেন। মি. ওয়াটসন অত্যন্ত চতুরতার সাথে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন। যার ফলশ্রুতিতে পলাশীতে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়বরণ করতে হয়েছিল।

কাশিমবাজারের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রেশম সুতার কারখানা বা ফ্যাক্টরি এবং তৎসংলগ্ন কোম্পানি অফিস, ইতিহাসে যে জায়গা কাশিমবাজার কুঠি নামে খ্যাত, তৈরি হয়েছিল ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে এবং ওই সময়েই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম ইংলিশ এজেন্ট নিয়োগ করে। জব চার্নক প্রথম এজেন্ট হিসেবে নিয়োজিত হয়েছিলেন। ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে এখানকার ইংলিশ এজেন্টকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালক পর্ষদের অতিরিক্ত সদস্য পদ দেয়া হয়। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কলকাতা আক্রমণের পূর্বে কাশিমবাজার কুঠি বা ইংলিশ ফ্যাক্টরি দখল করেছিলেন। পরে চন্দননগরের সন্ধির পর ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল। ওই সময়ে মি. ওয়াট্সন ছিলেন এখানকার ইংলিশ এজেন্ট।

উইলিয়াম ওয়াটসন বাংলা, উর্দু আর ফার্সি ভাষা জানতেন। তিনি বহু বছর বাংলাতে থাকায় এখানকার আবহাওয়া জনজীবন এবং স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে সুপরিচিত ছিলেন। তার অবাধ বিচরণ ছিল বাংলার নবাবদের সাথে। ব্যবসার সাথে এদেশের বণিকরা জড়িত হওয়ায় তিনি প্রত্যেকের সাথে ছিলেন সুপরিচিত। এ কারণেই তাকে একই সাথে নবাবের দরবারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব নিয়োগ করা হয়েছিল। সে সুযোগ নিয়েই সহজেই তিনি হয়ে উঠেন সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রধান খলনায়ক। জুন ৫, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি রায় দুর্লভ, ইয়ার লতিফ আর

www.pathagar.com

মীরজাফরের সাথে দেখা করে তাদের সহযোগিতার শপথ আদায় করেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর গোপন চুক্তি আর পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক ওয়াটসনকে এ কাজের জন্য ১,১৪,০০০ পাউন্ড স্টার্লিং দেয়া হয়। পরে ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাকে মি. ড্রেকের স্থলে ফোর্ট উইলিয়াম, কলকাতার, গভর্নর করা হয়। মি. ওয়াটস্ কাশিমবাজারে থাকাকালীন সময়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল ফ্রান্সিস-এর সাথে যিনি পরে পরিচিত হন বেগম জনসন হিসাবে। আমরা বেগম জনসনের কথা আগেই জেনেছি। পরে লর্ড ক্লাইভ ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর নিযুক্ত হলে মি. ওয়াটসন ব্রিটেনে চলে যান। মি. ওয়াটসন ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনে মৃত্যুবরণ করেন।

আমরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কারখানার ভগ্নস্তূপ পার হয়ে প্রায় অর্ধ কিলোমিটার যাবার পর হাতের বাঁপাশে, পূর্ব পাশে একটি দেয়াল ঘেরা খ্রিস্টান কবরস্থান দেখলাম। দেয়ালটি প্রায় তিনশত বছর পুরাতন। দেয়ালের ভেতরের সমাধিগুলোও ওই একই বয়সের। এটাই পুরাতন ইংলিশ সমাধি ক্ষেত্র। আমরা গাড়ি থেকে নেমে প্রবেশ পথ দিয়ে ভেতরে গেলাম। এখানে একজন কেয়ারটেকার পেলাম যিনি আমাদের দেখে এগিয়ে আসলেন। প্রবেশের মুখে একটি লোহার ফলকে পড়েছিলাম যে, এখানে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর মেয়ে এলিজাবেথ এবং স্ত্রী মেরী সমাহিত হয়েছিলেন। তাদের সমাধিসহ আরও বহু কর্মকর্তা তাদের পরিবারের অনেক সমাধি রয়েছে। কতগুলো চিহ্নিত আর বেশিরভাগই তেমন চিহ্নিত নয়।

এই সমাধি ক্ষেত্রটি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত। সমগ্র সমাধিক্ষেত্রটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং ঘাসগুলো বেশ সুন্দর পরিপাটি করে ছাঁটা। কেয়ারটেকার আমাদেরকে জানালেন তিনি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ থেকে নিয়োজিত। এখানেই ধারে কাছে থাকেন এবং প্রতিদিন দর্শনার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে প্রবেশ পথ খুলে দেন। তিনি নিজের নাম জানালেন নিখিল চন্দ্র দাশ। ছিপছিপে মধ্যম উচ্চতার বয়সে তরুণ হলেও এ জায়গা এবং সমাধিতে শায়িত ব্যক্তিদের ইতিহাসের সাথে কিছুটা পরিচিত।

নিখিল প্রথমে যে সমাধির সামনে আমাদের নিয়ে আসলেন সেই সমাধিটিই ওয়ারেন হেস্টিংস-এর প্রথম স্ত্রীর সমাধি, পাশে দুই কন্যা। এখানকার সব সমাধিগুলোই প্রায় তিনশত বছর পুরাতন।

আমি নিখিলকে জিজ্ঞাসা করলাম এ সমাধি ক্ষেত্র দেখতে কি মানুষ আগ্রহী। নিখিল বললেন,' যারা কাশিমবাজার ঘুরতে আসেন বেশির ভাগই আসেন হাজারদুয়ারী দেখতে, মুর্শিদাবাদে যাবার বা আসবার পথে এ ধার হয়ে যান।' সাদা চামড়ার পর্যটক অথবা এদের বংশধরদের কেউ কি কখন এসেছে?'

উত্তরে নিখিল চন্দ্র দাশ বললেন, 'মাঝে মধ্যে বিদেশিরা আসেন। অনেক

www.pathagar.com

গোরারাও আসেন তবে এনাদের বংশধর কিনা তা বলতে পারব না।'

'আমরা বিদেশি তবে আমরা বাংলাদেশি', কামরুল হেসে বলল।

আমরা নিখিল চন্দ্র দাশকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে সমাধিক্ষেত্র ছেড়ে লক্ষ্মনকে নিয়ে এবার মুর্শিদাবাদের দিকে রওনা হলাম। যাবার পথে আবার তাকিয়ে দেখলাম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অফিস আর কারখানার ভগ্নস্তূপ। পেছনে মহারাজা কৃষ্ণকান্ত নন্দী বা কান্তা বাবুর প্রাসাদ।

কৃষ্ণকান্ত ছিলেন সাধারণ দোকানি। ফার্সী বাংলা আর ইংরেজি ভাষায় পারদর্শিতার কারণে কাশিমবাজারে ইংরেজদের ঘনিষ্ঠতা লাভ করেন। ক্রমেই তিনি যুক্ত হয়ে পড়েন রেশম ব্যবসার সাথে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কারখানায় রেশম যোগান দিতেন। ওয়ারেন হেস্টিংস কাশিমবাজারে যোগদান করলে তিনি হেস্টিংস-এর দিওয়ান নিযুক্ত হলেন। আরও পরে যখন হেস্টিংস ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হলেন তখন তাকে জমিদারী দেয়া হয়। তার জমিদারী ছিল বৃহত্তর রংপুর বিশেষ করে গাইবান্ধা অঞ্চলে। এরপরে তাকে ব্রিটিশ ভারত সরকার মহারাজা উপাধি দেন।

আর ওয়ারেন হেস্টিংস? ভাগ্যান্বেষায় এসেছিলেন চার্চিল, অক্সফোর্ডশায়ারের এক অখ্যাত গ্রামে জন্মগ্রহণকারী গরিবের সন্তান ওয়ারেন হেস্টিংস। ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে তরুণ ওয়ারেন হেস্টিংসন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির করণিক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হন। পলাশীর যুদ্ধের কিছু পূর্বেই ওয়াটসন-এর জায়গায় হেস্টিংস কাশিমবাজারে নিযুক্ত হন। তিনি ষড়যন্ত্রের প্রত্যক্ষ খলনায়ক না হলেও যুক্ত ছিলেন সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার সাথে। পলাশীর পূর্বে কাশিমবাজারে নবাবের অনুমতির বাইরে শক্তি সঞ্চয়ের অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে অবশ্য তিনি মুক্তি পান।

পলাশীর যুদ্ধের পর হেস্টিংস মীরজাফরের দরবারে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট হিসাবে নিযুক্ত হন। বস্তুতপক্ষে মীরজাফর হেস্টিংস-এর উপস্থিতিতে পুতুল নবাবে পরিণত হয়েছিলেন।

ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে ফিরে যান এবং পরে তিনি মাদ্রাজে ব্রিটিশ কাউন্সিলের মেম্বার পদে পুনরায় ভারতে ফিরে আসেন। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে তিনি সদ্য স্থাপিত ব্রিটিশ উপনিবেশ বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। তিনি এ পদে ছিলেন ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হবার এবং তারও পূর্বে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার সমাজে তৈরি করেন প্রচুর সামন্ত প্রভু। একাধিক হিন্দু জমিদারীর সৃষ্টি করে এক নতুন ধরনের নতুন সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। এ সব সামন্ত প্রভুরা বংশ পরম্পরায় ইংরেজ প্রভুদের অনুগত থেকেছেন। এদের হাতে নিষ্পেষিত হয়েছে বাংলার কৃষক আর প্রজারা। যদিও পরবর্তীতে এদের

www.pathagar.com

বংশধররা বহু সামাজিক কাজ এবং বিদ্যার প্রসার ঘটিয়েছিলেন। লক্ষণীয় বিষয় হল এদের জমিদারী ছিল তৎকালীন পূর্ব বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশের) বিভিন্ন অঞ্চলে। এমনি কয়েকজনের বিষয়ে আমি আলোচনা করেছি।

ওয়ারেন হেস্টিংস-এর বিরুদ্ধে অসদাচরণ আর দুর্নীতির অভিযোগ উঠে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে। এ অভিযোগে তার বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্টের বিল আনলে তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়ে দায়িত্ব হতে অব্যাহতি নেন। বিচার চলে প্রায় সাত বছর। অবশেষে ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পান। তবে তিনি যে বাংলাকে শোষণ করে বিপুল অর্থের অধিকারী হয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ইংল্যান্ডে তার সম্পত্তির খোঁজ করলে। যিনি সামান্য করণিকের পদে ভারতে এসেছিলেন তিনিই বিপুল সম্পত্তির মালিক হন মাত্র দশ বছরে।

আমরা কাশিমবাজার ছেড়ে আসছিলাম। শহরটি ছোট। খুব বেশি ঘনবসতি তেমন নয়, তবে ঐতিহাসিক কারণে শহরটির গুরুত্ব যথেষ্ট। এখান থেকেই ভারতে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হয়।

শহরের মধ্য দিয়ে আসবার সময়ে মনে হচ্ছিল যেন ষড়যন্ত্রের খলনায়করা এখনও এই শহরের উপরে ভর করে আছে। কেমন খালি খালি আর ছাড়া ছাড়া পরিবেশ। কাশিমবাজার এক বিশাল ষড়যন্ত্রের স্থান। কাশিমবাজার কুঠি ষড়যন্ত্র আজও বাংলার রাজনীতিতে প্রতীকী হিসেবে উচ্চারিত হয়।

www.pathagar.com

ষোল

বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ

আমরা ষড়যন্ত্রের শহর ছেড়ে উত্তরদিকে মুর্শিদাবাদের পথে। রাস্তাটি তেমন চওড়া নয় কিন্তু দু'ধার নয়নাভিরাম। রাস্তার পশ্চিম দিক থেকে বয়ে যাচ্ছে কালের সাক্ষী ভাগিরথী নদী আর পূর্ব পাশ সবুজের বেষ্টনী। ভাগিরথী নদী এ স্থানে খুব প্রশস্ত না হলেও এ সময়ে পানির স্তর বেশ ভাল।

কিছুদূর যেতেই রাস্তায় টোলঘরের সামনে আমাদেরকে থামালো কিছু তরুণ। জানালো যে, মুর্শিদাবাদ শহরে প্রবেশ করতে হলে তিনশ' রুপি টোল দিতে হয়। এখানে টোল দিলে কোথাও পার্কিং-এর জন্য আলাদা পয়সা দিতে হবে না। টোল দেবার সময় আমাদেরকে ছেকে ধরল স্থানীয় গাইডরা। বিশাল ফিরিস্তি দিল আমাদেরকে দেখাবার জায়গাগুলোর। আমাদের গাইডের দরকার নেই জানালে হতাশ হয়ে আমাদের ছেড়ে দিল।

টোলঘর হতে প্রায় পনের মিনিটের মাথায় আমরা মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠে এসে পড়লাম। মনে মনে ভাবছিলাম যে এককালের বাংলার রাজধানী যে শহর থেকেই একসময় প্রথমে মোগল সুবেদার পরে নবাবরা বাংলা, বিহার আর উড়িষ্যা শাসন করতেন ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর মুর্শিদাবাদ আর মুর্শিদাবাদ রইল না।

ভারতীয় শহরগুলোর তুলনায় মুর্শিদাবাদ ছোট শহর। পুরাতন আর নতুন বাড়িঘরের সংমিশ্রণে বর্তমান মুর্শিদাবাদ। এতটুকু শহরে বহু মসজিদ রয়েছে। এ সব মসজিদের বেশির ভাগ নবাবী আমলের।

মুর্শিদাবাদ সুবে বাংলার রাজধানী হিসাবে পরিচিত হয় ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে যখন মোগলদের সনদপ্রাপ্ত মুর্শিদকুলী খাঁ ঢাকা হতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। এ জায়গার নামকরণ করেন নিজের নামে 'মুর্শিদাবাদ'।

ঢাকা সুবে বাংলার রাজধানী হিসাবে গড়ে উঠে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দের পর হতে। তখন মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর দিল্লীর মসনদে। ঢাকা রাজধানী ছিল আওরঙ্গজেবের শেষ সময় পর্যন্ত। এখান থেকেই মুর্শিদকুলী খাঁ দিওয়ান হবার পর প্রথমে দিওয়ানী পরে রাজধানী পরিবর্তন করবার পর হতে ঢাকার গুরুত্ব কমে আসে। সুবেদার ইসলাম খান প্রথম

www.pathagar.com

সুবেদার ছিলেন। শহরটির নাম রেখেছিলেন জাহাঙ্গীরনগর। পরে এ নাম মোগল শাসনামলেই পরিবর্তিত হয়।

বর্তমান বাংলাদেশে তৎকালীন বাংলার কয়েকটি রাজধানীর ভগ্নাবশেষ এখনও রয়েছে। বগুড়ার মহাস্থানগড়ে মৌর্য আমলের পুন্ড্রবর্ধন, সুলতানী আমলের পরের সোনারগাঁও আর তৎকালীন বাংলার সবচাইতে সমৃদ্ধ রাজধানী ছিল গৌড় বা লক্ষাবতী বা লক্ষনৌতী। শশাঙ্ক সময় হতে মোগল সম্রাট আকবরের সময় পর্যন্ত মাঝের অল্প সময় বাদ দিলে, বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়ের পূর্ব প্রান্তই রাজশাহীর সোনা মসজিদ অঞ্চল। তবে ঢাকাই গড়ে উঠেছে প্রথমে প্রদেশ পরে স্বাধীন বাংলা ভাষাভাষী রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে।

মুর্শিদকুলী খাঁ তৎকালীন সুবেদার আজিম উসশানের সাথে বিরোধে না জড়ালে হয়ত ঢাকা থেকে যেত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী। তেমন হলে ইতিহাস কেমন হতো তা হতে পারে কাউন্টার হিসট্রির গবেষণার বিষয়।

মুর্শিদাবাদের আরেক অংশ ছিল জগৎ শেঠদের যারা বংশ পরম্পরায় রাষ্ট্রের ব্যাংকার হিসাবে পরিচিত। এই শহর ব্রিটিশ শাসনের গোড়াপত্তনের পরে বেশ কিছু বছর রাজধানী ছিল, অন্তত নবাব মীর কাশেম আলী খানের সময় পর্যন্ত। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সময় ক্রমেই ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তার করতে থাকলে ব্রিটিশ বাংলার রাজধানীর অনেকাংশ ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে সরিয়ে নেন। তবে ব্রিটিশ ছত্রচ্ছায়ায় নবাবদের বসত মুর্শিদাবাদেই থেকে যায়। এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ, জনসংখ্যার মোট ৬৬ শতাংশ মুসলমান ধর্মাবলম্বী। তবে এদের বেশির ভাগ শিয়া মতবাদের মুসলমান। যেমন ছিলেন এখানকার নবাবরা। মুর্শিদাবাদ সম্পূর্ণভাবে বাংলার রাজধানীর মর্যাদা হারায় ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদকে পৌরসভা ঘোষণা করা হয় যা আজ পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে।

মুর্শিদাবাদের ইতিহাস হাসি-কান্না, প্রবঞ্চনা, স্বেচ্ছাচারিতা আর বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাসে সিক্ত। আমরা সেই শহরে প্রবেশ করলাম। আমাদের গন্তব্য হাজারদুয়ারী প্রাসাদ বা নিজামাত কিল্লা। লক্ষ্মন শহরের অপর প্রান্ত দিয়ে হাজারদুয়ারীর দিকে যেতে যেতে একটি সুন্দর ছোট মসজিদ দেখালেন। পরে হাজারদুয়ারীর গাইড আমাদের বলেছিলেন ওই মসজিদটি নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার মা আমেনা বেগম তৈরি করেছিলেন। আমরা যে রাস্তা দিয়ে হাজারদুয়ারী প্রাসাদের দিকে যাচ্ছিলাম তার দক্ষিণে চকবাজার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা হাজারদুয়ারী প্রাসাদের দক্ষিণ প্রান্তে এসে পৌছলাম। হাজারদুয়ারীর সামনের প্রধান প্রবেশ পথ উত্তরদিকে। আমরা যেখানে নামলাম সেখানে বিশাল এলাকা জুড়ে লোহার রেলিংয়ের মধ্য বরাবর একটি প্রবেশ পথ রয়েছে। এখান

www.pathagar.com

দিয়েই পর্যটকরা এ প্রাসাদ দেখতে চত্বরের ভেতরে প্রবেশ করেন। বিশাল জায়গা নিয়ে প্রাসাদ। যার উত্তরে রয়েছে ভারতের সবচাইতে বৃহত্তম ইমামবাড়া বা শিয়াদের অন্যতম ধর্মীয় স্থাপনা।

আমরা গেটের কাছে গিয়ে একজন গাইড নিলাম। চটপটে তরুণ। নাম শাহেনশাহ। একজন শিয়া মুসলমান। প্রথমেই তিনি ওই ফটকের এপারে একটি সূর্যঘড়ি দেখালেন। বললেন যে এ ঘড়িটি প্রাসাদ তৈরির সময় বানানো হয়েছিল। এ ঘড়ি দিয়ে এখনও খুব ভালভাবে সময় নির্ধারণ করা যায়। গাইড আমাদেরকে পেছনের রাস্তা ধরে উত্তরদিকে নিয়ে চললেন। হাঁটতে হাঁটতে তোতা পাখির মত ইতিহাসের বহু জানা অজানা প্রসঙ্গ তুলে ধরছিলেন। একপর্যায়ে তিনি বললেন, 'অনেকেই মনে করেন এই প্রাসাদ সিরাজ-উদ-দৌলার বা আলীবর্দী খাঁর সময়কার তৈরি। কথাটা সঠিক নয়। এখানে সিরাজের সময়কার যা কিছু ছিল তা গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছিল শুধুমাত্র 'মদিনা' ছাড়া। এই মদিনা ঠিক প্রাসাদের সামনে পশ্চিম লনে। আমি আপনাদের দেখাব আর সবিস্তারে বর্ণনা করব।

আমরা প্রাসাদের উত্তরে চলে এসেছি। আসবার পথে গাইড শাহেনশাহ জানালেন যে, প্রাসাদ জাদুঘরের ভেতরে গাইডদের প্রবেশাধিকার নেই। তিনি বাইর থেকেই আমাদের প্রাসাদ সম্বন্ধে জানাবেন এবং ভেতরে রক্ষিত কিছু অবশ্য দর্শনীয় বস্তুর বর্ণনা দেবেন। যেতে যেতে তিনি পূর্বদিকে বিশাল আয়তনের দেয়ালঘেরা একাংশ দেখালেন। যার ভিতরে অনেকগুলো বাড়ি আর একটি ছোট ইমামবাড়া রয়েছে। প্রাচীর প্রায় আট হতে নয় ফুট উঁচু। অনেকটা ছোটখাটো দুর্গের মত। ভিতরের ইমামবাড়ার উপরে শিয়া সম্প্রদায়ের ত্রিকোণকালো পতাকা দেখা গেল। শাহেনশাহ বললেন, 'ওই পতাকাগুলো ভিতরের ইমামবাড়ার। এই দেয়ালঘেরা বাড়িগুলো আর ইমামবাড়ার এককালের মালিক ছিলেন মীরজাফর আলী খান, সংক্ষেপে মীরজাফর। তার বংশধররা এখনও এখানে থাকেন। আমি কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। শাহেনশাহকে জিজ্ঞাসা করলাম

'আপনি তাদের চিনেন?'

'জ্বি চিনি। এখানে আমার কয়েকজন বন্ধুও রয়েছে।' বললেন শাহেনশাহ গাইড।

'সাধারণ মানুষ তাদের কি চোখে দেখে?' গাইডকে জিজ্ঞাসা করলাম।

'না তাদের অতীত নিয়ে কেউ কথা বলে না। প্রায় আড়াই শত বছর আগের ঘটনা কেউ তেমন মনেও করে না।' বললেন শাহেনশাহ।

মীরজাফর সম্বন্ধে বাংলা ভাষাভাষী সকলেই হয়তো কম বিস্তর জানেন। তবুও সংক্ষিপ্তভাবে তার পরিচয় তুলে ধরছি। মীরজাফর ছিলেন নবাব আলীবর্দী খাঁ-এর ভগ্নিপতি। সে সুবাদে তিনি সিরাজেরও দাদা ছিলেন। মীরজাফরের পিতার নাম

www.pathagar.com

আহমেদ নাজাফী। এদের আগমন হয় নাজাফ বা মধ্যপ্রাচ্য হতে। মীরজাফর আলী খান দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রিয়ভাজন হয়ে উঠলে তিনি মুর্শিদাবাদে বসবাসের জন্য হুকুমপ্রাপ্ত হন। সেই থেকে তিনি মুর্শিদাবাদে আর আলীবর্দী খাঁর ভগ্নির সাথে বিবাহ সূত্রে নবাবদের পরিবারে অন্তর্ভুক্ত হন। এরপরের ইতিহাস বহুল চর্চিত তাই উল্লেখ করা হতে বিরত থাকলাম।

আমরা আমাদের গাইড শাহেনশাহের পেছনে পেছনে উত্তরমুখী বিশাল প্রাসাদের সম্মুখে আসলাম। গাইড মুখস্থ ইতিহাস দ্রুত বলতে শুরু করলে তাকে একটু আস্তে আস্তে বলতে অনুরোধ করলাম।

প্রাসাদ জাদুঘরের সামনে বিশাল সবুজ চত্বর। উত্তর প্রান্তে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি দক্ষিণমুখী সাদা রংয়ের বিশাল আকারের ইমামবাড়া। প্রাসাদের মধ্যখান হতে সবুজ চত্বর পার হয়ে ইমামবাড়ায় যাবার জন্য সিমেন্টের ফুটপাত। সবুজ চত্বরের পশ্চিমে ছোট একটি মসজিদ আর পূর্বপাশে একটি সুউচ্চ ঘণ্টাঘর। আমরা যেখানে দাঁড়ানো সেখান দিয়ে প্রশস্ত সিঁড়ি উঠে গেছে সোজা দরবার হলে আর সিঁড়ির নিচে গাড়ি বারান্দা এবং প্রথম তলায় প্রবেশ পথ। প্রাসাদটি তিন তলা। প্রচুর পর্যটকের সমাগম দেখলাম। তবে বেশির ভাগই ভারতীয়।

হাজারদুয়ারী সম্বন্ধে এবার আমাদের গাইড বিবরণ দিতে শুরু করবার প্রথমেই জানালেন যে, এখানে সিরাজের বা তার উত্তরসূরিদের কোন চিহ্নই রাখা হয়নি। বর্তমানের ইমামবাড়ার স্থানেই ছিল সিরাজের নির্মিত কাঠের ইমামবাড়া। সিরাজের হত্যার পর ওই ইমামবাড়াটি আগুনে পুড়ে গেলে অবশিষ্ট অংশ কোম্পানি রাজের অনুমতিতে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে তৈরি করা হয়। গাইড তারপরে বললেন 'অনেকেরই ধারণা যে মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারী প্রাসাদ সিরাজ অথবা সিরাজের অগ্রজরা বানিয়েছিলেন। তেমনটি মোটেই নয়। এই প্যালেস তৈরি হয় সিরাজের হত্যার প্রায় আশি বছর পর। এই হাজারদুয়ারী তৈরি হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার কোরের তত্ত্বাবধানে।'

'শাহেনশাহ বলেই চললেন, সামনে যে ছোট মসজিদটি দেখছেন এরই নাম মদিনা। এটাই সিরাজের নির্মিত একমাত্র স্থাপনা যা এখানে অবশিষ্ট রয়েছে। এর একটু দূরেই নদীর তীরে দেখেছেন ছোট একটি হলদে রংয়ের মসজিদ সেটিও সিরাজের সময়ের তৈরি।

'আমি আপনাদেরকে বাইরে হতেই হাজারদুয়ারী এবং এর ভেতরের জাদুঘরের বর্ণনা দেবার জন্য দরবার হলের সামনে নিয়ে যাব, সেখান থেকে ভেতরের কিছু বর্ণনা দেব সেগুলো আপনারা অবশ্যই দেখবেন। এরপর আমি টিকিট কিনে আপনাদেরকে প্রবেশ পথ পর্যন্ত নিয়ে যাব। শাহেনশাহ মুখস্থ বললেন।

www.pathagar.com

আমরা সিঁড়ির প্রথম ধাপের কাছে দাঁড়ানো। এখান থেকে ৩৬টি সিঁড়ি ভেঙে উপরের দরবার হলের প্রবেশ পথ পর্যন্ত যেতে হবে। সিঁড়িগুলো আস্তে আস্তে উপরের দিকে দৈর্ঘে, কমতে থাকে। আমরা যে ধাপে দাঁড়িয়ে আছি সেটি ১০৮ ফুট আর উপরের সব শেষ সিঁড়িটি ৬৫ ফুট লম্বা। আমরা যেখানে দাঁড়ানো তার দু'দিকে দু'টি সিংহের মূর্তি। সিঁড়ির ডানদিকে ইংরেজিতে আর বাঁ দিকে ফার্সিতে লেখা রয়েছে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট ৯ এ প্রাসাদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল। এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনা করেন সুবে বাংলার নবাব নাজিম হুমায়ুজা বাহাদুর। সাথে ছিলেন গভর্নর জেনারেলের এজেন্ট এখানকার ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর কমান্ডার লর্ড উইলিয়াম কেভেনডিস বেন্টিংক। বস্তুতপক্ষে গভর্নর জেনারেলের এজেন্টই ছিলেন তৎকালীন নবাবদের চালক। এজেন্টের অনুমোদন ছাড়া নবাব কোন অর্থ ছাড় দিতে পারতেন না। এমনকি বিচার কার্যও সম্পাদন করতে পারতেন না। স্মরণীয় যে, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের পর হতে ক্রমেই ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব স্থায়ী হতে শুরু করে।

এই প্রাসাদটি লম্বায় ৪২৫ এবং চওড়ায় ২০০ ফুট। এখানকার সিঁড়িগুলো পাথরের তৈরি। নবাব হুমায়ুজা ছিলেন মীরজাফর আলী খাঁ-এর বংশের অষ্টম নবাব। সম্পূর্ণ প্রাসাদটি ইতালীয় স্থাপত্যের আদলে তৈরি।

আমাদের গাইড এসব তথ্য দেবার পর বললেন, 'উপরে উঠবার পূর্বে আপনাদেরকে এদিককার ওই বিশাল কামানটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব।' কামানটি প্রাসাদ আর ইমামবাড়ার রাস্তার পাশে স্থাপিত। এই কামানটি লম্বায় ১৮ ফুট এবং ব্যারেলের ব্যাস ৫ ফুট। কামানটি জাহানকোষা কামানের সমসাময়িক। এই কামান তৈরি করেছিলেন জনার্দন কর্মকার। এই কামান দাগতে ১৭ কেজি বারুদ লাগত। উদ্ধার করা হয়েছিল ভাগিরথীর নদীগর্ভ থেকে। গাইডের তথ্য মতে এ কামানটি একবারই দাগা হয়েছিল। এর আওয়াজ এমনই বিকট ছিল যে বিস্তীর্ণ এলাকার গর্ভবতী মায়েদের গর্ভপাত হয়েছিল বলেই এর নাম রাখা হয় 'বাচ্চাওয়ালী তোপ'। এটা পাওয়া যায় নবাব হুমায়ুজার সময়ে। নবাব হুমায়ুজা ছিলেন মীর জাফরের পঞ্চম বংশধর।

শাহেনশাহ গাইড এর পর সিরাজের মদিনার দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন এর ইতিহাস। তিনি বললেন যে এই সাদা স্থাপনাটি দেখতে মসজিদের মত হলেও বর্তমানে শুধুমাত্র আশুরার দিনে খোলা হয়। কথিত আছে যে, সিরাজের মাতা মানত করেছিলেন যে সিরাজ বাংলার নবাব হলে তিনি মক্কার মাটি দিয়ে একটি মসজিদ বানাবেন। মায়ের কথা রাখতে সিরাজ মক্কা থেকে মাটি এনে নিজে মাথায় করে ছয়ফুট খুঁড়ে সে মাটি নিজে ভিতের নিচে রাখেন। নাম রাখেন মদিনা। এখানে ছিল সোনা রূপা আর কাচের কাজ। তৈরির পর হতে মহররমের সময় এখানে চলে কোরআন পাঠ।

আমরা গাইডের সাথে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম। উপরে দরবার হলের সকল

www.pathagar.com

দরজা স্থায়ীভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে শুধুমাত্র একটি দরজার উপরের অংশ খোলা যার মধ্য দিয়ে গাইডরা পর্যটকদের ভেতরের বিবরণ ও দর্শনীয় বস্তুর বিবরণী দিয়ে থাকেন। আমাদের অপেক্ষা করতে হল কারণ আমাদের সামনে একদল দর্শনার্থী মন্ত্রমুগ্ধের মত তাদের গাইডের কথা শুনছে।

আমাদের অপেক্ষার ফাঁকেই গাইড বললেন, 'হাজারদুয়ারীতে হাজার দরজা থাকলেও বাইরের দিকের দরজার অধিকাংশই সিমেন্টের তৈরি দরজা সদৃশ নক্সা করা মাত্র। এগুলো প্রবেশ পথ নয় এবং খোলাও যায় না। আপনাদের সামনে যে দরজাটি সেটিও অনুরূপ। হাত দিলে বুঝতে পারবেন। আমরা হাত দিয়ে দেখলাম সত্যিই তাই। এখানে প্রায় ১০০টি নকল দরজা রয়েছে। এগুলো এমন নিখুঁতভাবে বানানো যে সহজে তফাৎ বোঝা যায় না। বলা হয়ে থাকে এগুলো বানানো হয়েছিল যাতে হঠাৎ কোন আক্রমণকারী সঠিক দরজা যাতে খুঁজে না পায়।' গাইডের বক্তব্য শেষ হলেই আমরা সুযোগ পেলাম ওই খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হলরুমের ভেতরটা দেখতে।

শাহেনশাহ আমাদেরকে দাঁড় করিয়ে দরবার হল দেখিয়ে বললেন, 'যখন আপনারা ভেতরে যাবেন এই দরবার হলটির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বস্তু দেখবেন।' বলে একে একে কয়েকটা অবশ্য দর্শনীয় বস্তুর বর্ণনা শেষ করে দরবার হলের মধ্যখানের বিশাল ঝাড়বাতি দেখিয়ে বললেন 'এই ঝাড়বাতিটি বেলজিয়ামের। এত বড় ঝাড়বাতি ভারতের অন্য কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই।

'গোয়ালিয়রের রাজবাড়িতে যে ঝাড়বাতি আছে সেটা তো ভারতে সবচাইতে বড় ঝাড়বাতি বলে দাবি করা হয়।' আমার এ কথা শুনে গাইড বললেন, 'স্যার আমার জানা নেই।' উপরে দাঁড়িয়ে গাইডের বয়ান শেষ হলে আমরা ভেতরে প্রবেশের জন্য নিচে নেমে আসলাম।

আমাদের নিয়ে শাহেনশাহ নিচের পোর্চের বা গাড়ি বারান্দার একধারে দাঁড়াতে বললেন। সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলাম প্রচুর দর্শনার্থী টিকেট হাতে জাদুঘরে প্রবেশের জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়ানো। সেখানে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে দেখলাম প্রবহমান ভাগিরথী একেবারে প্রাসাদের লনের পশ্চিম প্রান্ত ছুঁয়ে যাচ্ছে। নদীর ওপারে প্রচুর গাছগাছালি। এখান থেকে কয়েক কিলোমিটার দক্ষিণে নদীর পশ্চিম তীরে খোশবাগ। খোশবাগে শায়িত নবাব আলীবর্দী খাঁ আর তার পায়ের কাছে সিরাজের খণ্ডিত দেহ সমাহিত। আরও সমাহিত সিরাজের বেগম লুৎফুনন্নেসা।

একদিকে ছিলেন আলীবর্দী খাঁ, সিরাজের মাতামহ অন্যদিকে পিতামহ, তার অন্যতম কন্যা আমেনা বেগম আর ভাইয়ের ছেলে মির্জা আহমেদের পুত্র জৈনউদ্দিনের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সিরাজ। আলীবর্দী খাঁ গড়ে তুলেছিলেন নাতিকে ভবিষ্যৎ উত্তরসূরি হিসাবে।

www.pathagar.com

১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে আলীবর্দী খাঁ গিরিয়ার যুদ্ধে নবাব সরফরাজ খাঁ, মুর্শিদকুলী খাঁ-এর জামাতা নবাব সুজা-উদ-দৌলার পুত্রকে হত্যা করেন। হত্যা করেন মারাঠা দূত ভাস্কর পণ্ডিতকে। দখল করেন বাংলার মসনদ। আলীবর্দী খাঁর পিতা ছিলেন আওরঙ্গজেবের পুত্র আজম শাহের প্রধান বাবুর্চি। আলীবর্দী খাঁর তিন কন্যার মধ্যে সবচাইতে বড় ছিলেন ঘসেটি বেগম, যাকে পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে ষড়যন্ত্রী হিসাবে সিরাজ বন্দি করে ঢাকায় পাঠিয়েছিলেন। সিরাজ হত্যার পর মীরজাফর ঘসেটি বেগমসহ বন্দিদের মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসবার সময় বুড়িগঙ্গায় নৌকাডুবিতে ঘসেটি বেগম মারা যান। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন মীরজাফর আলীবর্দী খাঁর বংশ নির্বংশ করবার জন্যই নদীগর্ভে নৌকা ডুবিয়েছিলেন।

শাহেনশাহ তিনটি টিকেট নিয়ে ফিরে এলেন। বললেন, আমি এ পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গ দিতে পারলাম। আপনারা জাদুঘরে প্রবেশ করেই বাঁ দিকের গ্যালারি হয়ে যাবেন, পূর্ব দিকে রাখা আছে নানান ধরনের অস্ত্র, মাসকেট যেগুলো ব্যবহার হয়েছিল পলাশীর যুদ্ধে। রাখা আছে আলীবর্দী খাঁ-এর তলোয়ার আর টিপু সুলতানের ঢাল। তবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় বস্তুটি হল খাপসহ একটি ছোরা। এই ছোরাটি দিয়েই মোহাম্মদী বেগ জুলাই ২, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে মীরজাফর পুত্র মিরনের হুকুমে বন্দি অবস্থায় সিরাজকে হত্যা করেছিলেন।' শাহেনশাহর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসল। 'বললেন খোদা হাফেজ স্যার।' আমরা টিকেটের টাকাসহ তার ফিস দিয়ে দিলে তিনি আরও পর্যটক খুঁজতে চলে গেলেন।

আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে নিচের তলার প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকতে গিয়ে দেখলাম দু'পাশে বেশ অলঙ্কৃত দু'টি ফিটন। এগুলোর একটি ছিল নবাবের বাহন অপরটি ছিল অন্দর মহলের জন্য। ভেতরে প্রবেশ করে গাইডের কথা মত পূর্বদিকে ঢুকলাম। শাহেনশাহ দোতলার সবচাইতে আকর্ষণীয় একটি আরশীর কথা বলেছিলেন যার সামনে দাঁড়ালে নিজের প্রতিবিম্ব ছাড়া অন্যদের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। সেটাও অবশ্যই দেখতে বলেছিলেন।

যাই হোক প্রথম প্রদর্শনী রুমে ঢুকতেই দেখলাম উপরে একটি বল্লম আটকানো। নিচে লেখা সিরাজ-উদ-দৌলার বল্লম। তার পাশে দু'টি তরবারি আর ঢাল। তারই পাশে একটি উন্মুক্ত ছুরি প্রায় এক ফুট লম্বা। পাশে ছুরির খাপ। নিচে লেখা রয়েছে 'এই ছুরি দ্বারা সিরাজকে হত্যা করা হয়।' আমি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলাম বোধকরি বেশ কয়েক মিনিট। মুকুল আর কামরুল এই দর্শনস্থান থেকে পাশে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাসকেট বা রাইফেল দেখছিল। এ সব মাসকেটেই ব্যবহার করেছিল ক্লাইভের বাহিনী।

আমি ছুরিটির সামনে দাঁড়ানো। মনে হল ছুরিটিতে এখনও রক্তমাখা। এ রক্ত কার। এ রক্ত সিরাজের। সিরাজ নিজের দুর্ভাগ্য অনেকটা নিজেই রচনা করেছিলেন।

www.pathagar.com

চারদিকে তার বিরুদ্ধে যে বিশাল ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার হচ্ছিল তার কিছু কিছু সংবাদ তাকে দিয়েছিল ফরাসী জেনারেল (ললালী বলে বেশি পরিচিত)। এমন কি মি. ওয়াটস এক সময় এমন আভাষ দিয়েছিলেন। সিরাজ আবেগতাড়িত হয়ে এ সব ষড়যন্ত্রকারীর মধুর বাক্যে তুষ্ট হয়েছিলেন। ঘোর ইংরেজ বিরোধী নবাব চন্দননগরের চুক্তির পর ফরাসী জেনারেলকে বাংলা ছাড়া করেছিলেন তবুও তার সাথে গুটি কয়েক ফরাসী রয়ে গিয়েছিল। ললালী যখন পলাশীতে সৈন্য সমাবেশের সংবাদ পান তখন তিনি বিহার থেকে পলাশীর উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিলেন, কিন্তু ততক্ষণে পলাশীর নাটকের যবনিকা টানা হয়ে গিয়েছিল।

এরও আগে বহু ইতিহাস। অত্যন্ত জটিল ইতিহাস। ষড়যন্ত্র আর চক্রান্তের ইতিহাস। কলকাতা কাশিমবাজার আর মুর্শিদাবাদ পরিণত হয় ষড়যন্ত্র আর কুচক্রের কেন্দ্রবিন্দুতে। বহু যোগাযোগের পর উমিচাঁদ আর রায় দুর্লভ ঠিক করলেন ইংরেজদের সাথে মীরজাফরের সন্ধির বিষয়টি মি. ওয়াটসনকে দিয়ে জানাতে হবে। মি. ওয়াটসন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাউন্সিলের শর্তগুলো মীর জাফরের কাছে নিয়ে যেতে রাজি হলেন। মি. ওয়াটসন বোরখা পরলেন। কোজা পেট্রসের সহযোগিতায় পালকি চড়ে মীরজাফরের প্রাসাদে পৌঁছলেন। শর্তগুলো মীরজাফর দেখলেন। কোন মন্তব্য করলেন না পরবর্তীতে রায় দুর্লভ আর নবাবের খাজাঞ্চি উমিচাঁদের সম্পৃক্ততায় এবং চাপে নিমরাজি হলেন।

কোম্পানির কাউন্সিলের শর্তগুলোর মধ্য ছিল; (১) সিরাজের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি মীরজাফর পালন করবেন। (২) সকল বিষয়ে কোম্পানির সাথে মীরজাফর সহযোগিতা এবং সম্পৃক্ত থাকবেন। (৩) ফরাসীদের যাবতীয় ব্যবসা এবং সম্পত্তি ইংরেজদের হাতে তুলে দিবেন এবং ফরাসীরা বাংলা বিহার উড়িষ্যার কোথাও থাকতে পারবে না। (৪) কলকাতা পুনঃনির্মাণের এবং ওই যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে এক কোটি রুপি দিতে হবে (৫) কলকাতার ইউরোপীয়রা ক্ষতিপূরণ বাবদ পঞ্চাশ লক্ষ রুপি পাবেন। (৬) বিশ লাখ রুপি পাবেন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা। (৭) আর্মেনিয়ানদের দিতে হবে সাত লক্ষ রুপি। (৮) উমিচাঁদকে দিতে হবে বিশ লাখ রুপি (৯) কলকাতার মারাঠা খাল (বর্তমানে ময়দানের উত্তর-দক্ষিণ অংশ) আর এর ছয়শত গজ ব্যাস জায়গা কোম্পানিকে লিখে দিতে হবে। (১০) কোম্পানি কলকাতার দক্ষিণাঞ্চল সল্টলেক হতে কালপী পর্যন্ত জমিদারী পাবে। (১১) নবাব যখনই সাহায্য চাইবেন সেক্ষেত্রে ব্রিটিশ বাহিনীর ভরণ পোষণের খরচ বহন করবেন। (১২) হুগলীর নিম্নাঞ্চলে সরকার কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে না। (১৩) এ সব শর্ত মীরজাফরের নবাব হবার ত্রিশ দিনের মধ্যে কার্যকর করতে হবে। (১৪) মীরজাফর যতদিন শর্ত মেনে চলবেন ততোদিন কোম্পানি মীরজাফরকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করবে।

www.pathagar.com

মীরজাফর নবাব হবার গুপ্ত বাসনাকে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে বিসর্জন দিতে পারলেন না। দেশের স্বাধীনতার চাইতে ব্যক্তি ও পারিবারিক স্বার্থ বড় হয়ে দেখা দিল। যার বংশপরিচয়ের সূত্রে ইসলামের মহানবী হযরত মোহাম্মদ (দ:) আর হযরত আলীর সরাসরি বংশধর তিনিই নবাবীর লোভে বিসর্জন দিলেন সকল নৈতিকতা দেশপ্রেম আর ঈমান। মীরজাফর দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে মৌন সম্মতি দিলেন ইংরেজদের সাথে হাত মেলাবার। আর পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফর চুক্তির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করলেন সমগ্র যুদ্ধে নির্লিপ্ত থেকে।

আমি তখনও মোহাম্মদী বেগের ছুরির দিকে তাকিয়ে। ইতিহাসের টাইম মেশিন আমাকে নিয়ে গেল জুন ২৩, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশীর প্রান্তরের সন্ধ্যায় যখন সিরাজ পরাজয়ের মুখে পলাশী ছাড়লেন। ছাড়লেন প্রিয় হাতী। যৎসামান্য দেহরক্ষী নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে পৌঁছলেন মুর্শিদাবাদে। ততক্ষণে মীরজাফর ক্লাইভকে সব শর্ত মানবার কথা দিলেন। মুচলেকা হল। মীরজাফর দলবল নিয়ে রওয়ানা হলেন মুর্শিদাবাদের দিকে। মীরজাফর ময়ুরগঞ্জের সিরাজের প্রাসাদ দখল করে নিলেন। জাফরগঞ্জে নিজের প্রাসাদের দায়িত্ব দিলেন পুত্র মিরনকে।

এদিকে সিরাজ মুর্শিদাবাদে পৌঁছে মন্ত্রণাদাতাদের সাথে সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে ভবিষ্যত নির্ধারণ করতে গেলে তাকে অনেকেই আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিলেন। সিরাজ আত্মসমর্পণ না করে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চাইলেন, কিন্তু সাড়া পেলেন না। এই দুর্যোগের সময় তার আশেপাশের সুযোগ সন্ধানীরা আস্তে আস্তে সরে পড়লেন। আহত মোহন লাল ততক্ষণে মীরজাফরের অনুগতদের হাতে বন্দি। রাত প্রায় নিঃশেষ। সিরাজ একা। কি 'করবেন ভাবতে পারছেন না। অবশেষে মীরজাফরের সসৈন্যে আগমনের খবর পেলেন। তিনি তার প্রিয়তমা বেগম লুৎফুননেসা এবং শিশু কন্যা উম্মে জোহরাসহ মাত্র কয়েকজন সহচর নিয়ে সজল চোখে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব মুর্শিদাবাদ ছাড়লেন।

সিরাজ রাজমহলের দিকে গেলেন না। হয়ত তিনি ভেবেছিলেন মীরজাফর তাকে খুঁজতে রাজমহলেই আসবেন। সিরাজ হয়ত জীবনের শেষ ভুলটি করলেন। তিনি ভগবানগোলার দিকে রওয়ানা হলেন। সেখানে পৌঁছতে তিনি নৌকায় নদীপথ ধরলেন ভগবান গোলার কাছাকাছি এসে নৌকা সফরে ক্লান্ত সিরাজ তীরে নামলেন। তার সাথের কিছু সংখ্যক সহচররা খাবার প্রস্তুতে ব্যস্ত হলেন। ওই সময়, যদিও সিরাজ অতিসাধারণ বেশেছিলেন, তবুও তাকে চিনতে পারলেন দানা শাহ নামের কথিত এক দরবেশ। দানা শাহ সন্তর্পণে ওই জায়গা ত্যাগ করে অতি নিকটেই আরেক কুচক্রী মীর দাউদকে খবর দিলেন। মীর দাউদ আটক করলেন সিরাজকে। ইতিমধ্যেই সিরাজের খোঁজরত মীর জাফরের জামাতা, মীর কাশেম আলী খান, বেগম লুৎফুননেসাসহ

www.pathagar.com

অন্যদের আটক করে আলাদাভাবে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসলেন।

জুলাই ২, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে। ক্লাইভ, হেস্টিংস আর ওয়াটসের সাথে ষড়যন্ত্রকারীর বহর তখনও কাশিমবাজারের কাছাকাছি ফরাসীদের সাইদাবাদের কারখানা অঞ্চলে। মুর্শিদাবাদে সিরাজের বন্দি হবার খবর ছড়িয়ে পড়ল। ক্লাইভ খবর পেয়েও জায়গা ছাড়লেন না। মুর্শিদাবাদে যাবার সাহস পেলেন না। সিরাজ বিচ্ছিন্ন তার বেগম আর মা আমেনা বেগমের সান্নিধ্য থেকে। অনেক অপমান আর হেনস্থার পর মীর দাউদের বাহিনী মুর্শিদাবাদ ছাড়বার আটদিন পর পুনরায় সিরাজকে রাজধানীতে নিয়ে আসল। বাংলার নবাব অসহায় অবস্থায় মীরজাফরের প্রাসাদের এক কুঠুরিতে মীরনের হাতে বন্দি রইলেন।

মীরজাফর তখন নতুন নবাব, রাতে বন্দি সিরাজকে সামনে আনা হলে মীরজাফর চোখ তুলে চাইতে পারলেন না। দরবারের মীরজাফরের ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা এদের সবাই সিরাজের পরিচিত। সিরাজ চোখ রাখলেন প্রত্যেকের চোখে। শেষবারের মত দেখলেন স্বাধীনতা বিরোধী ষড়যন্ত্রীদের। তারপরেও তিনি দেখতে পাননি আরও অনেক ষড়যন্ত্রীদের। সিরাজের ভাগ্য নিয়ে আলোচনায় মতানৈক্য হলো। মীরজাফর নিজে কোন মত দিলেন না। মীরন দেখলেন মীরজাফর সিরাজ হত্যায় মত দিচ্ছেন না। তাই তিনি নবাব বাহাদুরকে বললেন, 'আমি সিরাজের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিচ্ছি। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আপনার মতামতই হবে শেষ বাক্য। এই বলে মীরন পিতাকে বিশ্রাম নিতে পাঠালেন। মীরন জানালেন সিরাজকে বন্দি করে রাখা হবে। দিলেন নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। মীরজাফর হয়ত মনে মনে তাই চাইছিলেন। সভা ভঙ্গ হল। সিরাজকে কুঠুরিতে বন্দি করা হলো।

সিরাজ বন্দি হবার পরপরই বুঝতে পারলেন তাকে বাঁচিয়ে রাখা হবে না। সকাল হয়ে আসছে। সিরাজ ওজু করবার জন্য পানি চাইলেন। ওজু করতে গিয়ে চোখের পানি ফেললেন বেগম লুৎফুননেসা, কন্যা আর স্নেহময়ী মায়ের জন্য। চোখের পানি ফেললেন বাংলা, বিহার আর উড়িষ্যার স্বাধীনতার অস্তগামী সূর্যের কথা ভেবে। জেনে গেলেন ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য মানুষ কত কি বিসর্জন দিতে পারে। কাছেই ছিল পানির কলসী। একজন ভরা কলসী নিয়ে সিরাজের গায়ে ঢেলে দিল। পাশের কক্ষে কয়েকজনের পদচারণা আর গলারও আওয়াজ শুনতে পেলেন। বুঝতে বাকি রইল না যে তার অন্তিম সময় আসন্ন। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইলেন তার জীবনের সমস্ত পাপ আর অন্যায়ের জন্য। উঠে দাঁড়ালেন পেছন থেকে একজন এই ছুরি দ্বারা আঘাত করলেন। সিরাজ ঘুরে দাঁড়ালেন।

সিরাজ বিস্ফারিত চোখে দেখলেন তারই ভাইয়ের মত করে তার পিতামহ যাকে রাস্তা থেকে কুঁড়িয়ে এনে প্রতিপালন করেছিলেন সেই মোহাম্মদী বেগ ছুরি হাতে,

www.pathagar.com

সিরাজ হন্তারক। সিরাজের মুখ দিয়ে বের হল 'তুমি মোহাম্মদী বেগ?' নিরুত্তর মোহাম্মদী বেগ পুনঃ পুনঃ ছুরি দিয়ে আঘাত করল। সিরাজ লুটিয়ে পড়লেন। বলে উঠলেন 'হোসেন কুলির অন্যায় হত্যার ফলে আল্লাহ্ আমাকে এই পরিণাম দিলেন। আমি প্রায়শ্চিত্ত করলাম। হোসেন কুলি তোমার আত্মার তৃপ্তি হোক সিরাজের মৃত্যু হল। মোহাম্মদী বেগের ছুরি থেকে, যার সামনে আমি দাঁড়ানো, টপ টপ করে ঝরে পড়ছিল সিরাজের রক্ত। শুরু হল সমগ্র ভারতের পরাধীনতার পর্ব।'

আমি তখনও দাঁড়ানো ছুরিটির সামনে। মোহাম্মদী বেগ ছুরি হাতে আরেকবার সিরাজের নির্জীব দেহের উপর আঘাত করল, এবার ধড় থেমে মুণ্ডু বিচ্ছিন্ন করল। পৈশাচিক উল্লাসে সিরাজের দেহটিকে কয়েকটি টুকরা করে ঘর ছাড়ল। তার হাতের ছুরি থেকে রক্ত ঝরছে। মীর মদনকে সংবাদ দিয়ে আশ্বস্ত করল যে সিরাজকে হত্যা করা হয়েছে।

মীর মদনের আদেশে সিরাজের খণ্ড বিখণ্ডিত লাশ হাতির পিঠে চাপিয়ে সমস্ত মুর্শিদাবাদ প্রদক্ষিণ করানো হলো। কথিত আছে যে হাতিটি সিরাজের মাতা আমেনা বেগমের বাড়ির সামনে এসে থেমে গিয়েছিল। এর মধ্যেই খবর পেয়েছিলেন সিরাজকে হত্যা করা হয়েছে। চির মমতাময়ী মাতা সিরাজের খণ্ডিত দেহ দেখে শোকে আছড়িয়ে পড়লেন পুত্রের খণ্ডিত দেহের উপরে। মাতা প্রিয় পুত্রের সুন্দর মুখখানিতে চুমু খেয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। অবশেষে সিরাজের খণ্ডিত দেহ নৌকায় চড়িয়ে ভাগিরথী পার হয়ে খোশবাগে দাদার সমাধি প্রাঙ্গণে নিয়ে পাশাপাশি কবর দেয়া হল।

সিরাজের কবর দেবার সময়ের এক অবিশ্বাস্য কল্প কথা শোনা যায় যে, আলীবর্দী খাঁর কবর ফেটে গিয়ে রক্ত বের হয়েছিল। এমনটা আমাদের গাইড শাহেনশাহও বলেছিলেন। হয়তো এটাই বিশ্বাস এখানকার মানুষের, বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে।

সিরাজকে যে প্রাসাদে হত্যা করা হয় সে প্রাসাদটি ছিল হাজারদুয়ারীর উত্তরে ইমামবাড়ার পেছনে অল্প দূরে। বর্তমানে সেখানে শুধু প্রাসাদে প্রবেশের সিংহদরজাটি রয়েছে। ঐ স্থানটি এখন 'নমকহারাম দেউড়ি' নামে পরিচিত। অনেকে মনে করেন। কোন প্রকোষ্ঠে নয় ঐ দেউড়িতেই সিরাজ-উদ-দৌলাকে হত্যা করেছিল মোহাম্মদী বেগ।

আমার দেরি দেখে মুকুল আর কামরুল আমার কাছে এসে ডাক দিলে আমি মোহাম্মদী বেগের ছুরির সামনে থেকে পাশের প্রদর্শনীতে আসলাম। ততক্ষণে ওই ছুরি দেখতে বেশ ভিড় হয়ে গিয়েছিল। কামরুল জিজ্ঞাসা করল 'এতক্ষণ দাঁড়িয়ে কি দেখলেন?'

www.pathagar.com

'দেখলাম মানুষ ক্ষমতার লোভে কিভাবে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে সব বিসর্জন দেয়। দেশ, মানুষ, ভবিষ্যৎ আর নৈতিকতা বিসর্জন দেয়। এমনটিই হয়ে এসেছে যুগে যুগে। দেশের সমস্যা সমাধানে বিদেশিদের আগমন, আর ক্ষমতায় যাবার জন্য বিদেশি প্রভু তুষ্টির কারণেই উপমহাদেশ ছিল দু'শত বছর গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ। এখনও আছে পরোক্ষ শক্তির কাছে জিম্মি। মোহাম্মদী বেগরা যুগে যুগে হত্যা করেছে স্বাধীনতার প্রতীক। কামরুল চুপ আর মুকুল আমার মুখের দিকে তাকালো।

অস্ত্র দেখতে দেখতে আমরা ভেতর দিয়ে দো'তলায় উঠবার সিঁড়ির কাছে সেই আরশিটি দেখলাম যার কথা আমাদের গাইড বলেছিল। আরশিটির সামনে বেশ ভিড়। ভিড় হালকা হলে দেখলাম আরশিটি এমন কৌণিকভাবে তৈরি যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখা যায় না। তবে পেছনে দাঁড়ানো বা অন্য কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখা যায়। আমি ইতিপূর্বে এ ধরনের আরশি বা আয়না দেখিনি। গাইড শাহেনশাহ বলেছিলেন যে, এই আয়নাটি দরবার হলে নবাবের সিংহাসনের সামনে রাখা হত যাতে নবাব পেছনে দেখতে পেতেন। দেখতেন পেছন হতে যে কোন আততায়ীর আগমন হয় কিনা।

আমরা সিঁড়ির কাছে একটি পুরাতন কামান দেখলাম। লেখা রয়েছে যে এ কামানটি মীর মদনের কামান বহরের একটি। হোলার কামান। আমরা উপরে উঠে আসলাম। দোতলার ল্যান্ডিং-এ। এখানে পাঁচটি ছোট বড় তৈলচিত্র রয়েছে। সবচাইতে বড়টিতে অঙ্কিত রয়েছে হাজারদুয়ারীর স্থপতি ডানকান ম্যাকলিংড নবাব হুমায়ুজা-এর দরবারে। আর বাকি চারটির একটিতে কর্নেল ক্লাইভ দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলার দেওয়ানী লাভ করছেন। ঘটনাটি ঘটেছিল নবাব মীর কাশেম আলী খানকে বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত করতে মোগল ফৌজকে সাহায্য করবার পর। সম্রাট শাহ আলম সেদিন খাল কেটে কুমির আনার বৈধতা দিলেন। বাকিগুলো নবাবী আমলের বিভিন্ন উৎসবের তৈল চিত্র।

আমরা ল্যান্ডিং ছেড়ে সোজা চলে আসলাম দরবার হলে। এখানেই সেই বৃহৎ ঝাড়বাতিটি যেটি গাইড আমাদের বাহির হতে দেখিয়েছিলেন। দরবার হলটি আলোকিত। সামনে রাজকীয় আসন বা সিংহাসন। আসনটি রূপার তৈরি তবে স্বর্ণের কাজও রয়েছে। সিংহাসনের মাথায় রূপার ছাতা এবং সামনে রাখা রূপার তৈরি বৃহদাকারের হুক্কা। এখানে লক্ষণীয় যে সিংহাসনের পূর্বদিকে সিল্ক দিয়ে মোড়ানো একটি আসন। গাইড শাহেনশাহ আমাদেরকে সিংহাসনের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে দরবার হলে সিংহাসনের পাশের এই আসনটিতে বসতেন কোম্পানির রেসিডেন্ট বাহাদুর। সিরাজ পরবর্তী নবাবদের শাসন আমলে দরবারে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং গুরুতর অপরাধের বিচার কার্যের সময়ে রেসিডেন্ট বাহাদুর উপস্থিত থাকতেন।

www.pathagar.com

গাইড সিংহাসনের বিবরণ দেবার সময় দরবার হলে প্রবেশ পথের উপরে সিরাজ-উত্তর বাংলার নবাবদের প্রতীক দেখিয়ে বলেছিলেন, দেখুন নবাবদের প্রতীক দু'টি সিংহ, কিন্তু দু'টির গায়েই শিকল বাঁধা। যার মানে হল সিংহ দু'টি স্বাধীন নয় শিকলে আবদ্ধ। রেসিডেন্ট বাহাদুরের আসনই গাইডের কথার প্রমাণ।

হাজারদুয়ারী জাদুঘরে বহু পেইন্টিং আর দর্শনীয় দ্রব্যাদি রয়েছে যা অনেক সময় নিয়ে দেখা যায়। আমরা হাঁটার উপরে এসব দেখলাম। বহু দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে রূপার তৈরি সম্রাট শাহজাহানের হাতির হাওদা রয়েছে। তবে সিরাজের কোন দ্রব্যাদি দেখতে পেলাম না।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে প্রবেশ করলাম নবাব গ্যালারিতে। এখানে নবাব মুর্শিদকুলী খা হতে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের শেষ নবাব টাইটেলধারী ওয়ারিশ আলী মীর্জার তৈল চিত্র রয়েছে। তৈলচিত্রগুলো দেখতে দেখতে সিরাজের চিত্রের পরের দুটোর সামনে এসে দাঁড়ালাম। এই চিত্রটিতে মীরজাফরের সাথে তার পুত্র মীরনের তৈল চিত্র। থমকে দাঁড়ালাম কুচক্রী মীরজাফর আর হন্তারক মীরনের তৈল চিত্রের সামনে।

মীরন মীরজাফরের প্রথম স্ত্রীর পুত্র। পিতার পরই বাংলার ভবিষ্যৎ নবাব। হোক না ইংরেজদের হাতের পুতুল তবুও নবাব। সিরাজ হত্যার পর মীরন মেতে উঠলেন হত্যাযজ্ঞে। একে একে হত্যা করলেন আলীবর্দী খাঁনের বংশধরদের। সিংহাসন নিষ্কণ্ট করতে চাইলেন মীরন। সিরাজের এগারো বছরের ছোট ভাই মীর মেহদীকে হত্যা করলেন বুকে পিঠে তক্তা দিয়ে পিষে। সিরাজের মরহুম ভাই আকরাম-উদ-দৌলার ছেলে মুরাদ-উদ-দৌলাকে হত্যা করা হয়। পুর্নিয়ার সৌকত জংয়ের ছোট ভাই রমজানির ভাগ্যে কি ঘটেছিল জানা যায়নি। এ হত্যাযজ্ঞের তালিকায় ছিল অনেকে। মীরন এ হত্যাযজ্ঞ শেষ করতে পারেনি তার অকাল মৃত্যুর কারণে। সে কথায় পরে আসছি।

মীরনের নির্দেশে সিরাজের মা আমিনা বেগম, দাদী শরফুন্নেসা আর কন্যাসহ লুৎফুননেসা বেগমকে ঢাকায় বন্দি করে পাঠানো হল। রাখা হলো ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে জিঞ্জিরা মহলে। ঢাকার জিঞ্জিরা মহলটি ছিল বেশ বড়োসড়ো পরিবেশে, কিন্তু এখন তেমন কিছু অবশিষ্ট নেই। কিছুদিন আগেই আমানউল্লাহর সাথে গিয়েছিলাম বন্দিশালাটি দেখতে। সম্পূর্ণ জায়গাটি বহু বছর পূর্বেই বেদখল হয়ে গিয়েছে। তৈরি হয়েছে ঘরবাড়ি। প্রাসাদের বন্দিশালাটির যৎসামান্য অংশ আজও দাঁড়িয়ে আছে যেখানে বহু পরিবার বাস করছে। দু'টি ছোট প্রকোষ্ঠ রয়েছে। একটি অন্ধকার কুঠরি ছিল বলে মনে হল। এখানে বন্দিদের রাখা হতো বলে একজন স্থানীয় ব্যক্তি জানিয়েছিলেন। প্রাসাদের দেউড়ির যৎসামান্য চিহ্ন রয়েছে। সেখানেও আধুনিক ঘরবাড়ি উঠেছে। স্থানীয় কেউ দেখিয়ে না দিলে বুঝবার উপায় নেই। ওই জায়গা দেখে

www.pathagar.com

মনে দুঃখই পেলাম কারণ আমাদের দেশে যে সামান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো রয়েছে সেগুলোর বেশির ভাগেরই সংরক্ষণের উদ্যোগ তেমন না নেয়াতে বেহাত হয়েছে এ সব দুর্লভ ঐতিহাসিক নিদর্শন।

সেবারই দেখতে গিয়েছিলাম ঢাকার তিন নেতার মাজারের পেছনের ঐতিহাসিক হযরত হাজী খাজা শাহবাজ (রঃ) এর তৈরি মসজিদ ও মাজার–তৈরি হয়েছিল ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে। নির্মাণ করা হয়েছিল মোগল স্থাপনার ধাঁচে। সময়টি ছিল আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল। ওই বছরই আওরঙ্গজেব হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর ধার্য করেন। মসজিদটি এখনও আবাদ রয়েছে। সাধারণ জনগণের কাছে মসজিদটি জ্বীনের মসজিদ নামে অধিক পরিচিত। অনেকের মতে এ ছোট মসজিদটিতে জ্বীনেরা নামাজ পড়তে আসেন। অনেকটা দিল্লীর মোহাম্মদপুরের নীল মসজিদের কিংবদন্তির মত (লেখকের যমুনা গোমতীর তীরে ভ্রমণ কথা দ্রষ্টব্য।) মসজিদের কেয়ারটেকার বলেছিলেন দু'বছর পর পর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মসজিদটিতে রং করেন মাত্র। চলে কমিটির মাধ্যমে।

ফিরে আসছি গাইডের বিবরণে। সিরাজের স্ত্রী, মাতা আর ঘসেটি বেগমের পরিণতির কথা বলতে গিয়ে গাইড বলেছিলেন বেগম লুৎফুননেসার কন্যাকে হত্যার পর মীরন তাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। নবাব বেগম তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। পরে আমৃত্যু তিনি সিরাজের সমাধিতে থেকেছেন। যেমনটা আগেই বলেছি মীরনের নির্দেশেই বুড়িগঙ্গার পানিতে ডুবিয়ে মারবার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ঘসেটি বেগমের সাথে মারা গিয়েছিলেন বোন আমেনা বেগম। নেহাৎ ভাগ্যের জোরে বেঁচে গিয়েছিলেন শরফুন্নেসা ও লুৎফুন্নেসা। কথিত আছে যে ক্লাইভ এ হত্যাযজ্ঞে সায় দেননি। তারই হস্তক্ষেপে এই দুই মহিলা প্রাণে বেঁচে যান। ডুবে যাবার পূর্বে ঘসেটি বেগম মীরনকে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন, 'মীরনের মাথায় বাজ পড়বে।' মীরনের মাথায় বাজ ঠিকই পড়েছিল।

বাজ (বিদ্যুৎ) পড়ে মীরন মারা গেলেন রাজমহলে যেখানে সিরাজ ধরা পড়েছিলেন তার কাছাকাছি। আর মীরজাফর পুত্র শোক কাটিয়ে উঠতে পারেননি। পারেননি সিরাজের খণ্ড বিখণ্ড দেহের দৃশ্য ভুলতে। বৃদ্ধ বয়সে মীরজাফর দুঃস্বপ্ন দেখতেন। দেখতেন সিরাজের ঘোড়া তার বুকের উপরে পদাঘাত করছে। মীরজাফর আলী খাঁ জীবনের শেষ কয়েক বছর কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে ঘৃণ্য জীবন অতিক্রান্ত করেন। এ রোগের কারণে তাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্ধকার ঘরে কাটাতে হয়েছে। এমনকি তার দ্বিতীয় ঘরের পুত্র পরবর্তী নবাব নাজমুদ দৌলাও পিতার রোগের কারণে পরিত্যাগ করেছিলেন। মীরজাফরের শেষের পরিণতির বিবরণ দিতে গিয়ে ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার লিখেছিলেন, 'ঘৃণ্য জীবনের ঘৃণ্য পরিণতি।'

ষড়যন্ত্রকারী প্রায় সকলের জীবননাশ হয় অস্বাভাবিকভাবে। ক্লাইভ আত্মহত্যা

www.pathagar.com

করেন। উমিচাঁদ প্রতারণার শিকার হয়ে উন্মাদ অবস্থায় মারা যান। আর জগৎ শেঠকে ভাইয়ের সাথে মুঙ্গেরের দুর্গের চূড়া হতে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে ডুবিয়ে মারা হয়। রায় বল্লভসহ্ অন্যান্যরা পরে নিগৃহীত জীবনযাপন করেন।

উমিচাঁদ প্রতারণার শিকার হয়েছিলেন এটা যেন সঠে শাধ্যাং।

এ সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়। উমিচাঁদ বাংলার নবাব আলীবর্দী খাঁর সময় বিরাট ব্যবসায়ী হিসেবে প্রচুর বিত্তের মালিক হন। তিনি একসময় আলীবর্দী খাঁ-এর অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন, কিন্তু সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করবার পর হতে বিভিন্ন কারণে উমিচাঁদও সিরাজের অবহেলার কাতারে শামিল হন। প্রকৃতপক্ষে এদের অনেকেই সিরাজের তারুণ্যের অনভিজ্ঞতা, উগ্র মেজাজ এবং মাঝে মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণের কারণে মীরজাফরের শিবিরে যোগ দেন।

আমি উমিচাঁদের উপাখ্যান একটু বিস্তারিত আলোচনা করছি এ কারণে যে, ষড়যন্ত্রকারীদের সাথেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তারা বিশেষ করে ক্লাইভ কি ধরনের প্রতারণা করেছিলেন তার কিছুটা ধারণা দেবার জন্যে। এসব এবং দুর্নীতির কারণে ক্লাইভের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে শুনানি হয়েছিল এবং ওই শুনানিকালেই ক্লাইভ অপমান হওয়া হতে নিষ্কৃতি পেতে আত্মহত্যা করেন।

আগ্রা নিবাসী উমিচাঁদ কলকাতার দাদনী ব্যবসায়ী বিষ্ণু দাসের সহায়তায় কলকাতায় ব্যবসার জন্য আসেন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই উমিচাঁদ একজন বড় ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমেই তিনি আলীবর্দী খানের ঘনিষ্ঠতার সুবাদে নবাবের কাছের মানুষে পরিণত হন। আলীবর্দী খাঁ-এর ভ্রাতা হাজী আহমেদের মাধ্যমে কোম্পানির সাথে লবণ এবং আফিমের ব্যবসায় নিয়োজিত হন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এত বিশাল ধন সম্পদের মালিক হন যে, নবাবের প্রয়োজনেও তিনি অর্থ যোগান দিতেন।

এই উমিচাঁদই সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রথমদিকে সিরাজের আরেক সেনাপতি ইয়ার লতিফকে সিরাজের পরিবর্তে গদিতে বসাবার প্রস্তাব ক্লাইভকে দেন। পরে অবশ্য এক পর্যায়ে মত পাল্টিয়ে মীরজাফরের পক্ষেই রায় দেন। উমিচাঁদ তার এই সব ষড়যন্ত্রমূলক কাজের জন্য তৎকালীন মূল্যের ৩০০,০০০ পাউন্ড দাবি করেন। অন্যথায় তিনি এই ষড়যন্ত্রের বিষয় ফাঁস করবেন বলেও ক্লাইভকে হুমকি দেন। শিক্ষা দেবার জন্য উমিচাঁদের হুমকি এবং দাবি ক্লাইভ দৃশ্যত অগ্রাহ্য করতে প্রতারণার আশ্রয় নিলেন। উমিচাঁদের জন্যে একটি নকল অঙ্গীকার পত্র তৈরি করা হয়। এ মুচলেকার রং ছিল লাল। আর অন্য মুচলেকাগুলোর জন্য সাদা কাগজ ব্যবহার করা হয়। ওইগুলো হতে উমিচাঁদকে বাদ দেয়া হয়েছিল।

আমি আগেই বলেছি যে, এই নকল মুচলেকা নিয়ে ক্লাইভ আর এডমিরাল ওয়াটসনের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এডমিরাল ওয়াটসন একজন নিষ্ঠাবান

www.pathagar.com

সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি এ হেন নকল দলিলে দস্তখত করতে অস্বীকার করলে ওয়াটসনের দস্তখত জাল করে মুচলেকা তৈরি করে উমিচাঁদকে দেয়া হয়। ক্লাইভের এই কূটচাল উমিচাঁদ টের পাননি। টের পেলেন তখন যখন পলাশীর যুদ্ধের পর তিনি কোম্পানির নিকট তার কথিত প্রাপ্য দাবি করেন। লর্ড ক্লাইভ তাকে প্রকৃত মুচলেকা দেখালে উমিচাঁদ জানতে পারলেন যে, তিনি প্রতারিত হয়েছেন। সেই শোকে উমিচাঁদ ক্রমেই উন্মাদ হয়ে যান। পরে উন্মাদ অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়। এটাই বোধহয় প্রকৃতির প্রতিশোধ বা natural justice. আমরা সাধারণরা ভুলে যাই প্রতারক যতই শক্তিশালী হোক প্রকৃতির প্রতিশোধের হাত থেকে কম প্রতারকই রক্ষা পেয়েছে। আমাদের চারপাশে এর বহু নজির রয়েছে।

ছবির ঘর থেকে আস্তে আস্তে বের হয়ে আসছিলাম। লুৎফুননেসার ছবি কোথাও দেখতে পেলাম না। অবশ্য এখানে নবাবদের বেগমদের কোন তৈলচিত্র নেই। মনে পড়ল কবি নবীন চন্দ্র সেন লুৎফুননেসা আর সিরাজকে নিয়ে রচনা করেছিলেন 'পলাশীর যুদ্ধ'। যে কাব্যের নাটক রচিত হয়েছিল, তারই ভিত্তিতে কয়েকটি ছবিও তৈরি হয়েছিল। সিরাজ চরিত্রে অভিনয় করে আমাদের দেশের অভিনেতা আনোয়ার হোসেন তৎকালীন সমগ্র পাকিস্তানে সাড়া ফেলেছিলেন।

আমরা যতদূর সম্ভব হাজারদুয়ারী প্রাসাদ জাদুঘর দেখে বের হয়ে আসলাম। সামনে বিখ্যাত ক্লকটাওয়ার। ঘড়ির দিকে তাকালাম। ঘড়িটি বেশ কিছুদিন থেকে বন্ধ হয়ে আছে। এ টাওয়ার স্থাপিত হয়েছিল হাজারদুয়ারী তৈরির পরপরই। হাতের ঘড়ি দেখলাম বেলা প্রায় একটা। আজই আমরা ফিরব কলকাতায়। রাত কাটাবো হোটেলে। পরের দিন সকাল সাড়ে ছয়টায় ঢাকার উদ্দেশে কলকাতা ত্যাগ করব। কাজেই অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে, সেই সাথে শেষ হবে আমার বাংলা বিহার প্রান্তর সফর। আগের দু'টির মত লিখব এই সফরনামা।

আমরা বের হয়ে এসে লক্ষমনের গাড়িতে চড়লাম। লক্ষমন বললেন যে, তিনি আমাদেরকে পুরাতন মুর্শিদাবাদ এলাকা দিয়ে নিয়ে যাবেন। যাবার পথে কিছু ঐতিহাসিক স্থাপনা দেখতে পারব। আমরা চকবাজারের এক দোকানে দাঁড়িয়ে চা পান করলাম। এতক্ষণে বহু পর্যটকের সমাগম হয়েছে। বাজারে প্যাডেল রিক্সা আর ঘোড়ার গাড়ির ছড়াছড়ি। আমরা মুর্শিদাবাদের পুরাতন এলাকার রাস্তা ধরলাম। ভাগিরথী নদীর পূর্ব পাড়। কিছুদূর যেতেই চোখে পড়ল একটি দৃষ্টিনন্দন সাদা রংয়ের সুন্দর মসজিদ। এ মসজিদটি মীরজাফরের স্ত্রী মনি বেগম বীনাকার ওয়াজেদ আলীর নামে বানিয়েছিলেন বলে গাইড বইতে পেয়েছিলাম। এখানেই মুর্শিদকুলী খাঁর 'চেহেল সেতুন প্রাসাদ' ছিল। এ মসজিদের দৈর্ঘ্য ১২৫ ফুট। সাত গম্বুজের মসজিদে এখনও নামাজ পড়ানো হয়। মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে।

www.pathagar.com

আমরা ত্রিপোলিয়া গেট পার হয়ে পুরাতন মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদকুলী খাঁর শহর ছাড়লাম। মুর্শিদ কুলী খাঁ বণিক হাজী ইস্পাহানের ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি আদলে ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণের পুত্র পরে হাজী সাহেব তার নাম পরিবর্তন করে রেখেছিলেন 'মোহাম্মদ হাদী' এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেন। পরে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নেক নজরে আসেন। তাকে নিয়োগ দেয়া হয় দেওয়ান হিসাবে। পরে বাংলার সুবেদার আজিমুসশানের সাথে মতানৈক্যের ফলে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হন। পরে তিনি সম্রাট ফররুখশিয়রের সময় সুবেবাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন। তাকে নবাবের টাইটেল প্রদান করা হয়।

মুর্শিদাবাদ তিনশত বছরের শহর। বহু স্থাপনা এখনও মুর্শিদকুলী খাঁর কথা মনে করিয়ে দেয়। তিনি শায়িত আছেন প্রধান রেলস্টেশন সংলগ্ন কাটরা মসজিদের উপরে উঠবার সিঁড়ির নিচে। মসজিদটি জীর্ণ অবস্থায় রয়েছে তবে ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সংস্কার করে সংরক্ষিত রেখেছেন। মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন মুর্শিদকুলী খাঁ। মুর্শিদাবাদ ছাড়বার সময় মনে হল কেন যেন অতৃপ্ত রয়ে গেল। হয়ত আবার সুযোগ পেলে আসতে হবে মুর্শিদাবাদকে, বাংলার শেষ রাজধানীটিকে, আরেকটু বিস্তারিতভাবে ঘুরে দেখতে। ইতিহাস জানতে।

আমরা শহরের বাইরে। মুর্শিদাবাদ-বহরমপুর সড়কে ফিরতি পথে। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর আমরা কলকাতায় পৌঁছব। কামরুল ঘুমে। মুকুল সামনে বসে ঝিমুনিতে। লক্ষ্মন একমনে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা দক্ষিণমুখী। মুর্শিদাবাদ পেছনে ফেলে আসছি। হাতের ডানে-পশ্চিম পাশে রাস্তার সমান্তরাল ভাগিরথী নদী। সূর্য পশ্চিম দিকে হেলা শুরু করেছে। সূর্যের রশ্মিতে ভাগিরথীর রূপালী পানির উপরে সোনালী রংয়ের আভার মত মনে হল। ওপারে খোশবাগ। এ যাত্রায় সময়ের অভাবে খোশবাগে যাওয়া হয়নি। দেখা হয়নি আলীবর্দী খাঁ তার নাতি সিরাজ আর লুৎফুননেসার সমাধি।

আমি ভাগিরথীর পানির দিকে তাকিয়েছিলাম। দূরে একটি নৌকা লাল রংয়ের ছোট পাল তুলে উত্তর দিকে, খোশবাগের দিকে যাচ্ছিল। লাল পালের রং প্রতিফলিত হচ্ছিল নৌকার তলদেশে। মনে হল জুলাই ৩, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে হয়ত এমনই সময়ে সিরাজের খণ্ডিত দেহ নৌকায় চড়িয়ে খোশবাগে আনবার সময় নৌকার পাটাতন গড়িয়ে সিরাজের রক্ত মিশে যাচ্ছিল ভাগিরথী নদীর পানিতে। এই ভাগিরথী নদীই কালের সাক্ষী হয়ে আজও প্রবহমান। বুকে বয়ে বেড়াচ্ছে ষড়যন্ত্র, বঞ্চনা আর বহু প্রেম কাহিনী। বয়ে চলেছে বাংলার ইতিহাসের উত্থান আর পতনের সাক্ষী হয়ে ভাগিরথী নদী।

www.pathagar.com

সতের

ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী ট্রেনে

আমার এ ভ্রমণ কাহিনী এখানেই শেষ হতে পারত যদি আগেরবার খোশবাগে যেতে পারতাম। দেখতে পারতাম আলীবর্দী খাঁ আর বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের সমাধি। কিন্তু তেমনটি হয়নি। অতৃপ্ত থেকে গিয়েছিলাম বলেই ভেবেছিলাম এ কাহিনী শেষ হবার আগেই আরেকবার মুর্শিদাবাদ আর কলকাতার কিছু আংশিক দেখা জায়গাগুলো, যেগুলোর কথা আগে সংক্ষেপে বলেছি, পুনরায় সময় নিয়ে দেখব। সুযোগ বেশ তাড়াতাড়িই জুটে গেল। রমজানের শেষে ঈদের একদিন পর দিন দশেকের ছুটি নিয়ে আবার রওয়ানা হলাম কলকাতার উদ্দেশে।

ঢাকা থেকেই মুকুল আমাদের চারজনের মুর্শিদাবাদে যাতায়াতের ট্রেনের টিকিট করে নিজে তার স্ত্রীকে নিয়ে চলে এসেছিল কলকাতায়; কথা ছিল আমাদের সাথে যোগ দেবার কিন্তু অনিবার্য কারণবশত দ্বিতীয়বারের মত এ সফরে সে থাকতে পারেনি।

আমার দ্বিতীয়বারের এ সফরে কামরুল ছাড়াও আমানউল্লাহ যোগ দিয়েছিল। আমানউল্লাহ একজন সফল ব্যবসায়ী। গুলশান লেক পার্কের আড্ডার সূত্র ধরেই পরিচয়। অনেক ধরনের ব্যবসার সাথে জড়িত আমানউল্লা। বাপ-দাদার সূত্রে ঢাকার আদি বাসিন্দা তবে থাকে গুলশানে। তার প্রবল ইচ্ছা ছিল ইতিহাস নির্ভর কোন সফরে আমার সাথে যোগ দেবার, তাই সানন্দ চিত্তে এবার সফর সঙ্গী হয়েছিল।

আমরা পূর্বেই নির্ধারণ করেছিলাম যে, এবার ঢাকা থেকে কলকাতা মৈত্রী ট্রেনে সফর করব। পরিকল্পনা মোতাবেক আমরা মৈত্রী ট্রেনে চাপলাম। কলকাতা পৌঁছতে প্রায় এগারো ঘণ্টার প্রয়োজন হবে। তবে তার তিন ঘণ্টা ব্যয় হবে বাংলাদেশের সীমান্ত দর্শনায় আর ভারতের সীমান্ত 'গেদে'তে। দু'জায়গাতেই ইমিগ্রেশন কাস্টমস ইত্যাদি করাতে হবে। এত সময় নিয়ে এ দু'জায়গার তল্লাশির বিপরীতে বিকল্প ব্যবস্থায় এ সময়টুকু কমিয়ে আনতে পারলে এই ট্রেনটি ঢাকা-কলকাতার যাত্রীদের নিকট আরও জনপ্রিয় বাহন হতে পারত।

যাই হোক, আমরা ঈদের একদিন পর অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ২,২০১১ সালের সকালে ঢাকা সেনানিবাস থেকে ট্রেনে চাপলাম। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি কুপেতে আমাদের তিনজনের ঠাঁই হল। ট্রেন যথাসময়ে, সকাল আটটা বেজে দশ মিনিটে, কলকাতার

www.pathagar.com

উদ্দেশে রওয়ানা হলো। মাঝে কোথাও থামবে না আর কোন যাত্রীও উঠাবে না, তবে প্রথমে যমুনা ব্রিজের পূর্বপ্রান্তে নিরীক্ষণের জন্য আর ঈশ্বরদীতে পানি নিতে কিছুক্ষণের জন্যে দাঁড়াবে। ওই সময়ে যাত্রীদেরকে স্বীয় বগিতেই অবস্থান করতে হবে।

সেনানিবাস স্টেশনে মৈত্রী ট্রেনে এত যাত্রী হবে আমি ভাবতে পারিনি। কারণ, এর আগে যতটুকু শুনেছি তাতে মনে হয়েছিল শুয়ে বসেই যাওয়া যাবে। কিন্তু আমার সে ধারণা পাল্টে গিয়েছিল। যাত্রীতে ট্রেন প্রায় পূর্ণ। পরে শুনলাম মৈত্রী চালু হবার পর হতে এ পর্যন্ত এ দিনই সর্বোচ্চ যাত্রীর সমাগম হয়েছে। কারণ বুঝতে দেরি হলো না। আজকাল বাংলাদেশিরা, অবশ্য যাদের সামর্থ্য রয়েছে, ছুটি পেলেই বেড়াতে বের হয়। তা দেশের অভ্যন্তরেই হোক অথবা বিদেশেই হোক। আর ঈদের ছুটি অথবা পরের সপ্তাহখানেকের তো কথাই নেই। দেশের সমুদ্র সৈকতে যে কোন লম্বা ছুটিতে স্থান সংকুলান করাই দুরূহ ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে।

এবারের লম্বা ছুটিতেও তাই হয়েছে। যারা দেশের রাস্তার দুরবস্থার কারণে গাড়ি নিয়ে দূরে যেতে পারেনি তাদের অনেকেই হয়ত এই ট্রেনের যাত্রী হয়েছে। সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক আর কোলকাতার বিমানগুলো অর্ধেক মাসই বুক। তাই আজ মৈত্রী ট্রেনের এ লম্বা যাত্রার ঝক্কি ভ্রমণকারীদের উৎসাহ দমাতে পারেনি। আমরাও যোগ দিলাম তাদের সাথে।

আমাকে এ ট্রেনে উঠতে দেখে ট্রেনের পরিচালক হতে প্রায় সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী বিস্ময় প্রকাশ করলেন। বগিতে বসবার পর একে একে বহুজন আসলেন খোঁজ-খবর নিতে। সহাস্যে ধন্যবাদ জানালাম।

ট্রেন ঢাকা ত্যাগ করবার প্রায় ঘণ্টা চারেকের পর ঈশ্বরদীতে থামল। ঈশ্বরদী পাবনা জেলার স্টেশন। বহু পুরাতন রেলওয়ে জংশন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে যখন এ অঞ্চলে বৃটিশ-ভারত সরকার ট্রেনের প্রচলন শুরু করে তখনকার সময়ের এই জংশন। আজকের এই পুরাতন স্টেশন সে কালের সাক্ষী। তখন আরও রমরমা ছিল। এখন বার্ধক্য। তেমন চাকচিক্য নেই। কবে প্রথম এখানে স্টেশন স্থাপিত হয়েছিল জানতে পারলাম না। কারণ, স্টেশনের কোথাও স্থাপনের সময় উল্লেখ নেই। ছেলেবেলায় বহুবার পাবনায় আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসে ঈশ্বরদীতে নেমেছি। এখান থেকে বাসে চড়ে পাবনা শহরে গিয়েছি। আমার খালু তখন এ জেলার সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। সে বহু বছর পূর্বের কথা। তখন গোয়ালন্দ ঘাট পার হয়ে ঈশ্বরদীর জন্য এপাড়ে ব্রডগেজ ট্রেনে চাপতে হতো। বাষ্প চালিত ট্রেনের ইঞ্জিন তীক্ষ্ম হুইসেল মেরে কালো কয়লার ধূয়োর কুণ্ডুলি আকাশে ছড়িয়ে ছুটতো। এখন আর তেমন নেই। তখনকার গোয়ালন্দ ঘাট আর নেই। ট্রেন এখন যমুনা সেতু পার হয়ে এপাড়ে আসে। রাস্তাঘাট হওয়াতে ঈশ্বরদীতে নেই সে প্রাণচঞ্চলতা। ট্রেন এখন অবহেলিত।

www.pathagar.com

ঈশ্বরদী ছেড়ে সবুজ প্রান্তরের বুক চিড়ে ট্রেন আরও ঘণ্টাখানেক পর দর্শনা স্টেশনে পৌছল। এখানে প্রায় দু'ঘণ্টার বিরতি। সব যাত্রীকে নেমে ইমিগ্রেশন আর কাস্টমস্ চেকিং করাতে হবে। সবাই নামবার পর স্টেশন মাস্টার আসলেন। জানালেন ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্টধারীদের ঘোষণাপত্রই যথেষ্ট। শুধু ইমিগ্রেশনটা করাতে হবে। এ ব্যাপারে তিনিই সাহায্য করবেন। তার আমন্ত্রণে স্টেশনে তার বরাদ্দ কক্ষে বসলাম। অমায়িক কর্মঠ ভদ্রলোক। নাম লিয়াকত আলী।

দর্শনা। এক সময়ে এ পথেই বেঙ্গল-আসাম রেল চলাচল করতো। এই স্টেশনটিও প্রায় দেড়শত বছর পুরাতন। আশে পাশের ইটের লাল রংয়ের দালানগুলো সে কালের ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার সফরসঙ্গী দু'জনও আমার সাথে। কামরুল সমস্ত পথটাই অনর্গল কথা বলে আমাদের মাতিয়ে রেখেছিল। আমানউল্লাহ চোখ বুজে শুনে যাচ্ছিল। আমিও ঝিমুতে ঝিমুতে এ পর্যন্ত এসেছি।

স্টেশন মাস্টার সাহেবের রুমে বসে তাঁর সৌজন্যে এক কাপ খেলাম। লাঞ্চ আমরা ট্রেনেই সেরে ফেলেছিলাম। লিয়াকত সাহেবকে, তার মাথার উপরে ঝুলানো অনার বোর্ড দেখে, জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে এই স্টেশনের প্রথম স্টেশন মাস্টারের নাম তার কাছে আছে কিনা? তিনি কাচুমাচু হয়ে বললেন, 'হয়ত আমাদের হেড অফিসে পাওয়া যেতে পারে। এখানে নেই।'

জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে স্টেশনটির বয়স কত? সঠিক বলতে পারলেন না। জানার খুব ইচ্ছে ছিল জানতে পারলাম না। আলাপচারিতার ফাঁকে বললাম, বাল্যকালে ট্রেন ভ্রমণে দেখেছি মেইল ট্রেনগুলো যে স্টেশনে থামতো না তার একপ্রান্তে একজন একটি বড় রিং আকারের বস্তু নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন আর ইঞ্জিনের চালক চলন্ত অবস্থায় রিং-এ হাত গলিয়ে বাজ পাখির মত ছোঁ মেরে সেটি গ্রহণ করতেন।' জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে সেটি কি ছিল? আজও সে রকম কিছু দেখা যায় কিনা। উত্তরে একজন বললেন, 'জি স্যার, এখনও আছে। রিং-এর গোড়ায় একটা থলি থাকে তাতে সিগন্যাল ক্লিয়ারে সার্টিফিকেট দেয়া থাকে। তবে এখন যে সব জায়গায় বৈদ্যুতিক সিগন্যাল রয়েছে সেখানে প্রয়োজন হয় না। তবে ম্যানুয়েল সিগন্যাল ব্যবস্থায় ওই ধরনের ব্যবস্থা বলবৎ রয়েছে।

ইতিমধ্যে ইমিগ্রেশন শেষ, যাত্রীরা ট্রেনে উঠতে শুরু করলেন। আমি প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে একটু দূরে উপমহাদেশ খ্যাত কেরু এন্ড কোম্পানির চিনিকলের চিমনির দিকে তাকালাম। দর্শনা এই কেরু এন্ড কোম্পানির চিনিকল আর ডিস্টিলারির মিলের জন্য খ্যাত। বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকে আমি তৎকালীন বিডিআর-এর খুলনা সেক্টর কমান্ডার থাকাকালীন সময়ে বহুবার বিওপি পরিদর্শনকালে কেরু কোম্পানির রেস্ট হাউসে থেকেছি। তখনও ওই রেস্ট হাউস এ অঞ্চলে বৃটিশ রাজত্বের কথা মনে করিয়ে

www.pathagar.com

দিতো। আজও তেমনি দেয়। দেশের মানচিত্র দু'বার বদলালেও কেরু কোম্পানির নাম রয়ে গেছে। তেমনি থাকবে আশা করি। পরাধীন দিনগুলোকে স্মরণ করিয়ে দিতে এ সব ইতিহাস আর ঐতিহাসিক স্থানগুলোর নাম বদলানোর পক্ষপাতী আমি নই। থাকুক কেরু কোম্পানির নাম যদিও এ চিনিকল বার্ধক্যের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। এ অঞ্চলে প্রচুর আখের চাষ এখনও হয় তখনও হতো। তখন তুঁতগাছেরও চাষ হতো। এ অঞ্চলে ছিল নীলকরদের দৌরাত্ম্য। কোথাও কোথাও জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় এখনও দু'একটি ছোট আকারের নীলকুঠি দেখা যায়। এমনি একটি নীলকুঠি আছে জীবননগরের আমঝুপীতে। তথ্যে প্রকাশ, ওই কুঠিতে বসেই ক্লাইভের সাথে ঘসেটি বেগম সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। বহুবার গিয়েছি আমঝুপীর ওই কুঠিতে। এখন ওই কুঠি একটি রেস্ট হাউস।

আমি দর্শনা প্লাটফরমে দাঁড়ানো। দর্শনা এখন চুয়াডাঙ্গা জেলার একটি উপজেলা। এক সময় নদিয়া জেলার অংশ ছিল। আমার সামনে ১৯৩৩ সালে স্থাপিত কেরু কোম্পানির স্টাফ ঘরগুলো। অযত্ন অবহেলায় জর্জরিত। হলুদ হয়ে যাওয়া দাঁতের মত বিবর্ণ হয়ে গেছে। এ কেরু কোম্পানি ছিল এক সময় উপমহাদেশের অন্যতম চিনি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, বর্তমানে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ চিনিকল।

দর্শনা রেলওয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে দেখলাম মৈত্রী আন্তর্জাতিক ট্রেনের জন্য স্টেশনের চেহারায় কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। একদিকে তারের জালি দিয়ে নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করা হয়েছে। শতাব্দীর উপরের পুরাতন স্টেশনের দালানেও রয়েছে প্রলেপ দেয়া। প্লাটফরম তুলনামূলকভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পূর্বমাথায় ইমিগ্রেশনের জন্য বর্ধিত করা হয়েছে। দর্শনার এ পথ দিয়ে শুধু যাত্রী চলাচল করে তেমন নয় এখান দিয়ে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে মালবাহী ট্রেনেরও আগমন নির্গমন হয়।

দর্শনা রেল স্টেশনের স্থাপনার তারিখ বা সন আমাকে স্টেশন মাস্টার জানাতে না পারলেও বাংলাদেশ রেলওয়ের ইতিহাস উপমহাদেশের রেলওয়ে স্থাপনার সাথে যুক্ত। বর্তমান বাংলাদেশের প্রথম রেলওয়ে স্টেশন দর্শনা নভেম্বর ১৫, ১৮৬২ সালে তৎকালীন বেঙ্গল আসাম রেল নেটওয়ার্ক স্থাপনাকল্পে দর্শনা হয়ে কুষ্টিয়া জেলার জগতি পর্যন্ত ৫৩.১১ কি. মি. ব্রডগেজ রেলওয়ে লাইন স্থাপিত হয়েছিল। সম্ভবত ওই সময়ের স্টেশন এই দর্শনা।

আরও পরে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে খুলনা হতে উত্তরাঞ্চলে রেল যাতায়াতের জন্য ১৯১০ সালে পদ্মার উপর তৈরি শুরু হয় বর্তমানের হার্ডিঞ্জ বা সারা ব্রিজ। ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ এ ব্রিজের উদ্বোধন করেন। ইংরেজ লর্ডকে স্মরণীয় করে রাখতে এর নাম রাখা হয় হার্ডিঞ্জ ব্রিজ। যদিও এই ব্রিজের পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল আরও বিশ বছর পূর্বে। আমরা কথিত ব্রিজের উপর দিয়ে

www.pathagar.com

আসবার সময় দেখলাম স্যার এফ জেই স্প্রিং (Sir F JE spring) এর ডিজাইনে তৎকালীন চিফ ইঞ্জিনিয়ার স্যার রবার্ট গেইলসের তত্ত্বাবধানে তৈরি লোহার এই ব্রিজটি আজও দাঁড়িয়ে। অবশ্য এ ব্রিজটি মুক্তিযুদ্ধের সময় ধ্বংস করা হয়েছিল। ১.৮ কি. মি. দীর্ঘ ১৮টি স্পেনের উপর দাঁড়ানো এই ব্রিজ।

বাংলাদেশে বর্তমানে ২, ৮৫৫ কি. মি. রেল যোগাযোগের আওতায় রয়েছে। ব্রডগেজ এবং মিটার গেজ লাইনে উভয় ধরনের ট্রেনই চলাচল করছে। মিটার গেজ প্রথমে বসানো হয় চট্টগ্রাম হতে কুমিল্লামুখী ১৪.৯৮ কি. মি.। সময় ছিল জানুয়ারি ৪, ১৮৮৫ সাল। পরে ১৮৯১ সালে চট্টগ্রাম হতে কুমিল্লা পর্যন্ত লাইন সম্প্রসারিত করা হয়।

কিছুক্ষণ পর স্টেশন মাস্টার সাহেব এসে জানালেন ইমিগ্রেশনের কাজ শেষ, অল্পক্ষণের মধ্যেই ট্রেন ছাড়বে। সামনেই নোম্যানস ল্যান্ড তারপরে ভারতের স্টেশন গেদে। সেখানে আবার ইমিগ্রেশনের জন্যে ট্রেন থামবে আর যাত্রীদের ব্যাগ ইত্যাদি পরীক্ষা হবে। তিনি আরও জানালেন, আমার বিষয়ে তিনি ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। আমরা জনাব লিয়াকত আলীর আতিথেয়তার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে ট্রেনে উঠলে ট্রেন ছেড়ে দিল। নোম্যানস ল্যান্ডের মধ্য দিয়ে ট্রেন লাইনের দু'পাশে তারের নেট দিয়ে ঘেরা দেয়া। ঘেরা পার হতেই ট্রেন গেদে প্লাটফরমে থামল। ইতোপূর্বেই বাংলাদেশি ট্রেন পরিচালক নেমে গিয়েছিলেন। যাবার সময় জানিয়েছিলেন, ট্রেন পরিদর্শক আর দুইজন কারিগরি স্টাফ সাথে থাকবেন। এই তিনজন কলকাতা পর্যন্ত যাবেন। পরের দিন আবার ঢাকার উদ্দেশে এই ট্রেন নিয়ে চলে আসবেন। গেদে থেকে আমাদের এই ট্রেনটি ভারতীয় ইঞ্জিন আর পরিচালক নিয়ে যাবেন। গেদে হতে যোগ হবে বিদ্যুৎচালিত ইঞ্জিন।

গেদে পৌঁছলে সব যাত্রীই তাদের মালামাল নিয়ে নেমে পড়লেন। আমরা তিনজন ভিতরে বসা। কিছুক্ষণ পর ট্রেন পরিদর্শক এসে আমাদের পাসপোর্ট এবং প্রয়োজনীয় দলিলাদি নিয়ে ইমিগ্রেশনে চলে গেলেন। সম্পূর্ণ ট্রেনে আমরা তিনজন। শুধুমাত্র অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের কিছুই করবার ছিল না।

গেদে স্টেশন খুব ছোট তবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। স্টেশনটি দু'ভাগে ভাগ করা। একভাগ আন্তর্জাতিক আর একভাগ লোকাল ট্রেনের জন্যে। এখান থেকে প্রতি ঘণ্টায় লোকাল ট্রেন রানাঘাট হয়ে কলকাতার উদ্দেশে ছাড়ে। এক সময় এই লাইনটিই ছিল আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের প্রধান পথ। ওই সময় দর্শনা ছিল প্রধান স্টেশন। গেদে আরও পরে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর স্থাপিত হয়েছিল।

আমি কামরায় বসে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম প্লাটফরমে প্রচুর ভারতীয় রেলের

www.pathagar.com

পুলিশ ট্রেনের নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত। ছোট স্টেশন। একটি ছোট ক্যান্টিন যেখানে শুধু চা আর সস্তা বিস্কুট পাওয়া যায়। চায়ের তেষ্টা পেলেও আমরা ট্রেন থেকে প্লাটফরমে নামিনি।

'কলা খাবেন? কামরুল সুধালো। তার হাতে একটি চম্পা কলা। সহাস্য ভক্ষণরত।

'কোথায় পেলে?' জিজ্ঞাসা করলাম। আমানউল্লারও ওই একই প্রশ্ন।

'খাবেন তো বলেন। কোথায় পেলাম তার উত্তর পরে দেব।'

কামরুলের মুখে শিশুসুলভ দুষ্টামির হাসি।

আমানউল্লা বলল, 'নিশ্চয়ই সে কোথাও থেকে এনেছে। আচ্ছা নিয়ে আসুন খাব।'

কামরুল দরজা ছেড়ে গেল। কয়েক মিনিটের মাথায় আরও কয়েকটি কলা নিয়ে হাজির।

এবার আমি চাপ দিয়ে বললাম, 'ভাই কোথায় পেলে না বললে খাই কিভাবে?'

'আগে খান পরে বলছি।'

অগ্যতা ছোট চম্পাকলা ছুলে মুখে পুরে খেয়ে আবার একই প্রশ্ন করলাম।

এবার কামরুল বলল, 'পাশের ক্যাবিনে কেউ নেই শুধুমাত্র একছড়া কলা ছাড়া। ভাবলাম কলাগুলো পড়ে রয়েছে অন্তত কয়েকটার সদ্ব্যবহার করা যাক।'

এতক্ষণে কামরুল তার হাতের কলা শেষ করে বলল, 'যা পাওয়া যায় তাই হালাল।'

আমি একটু অপরাধীর মত হয়ে বললাম, 'হয়ত পাশের কেবিনের যাত্রীরা ইমিগ্রেশনে যাবার সময় রেখে গেছে। ইমিগ্রেশন কলার ছড়া দেখলে হয়ত কোয়ারেনটাইনে নিয়ে যেত। তবুও আজ্ঞা না নিয়ে খাওয়াটা কি চৌর্য্যবৃত্তি নয়?

কামরুল হেসে বলল, 'কেন ছোটবেলায় মানুষের গাছের ফল চুরি করে খাননি? আমি খেয়েছি।'

'আমিও' আমানউল্লা বলল।

'হ্যাঁ খেয়েছি, কিন্তু তখনতো অপরাধ বোধ জাগেনি। এখন তো জাগে।

'কিছু হবে না। না হয় কলার মালিক আসলে মাফ চেয়ে নেব।' ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল ভাবলাম একটু স্মৃতিটাকে ঝালাই করি।' কামরুলের মুচকি হাসিটা মুখে লেগেই রইল।

মনে পড়ল কোন এক বড় সাহিত্যিক বলেছিলেন 'মানুষের বয়স যতই বাড়ুক না কেন অন্তরের শিশুটি কখনই বিস্মৃত হয় না। সত্যি কথাই। বয়স বাড়লেও মাঝে মধ্যে আমরা শিশুসুলভ আচরণ করি। অবশ্য সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই একটু আনন্দদায়কও বটে।

www.pathagar.com

মনে পড়ল সেই হারানো দিনের কথা। আমি তখন নেহাতই বালক। রংপুরে যে বাড়িতে আমরা ভাড়া থাকতাম পাশেই থাকতেন বাড়ির মালিক ইসহাক প্রধান। বাড়ির ভিতরে প্রচুর পেয়ারা গাছ ছিল। মৌসুমে গাছের পেয়ারাগুলো গাছে পেকে গেলেও পাড়তেন না। দুপুরের দিকে সবাই ঘুমে অচেতন থাকতেন। ইসকুল থেকে ফিরে দলবল নিয়ে চুপিসারে পেয়ারা গাছে উঠে পেয়ারা পাড়ত আমাদের এক সহপাঠী মঞ্জু, আর আমাদের একজন পাহারায় থাকত বিপদ সংকেত দেবার জন্যে। প্রায়ই এমন হতো। একদিন হঠাৎ প্রধান সাহেবের বড় ছেলে টের পেয়ে চিৎকার করে উঠলে আমরা পেয়ারা ফেলে চোঁচা দৌড়। মঞ্জু গাছ থেকে লাফিয়ে পড়তে গিয়ে পা মচকালো। তিন দিন আর ইসকুলে যেতে পারেনি। ইসহাক প্রধান সাহেব ছেলেকে ভর্ৎসনা করলেন। বললেন, 'আমি তো রোজই টের পেতাম যে শয়তানগুলো গাছে উঠেছে কখনও তো ধাওয়া দিইনি। তুই দিলি কেন? এ সব শুনে আমরা বেশ লজ্জিত হয়েছিলাম। আর কখনও ওভাবে পেয়ারা চুরি করিনি। তিনিই মাঝে মধ্যে ডেকে খাওয়াতেন।

প্রায় বছর দুই আগে আমি সরকারি কাজে যখন রংপুর গিয়েছিলাম তখন গিয়েছিলাম ইসহাক প্রধান সাহেবের বাড়ি দেখতে। বাড়িটি প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে। নেই শুধু দু'জনে। দেখা হল প্রধান সাহেবের বড় ছেলের সাথে। ওনার বয়স হয়েছে আমার কথা শুনে তিনি তার কর্মক্ষেত্র ছেড়ে বাসায় এসেছিলেন। বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন। সেই পেয়ারা গাছগুলো নেই, তবে কোণায় পুকুরটি আছে। হাসতে হাসতে বলেছিলাম ওইসব দিনের কথা। ভদ্রলোকও বেশ মনে রেখেছেন। বললেন, যখনই আপনাকে টিভিতে দেখি আমার অনেক স্মৃতি মনে পড়ে যায়।'

সেদিন আমারও ভাল লেগেছিল। কতকগুলো বছর পর শৈশবের টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলো খণ্ড খণ্ড মেঘের মত চোখের সামনে ভেসে গেল।

'নমস্কার স্যার'।

পিছে ফিরে দেখলাম ভারতীয় রেল পুলিশের পরিদর্শকের সাথে কাস্টমসের সুপারভাইজার আর আমাদের রেল পরিদর্শক। হাতে তার আমাদের পাসপোর্ট।

'আপনার কথা শুনে আসলাম স্যার। বললেন সুপারভাইজার সাহেব। কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো স্যার?'

'জ্বি না। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। এখানে আসার জন্যে।' হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলাম।

পুলিশ পরিদর্শক সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্যার বেড়াতে যাচ্ছেন?'

'জ্বি'

'আমরা কলকাতা হয়ে কালকেই মুর্শিদাবাদ যাব। স্যার বই লিখছেন তাই দেখতে

www.pathagar.com

যাওয়া। তবে সে বার অনেক জায়গা দেখা হয়নি। সিরাজের কবর দেখিনি। কামরুল এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো শেষ করল।

'ও তাই। স্যার লিখেন! আমার বাড়ি মুর্শিদাবাদ। ওখানে বহু কিছু দেখবার আছে। কয়দিন থাকবেন?'

সুপারভাইজার সাহেব বললেন।

'আচ্ছা শুনে ভালই লাগল। আমরা দু'দিন থাকব। গতবার বহু জায়গা দূর হতে দেখেছি সে কারণেই আরেকবার যাওয়া যাতে বইটি অসম্পূর্ণ না থাকে। আমার কথা শুনে বেশ বিগলিত হাসি দিয়ে পুলিশ পরিদর্শক সাহেব বললেন, 'স্যার আমাদের সুপারভাইজার ইসরায়েল সাহেবও মুসলমান। মুর্শিদাবাদের একেবারে খাস লোক।

'তাই নাকি' আমি বললাম।

'স্যার কি ট্রেনেই ফিরবেন?'

'জ্বি'

এতক্ষণে যাত্রীরা ফিরতে শুরু করল। ইসরায়েল সাহেব আর পুলিশ পরিদর্শক বিদায় নিলেন। কিছুক্ষণ পর ট্রেন কলকাতার পথে রওয়ানা হল। পথে কোথাও থামবে না তবে রানাঘাটে ক্রসিং হবে। আমরা সন্ধ্যার মধ্যে কলকাতা পৌঁছব। রাতে থাকার জন্য সেই গুলশান হোটেল ঠিক করা রয়েছে। কামরুল বলল সে রানাঘাট পৌঁছলে গতবারের ট্যাক্সি চালক রমেশকে জানাবে আমাদেরকে স্টেশন থেকে নিয়ে যেতে। ঢাকা ছাড়বার আগে রমেশের সাথে কামরুল যোগাযোগ করে আমাদের আগমন বার্তা জানিয়ে রেখেছিল। কামরুল বলল, 'মায়ের মুখে রানাঘাটের কথা বহুবার শুনেছি। আমার নানা এখানে চাকরি করতেন। মা বলতেন রানাঘাটে ছোট বেলায় সাইকেল চালাতেন। চিন্তা করুন সে সময়েও রানাঘাটের মেয়েরা সাইকেল চালাতো। আজ সেই রানাঘাট দেখব। কামরুল অনেকক্ষণ মায়ের কথা বলল। আমরা চুপচাপ কামরুলের মায়ের কথা তার মুখে শুনছিলাম। মায়ের কথা বলতে আমরা সবাই কেমন যেন ভাবাবেগে আপ্লুত হলাম। আমার নিজের মায়ের মুখে আলীপুর, চিৎপুর আর শিয়ালদাহের কথা কত শুনেছি। আমরা সেই চিৎপুর, বর্তমানের কলকাতা (চিৎপুর) স্টেশনে নামব।

ইতিমধ্যে ট্রেন কলকাতার উদ্দেশে রওয়ানা হলো। ছুটে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তর দিয়ে। দুই বাংলার দৃশ্যপটে তেমন বৈষম্য দেখলাম না। সবুজ ধানক্ষেত তার নারকেল সুপারিসহ অন্যান্য জাতের গাছগাছালি। বাড়িঘরগুলোর মধ্যে একটু তফাৎ চোখে পড়ল। এদিকের গ্রামের বাড়িগুলোর বেশির ভাগই চাড়ার চালের। কোথাও কোথাও ছনের ঘর। মানুষজনের কাপড় চোপড়ে সামান্য তফাৎ। লুঙ্গির সাথে যোগ

www.pathagar.com

হয়েছে ধুতি। বিবাহিত মহিলাদের মাথায় সিঁদুর আর গ্রাম্য কায়দায় শাড়ি পরা। মাঝে মধ্যে পাকা বাড়িঘর।

কামরুল আর আমানউল্লা কথায় ব্যস্ত।

'আসসালামুআলাইকুম স্যার'। তাকিয়ে দেখলাম ট্রেন পরিদর্শক সাথে দু'জন কারিগরি কর্মকর্তা যারা এই ট্রেনের সাথে যাচ্ছেন দরজার সামনে দাঁড়ানো। সাথে ভারতীয় ট্রেন পরিচালক। তিনিও অভিবাদন দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা। আমি ধন্যবাদ দিয়ে জানালাম যে, এ পর্যন্ত আমরা কোন অসুবিধায় পড়িনি।

'চা খাবেন স্যার। রানাঘাট থেকে আমাদের সাথে ক্যাটারাররা যোগ দিবে।'

আমরা তিনজনেই বললাম, 'চা পেলে ভাল হয়।' পাঠিয়ে দেব বলে ট্রেন পরিদর্শক বিদায় নিলেন। বাংলাদেশি তিনজন তখনও দাঁড়ানো। ট্রেন পরিদর্শক বললেন, 'স্যার কিছু মনে না করলে আমরা আপনাকে কিছু বলতে চাই।'

'বলুন।'

ট্রেন পরিদর্শক যা বললেন তার সারমর্ম এই যে, মৈত্রী ট্রেন চালু হবার পর হতে তাদের মত যারা এই ট্রেন নিয়ে কলকাতায় যান এবং রাতে স্টেশনেই থাকেন তাদেরকে ফরেন এলাউন্স আজ পর্যন্ত দেয়া হয়নি যদিও এটা তাদের প্রাপ্য। তাদের একরাত থাকতে হয়। খাওয়া দাওয়া করতে হয় নিজের খরচে। অথচ প্রথম যেদিন এ ট্রেন চালু হয় সেদিন বাংলাদেশি রেলের এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রিত অতিথি একদিনের ভ্রমণ ভাতা নিয়েছেন। তাদের দাবি রেল কর্তৃপক্ষ এই বলে নাকচ করছেন যে মৈত্রী ট্রেন লস-এ চলছে, তাই ভাতা দেয়া রেল কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব নয়। এই কর্মচারীরা বহু দেন-দরবার করেছে কিন্তু সুফল পায়নি। সে কারণেই কালে-ভদ্রে আমার মত কাউকে পেলে অনুরোধ করে তাদের দাবি দাওয়ার বিষয়টি সরকারের মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করতে।

আমি চুপচাপ তাদের অভিযোগ শুনলাম। আমার খাতায় নোট করে আশ্বস্ত করে বললাম, 'আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব আমি আপনাদের এ অনুরোধ সরকারের উচ্চ পর্যায়ে জানাবার চেষ্টা করব।' আমার কথায় তারা কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে বিদায় নিলেন।

কামরুল বলল, 'যেহেতু আপনার চেহারা অতি পরিচিত এবং আপনার প্রতি বহুলোকের শ্রদ্ধা রয়েছে, তাই তাদের দুঃখের কথা আপনাকে জানালো।' আমি চুপ রইলাম। সামান্য ক'টা টাকা, একদিনে নব্বই ডলার, জানি না কেন রেল কর্তৃপক্ষ দিতে পারে না। ট্রেন সার্ভিস তো খুব একটা লাভজনক প্রতিষ্ঠান তেমন মনে হয় না। অথচ সরকারের কোষাগার থেকে অর্থ তো খরচ হচ্ছে। সব সরকারই সাধারণ

www.pathagar.com

জনগণের জন্যে সার্ভিসে প্রয়োজনে ভর্তুকি দিয়েও সেবা দিয়ে যাচ্ছে। কেন এ সামান্য কিছু অর্থ দিতে এত অপারগতা। আমার কাছে লাল ফিতের দৌরাত্ম্য মনে হল। আমাদের বিমানও তো লাভবান প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারেনি তাই বলে তাদের পাইলট অথবা ক্রু-এর ভাতা বন্ধ করেছে। ট্রেনের সাথে এত বৈষম্য কেন। আমার ভাবতে খারাপ লাগে যে, এত পুরাতন এ সেবা সেখানে যারা চাকরি করেন তাদের মধ্যে কেন একাত্মতা নেই। রেজিমেন্টাল স্পিরিটি না থাকলে একটি সংগঠনের গর্ব করবার কিছুই থাকে না। গড়ে উঠে না মমত্ব আর ভ্রাতৃত্ববোধ। একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য তখনই সুদৃঢ় হয় যখন ওই প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্য মনে করতে পারে যে তাদের ওই প্রতিষ্ঠানের চাইতে ভাল দেখভাল অন্য প্রতিষ্ঠানে হয় না। ঔপনিবেশিক আমলে এসব দিকে বেশি খেয়াল দেয়া হতো বলেই এ সব সংস্থা সুসংহতভাবে চালাতে পেরেছে। বিদেশি শক্তি হয়েও পেয়েছিল আনুগত্য।

আমরা রানাঘাট এসে পৌঁছলাম। মৈত্রী ট্রেনের জন্যে আলাদা প্লাটফরম। ওপারের প্লাটফরমে প্রচুর যাত্রী ট্রেনের অপেক্ষায়। রানাঘাট অত্যন্ত ব্যস্ত জংশন। ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় রেলের অন্যতম ব্যস্ততম মধ্যম আকারে জংশন। স্টেশন সংলগ্ন বাজার আর শহর। স্টেশনের বাইরের দালানগুলো পুরাতন তার নতুনের সংমিশ্রণ। প্লাটফরমে প্রচুর হকার। হয়ত এ পর্যায়ের স্টেশনে বেশি নিয়ন্ত্রণ নেই। ঝালমুড়ি হতে ডিম সিদ্ধ সবই পাওয়া যায় এসব হকারদের কাছে।

কিছুক্ষণ পর ক্যাফেটেরিয়া থেকে এক লিকলিকে ছোকরা বয়সের একজন এসে চা আর হালকা খাবার পরিবেশন করে গেল। এই ট্রেনে খাবার কিনে খেতে হয়। দুপুরের নির্ধারিত (মেন্যু) থেকে খাবার পরিবেশন করেছিল বাংলাদেশিরা। বহু পীড়াপীড়ি করেও খাবারের পয়সা দিতে পারিনি। উত্তরে ম্যানেজার বলেছিলেন 'স্যার এ কয়টা টাকা আপনাদের কাছ থেকে নিতে পারব না। আপনারা আমাদের সম্মানিত মেহমান। অতিসাধারণ খাবার। টাকা দিলে লজ্জা পাব।' ভদ্রলোক কিছুতেই বিল দিলেনও না নিলেনও না। তার আন্তরিকতাকে আঘাত দিতে চাইলাম না। তবে চায়ের বিল তো দিতেই হবে কারণ, এরা ভারতীয়। এরা আতিথেয়তা দেখাবে কেন। আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। চায়ের বিল দিতে গিয়ে ওয়েটার ছোকরা জিভ কেটে বলল, 'স্যার ম্যানেজার বাবু বলেছেন, আপনারা সম্মানিত মেহমান। আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি বিল দিতেও পারব না নিতেও পারব না।' আমরা তার কথা শুনে কিছুটা আশ্চর্য হলাম। ভারতের রেল ক্যাটারারদের থেকে এটা ছিল অপ্রত্যাশিত সম্মান। বেশ অভিভূত হলাম।

রানাঘাট থেকে যখন ট্রেন ছাড়ল তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। আর ঘণ্টা দেড়েকের পথ কলকাতা পর্যন্ত। কামরুল জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, 'এই সেই রানাঘাট

www.pathagar.com

যে জায়গার কথা মায়ের মুখে কত শুনেছি। ট্রেনে আসাতে জায়গাটি দেখলাম। পরে বলল, 'মুকুলকে ফোন করেছিলাম। মুকুল বোধহয় আগামীকাল আমাদের সাথে মুর্শিদাবাদ যেতে পারবে না। তাকে তার স্ত্রীর সাথে ছেলের কাছে পুনা যেতে হবে। তবুও বলেছে পরে জানাবে।' এরপর কয়েকবার চেষ্টা করেও আমরা যতদিন ভারতে ছিলাম মুকুলের সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি। হঠাৎ মুকুল এভাবে নিশ্চুপ থেকে যাবে আমরা তেমনটি আশা করিনি। হয়ত আমাদের সাথে যোগাযোগ করবার প্রয়োজনীয়তাবোধ করেনি অথবা অতটুকু সময় বের করতে পারেনি।

'কামরুল রমেশের সাথে যোগাযোগ হয়েছে?'

'এখনই যোগাযোগ করছি। ওকে কয়টায় আসতে বলব' বলে কামরুল রমেশকে মোবাইলে যোগাযোগ করতে উদ্যত হলে আমি বললাম, 'কলকাতা (চিৎপুর) স্টেশনে সাড়ে সাতটার দিকে আসতে বল।' রমেশ ট্যাক্সিচালক এর আগের বারের ভ্রমণেও আমাদের সাথে ছিল কাজেই রমেশ মোটামুটি আমাদের টিমের একজন হয়ে পড়েছে।

কামরুল ফোন শেষ করে বলল, 'রমেশ সময়মত পৌছে যাবে। আমরা নিশ্চিন্ত হলাম যে স্টেশনে নেমেই আমাদেরকে ট্যাক্সি করতে বেগ পেতে হবে না।

সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটার দিকে ট্রেন কলকাতা স্টেশনে থামল। কাল সকালে মুর্শিদাবাদ যেতে আমাদেরকে নির্ধারিত ট্রেন হাজারদুয়ারী'তে চড়তে এখানেই আসতে হবে।

স্টেশন হতে বের হয়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছে যেতেই আমরা রমেশকে পেয়ে গেলাম। আমাদের দেখে রমেশ বিগলিত হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, 'সাহেব ভাল আছেন?' বললাম, 'হ্যাঁ, রমেশ আপ ক্যায়সা হ্যায়?'

'বড়িয়া সাহেব' রমেশের উত্তর।

মিনিট বিশ চলবার পর রমেশ আমাদেরকে পূর্ব পরিচিত গুলশান হোটেলে নিয়ে আসলে আগামীকাল সকাল সাড়ে পাঁচটায় আমাদেরকে আবার কলকাতা স্টেশনে নিয়ে যাবে বলে বিদায় নিলেন।

www.pathagar.com

আঠার

ফিরে দেখা মুর্শিদাবাদ

আজ শনিবার। ভোর সাড়ে চারটায় রিসিপশনিস্টের ডাকে ঘুম থেকে উঠে তৈরি হয়ে স্যুটকেস ইত্যাদি নিয়ে নিচে নেমে আসলাম। রমেশ ততক্ষণে এসে অপেক্ষা করছে। বাইরে ভোরের আলো ফুটে উঠছে। রাস্তায় তেমন ব্যস্ততা নেই। যা দেখা যায় সেগুলো ট্যাক্সি আর হোটেলের সামনে দিয়ে ঘর ঘর আর টং টং আওয়াজ করে খালি ট্রামগুলো চলে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর অপর দুই সফরসঙ্গী লবিতে আসলে আমরা হোটেল থেকে দু'রাতের জন্য বিদায় নিলাম। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মুর্শিদাবাদে আমাদের দু'রাত কাটাবার কথা। সেভাবেই আমাদের ট্রেন টিকিট করা। যেমনটা বলেছি যে, আগের বার তাড়াহুড়া আর সময়ের অভাবে মুর্শিদাবাদের অনেক কিছুই দেখা হয়নি। অতৃপ্ত থেকেছিলাম বলেই আবার যাবার পরিকল্পনা। তবে আমার আর কামরুলের জন্য দ্বিতীয়বার হলেও আমানউল্লা কখনই কলকাতার বাইরে যায়নি। স্বভাবতই তার কাছে মুর্শিদাবাদ একেবারেই অপরিচিত। মুকুল আসেনি আর তার টিকেটটিও বাতিল করা হয়নি।

রমেশ যখন আমাদেরকে স্টেশনে নিয়ে আসলেন তখনও ট্রেন ছাড়তে পঁয়তাল্লিশ মিনিট হাতে ছিল। কলকাতা স্টেশন তেমন বড়োসড়ো নয়। মাত্র চারটি প্লাটফরম। হাজারদুয়ারী এক্সপ্রেস ছাড়বে দুই নম্বর প্লাটফরম থেকে। আমরা সেখানে গিয়ে উন্মুক্ত বেঞ্চে বসলাম। এত ভোরে যাত্রীদের এখনও তেমন আগমন হয়নি। আনাগোনা শুরু হয়েছে মাত্র। মাইকে ঘোষণা শুনলাম যে, এক নম্বর প্লাটফরম হতে গতকালে ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী ট্রেন আজ সকাল সাতটায় ঢাকার উদ্দেশে কলকাতা ত্যাগ করবে। ইতিমধ্যে অপর পারের প্লাটফরমে ঢাকাগামী বহু যাত্রীকে বোচকা পেটরা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে দেখলাম। সকলের নিকটই, বিশেষ করে মহিলাদের সাথে অতিরিক্ত ব্যাগ ইত্যাদি। দেখেই মনে হল কলকাতার বাজারগুলোর শাড়ি ইত্যাদি ব্যাগ পূর্তি হয়েছে। মহিলারা কলকাতায় আসবেন এখানকার শাড়ি কিনবেন না এমনকি হয়! কলকাতার নিউমার্কেটসহ অন্যান্য স্থানের দোকানগুলোতে হরহামেশাই বহু বঙ্গললনাদের দর্শন মিলবে।

আমরা এই কাকডাকা ভোরে হোটেল ছাড়াতে প্রাতঃরাশ করতে পারিনি।

www.pathagar.com

প্রাতঃরাশ না হোক এককাপ চায়ের বড় প্রয়োজন অনুভব করলাম। কিন্তু কোন প্লাটফরমেই কোন চায়ের স্টল চোখে পড়ল না। হয়তো বা আরও পরে পাওয়া গেলেও পাওয়া যেতে পারে। ভাবলাম ট্রেনে উঠে হয়ত পাওয়া যেতে পারে। ট্রেনে নাস্তা করা যাবে ভেবে আমরা তিনজনেই বসে বিষয়বিহীন, উদ্দেশ্যবিহীন আলোচনায় রত হলাম।

কলকাতা স্টেশন। গতবার এখান থেকেই পাটনার উদ্দেশে 'গরিব রথ' নামক থ্রি টায়ার ট্রেনে উঠেছিলাম। ফিরতি পথেও এখানে নেমেছিলাম। স্টেশনটি চিৎপুর এলাকায়। যে বিশটি গ্রামে মোগল সম্রাট ফররুখশিয়ার ১৭১৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ব্যবসার সম্প্রসারণে আর খাজনা সংগ্রহের অনুমতি দিয়েছিল, চিৎপুর তারই একটি। আরও পরে যখন কলকাতা শহর গড়ে উঠে তখন বর্তমান উত্তর কলকাতার এ জনপদ শহরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সে অর্থে চিৎপুর কলকাতার অন্যতম পুরাতন স্থান। এখানে একসময় বসবাস করতেন বেঙ্গলি রেনেসাঁর পরবর্তী প্রজন্মের সদস্য, কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এ জায়গা বা গ্রামের নাম চিৎপুর কেন হল তা নিয়ে যথেষ্ট কিংবদন্তি রয়েছে।

অনেকে মনে করেন চিৎপুর নামটি এসেছে দেবী চিতেশ্বরী হতে। এখানে প্রায় তিন শত বছর পূর্বে গোবিন্দ মিত্র, যিনি এক সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্থানীয় কর্মকর্তা ছিলেন, ওই দেবীর মন্দির স্থাপন করেন। বলা হয়ে থাকে দেবীর তুষ্টির জন্য ওই সময়ে এখানে নরবলি হতো। মন্দিরটি ১৭৩৭ সালের ভূমিকম্পে ভেঙে যায়। অনেকে আবার মনে করেন এ জায়গার নামকরণ করা হয়েছিল এতদঞ্চলের কুখ্যাত চিতেই ডাকাতের নামে। এই চিতেই ডাকাত এ মন্দিরে প্রতিনিয়তই নরবলি দিয়ে পূজা করতেন।

জানিনা এর কতটুকু ইতিহাস আর কতটুকু জনশ্রুতি। তবে অনেক সময় জনশ্রুতিও ওরাল হিস্টরি হিসাবে স্বীকৃত হয়। চিৎপুর ১৮৮৮ সালে, তৎকালীন ক্যালকাটা, আজকের কলকাতা, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এখনও ট্রেনের ঘোষণা হয়নি তবে হাজারদুয়ারীর যাত্রী সমাগম ভালই হয়েছে। আমানউল্লা বেঞ্চের সাথে লাগানো পিলারে ঠেস দিয়ে চক্ষু মোদা অবস্থায় আর কামরুল লম্বা প্লাটফরমে পায়চারি করছে। আর কিছুক্ষণ পরেই দুই নম্বর প্ল্যাটফরমে হাজারদুয়ারী এক্সপ্রেস আসল। মাইকে ঘোষণা হল ছাড়বার সময়। হাজারদুয়ারী এক্সপ্রেস কলকাতা হতে লালগোলা পর্যন্ত যাতায়াত করে। পথে পলাশী, বহরমপুর হয়ে মুর্শিদাবাদে থামে। ট্রেনের চেয়ার কোচে উঠে নির্ধারিত সিটে বসলাম। মুকুল আসেনি তাই তার সিটটা খালিই রইল। তবে বেশিক্ষণ খালি থাকেনি কারণ, অনিশ্চিত এক টিকেটধারীকে টিকেট কালেক্টর বসিয়ে দিয়েছিলেন।

ট্রেন সঠিক সময়েই কলকাতা, চিৎপুর ছাড়ল। এই দিন সপ্তাহের ছুটি শুরুর দিন

www.pathagar.com

সে কারণেই যাত্রীর সংখ্যা বেশ। ট্রেন চিৎপুর, কোলকাতা ছেড়ে উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝ দিয়ে ছুটে চলছে। বহু ছোট ছোট স্টেশন পথে। প্রথম স্টপেজ দমদম-এর পরেই রানাঘাট। প্রায় ঘণ্টা খানেক পর উপলব্ধি করলাম বেশ ক্ষিদে পাচ্ছে। কিভাবে কোথায় প্রাতঃরাশ পাব আর খাব। এদিকে সাথে পানিও নেই। কামরুল আর অপেক্ষা করতে পারছিল না। পাশের যাত্রী থেকে জেনে নিল যে রানাঘাট থেকেই ট্রেনে খাবার পাওয়া যাবে। যাক ভালই হল। ভাবলাম নিশ্চয়ই রানাঘাট বড় জংশন সেখান থেকেই খাবারের প্যাকেট নিয়ে উঠতে পারে ক্যাটাররাস্, সেই আশাতেই রইলাম।

প্রায় দেড় ঘন্টা পর আবার আমরা রানাঘাটে। এখানকার বেশিরভাগ বাসিন্দা ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর তৎকালীন কুষ্টিয়া-পাবনা অঞ্চল থেকে এখানে বসবাস শুরু করেছে। বেশির ভাগ এ রিফিউজিরা ছিল জোলা যে কারণে এখানেও গড়ে উঠেছিল তাঁত শিল্প। বর্তমানে রানাঘাট তাঁত বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত।

আমরা তাপানুকূল চেয়ার কোচে বসা। এটাই এই ট্রেনের সর্বোচ্চ শ্রেণী। আমি ইতিপূর্বে দিল্লী থেকে লক্ষ্মৌ গিয়েছি, দ্বিতীয় শ্রেণীর তাপানুকূল চেয়ার কোচে। বিস্তর তফাৎ দেখলাম পূর্ব আর উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় রেল ব্যবস্থায়। ওই ট্রেনে নাস্তা চা-পানি ইত্যাদি টিকেটের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখানে নেই। এখানে যা আছে বা দেখলাম তা আমাদের দেশের ট্রেনে একসময় দেখা যেত। এখন এক্সপ্রেস ট্রেনগুলোতে দেখা যায় না। রানাঘাট থেকে ছাড়তেই প্রথমে বগিতে ঢুকল ঝালমুড়ি বিক্রেতা। সুন্দর করে সাজানো তার ডালিটি। স্টেইনলেস স্টিলের কৌটা যার মধ্যে মুড়ি মিশানো হয়। মুড়ির সাথে পিঁয়াজ, চানাচুর, সিদ্ধ বুট আর সর্বোপরি শতভাগ খাঁটি সরিষার তেল। তারপরে চামচ দিয়ে টুং করে শব্দ আর এসব উপাদান মিশানোর আওয়াজ সব একই ছন্দে। বিক্রেতা উচ্চস্বরে বললেন, 'একশত ভাগ খাঁটি সরিষার তেল মাখানো ঝালমুড়ি পাবেন শুধু নদিয়ায়।' একশত ভাগ খাঁটি'? একশ' ভাগ খাঁটি (!) প্রায় এরকম শুনি। মাঝে মধ্যে আমাদের দেশে এ ধরনের বিজ্ঞাপনও দেখি। তাহলে খাঁটিরও শতকরা হার আছে কি? বিশেষ করে খাবারের দ্রব্যে। এর উত্তর কারও জানা আছে বলে মনে হয় না।

'ঝালমুড়ি খাবেন?' কামরুল উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে পাঁচ রুপির (এখানেও টাকাই বলে) দুটো ঠোঙ্গার অর্ডার দিল। ভাবলাম ক্ষিদে যখন লেগেছে ঝালমুড়ি দিয়েই নিবারণ করি। ঝালমুড়ির জন্য কুচি কুচি করে কাটা পিঁয়াজের ঝাঁঝালো গন্ধ পুরো বগিতে ছড়িয়ে গেছে। ঝালমুড়ি খেতে ভালই লাগল। ঝালমুড়ির উল্টো দিক হতে আরেকজন ঢুকলেন 'ডিম সিদ্ধ ডিম সিদ্ধ' হাঁক দিতে দিতে। ঝালমুড়ি শেষ করে এবার কামরুল ডিম সিদ্ধ খাবার উদ্যোগ নিল। আমরা মানা করলাম। সে দুটো ডিম সিদ্ধ গলাধঃকরণ করে পানি বিক্রেতার কাছ থেকে তিন বোতল নিল। এরই মধ্যে বগির

www.pathagar.com

মাঝের সরু চলার পথ হরেক রকমের হকারদের দখলে চলে গেল। চাওয়ালার চা বিক্রি এমনকি বই ম্যাগাজিন, নক্সা করা ব্যাগ গেঞ্জি রুমাল কিছুই বাকি রইল না। ফেরিওয়ালাদের হরেক রকম হাঁকডাক এক বিচিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করল।

একটু হালকা হবার পরে আসল মাখন আর রুটি ওয়ালা। তার কাছ থেকেই মাখন রুটি নিয়ে ক্ষিদে নিবারণ করলাম। সামনে আরেকটি স্টেশন আসতেই হালকা হল ফেরিওয়ালাদের জমায়েত। আমরা কৃষ্ণনগরের কাছাকাছি কোন এক ছোট স্টেশনে। সামনেই কৃষ্ণনগর জংশন। স্টেশন ছাড়তেই বগিতে ঢুকলেন তিলের খাজা বিক্রেতা। খদ্দের জোটাতে সুরে সুরে তার তিলের খাজার বিশেষ গুণাগুণ আর স্বাদের ফিরিস্তি যেভাবে বয়ান করছিলেন তা অভিনব। বলছিলেন 'আমার তিলের খাজা বিশ্বসেরা' এমনভাবে বলছিলেন যে মনে হতে পারে সে সারা বিশ্বের লোকের এই তিলের খাজার সাথে পরিচয় আছে। 'এই তিলের খাজা বাছাই করা মৌচাকের মধু দিয়ে তৈরি। সুন্দর খাজা সুন্দর মুখে দিলে সুন্দর লাগবে। তুলার মত মোলায়েম। মুখে যখন গলবে মনে করবেন কত মৌমাছি আপনার মুখে মধু তুলে দিচ্ছে। আহা আহা শশীনাথের তিলের খাজা। খেতে কি মধুর কি মজা। নিজে খান বাড়ির জন্যে নিয়ে যান কৃষ্ণনগরের তিলের খাজা।' সুন্দর সুরে বিক্রেতা বিরামহীনভাবে বলে চলেছেন।

'আমি অনেক ফেরিওয়ালা দেখেছি কিন্তু এ রকম সুরে এভাবে তিলের খাজা বিক্রি করতে দেখিনি।' আমানউল্লার মুখে মুচকি হাসি। মনে হল বেশ মজা পেয়েছে।

'কিনব, খাবেন শশীনাথের তিলের খাজা' কামরুল জিজ্ঞাসা করল। 'না ভাই মিষ্টি জিনিস না খাওয়াই ভাল।' আমানউল্লার জবাব। আমিও কামরুলকে নিবৃত্ত করলাম।

ট্রেন কৃষ্ণনগর জংশনে দাঁড়ালে শশীনাথ বাবু চলে গেলেন। জায়গা করে দিলেন কৃষ্ণনগরের মিষ্টিওয়ালাদের জন্যে। এমনিভাবে ফেরিওয়ালাদের মিছিল চলছিল। কৃষ্ণনগরের পর পলাশী। কিছুক্ষণ পর একজন উঠলেন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে মাঝপথে দাঁড়িয়ে শুরু করলেন লালনগীতি। বাদ্য যন্ত্র নিয়ে বেশ কয়েকটি লালনগীতি শেষ করে বললেন, 'যাত্রী ভায়েরা একবার ভেবে দেখুন এই কণ্ঠস্বর একটি পরিবারকে বাঁচিয়ে রেখেছে। যে যা খুশি হয়ে দেবেন তাতেই আমি খুশি। এ কণ্ঠস্বর যেদিন থাকবে না হয়ত এ পরিবারও থাকবে না।' যাত্রীরা যে যা পারল অল্প বিস্তর পয়সা দিল। বগি থেকে অন্য বগি সংযোগকারী পথ দিয়ে বের হতে হতে গাইতে লাগলেন, 'মিলন হবে কতদিনে আমার মনের মানুষেরও সনে।'

পলাশী পার হয়ে ট্রেন বহরমপুরের কাছাকাছি চলে আসল ভাবলাম যাক বগিটি কোলাহল মুক্ত হল, কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজির হল জাদুকর। শুরু হল তাসের আর অন্যান্য সহজ খেলা, চলল অনেকক্ষণ। তার যাদু যে বিশেষ কোন ফল ফলাতে পারল তেমন মনে হল না। কারণ, সিংহভাগ যাত্রী তখন বোচকা পেটরা

www.pathagar.com

গোছাতে ব্যস্ত। সামনেই মুর্শিদাবাদের জেলা শহর বহরমপুর। বিষয়টি বোধকরি ভ্রাম্যমাণ জাদুকর আগাম বুঝতে পেরে বগি ছাড়লেন। ট্রেন বহরমপুর থামলে আমরা জনাপাচেক যাত্রী রয়ে গেলাম মাত্র। বহরমপুরের পর কাশিমবাজার। তবে কাশিমবাজারে এক্সপ্রেস ট্রেন থামে না। হঠাৎ দেখলাম কামরুলের পায়ে জুতা নেই। কোন ফাঁকে জুতা কালিওয়ালা এসে জুতা কালি করতে প্যাসেজের ফাঁকে নিয়ে গেলেন দেখিনি। ভাবলাম বাকি ছিল এই পেশার প্রদর্শনী। তাও পাওয়া গেল। ট্রেন কাশিমবাজার পার হয়ে গেল আর আধাঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব মুর্শিদাবাদ বা লালবাগ।

'ট্রেনে ভালই কাটল। ফেরিওয়ালারা বোর হতে দেয়নি' আমানউল্লা বলে উঠল। কাশিমবাজার পার হবার সময় কামরুল বলল, 'ষড়যন্ত্রের শহর কাশিমবাজার পার হলাম। এরপরেই নবাবদের রাজধানীতে পৌঁছব।' আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে গত ডিসেম্বরে আমাদের কাশিমবাজারের সফরের কথা মনে করছিলাম।

ট্রেন প্রায় দুপুর বারোটার কাছাকাছি সময়ে মুর্শিদাবাদের ছোট স্টেশনে দাঁড়ালে আমরাসহ অবশিষ্ট যাত্রী নেমে গেলাম। সমস্ত ট্রেনে অল্প কয়েকজন যাত্রী রয়ে গেল। সামনেই এই ট্রেনের শেষ গন্তব্যস্থল পদ্মার পশ্চিম পাড়ের ছোট শহর লালগোলা। তারই পূর্বপাড়ে বাংলাদেশের শহর রাজশাহী। লালগোলাতেই রয়েছে ট্রেনের ইঞ্জিন ঘুরাবার ব্যবস্থা।

বাইরে চামড়া পোড়ানো রৌদ্র আর ভ্যাপসা আবহাওয়া। নামতেই তরুণ বয়েসী একজন এসে আমার হাতে স্যুটকেস নিয়ে বললেন, স্যার আসুন বাইরে আমার ঘোড়ার গাড়ি। এখানে ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া পাবেন রিক্সা।'

'আমরা তিনজন একটা ভাল হোটেলে যেতে চাই।' কামরুল ঘোড়া গাড়িওয়ালাকে বলল।

'ঠিক আছে স্যার বাইরে আসুন আমি আপনাদেরকে এ শহরের সবচাইতে ভাল হোটেলে নিয়ে যাব। আপনাদের ওই হোটেল পছন্দ না হলে আরও দু'একটি হোটেলে নিয়ে যাব। আর আপনারা যদি আমার গাড়ি নিতে চান তবে আমি মুর্শিদাবাদের সব দর্শনীয় স্থানে নিয়ে যাব। আমিই আপনাদের গাইডের কাজ করব। ঘুরবার জন্যে আলাদা গাইড লাগবে না। আমার নাম স্যার সোহেল শেখ।'

'সে ক্ষেত্রে আপনাকে কত দিতে হবে?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'আগে হোটেল পছন্দ করুন তারপর আলাপ করব স্যার' সোহেল শেখ বললেন।

মনে মনে বললাম ঘড়েল মক্কেল। তিনি এ রকম যাত্রী সহজেই হাতছাড়া করতে চাইছেন না।

www.pathagar.com

'এখানে এটিএম (ATM) আছে?' কামরুল প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ স্যার, যে হোটেলে নিয়ে যাচ্ছি তার পাশেই বুথ আছে। আপনারা খাবার ওই হোটেলের রেস্তোরাঁতেই পাবেন। বাইরে তেমন ভাল একটা রেস্তোরাঁ নেই।'

আমরা কথা বলতে বলতে স্টেশনের বাইরে দাঁড়ালাম। সোহেল শেখ ওখানে দাঁড়ানো এক ছোকরাকে হুকুম দিলেন 'গাড়ি নিয়ে আস।'

স্টেশনের বাইরে বেশ কিছু দোকান। বেহাল অবস্থা। রয়েছে ভাতের দোকান 'মহাহিন্দু হোটেল।' সামনে ঘেরা দেয়া গোল চত্বর। মাঝে কয়েকটি গাছ। গোলচত্বর ঘুরে সোহেলের এসিস্ট্যান্ট গাড়ি আনল। ঘোড়ার চেহারা দেখে কেমন যেন মনে হল এ ঘোড়া আমাদের তিনজনকে টানতে পারবে কিনা। গাড়ির উপরে প্লাস্টিক সিটের আচ্ছাদন। বসবার ব্যবস্থা সামনে পিছনে পিঠ লাগালাগি। বসবার জন্য খড়ের পাতলা গদির মত বিছানো। ততোধিক বিবর্ণ কাপড়ে মোড়া।

'এ ঘোড়া কোথাকার। ঘোড়া না খচ্চর। এতসব মাল নিয়ে যাওয়া যাবে। টানতে পারবে তো?' আমার সন্দিহান গলার আওয়াজ।

'আপনি কোন কিছু ভাববেন না সাহেব এটি বাংলা ঘোড়া বা স্থানীয় ঘোড়া। একেবারে পক্ষিরাজ।' স্যুটকেসগুলো সামনের পায়ের কাছে রাখতে রাখতে সোহেল শেখ উত্তর দিলেন। আরেকটু যোগ করে বললেন, 'দেখবেন এ ঘোড়া আপনাকে এই ঐতিহাসিক শহর কিভাবে দেখায়।'

সোহেল শেখের একঘোড়ার গাড়ি, যাকে এক্কা গাড়ি বলে জানতাম। দেখে কেমন যেন এডভেঞ্চার এডভেঞ্চার মনে হল। এটাতে উঠাও বেশ কসরতের কাজ। পেছনে সামনে কাঠের তৈরি পাদান রয়েছে, তার চেহারা দেখে মনে হল আমাদের ভারে ভেঙে পড়তে পারে। সোহেলকে আমার আশঙ্কা জানালে বলল যে, তেমন কোন সম্ভাবনা নেই। তবুও কাঠের চেহারা দেখে ভয় পাচ্ছিলাম। গতবারও এ শহরে ঘোড়ার গাড়ি দেখেছি তবে চড়িনি।

সোহেল শেখ আমাদের বাক্স পেটারা সুরক্ষিত করবার পর আমি পেছনে আর দু'জন সামনে উঠে বসলাম। এমন নয় যে জীবনে এ ধরনের গাড়িতে ভ্রমণ করিনি। পাকিস্তানে চাকরি করবার সুবাদে এক ঘোড়ার গাড়ি যাকে টাঙ্গা বলে বহুবার চড়েছি। শিয়ালকোট শহরে তো এই ছিল বাহন। তবে সেগুলো ছিল যথেষ্ট উন্নতমানের। সুসজ্জিত এবং সিটগুলো চামড়ায় মোড়ানো। ঘোড়াগুলো দেখলেই মনে হতো উন্নতজাতের মসৃণ আর চিকচিকে শরীর। প্রতিটি টাঙ্গার পেছনে বালতি বাঁধা থাকত ঘোড়াকে পানি এবং খাবার দেবার জন্যে। চালকের হাতে একটি চাবুক তবে চাবুক ঘোড়ার পিঠে তেমন পড়তো না। করাচী শহরে দেখেছি গাধা আর উটের গাড়ি। অবশ্য

www.pathagar.com

এগুলো বেশিরভাগ সময় মালামাল বহন করতো। টাঙ্গায় চড়তে ভালই লাগত। সামনে পিছনে দেখতে দেখতে যাওয়া যেত। এ ধরনের বাহন উত্তর ভারতে প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। যে সব পাঠক আগ্রায় তাজমহল দেখতে গিয়েছেন তারা নিশ্চয় এ ধরনের বাহনে চড়েছেন হয়তো।

এতক্ষণ আমি পাকিস্তান আর ভারতের এক্কা গাড়ির যে বর্ণনা দিলাম তার ধারে কাছেও নেই আমাদের বাহন। সোহেল শেখ বলেছে বাংলা ঘোড়া। বাংলায় কি ঘোড়াকেও দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্টের মত চেহারা থাকতে হবে?

যাই হোক, আমরা সোহেল শেখকে নিয়ে তার সুপারিশ করা হোটেলের দিকে রওয়ানা হলাম। হোটেলটি এই ছোট ঐতিহাসিক শহরের মাঝামাঝি অঞ্চলে।

মুর্শিদাবাদ শহরের রাস্তাঘাটগুলোর চেহারা দেখলে মনে হয় এগুলো কোনদিন সংস্কারই হয়নি, খানাখন্দকে ভর্তি। তার উপরে জায়গায় জায়গায় স্পিড ব্রেকার লাগানো। আশেপাশের বেশির ভাগ বাড়িঘর পুরাতন। দেয়ালগুলোর রং বলতে কিছুই নেই। তদুপরি বৃষ্টির কারণে সবুজ শ্যাওলা ধরেছে। চালক সোহেল শেখ মাঝে মাঝে শক্ত করে ধরে সাবধান হতে বলছে। কারণ, ঘোড়া গাড়ির স্প্রিং বলতে তেমন কিছুই নেই, কাজেই যখনই কোন স্পিড ব্রেকারের উপর দিয়ে পার হতে যায় তখনই সাবধান হতে হয়। অসাবধান হলে ছিটকে পড়ে যাওয়া ছাড়াও মেরুদণ্ডে আঘাত অবশ্যম্ভাবী। এরপর এ দায়িত্ব কামরুলই নিয়েছিল। এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সব সময়ের জন্যে সামনে বসা কামরুল শুধু বলত 'সাবধান'। আর আমরা যতদূর সম্ভব ওজন পায়ের উপরে নিয়ে আমাদের নিতম্ব উঁচু করতাম। সেও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

আমি একাই পেছনে মুখ করে বসা। ওরা দু'জন সামনের দিকে মুখ করা। পাশে সোহেল শেখ চালক, নানা ধরনের আওয়াজ করে ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখছেন। রাস্তায় মোটর চালিত যানের সংখ্যা খুব কম। হয় চলছে মোটর সাইকেল অথবা সাইকেল। এমনকি মহিলারাও স্বচ্ছন্দে, সাইকেল চালিয়ে চলাফেরা করে। রিক্সা থাকলেও প্রধান বাহনই ঘোড়ার গাড়ি।

আমি সোহেল শেখকে জিজ্ঞাসা করলাম যে এই গাড়িটি তার নিজস্ব সম্পত্তি কিনা। তিনি বললেন, 'না স্যার মালিকের। আমি চালাই মাত্র। আমি তার আদি অন্ত জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে তিনি ভাই-বোনদের মধ্যে চতুর্থ। বড় দুই ভাই আর বোন রয়েছে, তাদের বিয়ে হয়েছে তবে সোহেল এখনও অবিবাহিত। আদি মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। জিজ্ঞাসা করতেই বলল যে বিস্তারিত ব্যাপক ইতিহাস তার জানা নেই। তবে এখানে যতগুলো ইতিহাস প্রসিদ্ধ দর্শনীয় স্থান রয়েছে সেগুলো সব চেনে এবং কিছু কিছু ইতিহাস জানে। খুব একটা লেখাপড়া করেনি।

www.pathagar.com

'এখানে মুসলমান আর হিন্দুর সংখ্যা কেমন।'

'প্রায় আধা আধি' বললেন সোহেল শেখ।

'মুসলমানরা কি শিয়াই বেশি? কামরুলের প্রশ্ন। কারণ, গতবারের গাইড শাহেন শাহ্ আমাদেরকে হাজারদুয়ারী দেখাবার সময় বলেছিলেন যে-বাংলার নবাবরা বেশির ভাগই ছিলেন শিয়া। তারই প্রেক্ষিতে এমনতর প্রশ্ন।

'না স্যার। শিয়া-সুন্নী প্রায় সমান।'

এখানে তো পুরাতন নতুন মিলিয়ে প্রচুর মসজিদ দেখছি।' সোহেলকে জিজ্ঞাসা করলাম।

'জ্বি স্যার, তবে দেখবেন, বহু ঐতিহাসিক মসজিদ সংস্কারের অভাবে ধ্বংসের পথে। কারণ, সরকারের নীতি এ রকম যে-কোন মন্দির-মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ভেঙে পড়লে সরকার সংস্কারে কোন অর্থ খরচ করবে না। তবে যেগুলো আর্কিওয়লজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (ASI) সংরক্ষণ করছে সেগুলোকে ঐতিহাসিক নিদর্শন সংরক্ষিত রাখতে প্রয়োজনে মেরামত করে মাত্র।'

আমরা সোহেলের সাথে কথা বলতে বলতে কথিত হোটেলের সামনে চলে আসলাম। হোটেলের নাম 'সিগনিক'। মনে হল কয়েক বছর পূর্বের তৈরি। আহামরি তেমন কিছু নয়। ছোট শহরে এর চাইতে ভাল কিছু আশা করাও যায় না। অবশ্য বেড়াতে এসে বা পর্যটক হিসাবে হোটেলে থাকবার সময়টুকু কোথায়। আমার ন্যূনতম চাহিদা রাতে ঘুমাবার ভাল পরিবেশ। গরমের দেশ হলে এয়ারকুলার এটাচড বাথরুম আর খবর দেখতে টিভি থাকলেই যথেষ্ট। বেড়াতে এসে ফাইভস্টার অথবা ততোধিক স্টার হোটেলে থাকা মানে অর্থের অপচয়। ওই সব হোটেলে যে সুবিধাদি থাকে তার কতখানি পর্যটক হিসাবে একজন উপভোগ করে বা করতে পারে। জিম-এ যাওয়া স্টিম বাথ অথবা অন্য কিছু করবার সময় পর্যটকদের থাকে না।

আমরা বেশ কসরত করে ঘোড়া গাড়ি থেকে নামলাম। সোহেল বললেন, 'সামনে এদের রেস্তোরাঁ এখানেই ভাল। মুর্শিদাবাদে খুব একটা ভাল রেস্তোরাঁ নেই।' এখানে আসার পথে যা দেখলাম আমারও তাই মনে হল।

সময় তখন দুপুর প্রায় একটা। প্রখর রোদ। কেমন একটা ভ্যাপসা গরম। আবহাওয়া একেবারেই আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চলের মত। আমি কামরুলকে বললাম যে হোটেলের রিসিপশনে গিয়ে আগে বুঝে নেই, তার পরে মালামাল নামাবো। সে মতেই হোটেলে আলাপ করে পছন্দমত রুম পেলাম। রুমগুলো ছোট তবে এসি রুম, এটাচড বাথরুম। বেশ সস্তা। কামরুল এবার সোহেলের সাথে চুক্তি করে নিল। আমরা দু'দিন থাকব। সোহেলের গাড়ি আমাদের জন্য থাকবে যতক্ষণ বা যেখানে

www.pathagar.com

আমরা যেতে চাই সেখানেই যাবে আর ফিরতি পথে স্টেশনে উঠিয়ে দেবে। দরাদরি করে দু'দিনের জন্যে এক হাজার রুপিতে চূড়ান্ত হল। আমানউল্লাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঘোড়াগাড়ি চলবে।' আমানউল্লা বলল, 'হ্ শুধু চলবই না মগর দৌড়ভি মারব। মগর দো দিন বাদ কমর হালায় ঠিক থাকলে চলব। ছোট বেলা কত চড়লাম এহন পারমুনা কেলা।' আমি তার বিশুদ্ধ ঢাকাইয়া ভাষায় তেমন উত্তর দিতে না পেরে বললাম, ছাব্বাছ। এই না খাঁটি ঢাকাইয়া।'

'আমরা এখানেই খেয়ে বের হব। সোহেলকে কয়টায় আসতে বলব।' কামরুল জিজ্ঞাসা করল।

'আমরা ঘন্টা দুই বিরতি করি তারপরেই বের হই। আজ এদিকটায় ঘুরি কাল সকালেই ভাগিরথী পার হয়ে খোশবাগে যাব। তারপরের দিন সকালে আমানউল্লাকে হাজারদুয়ারী দেখাতে নিয়ে যাব। আমরাতো আগেও দেখেছি। এই মোটামুটি প্রোগ্রাম।' আমি দু'জনকেই জিজ্ঞাসা করলাম কোন দ্বিমত আছে কিনা।

'না কোন দ্বিমত নেই। আমার যেহেতু কোন ধারণাই নেই তাই আপনারা যে প্রোগ্রাম করবেন তাতেই আমি রাজি। মুর্শিদাবাদের এত নাম শুনেছি। এত কিছু দেখবার আছে তাই অনেকদিনের ইচ্ছা ছিল আসবার সে সুযোগটাই নিলাম।' আমানউল্লার কথা শেষ হলে সোহেলকে দু'ঘণ্টা পরে আসতে বলে আমরা রুমের দিকে চললাম।

হোটেলটি তিন তলা। তিন তলাতেই আমাদের রুমগুলো। ওদের দু'জনের জন্যে ডাবল আর আমার জন্যে সিঙ্গেল রুম। ছোট কামরা ততোধিক ছোট বাথরুম। মনে মনে বললাম 'চলেগা'।

www.pathagar.com

উনিশ
নিমকহারাম দেউড়ি

হোটেলের রেস্তোরাঁতেই দুপুরের খাবার খেলাম। রেস্তোরাঁটিও এমন আহামরি কিছু নয়। খাদ্যের তালিকাও গতানুগতিক। খাবার শেষ করে বের হতেই সোহেল শেখ এসে উপস্থিত। তার ঘোড়ার গাড়ি আমাদের নিয়ে ভ্রমণে প্রস্তুত। তখনও রৌদ্রের তেজ কমেনি তার সাথে বাতাসে আর্দ্রতা। রেস্তোরাঁতে বসে ঘামাচ্ছিলাম বাইরে তো কথাই নেই। আমরা গিয়ে গাড়িতে বসলাম। ভাবলাম ভালই হল গাড়ির ঝাঁকুনিতে খাবার তাড়াতাড়ি হজম হবে। 'স্যার আপনাদেরকে প্রথমে জাফরগঞ্জের দিকে নিয়ে যাই। সেখান থেকে কাঠগোলা প্রাসাদ আর ফিরতি পথে কাটরা মসজিদ হয়ে হোটেলে ফিরব।' প্রত্যেক জায়গাতেই স্থানীয় গাইড আছে অল্প পয়সায় আপনাদেরকে ওই সব জায়গার বিস্তারিত বিবরণ দেবে।' সোহেল তার পরিকল্পনা জানালেন।

'আমরা কাল সকালে খোশবাগ যাব আর বিকেলে মুর্শিদাবাদের (লালবাগ) বাকি জায়গাগুলো দেখব। আমি সোহেলকে বলেছিলাম।

সোহেল বলেছিলেন, 'স্যার ভাগিরথীর অপর তীরে যেতে আপনাদেরকে সদরঘাট থেকে ট্রলারে পার হতে হবে। অপর পারে রিক্সা অথবা ভ্যান গাড়ি পাবেন। ওরা আপনাদেরকে যেখানে যেতে চাইবেন নিয়ে যাবে। ওপারে ঘোড়া গাড়ি নেই।'

'ঠিক আছে কালকেরটা কাল দেখব। এখন চলুন।' কথা শেষ করে কামরুল আর আমানউল্লা সামনে আর আমি পিছনে মুখ করে বসলাম। রওয়ানা হল মুর্শিদাবাদের সোহেল শেখ আর তার পঙ্খিরাজ ঘোড়া গাড়ি। রাস্তার যে হাল এতদূর এই গাড়িতে চড়বার পর কোমরের কি হতে পারে তা একটু চিন্তিত করেছিল বটে, তবে কাবু করতে পারেনি।

সোহেল শেখ হাজারদুয়ারী পেছনে ফেলে পাশের রাস্তা দিয়ে উত্তর দিকে চলছিল। রাস্তায় বিস্তর ঘোড়াগাড়ি, রিক্সা, রাস্তার খানখন্দক উপেক্ষা করে গাড়ি চলছে। দু'পাশের ইটের বাড়িগুলো বহু পুরাতন। এ জায়গাটি বেশ জনবহুল মনে হল। প্রচুর দর্শনার্থী হাজারদুয়ারীর টিকিট কাউন্টারে।

'পাশে হাজারদুয়ারী সামনে ইমামবাড়া আর মাঝে সিরাজের মদিনা, আপনারা কাল না হয় পরশু এখানে আসবেন।' সোহেল ঘোড়ার চাবুক দিয়ে একটু হালকভাবে

www.pathagar.com

ঘোড়ার পিঠে মারতে মারতে বললেন।

'হ্যাঁ আমরা গত ডিসেম্বরে হাজারদুয়ারীই দেখেছি বাকি জায়গাগুলো তেমনভাবে দেখা হয়নি। সে জন্যই আবার আসা। কামরুল বলে উঠল। আমানউল্লা চুপচাপ বসে চারদিকে দেখছিল।

হাজারদুয়ারী ছাড়িয়ে আসতেই উত্তর দিকে ভাগিরথীর কোল ঘিরে দেয়াল ঘেরা বিশাল দালান, সামনে খেলার মাঠ। অনেক জায়গা নিয়ে এই স্থাপনাটি। সোহেল শেখ এই বিরাট স্থাপনাটি দেখিয়ে বললেন 'স্যার এই স্থাপনাটি' নবাব বাহাদুর স্কুল এন্ড কলেজ। প্রথমে স্কুল ছিল পরে কলেজও হয়েছে। সোহেল শেখ গাড়ি চালাতে চালাতে কিছুটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বয়ান করতে লাগলেন।

নবাব বাহাদুর স্কুলটি তৈরি হয়েছিল প্রথম পর্যায়ে। পরবর্তী পর্যায়ে সাথেই একটি মাদ্রাসা গড়ে উঠে। এ জায়গাটি ছিল মীরজাফরের দ্বিতীয় স্ত্রী বাব্বু বেগমের পুত্র নবাব মোবারক উদ-দৌলার বাসস্থান। এক সময় এখানে বাঈজীদের আসর বসত। পরে নাজিম নবাব হুমায়ুজা-এর সময় ১৮২৫ সালে সম্পূর্ণ স্থাপনাটি স্কুলে রূপান্তরিত হয়। তখনকার গভর্নর লর্ড আর্মহার্স্ট পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এখানে নবাব বংশের সন্তানদের লেখাপড়া বিনা বেতনে চলতো। পরে এর নতুন নামকরণ করা হয় নবাব বাহাদুর ইনস্টিটিউট। আরও পরে এই স্কুল আমজনতার জন্য খুলে দেয়া হয়। এখানে ছাত্রদের জন্য খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে যা আজও বিদ্যমান। স্কুলটি চলে মীরজাফরের তৃতীয় স্ত্রী মুন্নী বেগমের ট্রাস্টের অর্থের দ্বারা। মুন্নী বেগমের ছিল প্রচুর অর্থ যা একসময় ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। কথিত আছে এই স্কুল ট্রাস্টে মুন্নী বেগমের ওই সময়ে নব্বই হাজার রুপী পরিমাণ অর্থ দিয়ে পরিচালিত হতো। মুন্নী বেগমের দুই পুত্র নাজমুদ্দৌলা এবং সাইফুদ্দৌলা মীরজাফরের মৃত্যুর পর ক্রমান্বয়ে নবাব হয়েছিলেন।

সোহেলের ঘোড়ার গাড়ি নবাব বাহাদুর ইনস্টিটিউট পার হয়ে অপেক্ষাকৃত নির্জন এলাকা দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। দু'পাশে আমবাগান মাঝে মধ্যে কয়েকটি বাড়ি। রাস্তার এ অংশটি অপেক্ষাকৃত ভাল। আমরা তিনজনই চুপচাপ। ঘোড়ার ক্ষুরের ছন্দের আওয়াজ মনে করিয়ে দিল ওই সময়ের কথা যখন এসব জায়গা দিয়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আশ্রিত নামে মাত্র বাংলার নবাবরা জাঁকজমক করে সজ্জিত ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে জাফরগঞ্জে জাফর মহলের দিকে যেতেন। আর সন্ধ্যা হলেই বাঈজীদের আসরে মদিরা পানে চূর হয়ে থাকতেন। কারণ, প্রশাসনের ক্ষমতা ততো দিনে ইংরেজ বাহাদুরদের হাতে। সে কারণেই রাতে মদ আর বাঈজী দিনে নিদ্রা ছাড়া নবাবের করবারই কি ছিল?

ইতিহাস বড় কঠিন, বড় সত্য। মীরজাফরের অপঘাতে মৃত্যুর আগেই বেনারসের নামকরা বাঈজী মুন্নী বেগমের ঔরসে জন্মগ্রহণকারী মীর জাফরের দুই পুত্র নাজমুদ্দৌলা

www.pathagar.com

আর সাইফুদ্দৌলা নবাব হন? পরে আরেক বাঈজী, যিনি ছিলেন মীরজাফরের দ্বিতীয় বেগম, তার পুত্র মোবারক উদ-দৌলা নবাব হয়েছিলেন।

মুন্নী বেগম ছিলেন বেনারসের অন্যতম সুন্দরী নর্তকী। তাকে সেখান থেকে নিয়ে আসেন তৎকালীন ঢাকার নবাব নওয়াজীশ মোহাম্মদ খাঁ। তার রূপ আর প্রখর বুদ্ধির জালে আবদ্ধ হয়েছিলেন মীরজাফর। অনুনয় বিনয় করে মীরজাফর ঢাকার নবাবের হেরেম থেকে মুন্নী বেগমকে নিয়ে আসেন পরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

মীরজাফরের মৃত্যুর আগেই তার প্রথম স্ত্রী শাহখানাম বেগমের পুত্র মীরন মারা গেলে, উত্তরাধিকারী নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়। তখন বাংলায় ইংরেজদের অঘোষিত রাজত্ব শিকড় গাড়তে শুরু করেছিল। মীরনের ছেলের সাথে মুন্নী বেগমের পুত্র নাজমুদ্দৌলার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। মুন্নী বেগম ইংরেজ কোম্পানির বড় সাহেবদের মন জয় করেন। কথিত আছে কোম্পানির শীর্ষ কর্মকর্তাদের এক লক্ষ আটত্রিশ হাজার পাউন্ড সমপরিমাণ অর্থ নজরানা দিয়েই পুত্র নাজমুদ্দৌলাকে নবাবের গদিতে বসাতে সক্ষম হন। ১৭৬৬ সালে অভিষেক হয়েছিল সে বছরই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সমগ্র বাংলার দেওয়ানি লাভ করেছিল। লর্ড ক্লাইভ উপস্থিত ছিলেন অভিষেকে। রব উঠল যে ক্লাইভ মুন্নী বেগম হতে ওই অর্থ উৎকোচ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। সে বছরই ক্লাইভ ফিরে যান ইংল্যান্ড। পরে আত্মহত্যা করেন ক্লাইভ।

নাজমুদ্দৌলা অল্প সময়েই মারা গেলে মুন্নী বেগমের দ্বিতীয় নাবালক পুত্রকে নবাব ঘোষণা করে মুন্নী বেগমই অভিভাবক হন। মুন্নী বেগম নাবালক পুত্রকে এক প্রকার অকার্যকর করে ফেলেন। মুন্নী বেগমের দ্বিতীয় এই পুত্র, সাইফুদ্দৌলার সময়ে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ হয় যা ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' হিসেবে চিহ্নিত। দৃশ্যপটে আসেন দেবী সিং। ১৭৭০ সালে সাইফুদ্দৌলার মৃত্যুর সাথে মুন্নী বেগমের যুগ শেষ হয়। শুরু হয়, আরেক বাঈজী হতে বেগম, বাব্বু বেগমের গর্ভের পুত্রদের যুগ। মীরনের বংশের কোন সদস্যই শৃঙ্খলিত বাংলার নবাব হতে পারেনি। এমনি বোধ হয় নিয়তির পরিহাস। মীরন নির্বংশ করেছিল সিরাজের। এটাই বোধ হয় ন্যাচারাল জাস্টিস।

আমাদের নিয়ে সোহেল শেখের পঙ্খিরাজ চলছে। তিনজনেই দুলছি আর কখনও কখনও সাবধানের আওয়াজ পেলে পায়ের উপর ভর দিয়ে নিজেকে বড় রকমের ঝাঁকুনি হতে দূরে রাখবার চেষ্টা করছি। কামরুল সোহেলের সাথে নানা ধরনের আলাপচারিতায় মশগুল আর আমানউল্লা রাস্তার দু'পাশে চোখ বুলিয়ে দেখছিল। আমি পিছনে মুখ করে বসা মাঝে মধ্যে নিজের অবস্থানকে ঠিক রাখতে কিছুটা উপরের দিকে উঠছি। আমরা আম বাগানের মধ্য দিয়ে চলছিলাম। আম বাগানটি বেশ বড়। আমের মৌসুমও শেষ, কাজেই বাগানে কোন তৎপরতা নেই। কবেকার এ বাগান অনুমান করা যায় না। বাগানের গাঢ় ছায়া রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

www.pathagar.com

আকাশে মাঝে মধ্যে কালো মেঘের আনাগোনা। চারদিক দেখে মনে হল জায়গাটি অতীতের মহাশ্মশান। মাঝে মধ্যে অপরদিক হতে সাইকেল আরোহীদের আনাগোনা।

আমার ভাবনায় মুন্নী বেগম। মুন্নী বেগম সিরাজ-উত্তর বাংলার মসনদের খেলায় বহু বছর প্রভাব রেখেছিলেন। বস্তুতপক্ষে ওই সময়ের ইতিহাসে মুন্নী বেগমই হয়ে উঠেন মহাপরাক্রমশালী নারী। মুন্নী বেগমের দ্বিতীয় পুত্রের মৃত্যুর পর বাব্বু বেগমের নাবালক পুত্র তের বছরের মোবারক দৌলাকে নবাবের গদিতে বসালো ইংরেজ বাহাদুররা। তখন ওয়ারেন হেস্টিংস-এর যুগ। শুরু হল বাব্বু বেগম আর মুন্নী বেগমের মধ্যে অভিভাবক রূপে নিয়োজিত হবার প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় মুন্নী বেগমের রূপ আর কূটকৌশলের কাছে পরাজিত হলেন বাব্বু বেগম। নৈতিকতা বিবর্জিত ওয়ারেন হেস্টিংস অর্থ আর রূপের কাছে নতি স্বীকার করে মুন্নী বেগমকেই নবাবের অভিভাবক নিয়োজিত করতে সহায়তা করেছিলেন। মুন্নী বেগম রয়ে গেলেন অভিভাবক হিসাবে। তবুও মুন্নী বেগম এককালের সখী বাব্বু বেগমকে সমীহ দেখাতেন। ১৮১২ সালে পরিণত বয়সে মুন্নী বেগম মারা যান। সিরাজ উত্তর বাংলার ইতিহাসে মুন্নী বেগম বিতর্কিত হয়েও স্থান করে নেন।

আমরা আমবাগান পার হয়ে একটা উন্মুক্ত জায়গায় এসে পড়েছি। হাতের পূর্বদিকে রাস্তার পাশে কয়েক পরিবারের ঘরবাড়ি। গোবরের ঘুটে তৈরির জন্য দেয়ালের ইটের উপরে সাটানোর কারণে জায়গাটি নোংরা হয়ে রয়েছে। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে এখনও গ্রামগঞ্জে, এমনকি কোলকাতার আশেপাশেও, গোবরের এ ধরনের ব্যবহার ব্যাপক।

ওই ছোট বাড়িঘরগুলোর উল্টো দিকে, মানে পশ্চিম দিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা এক ঐতিহাসিক স্থাপনার সামনে এসে সোহেল গাড়ি থামালেন। বললেন স্যার, 'দেয়ালের ভিতরে যে স্থাপনাটি দেখবেন সেটা এককালে মসজিদ ছিল। এখন মসজিদটির উপরের অংশ নেই। তবে পশ্চিমে একটি গেট এবং চত্বরটি রয়েছে। পূর্বদিক থেকে মসজিদে উঠবার যে সিঁড়িটি রয়েছে তার নিচে একটি কবর দেখবেন কবরটি আজিমউন-নিসা বেগমের। এ জায়গার নাম জিন্দা কবর (জীবিত কবর)। এখানে মুর্শিদকুলী খানের এক মেয়ে আজিমউন-নিসা বেগমকে জীবিত কবর দেয়া হয়েছিল। আপনারা ভিতরে গেলে ওখানে দেখাবার লোক পাবেন।'

আমরা তিনজনেই নেমে গেলাম। এ রকম ইতিহাস আমার জানা ছিল না। তবে এটুকু জানতাম নবাব মুর্শিদকুলী খান অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। সেভাবেই ইতিহাস তাঁকে চিহ্নিত করেছে। আমরা গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। ভিতরে যেতে কোন টিকেট লাগে না। প্রবেশ করলেই সামনে মসজিদের চত্বর। বেশ কয়েক ধাপ উপরে উঠতে হয় মসজিদের মূল চত্বরে যেতে। উপরে মসজিদের কোন অংশই

www.pathagar.com

বিদ্যমান নেই। সামনে এগুতেই এক যুবক বললেন, 'স্যার, আমি আপনাদের এ জায়গার সাথে পরিচয় করিয়ে দেব। মাত্র দশ রুপি দিলেই চলবে।' হয়ত কোন স্থানীয় যুবক গাইডের কাজ করছে। যদিও জায়গাটি সংরক্ষিত এবং দৃশ্যত মনে হয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখবার জন্য এরা নিয়োজিত, তবে টু পাইস এক্সট্রা ইনকামে অসুবিধা কি। আমরা রাজি হলাম।

গাইড আমাদেরকে প্রথমেই সিঁড়ির নিচে নিয়ে আসলেন দ্বিতল সম চত্বরের উপরে উঠবার সিঁড়ির নিচেই একটি ছোট প্রকোষ্ঠ, তার মধ্যে একটি পাথরে বাঁধানো কবর দেখিয়ে বললেন, 'এটাই মুর্শিদকুলী খানের মেয়ে সুজাউদ্দিনের স্ত্রী আজিমউন নিসা বেগমের জিন্দা কবর।' 'জিন্দা কবর?' কামরুল জিজ্ঞাসা করল।

গাইড বললেন, 'জ্বি স্যার উনাকে এখানে কবর দিয়ে এই মসজিদটি বানানো হয়েছে। তাঁকে জীবন্ত অবস্থায় কবর দেয়া হয়েছিল। এ কথা বলেই গাইড ছেলেটি ইতিহাস বলে চললেন।

স্থানীয় গাইডের বক্তব্য অনুযায়ী আজিমউন নিসা বেগম গুরুতর অসুস্থ হলে হেকিম তাকে নবজাত শিশুর কলিজা খাবার পরামর্শ দিলে তেমনই করা হয়েছিল। সে যাত্রায় তিনি রোগমুক্ত হলেন। কিন্তু তিনি নবজাত শিশুর কলিজা খাবার নেশায় পড়লেন। গোপনে তিনি বিভিন্ন স্থান হতে নবজাত শিশু সংগ্রহ করে কলিজা খেতে শুরু করলে ক্রমেই বিষয়টি তার স্বামীর গোচরে আসলে তিনি স্ত্রীকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। অগত্যা বিষয়টি স্ত্রীর পিতা মুর্শিদকুলী খানের কানে দেয়া হয়। তিনি কন্যাকে এই ভয়ানক নেশা থেকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না। অবশেষে তাকে এখানে জিন্দা কবর দেয়া হয়। পরে তার স্বামী সুজাউদ্দিন যখন নবাব হলেন এখানে এক বিশাল মসজিদ নির্মাণ করেন। কবরের উপর দিয়ে মসজিদে উঠবার সিঁড়ি নির্মাণ করেন। তিনি মনে করেছিলেন এখানে ইবাদত করতে আসা মুসল্লিদের পায়ের ধূলায় হয়ত তার স্ত্রী পাপ মুক্ত হবেন। এমনই বিশ্বাস থেকে গড়ে উঠেছিল এই মসজিদ। বর্তমানে সিঁড়ি চত্বর আর পশ্চিমদিকের একটি প্রবেশ ফটকছাড়া মসজিদের দেয়ালসহ অন্যান্য অংশ নেই। তবে বাকি অংশটুকু সযত্নে পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত করা আছে।

এ ধরনের জনান্তিকে শ্রুত ঘটনার ঐতিহাসিক সাক্ষী থাকুক আর নাই থাকুক অনেক সময় বছরের পর বছর শ্রুত ঘটনা অবিশ্বাস্য হলেও ইতিহাসের অংশ হয়ে যায়। এ ধরনের বাস্তবতাবিহীন তথ্য নতুন নয়। তবে ঐতিহাসিক দলিলাদি বলে আজিমউন-নিসা ১৭৩০ সালে, মুর্শিদকুলী খার মৃত্যুর পাঁচ বছর পর, এখানে যখন মারা যান তখন বাংলার নবাব পদে আসীন ছিলেন সুজাউদ্দিন। সুজাউদ্দিনের কবর রয়েছে ভাগিরথী নদীর পশ্চিম তীরে, রোশনীবাগে।

আমরা কবরের উপরের সিঁড়ি দিয়ে মসজিদের চত্বরে উঠলাম। হাঁটতে হাঁটতে

www.pathagar.com

পশ্চিম দিকে এখন দণ্ডায়মান বিশাল আকারে দরওয়াজার দিকে গেলাম।

ওই মসজিদের পশ্চিম কোল ঘেঁষে এককালে প্রবাহিত হতো ভাগিরথী নদী। বর্তমানে অনেকখানি পশ্চিমে সরে গিয়েছে। এখন সেখানে বিস্তীর্ণ চাষাবাদের জমি রয়েছে।

আমরা কথিত জিন্দা কবর থেকে বের হয়ে যাবার পথে প্রবেশদ্বারের নিকট একটি পাকা কবর দেখলাম। স্থানীয় গাইড জানালেন এই কবরটি এই মসজিদ তথা কবরের খেদমতগার দাতা বাহার শাহের। সেখান থেকে বের হয়ে ঘোড়া গাড়িতে রওয়ানা হলাম জাফরগঞ্জ সমাধির উদ্দেশে। জাফরগঞ্জ সমাধি পার হলে রাস্তার পূর্বদিকে দেখা যাবে নশিপুর প্রাসাদ। এই প্রাসাদের মালিক ছিলেন পূর্বে আলোচিত কুখ্যাত দেবী সিং। এ অঞ্চলে দেবী সিং ডাকাত নামে পরিচিত।

আমরা জাফরগঞ্জের কাছাকাছি। বাঁয়ে বিশাল নবাবী দরওয়াজা। জাফর মঞ্জিলের প্রবেশ পথ। ভিতরেই ছিল মীরজাফরের প্রাসাদ। এখানেই সিরাজ বন্দি অবস্থায় মোহাম্মদী বেগের হাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেই প্রাসাদটির ধ্বংসপ্রাপ্ত গেটটি রয়ে গিয়েছে। এরই নাম 'নিমক হারাম দেউড়ি'। সোহেল শেখ জানালেন যে, যেহেতু জায়গাটি এখনও মীরজাফরের বংশধরদের হাতে তাই পূর্বানুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ। ফটকটি লাগানো। ভিতরে রয়েছে একটি মসজিদ যার তিনটি গম্বুজ দূর হতে দেখা যায়। ঘোড়ার গাড়িতে চলন্ত অবস্থায় 'নিমক হারাম দেউড়ি'র ছবি তুলে নিলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা একটু ঘনবসতিতে আসলাম। এটা জাফরগঞ্জ সমাধি ক্ষেত্র। দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ছোট একটি গেট রয়েছে প্রবেশ পথে। পাশেই টিকিট ঘর। আর ঠিক উল্টো দিকে একটি ছোট মসজিদ। মসজিদটি বন্ধ। গেটের সামনে বেশ কিছু লোক বসা। সোহেল শেখ একপাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বললেন, এটাই জাফরগঞ্জ সমাধি। সামনের মসজিদটিরও দুইশত বছরের উপরে বয়স। এখানে ওই সময় হতে বর্তমানেও শুধু জানাজার নামাজ পড়ানো হয়। জাফরগঞ্জ সমাধির পিছন দিকে এখন তথাকথিত নবাব পরিবারের সদস্যদের দাফন করা হয়। আপনারা ভিতরে গেলে স্থানীয় গাইড পাবেন দশটাকার বিনিময়ে আপনাদের ঐতিহাসিক কবরগুলো দেখিয়ে দিবে। আমি এখানেই আপনাদের অপেক্ষায় থাকব। সোহেল বললেন।

কামরুল এগিয়ে গিয়ে তিন রুপি করে তিনটি টিকেট নিল ভিতরে প্রবেশের জন্যে। বড়োসড়ো গেট পার হতেই সামনে দেখলাম বেশবড় এলাকাজুড়ে কবরখানা। কিছু কিছু কবর দেয়াল দিয়ে ঘেরা। পরে জানলাম সেগুলো মহিলাদের কবর। শিয়রের কাছে নামফলক তবে দু'একটি ছাড়া লেখাগুলো স্পষ্ট নয়। যাও আছে সেগুলো ফার্সিতে লেখা। গেটের আচ্ছাদনের নিচে কয়েকজন বসা। তারা এ কবরস্থান তদারক করেন আর পরিচয় করিয়ে দেন কবরগুলোর সাথে। আমাদের দেখে একজন বললেন, দশ

www.pathagar.com

রুপি দিয়ে একজন গাইড নিন না হলে আপনারা কবরগুলো চিনতে পারবেন না। আমরা রাজি হলে তিনি ডাক দিলেন এমন একজনকে যাকে দেখে আমরা তিনজনই হতভম্ব। একটি দশ বছরের শিশু। প্যান্ট আর একটি স্পোর্টস গেঞ্জি পরা। নাম আমান হোসেন, নাম শুনে আমানউল্লা হেসে বলল, 'আরে এযে আমার নাম। তুমি এত ছোট মানুষ তুমি কি এত সব বলতে পারবে?' উত্তর দিলেন ওই ভদ্রলোক, 'আরে সাহেব ওটা বাচ্চা হলে কি হবে আমাদের সবার বাপ।' সত্যিই তেমনটিই প্রমাণিত হল যখন ওখানে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ কবরস্থানের পরিচয় দিতে গিয়ে গড়গড় করে বলল, 'এ কবরস্থান দেখছেন এখানে মীরজাফরের বংশের এগারো শত কবর রয়েছে। রয়েছে মীরজাফর আলী খানসহ তার তিন স্ত্রী। এখানে আছে, দু'একজন ছাড়া, মীরজাফর পরবর্তী সব নবাবদের কবর। প্রথমে জুনিয়র আর ক্রমান্বয়ে জ্যেষ্ঠদের কবর। আসুন আমার পিছে পিছে। কোন কবর চত্বরে উঠতে হলে জুতা খুলতে হবে। আপনারা শুনেছেন, মীরজাফর আলী খান সিরাজের সাথে গাদ্দারি (বিশ্বাসঘাতকতা) করেছিল। এরা তারই বংশধর।' ওই সময়ে আমাদের পেছনে, হয় স্থানীয় না হয় অন্যখান থেকে বেড়াতে আসা কয়েকজন দাঁড়িয়ে এই বাচ্চা ছেলের বয়ান শুনছিল। তাদের দেখে দশ বছরের আমান হোসেন অত্যন্ত তেজোদীপ্ত ভাষায় বলে উঠল, 'আমার বিবরণ শুধু এই তিনজনের জন্যে। আপনাদের শুনতে হলে দশ রুপি লাগবে।' এমন কথা শুনে পিছনে জড়ো হওয়া ব্যক্তিবর্গ সরে গেল। আমরা এ বাচ্চার ভঙ্গিমা তার তেজোদীপ্ত ভাবভঙ্গি দেখে আশ্চর্যান্বিত হলাম।

আমান আমাদের সামনে হাঁটতে হাঁটতে ওই সারির প্রতিটি কবরের পরিচয় দিয়ে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের একটু উঁচু, শ্বেত পাথরের বর্ডার দেয়া কবরের সামনে কোমরে দু'হাত দিয়ে দাঁড়ালো। কবরের উত্তর দিকের শিলাফলকে ফার্সিতে পরিচয় লিখা রয়েছে। আমান হোসেন তোতা পাখির মত বলল এটাই মীরজাফর আলী খানের কবর। সামনের তক্তিতে লেখা আছে পুরো নাম 'সুজাউল মূলক হাসান উদ্‌দৌলা নবাব মীর মোহাম্মদ জাফর খান বাহাদুর মোহায়েম জং নবাব নাজীম অব বেঙ্গল।' আপনারা যার কথা এতদিন শুনেছেন এই সেই মীরজাফর।

মীরজাফরের কবরের পূর্ব পাশে একটি ছোট ঘেরার মধ্যে দু'টি পাশাপাশি কবর দেখিয়ে আমান বলল 'এ দু'টি কবরের একটি মীরজাফরের প্রথম স্ত্রী শাহ খানাম বেগম এবং পরেরটি বাব্বু বেগম যিনি প্রথম জীবনে ছিলেন একজন বাঈজী। এবার পাশে উত্তর দিকে দু'টি ছোট ছোট কবর দেখিয়ে আমান বলল, 'এখন আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এ ছোট দু'টি কবর একজন নবাবের অতি আদরের দু'টি কবুতরের। এর বেশি আমি আর জানি না। আসুন আপনাদের আরেকটি কবর দেখাই।' এই বলে আমাদের শিশু গাইড উত্তর-পশ্চিম দিকে বেশ বড় সিমেন্টের জাফরির ঘেরা দেয়া কবর দেখিয়ে

www.pathagar.com

বলল, 'এই কবরটি নবাব নাজিম মীর জাফরের তৃতীয় বেগম-মুন্নী বেগমের। আপনারা হয়ত তার নাম শুনেছেন। নবাব বাহাদুর স্কুল তারই তৈরি। এখানে মীরন আর ফেরাদুন জা ছাড়া আর সকল নবাবের কবর রয়েছে।' মীরজাফরের বংশের নবাব টাইটেলধারী শেষ ব্যক্তি ছিলেন নবাব ওয়ারেশ আলী মির্জা যিনি ১৯৭০ সালে মারা যান। তার দুই পুত্রের মধ্যে বর্তমানে একজন কানাডায় এবং একজন ইংল্যান্ডে বসবাসরত।

আমরা জাফরগঞ্জের সমাধি ক্ষেত্র থেকে বের হয়ে আসতে আসতে আমাদের শিশু গাইড আমান হোসেনকে জিজ্ঞাসা করলাম সে কোন ক্লাসে পড়ে। সে জানালো বর্তমানে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। যতটুকু সে আমাদের বলেছে তার বাইরে ইতিহাস সম্বন্ধে তার কোন ধারণা নেই, তবে তার জানবার আগ্রহ রয়েছে। যতটুকু শিখেছে তা এখানেই শিখেছে। প্রায় প্রতিদিন এমনিভাবে বহু দর্শককে এই সমাধিস্থল দেখিয়ে থাকে। তবে শীত মৌসুমে হাজারো দর্শকের ভিড় থাকে। সে সময় স্কুলের পাট চুকাবার পর এখানেই বাকি সময় কাটায়। আমরা তিনজনেই এত ছোট বয়সের গাইড এবং তার তৎপরতায় মুগ্ধ হলাম।

এই সমাধিস্থল থেকে বের হয়ে আমরা নশিপুর হয়ে কাঠগোলা প্যালেসের দিকে রওয়ানা হলাম। এই সমাধি ক্ষেত্রটি একসময় ছিল নবাবের কিচেন গার্ডেন। তথ্যে প্রকাশ-মীরজাফরের প্রথম স্ত্রী শাহ খানাম-এর অত্যন্ত প্রিয় ছিল এই বাগান।

কাঠগোলা প্যালেসে যাবার পথেই দেবী সিং-এর রাজকীয় বাড়ি। বর্তমানে পরিত্যক্ত, ভগ্নপ্রায়। সোহেল যেতে যেতে আমাদের দেখিয়ে বললেন, 'এই সেই দেবী সিং ডাকাতের বাড়ি। লক্ষ্য করে দেখুন বাড়িটির আদল অনেকটা হাজারদুয়ারীর মত। অনেকটা তাই বোধকরি। এ ধরনের রাজকীয় বাড়িগুলো ইউরোপিয়ান স্থাপত্যের আদলে তৈরি করা হতো বলে প্রায় একই রকম দেখা যায়। এ সব প্রাসাদ এবং অট্টালিকার নক্সাকার এবং স্থপতি ছিলেন তৎকালীন বৃটিশ রাজের ইউরোপিয়ান স্থপতিরা। সে কারণেই আঠারো এবং উনিশ শতকের বাড়িগুলো দেখতে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

আমরা কাঠগোলা প্রাসাদের প্রধান গেটে এসে গাড়ি থেকে নামলাম। এখানে এ মৌসুমেও প্রচুর দর্শনার্থীর সমাগম হয়েছে গেটের অতি নিকটে, পশ্চিম দিকে, প্রবাহিত হচ্ছে ভাগিরথী নদী। নদীর উপরে একটি রেল সেতু নির্মাণাধীন রয়েছে। সোহেল শেখ জানালেন যে এই নদীর উপরের সেতুর কাজ শেষ হলে এই পথে দক্ষিণ ভারতে যেতে সময় অনেক কমে আসবে। এই রেল পথ নির্মাণ করছে ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষ।

আমরা গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। সোহেল জানিয়েছিলেন যে, এই প্রাসাদটি আসলে ছিল লছমি পৎ সিং দুগার নামক এক বিশেষ ব্যবসায়ীর। তৈরি করে

www.pathagar.com

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। তার ভাষ্যমতে এ বিশাল এলাকার মধ্যে ছোট প্রাসাদটি ছিল বাগানবাড়ি। বেশির ভাগ সময় এখানে চলত বাঈজীদের মেহফিল। উপরের তলায় ছিল নাচঘর যেখানে নামিদামী বাঈজীরা আসতেন 'মুজরা' করবার জন্যে। আসতেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা বৃটিশ রাজের হোমরা চোমরা ব্যক্তিরা। এখানে এক বাঈজী এসেছিলেন সুদূর বেনারস থেকে। বলা হয় থাকে এই সুন্দরী বাঈজী তার উচ্চতা আর পাতলা কটিদেশের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। সোহেল জানালেন যে, ওই বাঈজীর কোমর একজন পূর্ণাঙ্গ পুরুষের দু'হাতের তালু একত্র করে ধরা যেত।

আমরা সোহেলের বিবরণ শুনে ভিতরে প্রবেশ করলাম। অনেক বিস্তৃত এলাকাজুড়ে বাগান বাড়িটি। বাড়িটির সামনে বেশ বড়োসড়ো পুকুর। তিন দিকে বাঁধানো ঘাট আর পুকুরটি সিমেন্টের জাফরি দিয়ে ঘেরা দেয়া। এক সময় এখানে বিশাল ফুলের বাগান ছিল। ছিল বিভিন্ন জাতের ফুলের সমাহার। তবে এখন সেই জৌলুস নেই। এখানে প্রতিদিন বিভিন্ন শহর আর রাজ্য থেকে ভারতীয়রা বেড়াতে আসেন। পর্যটন মৌসুমে সংখ্যা আরও বাড়ে। ওই সময় মুর্শিদাবাদ রমরমা অবস্থায় থাকে। সোহেল শেখ বলেছিলেন যে, পর্যটন মৌসুম আসলে মুর্শিদাবাদে রাত কাটাবার জায়গারও সংকুলান হয় না। যে সব হোটেল রয়েছে তার মধ্যে দু'টিই কোন রকম মানসম্পন্ন। সোহেল আরও বলেছিলেন ওই সময়ে তারা সমগ্র বছরের কামাই করেন। এখন এ সময়ে আবহাওয়ার কারণে বেশি দর্শনার্থী আসে না। তারপরেও সপ্তাহান্তে লোকের সমাগম ভালই হয়।

কাঠগোলা প্রাসাদের সংস্কার চলছিল তাই উপরের নাচ ঘরে যাওয়া হয়নি। নিচের অংশের এক কামরায় মস্তবড় এক পালঙ্ক যার উচ্চতা প্রায় চার ফুট। উপরে উঠবার জন্যে মূল্যবান কাঠ দিয়ে তৈরি সিঁড়ি রয়েছে। দৃষ্টিনন্দন কাঠের কাজ। পাশের রুমে একটি পুরাতন বিলিয়ার্ড টেবিল। কলকাতার এক ইংরেজ কোম্পানির তৈরি। এ ধরনের বিলিয়ার্ড রুম উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রাসাদগুলোতেই দেখা যায়। ওই সময় বাড়িতে বিলিয়ার্ড টেবিল থাকা আভিজাত্য আর ইংরেজ সভ্যতার অনুরাগী হিসাবে গণ্য হতো বলে আমার ধারণা। ইউরোপিয়ানরা এদেশে, বিশেষ করে উপমহাদেশের বিত্তবানদের, সম্পদ যেভাবে অপচয় করিয়েছে তার নমুনা অন্তত এতদঞ্চলের বহু জমিদার, তথাকথিত রাজা-মহারাজা এবং বিত্তবানদের প্রাসাদ আর প্রাসাদোত্তম অট্টালিকাগুলোতে আজও দৃশ্যমান।

আমরা বেশ অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে কাঠগোলা প্রাসাদ দেখে বের হয়ে আসলাম। সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলা শুরু করেছে। তবুও রৌদ্রের তাপ কমেনি। ভ্যাপসা গরমে ঘামিয়ে উঠেছি। শরীরও কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে। মুর্শিদাবাদে বেশ বৃষ্টি হয় তবে আজ তেমন হয়নি। গেট থেকে বের হয়ে পাশের এক চায়ের দোকানে বসে

www.pathagar.com

চা খেয়ে সোহেল শেখকে নিয়ে রওয়ানা হলাম মুর্শিদাবাদের অন্যতম দর্শনীয় স্থান কাটরা মসজিদের উদ্দেশে যার সিঁড়ির নিচে, আজিম উন নিসার কবরের মত, মুর্শিদকুলী খাঁর অন্তিম শয্যা বা কবর রয়েছে।

মুর্শিদকুলী খাঁ ছিলেন দিল্লীর মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব এবং ফররুখশিয়রের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ব্যক্তি। তাদেরই সময়ে তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন সুবে বাংলার নবাব হিসাবে। সম্রাট ফররুখশিয়র যখন ঢাকা থেকে ফিরছিলেন তখন তিনি মুর্শিদাবাদে অবস্থান করেছিলেন। এককালের মোহাম্মদ হাদীকে তিনি দিওয়ান হতে উন্নীত করেন বাংলার সুবাদারে। উপাধি দেন আলাউদ্দিন জাফর খাঁ বাহাদুর ওরফে মুর্শিদকুলী খাঁ। সময়কাল তখন ১৭১৭ সাল।

কাটরা মসজিদটি মুর্শিদাবাদ রেলওয়ে স্টেশন হতে তিন কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে।

আমরা আমাদের বাহনে চড়ে কাটরা মসজিদের দিকে রওয়ানা হলাম। এখানকার রাস্তার দু'ধারে তেমন জনবসতি নেই। রয়েছে উন্মুক্ত চাষাবাদের জমি। মুর্শিদাবাদ লালগোলা রেলওয়ে লাইন পার হয়ে আমাদের ঘোড়ার গাড়ি ছুটছে। সূর্য প্রায় অস্তমিত। রেললাইন পার হতেই হাতের বাঁয়ে, উত্তর প্রান্তে, একটি পরিত্যক্ত তিন গম্বুজ বিশিষ্ট ইটের তৈরি মসজিদ দেখলাম। চারপাশ জঙ্গলাকীর্ণ। দেখেই মনে হয়েছে এই ঐতিহাসিক মসজিদটি এএসআই (ASI) এর তালিকাভুক্ত নয়। তালিকায় থাকলে হয়ত এখানে মানুষের আনাগোনা হতো। সোহেল বললেন, এটাই ফুটি মসজিদ। কথিত আছে যে, নবাব সরফরাজ খাঁ এক রাতে এই মসজিদটি তৈরি করেছিলেন। তবে সে রাতেই ছাদে ধস নেমে ফুটো হয়ে যায় সে অবস্থাতেই এখনও এই মসজিদ রয়ে গেছে।

নবাব সরফরাজ খাঁ ছিলেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ-এর দৌহিত্র। তিনি খুব ভাল শাসক বলে পরিচিত ছিলেন না। মদ আর নারী আসক্তির কারণে তার উপরে বিরক্ত ছিলেন তার পারিষদ। এই কথিত মসজিদ তৈরির পরপরই সরফরাজ খাঁ ১৭৪০ সালে গিরিয়ার যুদ্ধে তার দরবারের মারাঠা দূত ভাস্কর পণ্ডিতসহ মৃত্যুবরণ করেন। তার পরাজয়ের মধ্য দিয়েই আলীবর্দী খাঁ-এর উত্থান হয়। সরফরাজ খাঁ-এর মৃত্যুর পর আলীবর্দী খাঁ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ইতিহাসের তথ্য মোতাবেক মারাঠারা, বর্গি বলে অত্যধিক পরিচিত, সরফরাজ খাঁয়ের সময়ে বাংলায় ঘাঁটি গেড়েছিল। বর্গিদের হামলা আর লুণ্ঠন প্রতিহত করবার ক্ষমতা ছিল না নবাব সরফরাজ খাঁর। গিরিয়ায় সৈন্য সমাবেশ হলে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে মারাঠাদের নেতা ভাস্কর পণ্ডিতসহ তাদের এক জায়গায় জড়ো করে আলীবর্দী খাঁ হত্যা করেন বলে কথিত। তবে এখানে আলীবর্দী খাঁ-এর অংশগ্রহণ নিয়ে দ্বিমত রয়েছে।

www.pathagar.com

যেখানে মারাঠাদের কথিত এ হত্যা হয় সে জায়গাটি বহরমপুর ও সারগাছি স্টেশনের মাঝামাঝি জায়গায়। সেখানেই মারাঠাদের দেহের সৎকার হয়। বর্তমানে ওই জায়গার নাম মানকর ভাস্করদহ। ভাগিরথীর পশ্চিম পাড়ে রোশনাইবাগ নবাব সুজাউদ্দিনের সমাধির পেছনে ভাস্কর পণ্ডিতের তৈরি একটি মন্দির রয়েছে। অবশ্য পরের দিন যখন আমরা খোশবাগে গিয়েছিলাম ওখানকার স্থানীয় গাইড বলেছিলেন অন্যকথা। তিনি বলেছিলেন যে, এই ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যার পরিকল্পনা করেন মীরজাফর, নবাব আলীবর্দী খাঁ নয়। তবুও এ হত্যার দায় নবাবের উপরই বর্তায়। এ হত্যার প্রতিশোধ নিতে আলীবর্দীর শাসনামলে তাকে বর্গিদের হামলা হতে বাংলাকে রক্ষা করতে একাধিক যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন কলকাতায় স্থায়ী হয় তখনও বর্গিদের হামলা হতে শহর রক্ষার জন্য খনন করেছিল পরিখা যার নাম ছিল 'মারাঠা ডিচ্'। পরবর্তীতে ওই পরিখা ভরাট করে বর্তমানের লোয়ার সার্কুলার রোড তৈরি করা হয়।

আমরা আলোচনা করেছিলাম 'ফুটি মসজিদ'-এর যার সঠিক নাম 'ফৌতী মসজিদ' মানে বিজয়ের মসজিদ। মসজিদ নির্মাণ করেও জয় পাননি সরফরাজ খাঁ। এরপর হতে মসজিদটি পরিত্যক্ত থাকে। আজও তেমনি রয়েছে। আস্তে আস্তে হয়ত এই বাড়ন্ত জঙ্গল গ্রাস করবে লাল ইটের, অনেকটা কাটরা মসজিদের আদলে তৈরি, এই মসজিদটি। 'ফৌতী' মসজিদের উচ্চারণ বিকৃত হয়ে বর্তমানে স্থানীয়দের নিকট ফুটি মসজিদ নামে পরিচিত। মনে হয়নি যে খুব বেশি দর্শনার্থী এই মসজিদের ধারে কাছে যান।

বেশ কিছুক্ষণ ঘোড়া গাড়িতে ঝাঁকুনি খেয়ে চলার পর প্রায় গোধূলি লগ্নে আমরা মুর্শিদাবাদ-লালগোলা রাস্তার উপরে এসে পৌছলাম। রাস্তার পশ্চিম পাশে এক সারিতে কাঁচাপাকা বিভিন্ন প্রকারের গ্রাম্য দোকান, এর মধ্যে খাবারের দোকানই বেশি। আর রাস্তার উল্টো দিকে, পূর্ব দিকে, লাল ইটের তৈরি বিশাল আকারের কাটরা মসজিদ। মসজিদের দু'পাশে সুউচ্চ দু'টি মিনার। মিনারগুলো ইটের তৈরি তবে মিনারগুলো প্রচলিত ইন্দো-তুর্কিক মিনারের মত নয়। অনেকটা আমাদের দেশের ইটের ভাটার চিমনির মত। বাংলা পিডিয়ার ভাষ্যে বলা আছে যে, এই মসজিদটি ঢাকার কারতালাব খাঁ মসজিদের মত। অবশ্য ঢাকার ওই মসজিদ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই।

কাটরা মসজিদটি মাত্র কয়েক বছর পূর্বেও পরিত্যক্ত ছিল। তবে ইতিমধ্যেই এএসআই (ASI) বা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া হেরিটেজ সাইট হিসাবে স্বীকৃতি দেবার পর যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করা হয়েছে। মসজিদের পশ্চিম প্রান্তে সুন্দর সবুজ ঘাসের চত্বর। পাশে ফুলের বাগান তার মাঝখান দিয়ে ঘুরানো মসজিদের চারি পাশের পায়ে চলা পথে যাওয়ার জন্য রাস্তা করা আছে। ইতিমধ্যেই আমরা সমস্ত দিনের সফর,

www.pathagar.com

ঘোড়া গাড়ির ভ্রমণ তদুপরি ভ্যাপসা গরমে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। গাড়ি থেকে নেমে মনে হল পা বোধহয় আর চলতে চাইছে না। কামরুল নামতে চাইল না। আমি আমানউল্লার দিকে তাকালে সে আমার সাথে মসজিদটি ঘুরে দেখতে নেমে পড়ল। আমরা দু'জনেই মসজিদের পশ্চিম প্রান্ত হতে ঘুরে পূর্বপ্রান্তে মূল ফটকের সামনে হাজির হলাম। নির্মাণ শৈলী দেখে মুগ্ধ হলাম। মসজিদটি তৈরি হয়েছিল ১১৩৭ হিজরি মানে ১৭২৪-২৫ সালে।

পূর্বদিকের এই প্রধান ফটকের, আর্চ, এর দু'পাশে আরও দু'টি করে চারটি ফটক রয়েছে। উপরে মূল মসজিদ চত্বরে উঠতে বেশ কয়েক ধাপ চওড়া সিঁড়ি ভাঙতে হয়। এরই নিচে একটি প্রকোষ্ঠ বানানো যেখানে রয়েছে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ-এর কবর। কথিত আছে যে মৃত্যুর পূর্বে নবাব মুর্শিদকুলী এখানেই অবস্থান নিয়েছিলেন। তাঁর অন্তিম ইচ্ছা ছিল যেন তাকে এখানেই সমাহিত করা হয়। অনেকটা মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মত। কেন নয়, মুর্শিদকুলী খাঁ আওরঙ্গজেবের বদৌলতে এতদূর এসেছিলেন। তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবকে জীন্দাপীর মনে করতেন।

আমরা মূল মসজিদ চত্বরে প্রবেশের পূর্বে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ-এর সমাধি প্রকোষ্ঠ দেখলাম। খুবই সাধারণ সমাধিটি পাথর দিয়ে বাঁধানো। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে যতদিন এই মসজিদে মুসল্লিরা নামাজ পড়তে যাবেন আসা যাওয়ার পথে তাদের চরণধুলায় তিনি জীবনের সমস্ত কৃত পাপ মুক্ত হবেন। মুর্শিদকুলী খাঁ হয়ত তখন ধারণা করেননি যে এত বড় এত দৃষ্টিনন্দন মসজিদটি বেশিদিন আবাদ থাকবে না। উনিশ শতকের ভূমিকম্পে মসজিদের ছাদের পাঁচটি গম্বুজের দু'টি ধসে পড়ে সেই থেকে ছাদ সে রকমই উন্মুক্ত রয়েছে। আর এখন মুসল্লিরা নয় শখের পর্যটকরা নির্দ্বিধায় মসজিদটি একটি দৃষ্টিনন্দন পুরাকীর্তি হিসাবে দেখতে আসেন।

আমরা মসজিদের সিঁড়ি বেয়ে মূল চত্বরে প্রবেশ করলাম। খোলা চত্বরটি ইটের আর উত্তর দক্ষিণে দুর্গের মত পুরু দেয়াল ঘেরা। এই চত্বরেও প্রায় কয়েক হাজার মুসল্লিদের সংকুলান হত। মূল মসজিদের দালানে একটি মূল মেহরাব আর দু'পাশে আরও একটি করে মেহরাব রয়েছে। মসজিদটির ভেতরে কোথাও অলংকারকৃত নয়। তবে মূল মেহরাবের খিলানের উপরে এবং মসজিদের দালানে প্রবেশের মূল দরওয়াজায় ফার্সিতে কিছু লিখা রয়েছে। মসজিদের পূর্বধারেও আরও দু'টি মিনার ছিল। চারকোণায় চারটি মিনার ছিল যার উপরে উঠবার ব্যবস্থাও ছিল। বর্তমানে মাত্র দু'টি অবশিষ্ট রয়েছে যার বিবরণ আমি আগেই দিয়েছি।

আমরা মসজিদটি ঘুরে ঘুরে দেখে মূল দালানের দক্ষিণ পাশের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলাম। মসজিদের দালানের দু'পাশে বহু প্রকোষ্ঠ বানানো। দৃশ্যত মনে হল এ মসজিদে যখন ছাত্রদের পড়ানো হতো হয় এগুলোই ছিল তাদের বাসস্থান। হয়ত

www.pathagar.com

এখানে মসজিদের খেদমতগাররাও থাকতেন। আমরা মসজিদের সীমানা থেকে যখন রাস্তায় উঠলাম তখন অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। সামনের দোকানগুলোতে টিমটিম করে কোথাও মোমের কোথাও কেরোসিন বাতি জ্বলছে। কামরুল ঘোড়াগাড়িতে বসা। আমি আর আমানউল্লা সামনের এক দোকানে দাঁড়িয়ে তেষ্টা নিবারণের জন্য কোমল পানীয় নিলাম। সমস্ত দিনের ঘোরাঘুরি আর ভ্যাপসা গরমের কারণে বেশ ক্লান্তি বোধ করছিলাম। মনে হচ্ছিল গায়ে আর শক্তি নেই। হোটেলে ফিরে গোসল না করা পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবনা।

দোকানের সামনে কাঠের বেঞ্চে বসে পড়ে বিদ্যুতের পরিস্থিতি কথা জিজ্ঞাসা করলে দোকানের পরিচালক মহিলা বললেন, 'সেই দুপুর থেকে এখানে বিদ্যুৎ নেই। মুর্শিদাবাদে এমনটি সচরাচর হয় না। কখন আসবে তাও জানি না বাপু।' মনে মনে শংকিত হলাম তার মানে হোটেলে গিয়েও বিদ্যুৎ পাব না। জেনারেটরের সংযোগ পেলেও এসি কাজ করবে না। কাজেই রাতে যদি না পাওয়া যায় তবে রাতটা অস্বস্তিতে কাটাতে হবে। হয়েছিলও তাই। হোটেলে ফিরলে রিসিপশনিস্ট জানালেন যে, রাতে বিদ্যুৎ আসার সম্ভাবনা কম। এখানে লোডশেডিং তেমন হয় না, তবে গ্রিডে কোথাও কোন মেরামতের কাজ চললে চলতেও পারে। রাতটা অবশ্য কেটেই গিয়েছিল বৈদ্যুতিক পাখা আর সারা রাত ভর হোটেলের জেনারেটরের সুবাদে। শরীর ক্লান্ত ছিল তাই ঘুমের ব্যাঘাত ঘটেনি। মনে মনে ভাবছিলাম বিদ্যুৎ বিভ্রাট আমাদের পিছু ছাড়ছে না। এ যেন 'অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকিয়ে যায়।'

হোটেলে পৌঁছে সোহেলকে আজকে দিনের মত বিদায় দিয়ে কাল সকাল নয়টায় আসতে বলেছিলাম। সোহেল বললেন যে কাল তিনি আমাদেরকে প্রথমে মতিঝিল নিয়ে যাবেন, সেখান থেকে আমাদেরকে সদরঘাটে নামিয়ে দেবেন খোশবাগ যাবার জন্যে। তিনি ঘাটেই থাকবেন, ফিরতি পথে আরও কিছু জায়গা দেখিয়ে হোটেলে নিয়ে আসবেন। আমাদের মুর্শিদাবাদ ছাড়বার দিন সকালে তিনি হাজারদুয়ারীতে নিয়ে আসবেন। যদিও হাজারদুয়ারী আমি আর কামরুল মাত্র নয় মাস পূর্বেই দেখেছি, যার বিশদ বিবরণ দিয়েছি তথাপি এবার আমানউল্লাকে সাথে নিয়ে আবার যেতে হবে।

www.pathagar.com

বিশ
খোশবাগ–সিরাজের সমাধি

পরের দিন সকালে হোটেল রেস্তোরাঁয় নাস্তা করতে এসে অব্যবস্থার কারণে শহরে অন্য কোথাও নাস্তা করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে দেখলাম নির্ধারিত সময়ে সোহেল শেখ, এসে পৌঁছেননি। তবে হোটেলের সামনে এক তরুণ ঘোড়ার গাড়িওয়ালা গাড়ি সমেত দাঁড়ানো। আমাদের দেখতেই এগিয়ে এসে বলল, 'স্যার আপনাদের কি খোশবাগ এবং মতিঝিল যাবার কথা?'

আমি বললাম, হ্যাঁ। শুধু খোশবাগ মতিঝিলই নয় আরও কয়েকটি জায়গায়ও যাবার কথা, কিন্তু আমাদের সাথে তো সোহেল শেখ রয়েছে।'

এবার তরুণ গাড়িওয়ালা বলল, 'স্যার আমার নাম মুন্না শেখ আমাকে সোহেল ভাই পাঠিয়েছেন। উনি একটু অন্য কাজে ব্যস্ত। আমি তার চাচাতো ভাই।'

'তুমি কি আমাদের ওই সব জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে?' আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললাম। 'স্যার আমি মতিঝিল চিনি তাছাড়া অন্য জায়গা চিনি না। তবে আপনাদের সদরঘাটে নামিয়ে দিতে পারব।' এবার আমানউল্লা বলল, 'সোহেল শেখের সাথে আমাদের চুক্তি সেতো আমাদেরকে ফোনে জানাতে পারত। কাজটা ভাল করেনি।

'স্যার আমিও ওই চুক্তির মধ্যেই এসেছি।'

'ঠিক আছে চল আমাদেরকে ভাল কোথাও নাস্তা খেতে নিয়ে যাও– বলে কামরুল বাক্য ব্যয় না করে মুন্না শেখের গাড়ির সামনে বসবার জায়গায় উঠে পড়ল। কামরুলের সাথে আমানউল্লাহ আর আমি পিছনমুখী হয়ে পিছনে উঠে পড়লাম। মুন্না শেখের গাড়ি শহরের চকবাজারের ত্রিপোলি গেটের ভিতরের রাস্তা দিয়ে রেলওয়ে স্টেশনের পথ ধরল।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বৃষ্টি হবে হবে ভাব। গতকাল বেশ গরম ছিল। তার উপরে রাতে ছিল বিদ্যুৎ বিভ্রাট ; রাতে বৃষ্টি হয়েছিল সে কারণেই সকালের আবহাওয়া বেশ সহনীয় রয়েছে। ছোট শহরের রাস্তার খানা-খন্দকগুলো পানিতে ভরা। বাড়িঘরগুলোর রং বিবর্ণ। সকালে দোকানপাট খোলেনি, তবে রাস্তার পাশে সস্তা আর বাহারি নামের রেস্তোরাঁগুলোতে সকালের নাস্তার জন্য পরাটা বা লুচি তৈরির প্রস্তুতি চলছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হল। মুন্না শেখকে জিজ্ঞাসা করলাম সে কোথায় নিয়ে যাবে। কারণ, এসব

www.pathagar.com

রেস্তোরাঁয় নাস্তা করবার মত পরিবেশ নেই। সে জানালো আমাদেরকে স্টেশনের কাছে নতুন এক হোটেল ইন্দ্র জিৎ-এর রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর আমরা ওই হোটেলে পৌঁছলাম। এই হোটেলও আমরা যেটায় আছি ওই মাপেরই। রেস্তোরাঁয় একমাত্র পরিবেশককে নাস্তার অর্ডার দিলাম। নাস্তা শেষে মুন্নার গাড়িতে চড়লে সে আমাদেরকে অন্যপথে নিয়ে চলল। আমার পরনে রাতের শোবার কাপড়। ভেবেছিলাম হোটেলে ফিরে কাপড় বদলিয়ে পুনরায় বের হব। আমার পায়ে চপ্পল। অনেক অলিগলি ঘুরে অপেক্ষাকৃত কম বসতির এক এলাকায় আসলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'আমরা মতিঝিলের কাছাকাছি চলে আসছি।' মুন্নার জবাব।

আমার আক্কেল গুড়ুম হবার যোগাড়। বললাম, 'এ কাপড়ে মতিঝিল। পায়ে জুতাও নেই। হাঁটতে হলে হাঁটাও যাবে না।'

'খুব বেশি হাঁটতে হবে না স্যার। আমি তো ভাবলাম আপনারা নাস্তা সেরেই মতিঝিল যাবেন।'

'আচ্ছা চল ঠিক আছে। আসলামই যখন তখন দেখেই যাই।' আমানউল্লা মুন্নার কথার পিঠে বলল।

অগত্যা চপ্পল পায়ে কোনরকমে গাড়ি থেকে নেমে কাদামাটির মধ্য দিয়ে কিছু দূর হেঁটেই মতিঝিল একমাত্র অবশিষ্ট স্থাপনা কালা মসজিদের সামনে আসলাম। মসজিদটি পরিত্যক্ত। এএসআই-এর সম্পত্তি। সামনেই ইতিহাস খ্যাত মতিঝিল। এটি একসময় ভাগিরথী নদীর একটি স্বল্প গভীর লুপ ছিল। নবাব আলীবর্দী খাঁ-এর জামাতা বাংলার ইতিহাসের খলনায়িকা বলে পরিচিত ঘসেটি বেগমের স্বামী তাঁর স্ত্রীর জন্য এক আলীসান প্রাসাদ বানাতে গিয়ে এই ঝিলের জন্ম দিয়েছিলেন। জলাশয়টি ঘোড়ার খুরের মত আকারের যার মাঝে ছিল এই প্রাসাদ। তথ্যে প্রকাশ এখানে ঝিনুক চাষ করা হতো মুক্তা উৎপাদনের জন্যে। সে কারণেই এর নাম মতিঝিল।

এখানে এ প্রাসাদে ঘসেটি বেগম সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছিলেন। সিরাজও তার মাসিকে জব্দ করবার জন্য ভাগিরথীর অপর পারে তৈরি করেছিলেন হীরাঝিল প্রাসাদ। ওই প্রাসাদটি এখন আর নেই। নদী গহ্বরে বিলীন হয়ে গেছে।

সিরাজ যখন বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তিনি ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ঘসেটি বেগমের প্রাসাদটি গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। মেহেরুন্নেসা ওরফে ঘসেটি বেগমের যাবতীয় ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন। আরও পরে ঘসেটি বেগমকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। এর বিবরণ আমি আগেই দিয়েছিলাম। মতিঝিল এখনও রয়েছে তবে এখন মাছের চাষের জন্যে ইজারা দেয়া রয়েছে।

www.pathagar.com

এই মতিঝিলের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভ গভর্নমেন্ট হাউজ বানিয়েছিলেন ঠিক ওই স্থানে যেখানে মতিঝিল প্রাসাদ ছিল। সেই স্থাপনাটিও নেই।

আমরা কালা মসজিদের সামনে দাঁড়ানো। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট ছোট মসজিদটি মতিঝিলের ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। মসজিদটির সামনে, পূর্বদিকে, ছোট দেয়াল দিয়ে ঘেরা কয়েকটি কবর রয়েছে যার মাঝখানের কবরটি নওয়াজেশ খাঁ-এর সমাধি। নওয়াজেশ খাঁ ছিলেন ঘসেটি বেগমের স্বামী এবং ঢাকার শাসক নবাব। পাশে নওয়াজেশ খাঁ-এর পালক পুত্র ইকরামুদ্দৌলা এবং তার এক শিক্ষক। মসজিদের পশ্চিম দিকে একটি রাজকীয় ফটক এখনও জরাজীর্ণ অবস্থায় দণ্ডায়মান। এটিই তৈরি করেছিলেন নওয়াজেশ খাঁ। এই নওয়াজেশ খাঁই তার পালকপুত্র, সিরাজের ভাই একরামউদ্দৌলার বিয়ের আসরে নাচবার জন্য বেনারস থেকে দুই বাঈজী মুন্নী ও বাব্বু বেগমকে এনেছিলেন। পরে এরাই হয়েছিলেন মীর জাফরের দুই বেগম।

মসজিদের দক্ষিণ দিকে একটি ভগ্নপ্রায় জানালা দরওয়াজা বিহীন কুঠরি রয়েছে। তিন দিক জঙ্গলে ছেয়ে ফেলেছে। শুধুমাত্র উত্তর দিকের দেয়াল দেখা যায় যেখানে রয়েছে দেয়ালভাঙার প্রয়াসের চিহ্ন। কিংবদন্তিতে চাওর আছে যে সিরাজ যখন মতিঝিল আক্রমণ করবার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তখন ঘসেটি বেগম বহু ধনরত্ন এ ঘরটিতে লুকিয়ে বন্ধ করে ফেলেন। স্থানীয়রা এখনও বিশ্বাস করে যে যারাই এই ঘর ভাঙতে উদ্যোগী হয়েছেন তারা ভাঙতে পারেনইনি বরং কিছুদিনের মধ্যেই অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। এমনি একজন ছিলেন এক ইংরেজ কর্মকর্তা যিনি এসব কথায় বিশ্বাস না করে বহু চেষ্টায়ও ভাঙতে পারেননি। এমনকি কামানও দেগে ছিলেন। ওই ঘটনার দু'একদিনের মধ্যেই গলায় রক্ত উঠে মারা যা ওই ইংরেজ ব্যক্তি। এ ঘটনার সত্যতা কতখানি আছে তা বিবেচনার বিষয়, তবে মসজিদের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটি ছোট স্মৃতিফলক রয়েছে যেখানে ইংরেজিতে কয়েকটি নাম লেখা রয়েছে। স্থানীয় একজনকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানালেন এ সব নাম ওই ব্যক্তির পরিবারের যারা ওই ইংরেজের মৃত্যুর পরপরই বিভিন্ন রোগে মারা গিয়েছিল। ওই ফলকটির উপরে ১৯১৫ লেখা। তবে কোন সময় এ ঘটনা ঘটেছিল তার সময় ওই ফলকে অস্পষ্ট।

আমরা রহস্যাবৃত ওই ঘরটির সামনে দাঁড়িয়ে দেয়ালের এ অংশে বেশ পুরাতন ক্ষতচিহ্ন দেখলাম। ক্ষতচিহ্ন দেখে মনে হল এখানে খুব কম দূরত্ব হতে কামান জাতীয় কিছু ব্যবহার করা হয়েছিল। পরে জানতে পারলাম ইদানিং এ ঘরটিও এএসআই (ASI) এর সংরক্ষিত তালিকায় দর্শনীয় স্থানের মধ্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। হয়ত এএসআই আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে ঘরটি না ভেঙেও এর ভিতরে কি আছে তা নিরূপণ

www.pathagar.com

করতে পারবে। তা হলে হয়ত এর রহস্য উদ্ঘাটন হতে পারে।

আমরা বেশ কিছুক্ষণ মতিঝিলে কাটিয়ে হোটেলে ফিরতি পথে বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে পড়েছিলাম। রুম থেকে কাপড় পাল্টিয়ে আমরা যখন ভাগিরথীর তীরে সদরঘাটের দিকে রওয়ানা হলাম তার আগেই বৃষ্টি বন্ধ হয়ে মেঘের ফাঁকে সূর্যের লুকোচুরি দেখলাম। সেদিন মেঘে আর সূর্যের রশ্মিতে লুকোচুরি চলেছিল সন্ধ্যা পর্যন্ত। মাঝে মধ্যে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিও হয়েছে।

আমরা হাজারদুয়ারীর নহবৎখানা পার হয়ে ভাগিরথীর তীর ধরে ওয়াসেফ মঞ্জিল পার হয়ে সদরঘাটে পৌঁছলাম তখন বেলা এগারোটা। ওয়াসেফ মঞ্জিল তৈরি করেছিলেন মীরজাফরের পরবর্তী বংশধর ওয়াসেফ আলী। বৃটিশ রাজের সময়ে তিনি মুর্শিদাবাদের শেষ স্বীকৃত নবাব ছিলেন। বর্তমানে নতুন এবং পেছনে আরও পুরাতন জরাজীর্ণ প্রাসাদটিও ভারতের এক শিল্পপতি ক্রয় করে হোটেলে রূপান্তরিত করবেন বলে আমাদেরকে সোহেল শেখ জানিয়েছিলেন।

আমরা সদরঘাটের ফেরিঘাটে। বিচিত্র এই ফেরি। কেরোসিন চালিত ইঞ্জিন বোটের উপরে বাঁশের পাটাতন যার দ্বারা যাত্রীসহ রিক্সা ভ্যান ঘোড়ার গাড়ি এমনকি প্রয়োজনে হালকা মোটরযানও ফেরি করা যায়। ভাগিরথীর উপরে কোন সেতু না থাকায় এই ফেরিই পারাপারের একমাত্র অবলম্বন। বর্ষা মৌসুম তাই ভাগিরথী কানায় কানায় পূর্ণ। নদীতে বেশ স্রোতের টান রয়েছে। আমরা নদীর পাড়ে এক বটগাছের নিচে ফেরির অপেক্ষায় বসে রইলাম। ঘাট পারাপারের জন্যে কামরুল তিনজনের পক্ষে পনের রুপি পরিশোধ করল। মুন্না শেখ আমরা ফেরত না আসা পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করবে।

আমরা তিনজন ফেরিঘাটে অপেক্ষা করছি। সামনে ঐতিহাসিক ভাগিরথী নদী। উত্তর হতে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত এই নদী। বর্ষা মৌসুম বলে স্রোত রয়েছে। দক্ষিণে গিয়ে মিশেছে গঙ্গা বা হুগলীর সাথে। এই নদীর তীরেই ঘটেছে বাংলার ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ের ঘটনাগুলো। তখন এই নদীর গন্তব্যে পথ বেশ কিছু জায়গায় ভিন্নতর ছিল। আজ এর গন্তব্যে পথ অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। এ নদীর গহ্বরে বিলীন হয়েছে বহু প্রাসাদ আর গ্রাম। তখন এই নদী উন্মুক্ত ছিল। ছিল যৌবনে ভরপুর। এখন এ নদী বহুলাংশে শাসিত। চলার পথে নেই সেই উন্মাদনা আর বেহিসাবি গতি।

কিছুক্ষণ আগে ছেড়ে যাওয়া ফেরি ওপারে পৌঁছবার আগেই ওপার থেকে অনুরূপ আরেকটি ফেরি এদিকে রওয়ানা হল। উপরের পাটাতনে বসা ওপারের বহু গ্রামের মানুষ। হাতে গোনা কয়েকটি মোটর সাইকেল। ওপারে এখনও শুধু গ্রাম আর রয়েছে ইতিহাসের সাক্ষী কিছু স্থাপনা। ফেরিটি এ পারে আসলে আস্তে আস্তে যাত্রীরা নেমে গেলে আমরা উঠে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাদের সাথের যাত্রীরা সবাই ওপারের সাধারণ

www.pathagar.com

মানুষ। আমরা আগেই জেনেছিলাম যে ওপারে বাহন শুধু তিন চাকার প্যাডেল রিক্সা আর তিন চাকার প্যাডেল ভ্যান। এ ধরনের ভ্যানের প্রচলন বাংলাদেশেও আছে তবে কোনদিন চড়বার অভিজ্ঞতা হয়নি।

যথারীতি ইঞ্জিনচালিত নৌকার বাঁশের তৈরি পাটাতনের উপর একগাদা লোক জড়োসড়ো হয়ে রয়েছে। আর আমরা বাঁশের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রায় পাঁচ ছয় মিনিট পর আমরা ওপারে গিয়ে পৌঁছলাম। পাড়ে উঠতেই রিক্সা আর রিক্সা ভ্যানের ডাকাডাকি। এক রিক্সা ভ্যানকে জিজ্ঞাসা করলাম যে খোশবাগসহ অন্যান্য জায়গা ঘুরে ঘাটে নিয়ে আসতে কত নেবে। রিক্সা ভ্যানওয়ালা বললেন, 'খোশবাগ, রৌশনীবাগ, কিরীটিশ্বরী মন্দির এবং একলিঙ্গের মন্দির দেখাতে তিনশত টাকা দেবেন স্যার।'

দরদস্তুর করে দুইশত টাকায় রাজি হলে আমরা তিনজন রিক্সা ভ্যানে উঠলাম। এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আমাদের সকলেরই প্রথম অভিজ্ঞতা। রিক্সা ভ্যানটির দু'পাশে লোহার এঙ্গেল যাতে যাত্রী পড়ে না যায়, আর দু'পাশে কাঠের সরু বেঞ্চ পাতা। দৃশ্যত মনে হলো চারজন যাত্রীর জায়গা হলেও হয়ত গাদাগাদি করে যাত্রী বহন করে। সামনাসামনি বসলে পা গুটিয়ে বসতে হয় তবে তিনজন ছিলাম তাই যা রক্ষা। রিক্সাভ্যান আমাদেরকে নিয়ে প্রথমে খোশবাগের দিকে রওয়ানা হল।

ঘাটের কাছেই বেশ অনেকগুলো কাঁচা পাকা দোকান। বেশির ভাগই চা নাস্তার আর কয়েকটি সাইকেল এবং মোটর সাইকেল মেরামতের দোকান। কয়েকটি ছোট ছোট দালান আর বাকিগুলো বাঁশের ঝুপড়ি যেমনটা আমাদের দেশেও গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়। এ ধারটা একেবারেই গ্রাম আর গ্রাম্য দৃশ্য। আমরা খোশবাগের রাস্তায় উঠলাম। মাঝে মধ্যে ভ্যানের ঝাঁকুনি খেতে হচ্ছে। রাস্তাটি সরু হলেও মোটামুটি পিচঢালা। এ ধারে ছোট অথচ দৃষ্টি নন্দন কয়েকটি পাকা দালান আর বেশিরভাগ গ্রাম্য বাড়ি কাঁচাপাকা উপরে টিনের চাল। প্রায় সব বাড়ির কাঁচাপাকা দেয়ালে গোবরে ঘুটে শুকাতে দেয়া হয়েছে। যেতে যেতে দেখলাম বেশ কিছু পুকুর গ্রাম্য বাড়ি আর বেশির ভাগ ক্ষেতই পানির তলায়। এখানকার গ্রামের সাথে আমাদের গ্রামগুলোর তুলনা করলে বলা যেতে পারে ইদানিং বাংলাদেশের গ্রামগুলোর চেহারা এসব গ্রামের তুলনায় বেশি উজ্জ্বল। এখানকার মানুষজন নেহাতই গরিব শ্রেণীর বলে মনে হল।

প্রায় পনের মিনিট চালাবার পর ভ্যানচালক আমাদেরকে বহু প্রতীক্ষিত খোশবাগ, আলীবর্দী খাঁ-এর সমাধির গেটের সামনে নিয়ে আসলেন। বললেন, 'স্যার এটাই খোশবাগ।' তখনও মেঘ আর রোদের লুকোচুরি চলছে। বেশ গরম আর গুমোট আবহাওয়া। আমরা তিনজনেই নেমে ফটকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম টিকেট কাটতে হবে কিনা? সেখানে বসা একজন বললেন, 'এখানে টিকেট কাটতে হয় না তবে এখানে প্রায় সত্তরটি কবর রয়েছে এগুলোর উপরে নাম লেখা নেই। আপনারা

www.pathagar.com

প্রয়োজনে স্থানীয় গাইড নিতে পারেন।'

আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে একজন গাইড নেয়াই ভাল হবে। একজন এগিয়ে এসে পরিচয় দিলেন। নাম হাবিব শেখ। ত্রিশের কোঠায় বয়স। তরুণ। পরনে প্যান্ট আর গায়ে একটি টি শার্ট পায়ে চপ্পল। তিনি জানালেন তিনি স্থানীয় গাইড সংস্থার একজন এবং সংস্থার রেট হিসাবে দু'শত টাকা গাইড ফি দিতে হবে। আমরা রাজি হয়ে মূল ফটকে প্রবেশ করলাম। ফটকের একপাশে এএসআই (ASI) এর নোটিশ লাগানো; এ স্থাপনাটি পুরাকীর্তি হিসাবে সংরক্ষিত।'

আমরা গেট পার হলাম। গেটটি অনেকটা মোগল স্থাপত্যের আদলে তৈরি। দু'পাশে বেশ কয়েকটি প্রকোষ্ঠ রয়েছে যেখানে এক সময় পাহারাদার সৈনিকরা থাকত। পুরো সমাধি ক্ষেত্রটি সুউচ্চ দেয়াল দিয়ে ঘেরা। মাঝখান দিয়ে পায়ে চলা পথ। গাইড আমাদেরকে জানালেন যে, সমাধি সৌধগুলোর ভিতরে যেতে হলে জুতা খুলতে হবে। আমাদের শেষ স্বাধীন নবাবকে আমরা এতটুকু সম্মানই জানাতে পারি।'

আমরা হাবিব শেখের পেছনে পেছনে হাঁটছি আর তার বর্ণনা শুনছিলাম। এই দেয়ালে ঘেরা জায়গায় মূলত তিনটি স্থাপনা রয়েছে। পশ্চিম দিকে যেতেই প্রথমে সুউচ্চ দেয়াল দিয়ে ঘেরা কয়েকটি কবর। হাবিব জানালেন এর ভেতরে রয়েছে শুধুমাত্র কয়েকজন বেগমদের কবর যে কারণে দেয়াল দিয়ে পর্দা করা আছে। এরই উত্তরদিকে উঁচু প্লাটফমের উপর উন্মুক্ত অবস্থায় সতেরটি কবর। আরেকটি পশ্চিমে দেয়ালঘেরা অংশের বরাবর সাধারণ ধরনের ইট-সিমেন্টের তৈরি সমাধি সৌধ তার ঠিক মধ্যখানে নবাব আলীবর্দীর পাশে সিরাজ-উদ-দৌলা এবং তার পরিবারের কবর।

আমরা দেয়ালঘেরা অংশের উঁচু পাকা অংশে উঠবার পূর্বে জুতা খুলে সামনের সিঁড়িতে দাঁড়ালে প্রথমে হাবিব খোশবাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেন। এ জায়গাটির নাম 'খোশবাগ' প্রায় ত্রিশ একরের উপর তৈরি এ বাগান ছিল আলীবর্দী খাঁ-এর অত্যন্ত প্রিয় জায়গা। ওই সময় এর নাম ছিল খুশবু বাগান। এখানে প্রায় একশত প্রকারের গোলাপের এবং অন্যান্য সুগন্ধি ফুলের বাগান ছিল। তৈরি করেছিলেন সিরাজের দাদা আলীবর্দী খাঁ। বর্তমান সমাধির পশ্চিমে, পশ্চিম দেয়ালঘেঁষা তিন গম্বুজের ছোট একটি মসজিদ রয়েছে, যা বর্তমানে বন্ধ, সেখানে নবাব আলীবর্দী খাঁ নামাজ পড়তেন। তিনি বহু সময় এই বাগানে ফুলের সুগন্ধীর মধ্যে কাটাতেন।' এখন সে ধরনের বাগান না থাকলে সমস্ত জায়গাটির সবুজ ঘাসের চত্বর যত্ন করে পরিপাটি করে রাখা রয়েছে। রয়েছে বেশ কিছু গাছ-গাছালি।

আমরা গাইডের পেছনে পিছনে হেঁটে দেয়ালের দক্ষিণ দিক হয়ে পশ্চিম প্রান্তের গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। কামরুল একটু পিছনে ছিল তাইপূর্ব প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করল। উপর খোলা কোন ছাদ বা আচ্ছাদন নেই। উন্মুক্ত আকাশের চাদর দিয়ে

www.pathagar.com

যেন ঢাকা। ভিতরে তিনটি সমাধি। দু'টি আমাদের প্রান্তে পাশাপাশি আর একটি আলাদা পূর্ব প্রান্তে। হাবিব শেখ বললেন, 'পূর্ব প্রান্তে যে আলাদা কবরটি দেখছেন সেটি আলীবর্দী খাঁ-এর স্ত্রী শরিফুন্নেসার কবর। এই শরিফুন্নেসা শুধু অন্তপুরেই থাকতেন না তিনি বহু যুদ্ধে আলীবর্দী খাঁ-এর পাশে থেকেছেন। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কারণেই নবাব সঙ্কটের সময়ে এই মহীয়সী নারীর পরামর্শ নিতেন। আলীবর্দী খাঁ-এর মৃত্যুর পর তিনি সিরাজের পাশেও দাঁড়িয়েছিলেন। অলৌকিকভাবে তিনি মীরনের হত্যাযজ্ঞ থেকে রেহাই পান। পরে তার স্বাভাবিক মৃত্যু হলে তাকে এখানে দাফন করা হয়।'

হাবিব শেখের বর্ণনার মধ্যে ভক্তি আর শ্রদ্ধার আভাস পেলাম। প্রায় সমস্ত সময়েই তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে নবাব পরিবারের মৃত্যুর পরিস্থিতি আর শেষ সময়ের বিবরণ দিতে দেখেছি। এবার তিনি আমাদের সামনের দু'টি কবরের প্রথমটি দেখিয়ে বললেন 'এটিই হচ্ছে সিরাজের মাতা আমিনা বেগমের কবর আর তার পাশেরটি সিরাজের খালা আমিনা বেগমের বোন ঘসেটি বেগমের কবর। তবে ঘসেটি বেগমের একটি হাত পাওয়া গিয়েছিল তারই কবর এটি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ঘসেটি বেগমকে ঢাকা থেকে আনবার পথে মীরন ডুবিয়ে মারেন। কিন্তু সিরাজের বেগম লুৎফুন নিসা বেঁচে গিয়েছিলেন। সে কথায় পরে আসব।'

হাবিব শেখ তার বিবরণ শেষ করে দেয়ালের বাইরে উত্তর দিকে একটি বড় বেদিতে উঠলেন। আমরাও উঠলাম। তিনি ওই বেদিতে পূর্ব-পশ্চিমে সতেরটি কবর দেখিয়ে বললেন, 'দেখবেন মাঝের কবরটি অন্যান্যগুলোর থেকে একটু উঁচু। এখানে এগুলো কার কবর কোন নাম লিখা নেই। পূর্বপ্রান্তের একটি কবরের চারিপাশে 'আয়াতুল কুরসি' খোদাই করা রয়েছে।' তিনি আমাদের সে কবরটি দেখিয়ে বললেন, 'যতদূর তথ্য পাওয়া যায় তাতে প্রকাশ যে এরা সবাই পলাশীর যুদ্ধের আগেই ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন। সিরাজ যখন মীরনের হাতে বন্দি তখন এদের নিয়ে যাওয়া হয় সিরাজকে দেখাতে। পরে নির্মমভাবে এনাদের হত্যা করে এখানে দাফন করা হয়। হয়ত এনারা নবাব পরিবারের সদস্য হয়ে থাকবেন।'

আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম। হাবিব শেখের কথা শুনে মনে হল মীরন হত্যার নেশায় উন্মাদ ছিলেন। সিরাজের গুণগ্রাহীদেরকেও তিনি হত্যা করতে ইতস্তত করেননি।

আমরা পশ্চিম দিকে মূল সমাধি দালানের দিকে হাঁটছিলাম। ওই সমাধি চত্বরের সামনে আরেকটি দেয়াল দিয়ে আলাদা করে রাখা। ওই অংশে ঢুকতেই দক্ষিণ দিকে একটি গাছের নিচে একটি কবরের সামনে হাবিব দাঁড়ালেন বললেন, 'এই যে কবরটি দেখছেন এটি ওই সেই ব্যক্তির যিনি সিরাজকে চিনতে পেরে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। দানা

www.pathagar.com

শাহ্ দরবেশ বলে কথিত ব্যক্তি। সিরাজ ধরা পড়লেন শুধুমাত্র তার রাজকীয় জুতার কারণে। কথিত আছে কোন এক সময় সিরাজ ক্রোধের বশে দানাশাহের নাক কেটেছিলেন। এটা সম্পূর্ণ বানোয়াট কথা।' হাবিব শেখ কিছুটা আবেগের সাথে বললেন, 'বিশ্বাসঘাতক তার উচিত শাস্তি পেয়েছিল। সিরাজকে ধরবার পর তিনি এ কাজ বাবদ অর্থের দাবি করলে মীরন, ক্লাইভের পরামর্শে, তাকে এবং তার পরিবারের সকলকে হত্যা করে পরে সপরিবারে এখানে দাফন করা হয়। লক্ষ্য করে দেখুন এখানে তিনটি কবর রয়েছে। হাবিবের কথা শুনে কামরুল বলে উঠল, 'নিমক হারামীর উচিত শাস্তিই হয়েছে।' আমরা চুপচাপ মূল সমাধি সৌধের দিকে পা বাড়ালাম।

মধ্যের দেয়ালের অপরপ্রান্তে আসতেই হাঁটা পথের দক্ষিণ দিকে পাশাপাশি তিনটি কবরের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন হাবিব। বললেন, 'মাঝের কবরটি গোলাম হোসেনের। আপনারা জেনে থাকবেন গোলাম হোসেন ছিলেন সিরাজের সর্বসময়ের সহচর। যখন সিরাজ তার জীবনের অন্যতম ভুলটি করে মীরজাফরকে সিপাহসালার বানালেন তখন গোলাম হোসেন বলেছিলেন 'হুজুর একি করলেন এই ধূর্ত শিয়ালকে রাজা বানালেন?' হাবিব শেখ কিছুক্ষণ দম নিয়ে বললেন, 'উত্তরে সিরাজ বলেছিলেন, উপায় নেই গোলাম হোসেন।' এই উক্তিটি আজও কোন ব্যক্তির অসহায়তা প্রকাশ করতে ব্যবহার করা হয়।' এবার হাবিব শেখ দু'পাশের দু'টি কবর দেখিয়ে বললেন পশ্চিমেরটি আব্দুল হোসেন খোজা আর পূর্ব পাশেরটি সাব্দুল হোসেন খোজার। এ দু'জনই ছিলেন সিরাজের বিশ্বস্ত একান্ত দেহরক্ষী। সিরাজ হত্যার পরপরই মীরন এই তিনজনকে নির্মমভাবে হত্যা করে এখানে দাফন করেন। হাবিব শেখ এবার আমাদের নিয়ে চললেন আলীবর্দী তথা বাংলার হতভাগ্য নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সমাধি সৌধের দিকে।

সমাধি সৌধের দিকে কয়েক পা এগুতেই হাবিব থমকে দাঁড়ালেন। দক্ষিণ দিকের দেয়াল ঘেঁষে সবুজ ঘাসের চাদরে ঢাকা ঈষৎ উঁচু জায়গা দেখিয়ে বলেন, 'এই উঁচু জায়গাটা দেখছেন এখানে একটি ঘর ছিল। এখানেই আমৃত্যু সিরাজের বেগম লুৎফুননেসা, যার কবর আপনারা দেখতে পাবেন একটু পরে, থাকতেন। তিনি দাদা শ্বশুর আর সিরাজের কবর পরিচর্যা করতেন। জ্বালাতেন সন্ধ্যা প্রদীপ। জীবনের বাকি সময় কাটিয়ে শেষ বয়সে উন্মাদ হয়ে ১৭৮৬ সালে মারা গেলে সিরাজের পায়ের দিকে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।'

ওই জায়গাটিতে শুধু ভিটা রয়েছে। মনে হল কোন অস্থায়ী ঘরছিল এখানে। লুৎফুননেসা এখান থেকে কখনই বাইরে যাননি। এক অসহ্য দুঃখ বুকে নিয়ে উনত্রিশ বছর বেঁচেছিলেন সিরাজের বেগম। ভাবলে অবাক লাগে। সিরাজের প্রতি অগাধ ভালবাসাই তাঁকে এই শক্তি যুগিয়েছিল।

www.pathagar.com

লুৎফুননেসার বংশ পরিচয় অনাবৃত থেকে গেছে। বাল্যকালেই তিনি ক্রীতদাসী হিসাবে নবাব আলীবর্দীর অন্দরে আশ্রয় পেয়েছিলেন। বয়স বাড়বার সাথে সাথে তার রূপের ছটা ছড়াতে থাকে আলীবর্দীর হেরেমে। রূপ, গুণে আর কোমল মনের পরিচয় সিরাজকে আকৃষ্ট করে। সিরাজ এ নারীর প্রেমে পড়লেন। তবে দু'জনের বিবাহের সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। সিরাজ যখন কাশিমবাজার কুঠি অবরোধ করেন তখন সিরাজের মাতা আমেনা বেগম ওয়াটস্-এর স্ত্রী বেগম জনসনকে প্রাসাদে নিয়ে আসলে লুৎফুননেসা আকুতি মিনতি করে ওয়াটস-এর স্ত্রীকে নিরাপত্তা দিয়ে ফোর্টউইলিয়ামে পাঠিয়েছিলেন। এ বিষয়ে আমি পূর্বে আলোচনা করেছি। এরপরে ওয়াটস যখন সিরাজের হাতে বন্দি হয়েছিলেন সে সময়ে লুৎফুননেসার কারণেই ওয়াটস সিরাজের হাত হতে মুক্তি পেয়েছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পরাজয়ের পর সিরাজ যখন পাটনার দিকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন সে সময় সিরাজের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন লুৎফুননেসা। অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেন সিরাজের মৃত্যুর পর। ঢাকায় অন্তরীণ ছিলেন বহুদিন। ক্লাইভের হস্তক্ষেপে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন। তারপর হতেই এখানেই ছিলেন।

লুৎফুননেসার ভরণ পোষণের এবং খোশবাগের তত্ত্বাবধানের জন্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ৩০৫ টাকা মাসোহারা হিসেবে বরাদ্দ করে। আরও ১০০ টাকা পেতেন তাঁর নিজের খরচের জন্যে। সমস্ত অর্থই তিনি ব্যয় করতেন খোশবাগ, বিশেষ করে স্বামীর সমাধি রক্ষণাবেক্ষণ করতে।

আমরা তিনজনেই আস্তে আস্তে সামনে সমাধি সৌধের বেদিতে উঠলাম। খোশবাগ তৈরি হয়েছিল ১৭৪০ সালে আর আলীবর্দী খাঁর বার্ধক্যজনিতকারণে মৃত্যু হয় ১৭৫৬ সালে। সিরাজ নবাবকে এখানে সমাধিস্থ করেন। সিরাজ জানতেন না আর এক বছর পর তিনি নির্মমভাবে প্রাণ হারাবেন আর নিজের খণ্ডিত দেহ সমাহিত হবে প্রিয় দাদুর পাশে।

আমরা তিনজনে নিশ্চুপ। কেমন যেন মনটা ভারী হয়ে উঠল। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা মাত্র এক বছর বাংলার মসনদে বসেছিলেন। এই এক বছর শান্তিতে কাটেনি। দোষে গুণের মানুষ ছিলেন সিরাজ। রাজকার্য চালাতে গিয়ে অনভিজ্ঞ সিরাজ ভাবাবেগে আপ্লুত হতেন। তিনি তাঁর দাদুর আমলের বেশির ভাগ দরবার সদস্যদের অনানুষ্ঠানিকভাবে বিদায় দিয়েছিলেন। নিয়োগ করেছিলেন তারই মত তরুণ অনভিজ্ঞদের। কথিত আছে এদের মধ্যে অনেককে অপমান সইতে হয়। যার মধ্যে ছিলেন মীরজাফর আলী খাঁ, ঢাকার নায়েব গভর্নর রাজা রাজবল্লভ, উঁমিচাদ আর জগৎ শেঠরা। এরাই কাল হয়ে দাঁড়ান সিরাজের জন্যে। সিরাজ বাংলাকে ইংরেজমুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। কারণ, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এ বেনিয়ারা একদিন বাংলা গ্রাস করবে। মৃত্যুর সময় দাদু তাই বলেছিলেন।

www.pathagar.com

হাবিব শেখ বেদিতে উঠে সৌধের ভিতরে গেলেন। মাঝের প্রকোষ্ঠটিতে একটু উঁচু একটি কবর। বললেন, 'এটাই নবাব আলীবর্দী খাঁ-এর কবর। এর চারপাশে মার্বেল পাথরের কাজ করা। এর সরাসরি দক্ষিণে ফরাসের উপর যে কবরটি এটিই হচ্ছে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার।' আমরা তিনজন নিশ্চুপ। মনে মনে দোয়া করলাম। অত্যন্ত সাদামাঠা কবর। উপরে পাথরের চাদর। সিরাজের মৃত্যুর সময়ের দৃশ্য কল্পনা করে কেমন যেন ভাবাবেগে আপ্লুত হলাম। কামরুল আর আমানউল্লা পাশে নিশ্চুপ দাঁড়ানো। হাবিব শেখও বেশ চুপ মেরে গেলেন। এতক্ষণে পিছনে এক পরিবার এসে দাঁড়িয়েছে। দুটি কিশোরী বেশ উচ্চগ্রামে কথা বলছিল। হাবিব বলে উঠলেন, 'চুপ করুন। আমরা সিরাজ-উদ-দৌলাকে একটু সম্মান দেখাই।'

সিরাজের প্রতি আলীবর্দী খাঁ বেশ দুর্বল ছিলেন। কারণ, সিরাজের, যার জন্ম নাম ছিল মীর্জা মাহমুদ, ওই দিনে জন্মগ্রহণ করেন যেই দিন আলীবর্দী খাঁ বিহারের শাসক নিয়োজিত হন। ধারণা করা হয়ে থাকে সে কারণেই সিরাজের প্রতি এই দুর্বলতা ছিল। সিরাজকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করাতে অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যার মধ্যে ছিলেন সিরাজের চাচাতো ভাই শওকত জং। আলীবর্দীর মৃত্যুর পূর্বে শওকত জংকে পুনিয়ার শাসক নিয়োজিত করে সবাইকে সিরাজের হাত শক্ত করতে বলেছিলেন কিন্তু তেমনটি হয়নি। শওকত জং আর সিরাজের বিরোধ চরম আকার ধারণ করলে শওকত জং সিরাজের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন। সিরাজের হত্যার পর শওকত জং-এর স্ত্রী মতি বেগমকেও মীরন হত্যা করেন যার সমাধিও রয়েছে এই সৌধে।

হাবিব শেখ এবার সিরাজের কবরের দক্ষিণ দিকে লাগোয়া আরেকটি কবর দেখিয়ে বললেন, 'এটাই বেগম লুৎফুননেসার কবর। মৃত্যুর পর তাকে এখানেই দাফন করা হয়। লুৎফুননেসার কবরের পূর্বদিকে যে কবরটি সেটি মোহনলালের বোন মাধবী ওরফে আলেয়ার কবর।'

'আলেয়া কি কোন বাস্তব চরিত্র ছিল।' কামরুল হঠাৎ নীরবতা ছেদ করে হাবিব শেখকে জিজ্ঞাসা করল।

'এটাইতো আলেয়ার কবর। এখানেই তো প্রমাণ রয়েছে। যদিও অনেকে প্রশ্ন তোলেন, তবে বাস্তবে তো তিনি ছিলেন।' হাবিব শেখের উত্তর।

সিরাজের কবরের পাশে আরও দু'টি কবর দেখিয়ে আমাদের গাইড বললেন, 'একটি সিরাজের ছোট ভাই মীর্জা মেহেদির, যাকে মীরন বুকে তক্তা চাপা দিয়ে মেরেছিলেন, আর তার পাশে সিরাজের পাঁচ বছরের একমাত্র কন্যা সন্তান উম্মে জোহরা।'

www.pathagar.com

'উম্মে জোহরাকেও মীরন হত্যা করে তাই নয় কি?'

আমি হাবিবকে জিজ্ঞাসা করলাম।

'ঠিক তাই। মীরন সিরাজের বংশের প্রায় সবাইকে হত্যা করে। কারণ, কোনভাবেই কোন উত্তরাধিকারী বেঁচে থেকে, মসনদের দাবিদার হোক তা চায়নি। অথচ এই মীরনের কপালেও বাংলার মসনদ জোটেনি।

হাবিব শেখ সমাধি সৌধ থেকে বের হয়ে পশ্চিমে দেয়াল লাগোয় তৈরি ছোট মসজিদটির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এখানেই নবাব আলীবর্দী খাঁ নামাজ পড়তেন। আলীবর্দী খাঁ ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু এবং ধর্মভীরু মানুষ। জীবনে মদ, আফিম জাতীয় কোন নেশার দ্রব্য স্পর্শও করেননি। তিনি একজন সৎ এবং লড়াকু ব্যক্তি ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেছেন।'

আমরা মসজিদের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ফিরবার পথ ধরলাম। পথে যেতে যেতে কামরুল আমার মতামত জানতে জিজ্ঞাসা করল, 'মীরন সিরাজকে হত্যা করে এখানে ধর্মমতে কবর দিল কেন? সে তো সিরাজের খণ্ডিত দেহ অন্য কোথাও গুম করে দিতে পারত?'

আমি এর কি উত্তর দেব। এটাইতো ইতিহাস। বললাম, 'হয়ত সিরাজ মারা গেছেন তা প্রমাণ করতেই অথবা মৃত ব্যক্তির উপর আর ক্রোধ দেখাতে চাননি। এমনও হতে পারে নবাবের লাশ সৎকারের জন্যে ক্লাইভের চাপও থাকতে পারে! অনেক কারণ নিশ্চয়ই ছিল।' পরে এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর কোন আলোচনা হয়নি। আমরা খোশবাগ থেকে বের হয়ে হাবিব শেখকে ধন্যবাদ জানিয়ে রিক্সা ভ্যানে বসলাম। রিক্সাভ্যান আমাদেরকে কিরীটেশ্বরী মন্দিরের দিকে নিয়ে চলল। ওখান থেকে ফিরতি পথেই ঘাটের কাছেই পড়বে রৌশনীবাগ আর ভাস্কর পণ্ডিতের মন্দির বা একলিঙ্গের মন্দির।

কিরীটেশ্বরী মন্দির কত দূরে তার কোন ধারণাই ছিল না। কেন দেখতে চাইলাম তাও বলতে পারছিলাম না। মন্দিরের পথে যেতে আমাদেরকে একেবারে নির্জলা গ্রামের খোয়া বিছানো, কিছু পাকা আর কিছু কাঁচা রাস্তা দিয়ে চলতে হচ্ছিল। রাস্তার দু'পাশে মাঝে মধ্যে কাঁচাপাকা গ্রাম্য বাড়িঘর দেখা যাচ্ছিল। ছোট ছোট আঙিনা আর বাগান। বাগানে বেশির ভাগ বাতাবি লেবুর গাছ। প্রতি গাছে অজস্র বাতাবি লেবু ধরে রয়েছে। লেবুগুলো এখনও কাঁচা রয়েছে। রাস্তার উপরে হাঁস-মুরগীগুলো ছুটাছুটি করছিল। কোথাও কোথাও পাড়ার শিশুরা চাকা ঘোরাচ্ছিল। আমাদের ভ্যান চালক মাঝে মধ্যে গর্ত পার হতে নেমে গলধঘর্ম হয়ে টানছিলেন।

রাস্তার দু'পাশে নিচু জমি। বর্ষার পানিতে জমিগুলো টইটম্বুর। কোন ফসল দেখা যায়নি। মনে হল আমরা ভাগিরথীর সমান্তরাল দক্ষিণমুখী। অপর পাড়ের ট্রেন লাইনে

www.pathagar.com

হুইসেল বাজিয়ে একটি ট্রেন দক্ষিণমুখী চলে গেল। ট্রেনের ভাষায় 'ডাউন ট্রেন'। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ জমে বৃষ্টির আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ছিল। বেশ কিছু দূর ভ্যান চলার পর রাস্তার অপর প্রান্ত থেকে তিনজন মহিলা সিক্ত বদনে রাস্তায় উঠে ভ্যানের পিছনে পিছনে আসছিল আর নিজেদের মধ্যে যে ভাষায় কথা বলছিল তা যে খাঁটি বাংলা নয় তাতে আমি নিশ্চিত ছিলাম। কাপড় পরবার ধরণ আর চেহারাই বলছিল এরা সাঁওতাল উপজাতির হতে পারে। তাদের ভাষা শুনে কামরুল জিজ্ঞাসা করল; তোমরা কি ভাষায় কথা বলছ গো। 'হামরা হামাদের ভাষায় কোথা বুলছি। তোমরা বুঝতে পার নয় কি?' তিনজনের একজন উত্তর দিল। পাশের দু'জন জোরে পা চালাতে চালাতে খিলখিল করে হাসছিল।

'আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি তো তাই জিজ্ঞাসা করলাম।' কামরুল আবার বলে উঠল।

'ও। তাই কি বাবু?'

'বাংলাদেশের নাম শুনেছো গো। এই তো তোমাদের পাশেই।' কামরুল এবার ভৌগোলিক জ্ঞান ছড়াবার মুডে ছিল বলে মনে হল।

'কি জানি বাবু। হামরা ওখানে যাইনি তো বুলব কি করে। হামরা গ্রাম ছেড়ে কোথাও যাই না গো।' বলেই পাশের গ্রামের বাড়িতে ঢুকে পড়ল। 'বোধ হয় এরা সাঁওতাল হতে পারে। এ দিকে সাঁওতালের বাস বলে আমার মনে হয়। আমাদের দেশেও উত্তরবঙ্গে এরা বাস করে।' আমি কামরুলকে বললাম।

'ভ্যানের ঝাঁকুনি খাচ্ছি তাই একটু মন ফিরিয়ে নিতে চাইলাম।' কামরুল এই কথোপকথনের কারণ ব্যাখ্যা করল।

'ও হে আর কতদূর যেতে হবে।' আমি ভ্যান চালককে জিজ্ঞাসা করলাম। এতক্ষণে আমাদের তিনজনের কোমর ধরে গিয়েছিল।

'এই তো স্যার আর ধরেন আধা কিলোমিটার।' বললেন ভ্যান চালক। আমি একটু চিন্তায় পড়লাম। ভ্যানচালকের আধা কিলোমিটার কত কিলোমিটারে হয় তা জানতে পারলে ভাল হতো। এধারটা জনমানব শূন্য। আমরা তিনজন বিদেশি। এর মধ্যে কামরুল আবার পরিচয়ও দিয়ে ফেলল। একটু শংকিত হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। এবার কামরুলের ছাত্র ভ্যান চালক। জিজ্ঞাসা করল, 'বাংলাদেশের নাম শুনেছ?'

'না স্যার। ওদিকে আমি যাইনি।'ভ্যানচালকের উত্তর।

'আচ্ছা ঢাকার নাম শুনেছ'?

'না' ভ্যান চালক বললেন।

www.pathagar.com

'রাজশাহী'

'না সাহেব। আমি কলকাতাই যাইনি। ওই জায়গা কোথায়?'

'এই তো মুর্শিদাবাদের উল্টোদিকে?' কামরুল ভূগোল মাস্টারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হল।

'ও তাই সাহেব! কি জানি আগেতো শুনিনি।'

এবার কামরুল বলল, 'চিন্তা করুন এরা ঢাকার নামও শুনেনি। কিন্তু আমাদের গ্রামের লোকও বলতে পারবে কলকাতা কোথায়।'

'আমি বললাম, 'আমার এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে। 'আসাদুজ্জামান নূর' কে হবেন কোটিপতিতে যে সব প্রশ্ন করেন তার উত্তর দিতে যেভাবে অংশগ্রহণকারীরা হিমশিম খান তা দেখে মনে হয় না সবাই বহিঃবিশ্ব সম্বন্ধে এত খবর রাখেন।'

এই কথোপকথনের মধ্যে আমরা অনেক দূর এগিয়ে আসলাম। টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ছিঁটেগুলো সরাসরি আমাদের গায়ে পড়ছে।

'আর কতদূর?'

'এই তো সামনে যে গ্রামটা দেখছেন এটাই কিরীটেশ্বরী। ভ্যানচালক রাস্তার বাঁকের গ্রামটি দেখিয়ে বললেন।

ঝিরঝির করে হালকা বৃষ্টি শুরু হল। ভ্যানগাড়ি কিরীটেশ্বরী গ্রামের বাজারে গিয়ে থামল। ছোট গ্রাম, রাস্তার দু'পাশে কয়েক ঘর গ্রাম্য দোকান।

পশ্চিমদিকের কয়েকটি দোকানের সারির পিছনে একটু উঁচু ভূমি। কয়েকটি পুরাতন 'মঠ' আর তার পাশে পুরাতন মন্দির সংলগ্ন নতুন মন্দির। এটাই কিরীটেশ্বরী মন্দির।

বৃষ্টি একটু বাড়ল। তবে একেবারে অসহনীয় নয়। আমরা নেমে পড়লাম। কামরুল আর আমানউল্লা এক দোকানের সামনে কাঠের বেঞ্চে বসে চায়ের খোঁজ করছিল। মনে হল তারা আর এগুবে না। অগত্যা আমি একাই কয়েক কদম হেঁটে পুরাতন 'মঠ'গুলো দেখলাম। এর অনেকগুলো মারাঠা সেনাপ্রধান ভাস্কর পণ্ডিত আর আলীবর্দী খাঁ-এর বর্গিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় নিহত মারাঠা সামরিক কর্মকর্তাদের দাহ করবার পর স্মৃতি ধরে রাখতে বানানো। খোলা জায়গায় মঠগুলোর পিছনে বড় এক দীঘি। দীঘির পাড়ে মঠগুলোর মাঝে বহু পুরাতন পাকুর গাছ।

আমি কিরীটেশ্বরী মন্দিরের দিকে এগুলাম। কাছে যেতে দেখলাম একজন মধ্যবয়সী পণ্ডিত। খালি পায়ে ধুতি পরনে। গায়ে একটি সাদা সুতার পৈতা। বহু যুগ পর পৈতা পরা ব্রাহ্মণ দেখলাম। শুধুমাত্র পূজা পার্বণে আমাদের দেশে আগে দেখা

www.pathagar.com

যেত। আজকাল আমাদের দেশের ব্রাহ্মণরাও আধুনিক হয়ে গেছেন। দুর্গাপূজার আরতির সময় উনারা গায়ে ফতুয়া পরে থাকেন।

আমাকে একা এভাবে হাঁটাচলা করতে দেখে ব্রাহ্মণ মশাই একটু অপ্রস্তুত হলেন। আমি কয়েক কদম এগিয়ে বললাম, 'ঠাকুর মশাই নমস্কার।' ঠাকুর মশাই থমকে দাঁড়ালেন।

আমাকে দেখে বললেন, 'কিছু বলবেন।'

'না মন্দিরটি দেখতে আসলাম।'

'কোথা থেকে এসেছেন'?

অতি বিনয়ের সাথে বললাম, 'আমি এবং আমার সাথে আরও দু'জন বাংলাদেশ থেকে এসেছি।'

'বাংলাদেশের কোন শহর থেকে!'

'আমরা ঢাকা থেকে আসছি মুর্শিদাবাদের দর্শনীয় জায়গাগুলো ঘুরে দেখতে। তাই এখানে আসা।'

এবার ঠাকুর একটু সহজ হয়ে বললেন, 'আপনাদের দেশের ঢাকেশ্বরী মন্দিরের খুব নাম শুনেছি। খুব জাঁকজমকের সাথে সব পূজো হয়।'

আমি বললাম, 'শুধু ঢাকেশ্বরী মন্দিরেই নয়, দুর্গাপূজাসহ অন্যান্য পূজাও সারা দেশেই অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথেই হয়। একটু পরে বললাম, 'আসলে আমি ভাস্কর পণ্ডিতের মন্দির মনে করে ভ্যানচালকের কথায় এখানে এসেছি। এই মন্দিরের মাহাত্ম্য বা ইতিহাস আমার একেবারেই জানা নেই।'

আমি আমার নাম বললাম। ঠাকুর তার পরিচয় দিয়ে নাম জানালেন তারেকশ্বর চ্যাটার্জি এবং এই মন্দিরের অন্যতম পুরোহিত। ঠাকুর আমাকে ভিতরে যাব কিনা জিজ্ঞাসা করলে আমি বিনয়ের সাথে বৃষ্টির অজুহাতে যেতে চাইলাম না।

ঠাকুর তারকেশ্বর অতি সংক্ষেপে বললেন, 'এটা ভাস্কর পণ্ডিতের মন্দির নয়। ভাস্কর পণ্ডিতের কিছু যোদ্ধার এখানে সৎকার করা হয়েছিল যার কিছু চিহ্ন এখনও আছে। তবে ভাস্কর পণ্ডিতের মন্দিরের নাম একলিঙ্গ দেবের মন্দির। রৌশনীবাগের সুজাউদ্দিনের সমাধির প্রাঙ্গণের এক পাশে বিদ্যমান। ওখানে গেলে দু'জায়গাই দেখতে পাবেন।' 'তা হলে এই মন্দিরটি কার?'

'তাহলে সংক্ষেপে বলি কারণ বৃষ্টি বাড়তে পারে। আমাদের ধর্মমতে পুরাণে আছে যে দক্ষযজ্ঞের পর শিবের তাণ্ডবকালে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে সতীর অঙ্গ ৫১ খণ্ড হয়ে বহু জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং ওই সব প্রত্যেকটি জায়গায় পবিত্র স্থান হিসাবে মন্দির গড়ে উঠে। এই জায়গায় সতীর মুকুট বা কিরীট পড়েছিল। এই জন্য এই মহাপবিত্রস্থানে

www.pathagar.com

এই মন্দির নির্মিত হয়। ভেতরে গেলে দেখতেন যে এখানে সেই মুকুটটি রয়েছে। সে কারণেই এ মন্দিরের নাম কিরীটেশ্বরী মন্দির।'

আমি এর রকম আরেকটি মন্দির, কলকাতার কালিঘাটের কথা পূর্বেই বলেছিলাম। যার ইতিহাসও সতির খণ্ডিত অঙ্গের সাথে জড়িত।

এরই মধ্য বৃষ্টির তেজ একটু বাড়ছিল। আমি ঠাকুর তারেকশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে জোর কদমে সামনের দোকানে, যেখানে আমার দুই সফর সঙ্গী বসা, এসে তাদের সাথে যোগ দিলাম।

কামরুল বেঞ্চ থেকে উঠে সামনে ছোট একটি চায়ের দোকানে গিয়ে তিনকাপ চায়ের কথা বলে আমাদের আসতে বললে আমরা দোকানে প্রবেশ করলাম। ছোট একটি দোকান। পেছনে দোকানের মালিকের বাড়ি। ভেতর দিয়ে ছোট একটি সংযোগ দরওয়াজা। দোকানে বারো থেকে চৌদ্দ বছরের এক কিশোর চা বানাতে ব্যস্ত। পরনে ধুতি আর গায়ে পৈতা। জানলাম সেও ব্রাহ্মণের সন্তান। নাম জিজ্ঞাসা করলে বলল যে তার নাম সান্ত চক্রবর্তী। বাবা একজন পুরোহিত। বড় ভাইও পুরোহিত। এ দোকানের আয় তাদের দু'জনের রোজগারের সাথে যোগ হয়। ছেলেটি ক্লাস নাইনে পড়ে। এ দোকানগুলো বিভিন্ন পূজা-পার্বণের সময় ভাল ব্যবসা করে। পৌষ মাসের প্রতি মঙ্গলবার এখানে মন্দিরের সামনের মাঠে গ্রামীণ মেলা বসে, তখন এসব দোকানে রমরমা ব্যবসা হয়।

আমরা তিনজনে বেঞ্চে বসা, সামনে ব্রাহ্মণের ছেলেটি চা বানাতে ব্যস্ত। কামরুল দাঁড়িয়ে টিনের বাক্স থেকে বিস্কুট নিয়ে আমাদেরকে দিল আর নিজেও খাওয়া শুরু করল। আমি বসে ভাবছিলাম অন্য কথা। যে হিন্দু সমাজ, বিশেষ করে ব্রাহ্মণরা কোন এক সময় অন্য ধর্মের লোকদের ছায়াও মাড়াতো না আজ তারাই জাতপাতের আর ধর্মের বিচার না করে এক পাত্র হতেই খাবার তুলে দিচ্ছে। একজন ব্রাহ্মণ সন্তান চা বানিয়ে আমাদেরকে তুলে দিচ্ছে। কিন্তু একবারও জানতে চাইল না আমরা কে, কোন ধর্মের, কোন জাতের। এটাই সময়ের বিবর্তন। অথচ আমাদের বাল্যকালে এর উল্টো দেখেছি। আমার বাবা চাকরি সূত্রে তখন যশোহরে। আমাদের বাসার সামনে এক ব্রাহ্মণ পরিবার থাকতেন। বাড়ির আঙ্গিনায় তুলসী গাছ ছিল। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় পূজো করতেন। তাঁর বাড়ির ত্রি-সীমানায় আমাদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। তারপরও আমরা নেহাতই অবুঝ বালকগণ মাঝে মধ্যে দৌড়ে গিয়ে তুলসী গাছ ছুঁয়ে দিতাম। ঘাট থেকে কাকী 'জল ভরে' আনবার পথে ছুঁয়ে দিলে 'রাম রাম' বলে জল ফেলে দিতেন। ওই কাকীর কারণে আমরা আমাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে বেশ উত্তম মধ্যম খেয়েছি। অথচ আজ 'পবিত্র চন্দ্রের বিশুদ্ধ হিন্দু হোটেলে' আমরা অহরহ খাচ্ছি। একবার জিজ্ঞাসা করে না আমরা কোন ধর্মের। অথচ অহেতুক ধর্মের দোহাই দিয়ে

www.pathagar.com

সুযোগ সন্ধানীরা দাঙ্গা-ফ্যাসাদ তৈরি করছে। বাবরি মসজিদ নিয়ে বিবাদে জড়াচ্ছে। আর এখানে কিরীটেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত মুকুট দেখাতে আমন্ত্রণ জানায় আর পৈতাধারী সান্ত চক্রবর্তী অবলীলাক্রমে চা তৈরি করে আমাদের হাতে তুলে দিল।

চা পান শেষ করে বাইরে আসতেই রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সান্ত চক্রবর্তীর বড় ভাই মানস চক্রবর্তীর সাথে দেখা হলে কামরুল কতক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলল। মানস জানিয়েছিলেন যে তাঁরা কয়েক পুরুষ ধরে এখানে বিয়ে হতে শুরু করে শেষকৃত্য এবং বিশেষ পূজো পরিচালনা করে আসছেন। শুধু এ গ্রামেই নয়, তাদের ডাক পরে ভিন গ্রাম থেকেও।

সামনের দোকানগুলোর একপাশে আমাদের ভ্যান দাঁড়ানো। শেষ মাথার দোকানের সামনে পাতা বেঞ্চে বসে এক বৃদ্ধ এতক্ষণ আমাদের দেখছিলেন। জীর্ণ শীর্ণ দেহ। বসে সিগারেট ফুঁকছেন আর মাঝে মধ্যে খক্ খক্ করে কাশছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কোথা হতে এলেন বাবুরা'। কামরুল উত্তরে বলল, 'ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে।'

'ও তাই বুঝি। তা আমার বাবার বাড়ি ছিল যশোহর, ঝিনাইদহে। সেই পার্টিশনের সময় আমরা এখানে এসেছি। আমি তখন দশ বছরের। আমাদের কিছু ঘর এখনও সেখানে রয়েছে।'

'ও তাই বুঝি?' কামরুল আমার তাড়া খেয়ে সংক্ষেপে উত্তর দিল।

এই কথোপকথনের মধ্যেই সাইকেলে এসে থামলেন একজন সবজি বিক্রেতা। আমি এখানকার বাজার যাচাই করতে জিজ্ঞাসা করলাম, তার কাছে রাখা পটল, বেগুন আর ঢেঁড়সের কেজি কত করে। সাইকেলটাকে এক পাশে রেখে বিক্রেতা যে দাম বললেন তা যেন অবিশ্বাস্য মনে হল। বললেন, 'চড়া দাম। পটল আশি টাকা (রুপি) কেজি, বেগুন ষাট টাকা আর ঢেঁড়স সত্তর টাকা।

'বলেন কি? এগুলো কি বাইরের না এখানকার?' এবার আমানউল্লা মুখ খুলল।

'না বাবু এগুলো এখানকার ক্ষেতের'।

আমানউল্লা বলল 'আমরা শুধু শুধুই বুক চাপড়াই।'

'পশ্চিমবঙ্গে এত দাম?'

এবার বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'সর্বনাশা দাম গো বাবুরা। আমাদের কপালে তো এসব সবজিও জুটে না। সবজি বলতে ওই আলু। তাও কিনবার মত নয়।' আমি এক দোকানিকে সর্বনিম্ন চালের দাম জিজ্ঞাসা করলাম। সময়ক্ষেপণ না করে বললেন 'তা এই ধর পঁচিশ ছাব্বিশ টাকা (রুপি)।' এখানে টাকাই বলে। এরই মধ্যে আমরা ভ্যানে বসে গেলাম। পানির বোতল খালি হয়ে গিয়েছিল। ওই দোকানে জিজ্ঞাসা

www.pathagar.com

করলাম পানি পাওয়া যাবে কিনা। দোকানি হাঁক দিলেন, 'নরেশ বাবুদের বোতল ভরে দে।'

নরেশ নামক এক বালক দৌড়ে এসে বোতল নিয়ে উধাও হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর ভরা বোতল নিয়ে এসে আমার হাতে দিল। বললাম 'কত দিতে হবে?' 'না বাবু কিছুই না। ওটা তো আমাদের চাপকলের জল।'

'ও তাই। ধন্যবাদ। আমার কথা শেষ হতেই ভ্যানচালক রৌশনীবাগের দিকে নিয়ে চললেন।

প্রায় বিশ মিনিট চালাবার পর আমার রৌশনীবাগ নামক গ্রামে এসে পৌঁছলাম। এ গ্রামটি বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম মনে হল। বেশ কিছু পাকা বাড়ি রয়েছে এধারে। গ্রামের এক মাথায় সুউচ্চ দেয়ালঘেরা একটি সমাধি সৌধ। তারই পূর্ব প্রান্তে একটি মন্দির। ওই মন্দিরটিই ভাস্কর পণ্ডিতের একলিঙ্গ দেবের মন্দির। আমরা ঘাটের প্রায় কাছাকাছি জায়গায়। জায়গাটি হাজারদুয়ারীর উল্টো দিকে। সমাধি সৌধে প্রবেশের ছোট ফটকের সামনে দাঁড় করিয়ে চালক বললেন, 'এটাই রৌশনীবাগ। এই সমাধিটিই নবাব সুজাউদ্দিনের। আপনারা ভিতরে গিয়ে দেখে আসুন।'

আমরা ঈষৎ ভেজানো, ছোট ফটক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। একেবারেই জনমানব শূন্য। স্থাপনাটি এএসআই (ASI) কর্তৃক সংরক্ষিত। বেশ কয়েক একর জায়গা নিয়ে এই রৌশনীবাগ দেয়ালের বাইরে কিছু জায়গা একেবারে দেয়াল সংলগ্ন একলিঙ্গ দেবের মন্দির।

বাগের মাঝখানে ছোট অত্যন্ত সাধারণ একটি সমাধি সৌধ। লোহার জালির কয়েকটি দরওয়াজা। দরওয়াজাগুলো বন্ধ। উত্তরদিকের ফরাসে একটি নাম না জানা ব্যক্তির কবর আর সৌধের মাঝখানে উঁচু করে পাথরে বাঁধানো একটি কবর। কোথাও নাম উল্লেখ না থাকলেও অনুমান করতে সময় লাগল না যে এই কবরটিই মুর্শিদকুলী খাঁ-এর জামাতা নবাব সুজাউদ্দিনের সমাধি। এই জায়গাটি ছিল নবাব সুজাউদ্দিনের বাগান বাড়ি। আমানউল্লা আমাকে জিজ্ঞাসা করল যে এটা কার সমাধি?

আমি যতটুকু জানি সংক্ষেপে তাই বললাম। কামরুল একটু সামনে। মনে হল সেও শুনেছে।

সুজাউদ্দিন বাংলার নবাব ছিলেন ১৭২৭ হতে ১৭৩৯ সাল পর্যন্ত। সুজাউদ্দিনের স্ত্রী, মুর্শিদকুলী খাঁ-এর কন্যা জিন্নাত-উন-নিসার ঘরের এক পুত্র সরফরাজ খাঁকে মুর্শিদকুলী তার উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেছিলেন। কিন্তু মুর্শিদকুলী খাঁ-এর মৃত্যুর পর সিংহাসনের দাবি নিয়ে পিতা-পুত্র মুখোমুখি হলে মুর্শিদকুলী খাঁ-এর বিধবা বেগম মধ্যস্থতা করে পিতা-পুত্রের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটান। সুজাউদ্দিন সরফরাজ খাঁকে বাংলার

www.pathagar.com

দিওয়ান আর আরেক ঘরের পুত্র মোহাম্মদ তাকিকে বাংলা আর উড়িষ্যার নায়েব নিজাম হিসাবে মনোনয়ন দেন। মসনদে বসেই সুজাউদ্দিন বাংলার জমিদারদের সাথে সম্পর্ক উন্নত করেন যা মুর্শিদকুলী খাঁয়ের সময় চরম অবনতির পথে ছিল। অনেকের জমিদারি ফিরিয়ে দেন। এ সব জমিদারদের নিকট হতে কর আদায় করে প্রায় দেড় কোটি রুপি দিল্লীর কোষাগারে জমা দিলে ওই সময়কার মোগল সম্রাট মোহাম্মদ শাহ্ তাকে উপাধি স্বরূপ 'মুতামান-ই-মুলক সুজাউদ্দিন আসাদ জং' এবং বাংলার নবাব হিসাবে স্বীকৃতি দেন।

সুজাউদ্দিন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ এবং যোগ্য শাসক ছিলেন। তিনি বাংলা শাসনের সুবিধার্থে বেশ কয়েকটি পরগণায় ভাগ করেছিলেন। তাঁর দরবারে নিয়োগ দিয়েছিলেন বহু যোগ্য আর সমাজের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের। তিনিই আলীবর্দী খাঁকে বিহারের নায়েব সুবেদার নিয়োগ দিয়েছিলেন। তারই সময় এবং তারই পৃষ্ঠপোষকতায় উত্থান হয় জগৎ শেঠ ওরফে ফতেহ্ চান্দের। এই সুজাউদ্দিনের বেগম, মুর্শিদকুলী খাঁ-এর কন্যা আজিমুননিসাকে জীবন্ত কবর দিয়েছিলেন বলে কথিত রয়েছে যার বিবরণ আমি পূর্বে দিয়েছি। সুজাউদ্দিন ১৭৩৯ সালে মৃত্যুবরণ করলে এখানেই দাফন করা হয়। এ জায়গারই একসময় নাম ছিল ফরাহবাগ।

আমি আর আমানউল্লা হাঁটতে হাঁটতে পশ্চিম দিকের দেয়াল ঘেঁষা একটা ছোট মসজিদের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। মসজিদটিও ব্যক্তিগত ইবাদতের জন্যে এই বাগানের গোড়াপত্তনের সময়েই তৈরি করেছিলেন নবাব সুজাউদ্দিন। অনেকটা খোশবাগ মসজিদের মত।

আমি আর আমানউল্লা হাঁটতে হাঁটতে উত্তর দিকে এসে কামরুলকে পেলাম। সময় তখন দুপুর গড়িয়ে প্রায় তিনটা। বেশ ক্ষিদে অনুভব করলাম। এ পাড়ে কোন খাবার দোকান নেই। হাজারদুয়ারী কাছেই, কয়েকটা মোটামুটি ধরনের রেস্তোরাঁ রয়েছে সেখানে গিয়েই খেতে হবে। আমরা সমাধি সৌধের চৌহদ্দি থেকে বের হয়ে সামনে রাস্তায় ভ্যানের কাছে আসতেই চালক বললেন, 'একলিঙ্গ দেবের মন্দির দেখবেন না? এখানে শিবরাত্রির সময় বড় পূজা হয়, তখন ভারতের বহু জায়গা হতে মারাঠিরা আসেন। আসেন ভাস্কর পণ্ডিতের বংশধররাও।'

আমরা কোন বাক্য ব্যয় না করে ভ্যান চালককে ঘাটে যেতে বললাম। ভ্যান চালক আমাদের সেদিকেই নিয়ে চললেন।

ভাস্কর পণ্ডিত ছিলেন মারাঠাদের প্রধান সিপাহসালার। আলীবর্দীর সময় বহুবার বাংলা লুট করেছেন। বিশেষ করে বর্তমান বর্ধমান অঞ্চল ছিল মারাঠা, যাদের আমরা বর্গি বলে জানি, আতঙ্কে। বেশ কয়েকবার মারাঠারা মুর্শিদাবাদও আক্রমণ ও লুট করে। 'হর হর মহাদেব' ছিল এই মারাঠাদের যুদ্ধের ধ্বনি। একসময় এ ধ্বনি কম্পন

www.pathagar.com

ধরাতো বাংলার সাধারণ মানুষের হৃদয়ে। এদের উদ্দেশ্য করেই বাংলা ছড়া রচিত হয়েছিল :

'ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গি এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে।
ধান ফুরালো পান ফুরালো
খাজনার উপায় কি? আর ক'টা দিন সবুর কর
রসুন বুনেছি।'

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ঘাটে এসে পৌঁছলাম। এসেই ঘাটে নৌকা ফেরিতে চড়লাম। অপর পারে, পূর্বদিকে, হাজারদুয়ারী আর ইমামবাড়া দেখা যাচ্ছিল। দেখা যাচ্ছিল লালবাগ। পেছনে ফেলে এলাম খোশবাগ আর রৌশনীবাগ সমাধিক্ষেত্র।

তীরে উঠে মুন্না শেখকে পেলাম। সে ঘোড়া গাড়ির উপরে সটান শুয়ে নিদ্রায়। আমাদের আওয়াজ শুনে উঠে বসল। বলল, 'স্যার আপনাদের এত দেরি হবে জানলে আমি মাঝে একটা খ্যাপ মারতে পারতাম।'

আমানউল্লা বলল, 'ভালই হয়েছে বলিনি না হয় তুমিও সোহেলের মত হাওয়া হয়ে যেতে।'

কথা না বাড়িয়ে তাকে হাজারদুয়ারী দক্ষিণ দিকের রেস্তোরাঁতে নিয়ে যেতে বললাম। সেখানে পৌঁছে পাশাপাশি দুই রেস্তোরাঁর মধ্যে জয়কালী হিন্দু রেস্তোরাঁয় ঢুকে মোগলাই পরাটা কোল্ড ড্রিংক আর চা পান করে বের হয়ে দেখলাম সোহেল শেখ তার গাড়ি নিয়ে হাজির।

'কি ব্যাপার কোথায় গায়েব ছিলে?' আমানউল্লা জিজ্ঞাসা করলে অনেকটা অপরাধীর মত কাচুমাচু হয়ে বললেন, 'স্যার মাফ করবেন। আজ আমার টুরিস্ট বাসের যাত্রী নেবার নম্বর ছিল। তাই সকালে আমার ভাই মুন্নাকে পাঠিয়েছি। স্যার ও আপনাদের সাথে কোন বেয়াদবি করেনি তো?'

আমি বললাম, 'না, ও কোন বেয়াদবি করেনি, তবে সকালে মোবাইলে তোমার বিষয়ে জানালে আমরা খুশি হতাম। আমাদের চুক্তি তো তোমার সাথে ছিল।' সোহেল বললেন, 'স্যার মাফ করে দেবেন। এক সপ্তাহ পর আমার নম্বর এসেছে। এ পর্যটকদের কাছ থেকে ভাল কামাই হয়।

আর কথা না বাড়িয়ে সোহেল শেখের গাড়িতে বসলাম। মুন্না আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিল। সোহেল আমাদেরকে ওই সময়কার বিশ্বের অন্যতম ধনী জগৎ শেঠের কাচারি ঘরের দিকে নিয়ে চললেন।

মুর্শিদাবাদ তথা লালবাগের মাঝামাঝি জায়গায় জগৎ শেঠ ওরফে ফতেহ চান্দের কাচারি বাড়ি। জায়গাটি একটি ট্রাস্টকে দেয়া। জগৎ শেঠের বর্তমান প্রজন্মের একজন

www.pathagar.com

এখন কলকাতায় পাথরের ব্যবসা করেন। বাড়িটি সংরক্ষিত। একটি ছোটখাটো যাদুঘর।

কাচারি বাড়িটি উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। সামনের ফটকের উপরে ইংরেজিতে লেখা 'জগৎ শেঠের কাচারি বাড়ি।' ভিতরে প্রবেশ করতে পাঁচ রুপির টিকেট কিনতে হয়। কামরুল ভিতরে যেতে চাইল না। আমরা দু'জন ভিতরে প্রবেশ করলাম। দশ রুপি দিয়ে একজন স্থানীয় গাইড নিলাম। গাইড আমাদেরকে ঘুরিয়ে দেখালেন। নিচের তলায় বেশ কিছু মুদ্রা রাখা। রয়েছে জগৎ শেঠের তরবারি আর অন্যান্য ব্যবহৃত দ্রব্যাদি। উপরের তলায় জগৎ শেঠের স্ত্রী এবং নিজের কিছু পরিধান আর ঢাকার মসলিনের একটি শাড়ি। গাইড বললেন যে, এ সব কাপড়ই জগৎ শেঠের। একটি কাচের শোকেসে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির' এক সামরিক কর্মকর্তার ইউনিফরম রাখা রয়েছে। এটাও এই যাদুঘরের এক দর্শনীয় বস্তু।

গাইড জগৎ শেঠের সিরাজের বিরোধিতার কারণে বললেন, 'নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা জগৎ শেঠের কাছ থেকে দাবিকৃত অর্থ না পেয়ে দরবারে চড় মেরে অপমান করে বের করে দিয়েছিলেন। সেই দিন তিনি অপমানের প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। বিশ্বাসঘাতকতা করলেন জগৎ শেঠ। তিনি বাংলার বিশ্বাসঘাতকদের মধ্যে নাম লিখালেন।'

এতক্ষণে আমরা বেশ ক্লান্তবোধ করছিলাম। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। বের হবার পথে বাড়ির ভিতরে উত্তর পাশে মন্দির দেখলাম। সংস্কার করা হচ্ছিল। গাইড জানালেন যে, মন্দিরটি আসন্ন দুর্গাপূজার জন্য তৈরি করা হচ্ছে।

আমরা জগৎ শেঠ 'দি ব্যাংকার অব বেঙ্গল'-এর বাড়ি ছেড়ে সোহেলের গাড়িতে চড়ে হোটেলে ফিরলাম। আগামীকাল মুর্শিদাবাদ ছাড়ব। বিকেলের হাজারদুয়ারী এক্সপ্রেসে রাত নয়টায় কলকাতা পৌঁছবে। একদিন পর কামরুল ঢাকায় ফিরবে। সেই দিন আমি আর আমানউল্লা শান্তি নিকেতনে যাব। তার পরের দিন আমানউল্লা বিমানে ঢাকা ফিরবে আর আমি আরও একদিন কলকাতায় থেকে মৈত্রী ট্রেনে একাই ঢাকার পথে রওয়ানা হব।

আগামীকাল সকালে আমানউল্লাকে হাজারদুয়ারী যাদুঘর দেখিয়ে হোটেল থেকে বিদায় নিয়ে সোহেলের গাড়িতে স্টেশনে যাব।

হোটেলে পৌঁছে গোসল করে রাতের খাবার সেরে শুয়ে পড়লাম। ওই রাতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটেনি। পরের দিন সকালে হাজারদুয়ারী থেকে দুপুরের খাবার খেয়ে ট্রেন ধরলাম। রাত প্রায় নয়টার কাছাকাছি আমরা কলকাতায়। হাজারদুয়ারীর বিবরণ আগেই দিয়েছি।

www.pathagar.com

একুশ

বিশ্বভারতী বকুলতলা

পরের দিন সকালে নাস্তা সেরে আমরা তিনজনে রমেশকে নিয়ে বের হলাম। গতবার আমি কোলকাতা জাদুঘর দেখতে পারিনি তাই এবার দেখব মনস্থির করেছিলাম। কলকাতা ভ্রমণের অন্যতম আকর্ষণ ছিল এই জাদুঘর। কামরুলের কিছু ব্যক্তিগত কাজ ছিল তাছাড়া আগামীকাল ভোরে তার ঢাকায় ফিরবার কথা, সে কারণেই সে জাদুঘরে যেতে চাইল না। তবে কাজ শেষ করে আমার সাথে শোভাবাজারে রাজবাড়ি আর মার্বেল প্যালেসে যাবে। কাজেই এই পরিকল্পনার ছক ধরে কামরুল আমাকে আর আমানউল্লাকে কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের সামনে নামিয়ে দিল। এই জাদুঘরের ইতিহাস সম্বন্ধে আমি আগের সফরের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছি। কাজেই পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত থাকলাম।

দেড়শত রুপি করে দু'টি টিকেট কেটে আমরা দু'জনে যাদুঘরে প্রবেশ করলাম। প্রায় দু'ঘণ্টা কাটিয়েছি এই জাদুঘরে। তবে আমি হতাশ হয়েছি। কারণ, আমি ভেবেছিলাম প্রাচীন রাজনৈতিক ভারত, মুসলমান শাসনে হিন্দুস্থান আর বৃটিশ শাসনের রাজনৈতিক ভারতের প্রদর্শনী থাকবে। তেমন কিছুই নেই শুধুমাত্র মুদ্রা ছাড়া। তবে রয়েছে মিশরীয় সেকশনে একটি মমি। বাকি হাজার হাজার প্রদর্শনী রয়েছে নৃতাত্ত্বিক বিষয়াদির উপর। রয়েছে ডাইনোসর যুগের পশুপাখির কঙ্কাল আর ডারউইনের থিওরিতে হনুমান হতে মানুষের বিবর্তনের প্রদর্শনী। যাদুঘরের দোতলার পশ্চিম বারান্দায় মার্বেল পাথরের তৈরি বিশাল আকারের রানী ভিক্টোরিয়ার মূর্তি।

আমরা প্রায় দু'ঘণ্টা কাটিয়ে বের হয়ে কামরুলের সাথে যোগাযোগ করলে সে জানালো যে সে আমাদের দিকেই আসছে তবে রাস্তায় বেশ যানজট। হবারই কথা কারণ, প্রায় সব বাইলেনগুলো পূজামণ্ডপের আয়োজকদের দখলে চলে গিয়েছে। দুর্গাপূজার এখনও প্রায় এক মাস বাকি। কিন্তু কলকাতায় মণ্ডপ তৈরি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। চলছে পূজোর আয়োজনের নামে ব্যাপক চাঁদাবাজি। আমাকে একজন বলেছিলেন এবার এ চাঁদাবাজি অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছে। এখন তৃণমূল কংগ্রেসের মাস্তানদের দখলে কলকাতা। আর তাদের সাথে যোগ দিয়েছে বিগত শাসকগোষ্ঠী সিপিএমএ'র মাস্তান বাহিনী। এদের কোন দল নেই আদর্শ নেই। এরা

www.pathagar.com

সুযোগ সন্ধানী। অনুরূপ ভাষ্য আমাদেরকে ট্যাক্সি চালক রমেশও দিয়েছিলেন। মুর্শিদাবাদ থেকে ফিরবার পর চিৎপুর হতে আমাদেরকে হোটেলে নিয়ে আসবার পথে রমেশ বলেছিলেন যে, এখন কলকাতার বাইরে দূর পাল্লায় ট্যাক্সি যেতে চায় না। কারণ, ট্যাক্সি থামিয়ে ওই জায়গার পূজোর খরচের জন্যে চাঁদা দাবি করে এবং যে অঙ্ক দাবি করে তাই দিতে হয়। অন্যথায় বিপদ। সে কারণেই ট্যাক্সি যেতে চায় না।

আমরা বাইরে ফুটপাতে। চওড়া ফুটপাত। তার অর্ধেকের বেশি রকমারি পণ্যের হকারদের দখলে। পানির বেশ তেষ্টা পেয়েছিল। সামনে লেবুর শরবতওয়ালার কাছ থেকে শরবত খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করলাম। পাশেই ঝালমুড়ি, শশা, ছোলা মিক্স সবই আমরা দু'জনে তৃপ্তি সহকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে খেতে কামরুলের অপেক্ষায় রইলাম।

প্রায় পনের মিনিট পর রমেশকে নিয়ে কামরুল হাজির হলে সোজা শোভাবাজারে নবকৃষ্ণ দেবের রাজবাড়ির ভিতরের অংশ দেখে মার্বেল প্যালেসের দিকে রওয়ানা হলাম। আমি রাজবাড়িতে বিশেষভাবে দেখতে চেয়েছিলাম ওই পূজা মণ্ডপটি যেখানে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের পর ক্লাইভের উপস্থিতিতে প্রথমবারের মত দুর্গাপূজা উৎসবের আয়োজন করা হয়। আজও নিরবচ্ছিন্নভাবে যেখানে দুর্গাপূজা উদযাপিত হয়ে থাকে। বাড়ির ভিতরের ঘাসের খোলা আঙিনার উত্তর দিকে দুর্গা মন্দিরটি আগত পূজার জন্যে সংস্কার করা হচ্ছিল। স্থানীয় এক যুবক স্বপ্রণোদিত হয়ে আমাদের দেখিয়ে বলেছিলেন, 'কলকাতার দুর্গাপূজা মানে হল শোভাবাজার রাজবাড়ির পূজা।' এর বাইরে অন্যসব পূজাতো এখান থেকে শুরু। বের হবার পথে দেখেছিলাম দুর্গার প্রতিমা তৈরি হচ্ছিল। ওই ভদ্রলোক জানালেন, 'এ প্রতিমা যারা তৈরি করছেন তারা বংশপরম্পরায় এই রাজবাড়ির প্রতিমা তৈরি করে আসছে।' আমরা প্রায় ত্রিশ মিনিট পর মার্বেল প্যালেসের দিকে রওয়ানা হলাম।

কলকাতার অন্যতম দর্শনীয় স্থান বলে প্রচারিত মার্বেল প্যালেস। এ জায়গার বাংলার স্বাধীনতা হরণ অথবা এ শহরের পত্তনের ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত না হয়েও শুধুমাত্র দর্শনীয় স্থান বলে বিবেচিত। এর গুরুত্বের একমাত্র কারণ, শুধু দৃষ্টিনন্দন রাজবাড়ি হিসেবেই নয় বরং এর প্রতিষ্ঠাতা রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের অত্যন্ত দামি পেইন্টিং এবং বিভিন্ন ভাস্কর্য সংগ্রহের শখের জন্য। হয়তো এই পর্যায়ে এ ধরনের সংগ্রহ সমগ্র ভারতে বিরল।

মারবেল প্যালেস, বো-বাজার আর মানিকতলার মাঝামাঝি প্রধান সড়ক মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট-এর উপরে সড়ক দ্বীপে ইট রংয়ের কালীবাড়ির পূর্বদিকে গলিতে প্রবেশ করলেই সরাসরি প্যালেসের সম্মুখভাগ দেখা যায়। দৃশ্যত মনে হল কোন এক সময় এ সড়কটিই ছিল মার্বেল প্যালেসের প্রধান সড়ক যা সরাসরি প্যালেসের প্রধান ফটকের

www.pathagar.com

ভিতরে চলে যায়। এক্ষণ অবশ্য প্যালেসের প্রধান ফটকের সামনে উত্তর-দক্ষিণে আরেকটি সড়ক এই প্রধান সড়কের সাথে যুক্ত হয়েছে। রমেশ তার গাড়ি প্রধান ফটকের সামনে দাঁড় করালে আমরা নেমে গেলে তিনি একপাশে গাড়ি পার্কিং করালো।

আমরা তিনজনে প্রধান ফটকের সামনে দাঁড়ালাম। পাশে একটি নোটিশ দেখে কিছুটা হতাশ হলাম। নোটিশে লেখা আছে যে, এই প্যালেস সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয়। পর্যটন সংস্থার পূর্ব অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ নিষেধ। আমরা হতাশ হলাম, তবে আমি হাল ছাড়লাম না। ভিতরে প্রাসাদের পথে নুড়ির রাস্তার পাশে কয়েকটি গাড়ি দাঁড়ানো দেখলাম। ফটকে এক দারোয়ান খাকি ইউনিফরম পরা হাতে মধ্যযুগীয় বর্শা নিয়ে দাঁড়ানো। আমাদের দেখে আরও একটু টান হয়ে দাঁড়ালেন। আমি এমন ভাব করলাম যে ওই নোটিশটি দেখিই নাই। বললাম, 'টিকেট ঘর কোথায়?' এবার বললেন, 'এখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ তাই টিকিটের কোন ব্যবস্থা নেই। আপনাদের পর্যটন অফিস থেকে পাস আনতে হবে।' তারপরেও আমি নিরাশ না হয়ে বললাম, 'আমরা বাংলাদেশ হতে এতদূর এসেছি। আমরাতো এ ব্যবস্থা জানতাম না। এখন কি করা যায়।'

মনে হয় আমার আর্জি তার মনে ধরেছে। আস্তে করে বললেন, 'সোজা প্রবেশ করে ডানের রাস্তা দিয়ে গেলে দক্ষিণ পাশের গাড়ি বারান্দায় পৌঁছবেন। ওখানে কিছু লোক আছে তাদের কিছু টাকা দিলে আপনাদের ঘুরিয়ে দেখাবে।' এতক্ষণে বিষয়টা আমার নিকট পরিষ্কার হল। আর বাক্য ব্যয় না করে তিনজনে তার নির্দেশনা মত রওয়ানা হলাম। গাড়ি বারান্দায় পৌঁছবার পূর্বেই নুড়িপথের। একধারে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের মার্বেল পাথরের প্রমাণ সাইজ মূর্তি দেখলাম। তিনি এই প্রাসাদটি বানিয়েছিলেন ১৮৩৫ সালে। তখন বাংলায় এবং ভারতের বহু জায়গায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজের রমরমা অবস্থা। বর্তমানে প্যালেসের পিছন দিকের বর্ধিত অংশে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের বর্তমান বংশধররা থাকেন। রাজেন্দ্র মল্লিক ছিলেন নীলমনি মল্লিকের পালক পুত্র। নীলমনি মল্লিক এখানে শুধুমাত্র জগন্নাথ মন্দির বানিয়েছিলেন। মন্দিরটি এখনও আছে। তারই সম্মুখভাগে বর্তমানের এই প্যালেস। সমগ্র চৌহদ্দিটি প্রায় ত্রিশ একর জায়গার উপরে। এখানে ছোটখাটো একটি চিড়িয়াখানাও রয়েছে।

রাজা উপাধি ছিল রাজেন্দ্র মল্লিককে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেল কর্তৃক প্রদেয় সম্মান। তিনি আদলে ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তবে একই সাথে মাঝারি ধরনের জমিদারও ছিলেন। তিনি ১৮৭৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। আজও তার বংশধররা ব্যবসা ক্ষেত্রে সাফল্যের সাথে বিচরণ করছেন।

আমরা দক্ষিণের টানা গাড়ি বারান্দায় পৌঁছে খাকি উর্দিপরা কয়েকজন কর্মচারীদের মার্বেলের সিঁড়ির উপরে বসে আড্ডা মারতে দেখলাম। পরিচয় দিলে

www.pathagar.com

একজন উঠে এসে বললেন, 'দয়া করে জুতা খুলে আমার সাথে আসুন, আমি আপনাদের ভিতরে সব দেখাবো।' আমরা জুতা খুলে প্যালেসের প্রধান হলঘরে প্রবেশ করলে সম্পূর্ণ বাড়িটি নিচতলা আর দোতলাসহ নাচঘর হতে প্রতিটি রুম ঘুরে ঘুরে দেখালেন। দেখে অবাক হতে হয় প্রতিটি জায়গায় আর রুম ভর্তি সমস্ত ইউরোপ বিশেষ করে ইতালী, ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ড আর বেলজিয়াম হতে সংগৃহীত নামকরা শিল্পীদের তৈরি স্ট্যাচু আর পেইন্টিং। একটি গাছের কাণ্ড হতে খোদাই করে তৈরি রানী ভিক্টোরিয়ার মূর্তি। এখানে রয়েছে ঈশা, বুদ্ধ আর ভারজিন মেরির মূর্তি। রিউবেনস এর মত শিল্পীর শিল্পকর্ম। দুর্লভ তৈল চিত্র স্যার যশোয়া রেনল্ডস্ এর পেইন্টিং। প্যালেসের মধ্যে মূর্তিগুলো সব মার্বেল পাথরের। বহু রুমের ফরাস মার্বেলের তৈরি। প্রতি রুমের দু'প্রান্তে প্রমাণ সাইজের বেলজিয়ামের আরশি। উপরে ঝুলন্ত বেলজিয়াম ক্রিস্টালের ঝাড়বাতি। অবিশ্বাস্য সংগ্রহ। এর মূল্য নির্ধারণ করা সহজ নয়। মল্লিক পরিবারে বাসস্থান এটা ছিল না ছিল দর্শনীয় বস্তুর এক ধরনের জাদুঘর।

আমি এসব দুষ্প্রাপ্য দুর্লভ শিল্প কর্মগুলো দেখছিলাম, যার বর্তমান মূল্য নির্ধারণ অসম্ভব, এগুলো কিভাবে এখানে আনা হয়েছিল তা ভাবলে অবাক হতে হয়। এর পেছনে আজ হতে প্রায় পৌনে দুইশত বছর পূর্বে কত অর্থ ব্যয় করতে হয়েছিল তা এখন অনুমান নির্ভর হবে। ভাবছিলাম কিভাবে ইউরোপিয়ান বণিক তথা ইংরেজ ব্যবসায়ীরা এ সব ধনী ব্যক্তিদের লুণ্ঠন করেছে। এরা জমিদারি করেছে। করেছে দেদার ব্যবসা আর সেই অর্থ দিয়ে সমাজে সম্মান বাড়াতে গিয়ে কিভাবে দু'হাতে পয়সা লুটিয়েছে। এগুলো না দেখলে বিশ্বাস করবার মত নয়।

সমগ্র প্যালেসটি নিওক্ল্যাসিকাল ইউরোপিয়ান স্টাইলে তৈরি। ভিতরে বড় আঙিনা। আঙিনার একপাশে পূজা মণ্ডপ। প্যালেসটি তিন তলা তবে দুই তলা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের দেখানো হয়। প্যালেসের বাইরে পশ্চিমের বাগানের এককোণায় একটি চিড়িয়াখানা সেখানে বংশপরম্পরায় সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে কিছু বিরল প্রাণী।

এখানেই ছিল কলকাতার প্রথম চিড়িয়াখানা।

আমরা প্রায় এক ঘণ্টার উপরে এ প্যালেসের দর্শনীয় দ্রব্যাদি দেখে বের হবার পথে দুইশত টাকা চাইলে দেড়শত টাকা দিয়ে ফিরবার পথ ধরলাম। গেটের কাছে আসলে দারোয়ান সালাম ঠুকে বখশিশ চাইলেন। অগত্যা আরও পঞ্চাশটি টাকা দিয়ে বের হয়ে আসলাম। মনে মনে ভাবছিলাম এভাবেই বহু লোক এখানে সরাসরি দেখে যায় পর্যটনের পাসের ধার ধারে না। আমাদের উপমহাদেশের দেশগুলোতেই একই ধারা।

আমরা মার্বেল প্যালেস থেকে ফিরতি পথে দুপুরের খাবার খেয়ে হোটেলে চলে আসলাম। বিকেলে আমি আর বের হইনি। কামরুল আর আমানউল্লা কিছু বিভিন্ন জাতীয় বাদাম কিনে সন্ধ্যায় ফিরে আসল। আগামী দিন ভোর চারটায় কামরুল ঢাকার

www.pathagar.com

উদ্দেশে বিমানবন্দরে যাবে। আর আমরা তার এক ঘণ্টা পর শিয়ালদাহ স্টেশনে যাব শান্তি নিকেতনের পথে। হোটেলকে অনুরোধ করাতে আমাদের দু'জনের জন্যে রিটার্ন টিকিট এনে দিয়েছে। টিকেট দেখে ট্রেনের নাম 'গণদেবতা' আর ছাড়বার সময়টা জেনে নিলাম। যে ভুলটি আমরা ওই সন্ধ্যায় করেছিলাম তা ছিল টিকেটের উপরে কম্পিউটার প্রিন্ট তারিখটি সঠিকভাবে না দেখা। যার মাসুল আমাদেরকে দিতে হয়েছিল। সে কথায় পরে আসছি।

সন্ধ্যার পরে আমানউল্লা কফি হাউস যেতে চেয়েছিল কিন্তু যাওয়া হয়নি। কারণ, সে দিনের সন্ধ্যায় ঢাকায় বহু প্রতীক্ষিত আর্জেন্টিনা বনাম নাইজেরিয়ার প্রদর্শনী খেলা ছিল। মেসি ছিল ওই খেলার প্রধান আকর্ষণ। মাত্র কয়েকদিন আগেই কোলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামে খেলে গিয়েছিল মেসি। আমরা তিনজনে রুমে বসে খেলা দেখে রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরের দিন ভোরে কামরুল আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। আমরা ঘণ্টাখানেক পরে বের হলাম শিয়ালদাহ স্টেশনের পথে। আমাদের গন্তব্য বোলপুর, শান্তিনিকেতন। শিয়ালদাহ হতে 'গণদেবতা' এক্সপ্রেস ছাড়বে ছয়টা ত্রিশ মিনিটে আর বর্ধমান হয়ে শান্তি নিকেতন, বোলপুর পৌছবে নয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে। সে দিন বিকেলেই একই ট্রেনে আমাদের ফিরে আসবার কথা।

ট্যাক্সি আমাদেরকে শিয়ালদাহ স্টেশনে নামালো। আমরা আন্ডার গ্রাউন্ড পাস দিয়ে মূল টার্মিনালে পৌছলাম। শিয়ালদাহ বর্তমানে ভারতের পূর্বাঞ্চলের অন্যতম বৃহত্তম স্টেশন। শিয়ালদাহ হাওড়ার পর স্থাপিত হয়েছিল ১৮৬৯ সালে যখন পূর্বাঞ্চলে রেলওয়ের সম্প্রসারণ হয়। বোম্বের পর বৃটিশ ভারতে ১৮৫৪ সালে স্থাপিত হাওড়াই ছিল একমাত্র রেলওয়ে স্টেশন। এই দু'টো স্টেশনই এখনও কলকাতার সবচাইতে ব্যস্ততম স্টেশন। আমরা আমাদের ট্রেনের প্লাটফর্ম খুঁজে বের করলাম। সময় ছয়টার উপরে। শিয়ালদাহ স্টেশনে বারোটি প্লাটফর্ম আর দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা ট্রেন চলাচল করছে। স্টেশনে হাজার হাজার যাত্রী। এক বিচিত্র সমাবেশ। আমরা নির্ধারিত প্লাটফরমে 'গণদেবতা' এক্সপ্রেসের তাপানুকূল চেয়ার কোচের বগিতে উঠলাম। টিকেট বের করে নির্ধারিত আসন খুঁজে বের করে দেখলাম সেখানে যাত্রী আগের থেকেই বসে আছে। আমাদের সিটের কথা বলাতে এক ভদ্রলোক তার টিকেট বের করে দেখিয়ে বললেন যে তাকেও একই নম্বর দেয়া হয়েছে। এমনতো হবার কথা নয়। ইলেকট্রনিক টিকেটে এ ধরনের ভুল হবার কথা নয়। হাতে অল্প সময়। বাইরে টাঙ্গানো যাত্রীর তালিকা হতে আমাদের নাম খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আবার বগিতে চড়লাম। আমানউল্লা একটি খালি সিটে বসা। জিজ্ঞেস করল এমনটা কিভাবে হয়। আমি এর উত্তর কিভাবে দিব। এ রকম হবার কথা নয়। বললাম, 'এখানেই বসি। কয়েক মিনিট পর ট্রেন

www.pathagar.com

ছাড়বে তখন টিটি আসলে জিজ্ঞাসা করব চারজনের সিট নাম্বার এমন সাদৃশ্য কিভাবে সম্ভব।'

অগত্যা আমরা পিছনে খালি সিট পেয়ে দু'জনেই বসে পড়লাম। আমানউল্লা নিশ্চুপ। কিছুক্ষণ পর অপর প্রান্ত থেকে টিকেট দেখতে দেখতে টিটি আসলেন। আমাদের দু'টি টিকেট তার হাতে দিয়ে বিড়ম্বনার কথাটাও বললাম। তিনি টিকিট দু'টো নিয়ে তার কাছে রক্ষিত যাত্রীর তালিকার সাথে মিলাতে গিয়ে আমাদের নাম না পেয়ে কিছুটা ভ্যাবাচেকা খেয়ে টিকিট দু'টো ভালভাবে নিরীক্ষণ করলেন। লেখাগুলো খুব পরিষ্কার নয়। মনে হয়েছিল প্রিন্টারের কালি হালকা ছিল। অনেকক্ষণ পর বললেন, 'আপনারাও একই কেস।'

'মানে'?

'মানে সহজ।' টিটি স্মিত হেসে বললেন। আজ সেপ্টেম্বরের ৭ তারিখ আর আপনাদের টিকিট নভেম্বরের ৭ তারিখের। মানে ৭/১১/১১। এবার বুঝলেন। ঠিক এ রকম পরিস্থিতিতে পড়েছেন আরও চারজন যাত্রী।'

টিটির কথা শুনে ফিরতি টিকেটের তারিখ দেখে ওই একই তারিখ লেখা পেলাম। বহু কষ্টে পাঠোদ্ধার করতে হয়েছে। আমানউল্লা হোটেলের ম্যানেজারের চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করতে লাগল। এখন কি করব। ট্রেন এতক্ষণে শিয়ালদাহ স্টেশন ছেড়েছে। টিটি বললেন, 'এজ ফার এজ আই ক্যান সে ইউ আর উইদআউট টিকিট। আমার মতামত হল আপনারা বিনা টিকেটের যাত্রী।'

বলে কি? এখন উপায়? টিটিকে অনন্যোপায় হয়ে অনেকটা কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম।

'এখন আপনাদের টিকেট হবে দুইশত টাকা জরিমানাসহ মূল টিকেটের দামে। পরে বোলপুরে টিকেট সারেন্ডার করে টাকা ফেরত নিয়ে ফিরতি টিকেট কিনবেন।'

আর কি করা খেসারত দিতে হবে। আমানউল্লা বলল, 'ফিরে গিয়ে এ টাকাগুলো হোটেলের ম্যানেজার হতে আদায় করতে হবে।'

'ম্যানেজারের দোষের চাইতে আমাদের দোষ বেশি' আমি বললাম। আমানউল্লা এ সব যুক্তি শুনতে রাজি নয়, বলল, আমরা কি কখনও ভেবেছি যে ম্যানেজার এমন এজেন্ট থেকে টিকেট কিনবে যে দু'মাস পরের তারিখে আমাদের বুকিং করবে?' আমানউল্লার উষ্মা তখনও প্রশমিত হয়নি।

পরেরটা পরে দেখব আপাতত ভুলের মাশুল দিয়েই টিকেট করে নেই। বলে দুটো টিকেটের জন্য এক হাজার টাকা টিটির হাতে দিলাম। তিনি বেশ কিছু সময় নিয়ে আমাদের নামে দুটো টিকেট কাটলেন প্রায় দ্বিগুণ দামে।

www.pathagar.com

'আপনারা একা নন। সামনেও এমন আরেকটা কেস পেলাম। তাদের যাবার কথা আজকের তারিখে অথচ তাদের টিকেটে তারিখ ঠিকই আছে তবে তা আগামী মাসের।'

টিটি আমাদেরকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন বোধ হয়। তিনি আরও বললেন, 'ট্রেনের টিকিট এজেন্টদের হাতে দেয়া হয়েছিল যাত্রীর সুবিধার জন্যে। কিন্তু কিছু এজেন্ট যাত্রীদের জন্যে আরও বিড়ম্বনা বাড়ায়। কি করবেন এ ধরনের পরিস্থিতি নিয়েই চলতে হয়।'

আমি টিটি-এর হাত থেকে টিকেট দুটো আর দশ টাকা ফেরত নিয়ে গুম মেরে বসে জানালার বাইরে তাকিয়ে রইলাম। পাশে আমানউল্লা চোখ বন্ধ করে ঘুম দেবার চেষ্টা করছিল।

'গণদেবতা এক্সপ্রেস'। 'গণদেবতা' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাংলা সাহিত্যের এক অনবদ্য উপন্যাসের নামে নাম রাখা হয়েছে। বহু আগে এই উপন্যাসটি পড়েছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে বাংলার গ্রাম্যচিত্রে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক চরিত্রের সংগ্রাম আর শোষকের বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রামের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। আজ আর সে ধরনের শক্তিশালী লেখক খুঁজে পাওয়া যায় না যাদের লেখনী শক্তিতেই সমাজচিত্র বদলাতে সাহায্য করত। তারা শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত গ্রামের চিত্র এমন নিখুঁতভাবে আর কোন সাহিত্যিক ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিল কিনা আমার জানা নেই।

বেশ সকালে উঠেছি। তার উপর টিকেটের বিড়ম্বনা। শারীরিক মানসিক অবসাদগ্রস্ত মনে হল। বোধহয় কিছুক্ষণ ঝিমুচ্ছিলাম। এরই মাঝে দু'একটি স্টেশন পার হয়ে গিয়েছিল। ঝিমুনি ছুটে গেল হঠাৎ কানে আসা হকারদের হাঁকডাকে। এখানেও সেই একই চিত্র। ট্রেন ছুটে চলছিল সবুজ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে। কিছুটা তফাৎ রয়েছে বাংলাদেশের চিত্রের সাথে। এখানে বেশির ভাগ জমি আবাদযোগ্য নয়। অনেকটা লাল বালু মাটি, ছোট ছোট শহরগুলো বেশ পুরাতন। ঐতিহাসিক ভাবে এসব অঞ্চলে বৃটিশ ভারত এবং তার পূর্বেও উন্নতির ছোঁয়া ছিল। বরং এখন উল্টো চিত্র। পশ্চিমবঙ্গ এখন কলকাতা কেন্দ্রিক, বাইরের জেলা অথবা মহকুমা শহরগুলোতে উন্নয়নের ছোঁয়া সে রকম লাগেনি।

বোধহয় আবার ঝিমুচ্ছিলাম। হারমোনিয়াম আর কিছুটা অপরিপক্ক গলায় রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলাম আমার পাশে আমানউল্লা গভীর ঘুমে আর তার গা ঘেঁষেই স্বয়ং গায়ক দাঁড়ানো। ধরলেন, 'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙ্গামাটির পথ আমার মন ভোলায় রে' গানের কথার সাথে এ অঞ্চলের মাটির বেশ মিল রয়েছে। পরে শুনেছিলাম শান্তি নিকেতনের শালবিথীতে হাঁটতে হাঁটতে রবীন্দ্রনাথ এ গীত রচনা করেছিলেন। ট্রেন বর্ধমান স্টেশনে স্বল্পক্ষণের বিরতি দিয়ে আবার বোলপুরের দিকে

www.pathagar.com

রওয়ানা হল। গায়ক একের পর এক হরেক মেজাজের গান গেয়ে চলেছেন। একই সাথে হকারদের বিরতিহীন আনাগোনা আর বিচিত্র হাঁকডাক। সব মিলিয়ে ট্রেনের এই কম্পার্টম্যান্টে এক রকম মেলার পরিবেশ। গায়ক তার গান শেষে মেলে ধরলেন তার হাতের খঞ্জনি খানি। তিনি ভিক্ষা বলছেন না। তার গান শুনে যদি কেউ আনন্দ পেয়ে থাকেন তাদেরকেই কিছু দিতে বলছেন। আমার কাছে কয়েকটি এক টাকার বা রুপির কয়েন ছিল তাই দিলাম। আমানউল্লা একবার চোখ মেলে দেখে পূর্বতন অবস্থায় ফিরে গেল।

সকাল প্রায় সাড়ে নয়টার মধ্যেই আমরা বোলপুর-শান্তিনিকেতন স্টেশনে পৌঁছলাম। স্টেশনের এবং বীরভূম জেলার এই পৌরসভার নাম বোলপুর। শান্তি নিকেতনের কারণেই এখন এ নামেই বিশ্ব পরিচিতি। স্টেশনের ফলকে লিখা 'শান্তি নিকেতন (বোলপুর)।

নেমেই আমাদের প্রথম কাজ টিকেটের জট খোলা। স্টেশন মাস্টারকে না পেয়ে স্টেশনের ভিতর দিকে থেকেই 'ইনফরমেশন' কাউন্টারে গিয়ে আমাদের সমস্যার বয়ান দিলে সেখানে বসা মহিলা আমাদেরকে প্রথমে স্টেশন মাস্টারের কাছে যেতে বললেন। আবার সেখানে ছুটলাম। তিনি টিকেট দেখে বললেন, 'তা আপনারা ফেরত যাবার আধাঘণ্টা পূর্বে প্লাটফরম টিকিট কেটে আমার এখানে এসে বসবেন। পরে আমি দেখব কি করা যায়।' তার কথায় আমি খুব একটা আশাবাদী হলাম না। তাছাড়া আমার কাছে মনে হল ওই সময়ে তিনি কিছু উপরিও কামাইয়ের চিন্তা করছেন।

আমি পুনরায় ইনফরমেশনে গিয়ে বলেছিলাম, 'স্টেশন মাস্টারই আপনার নিকট পাঠিয়েছে।' এবার তিনি বললেন, 'প্রথমে টিকিট আপনাকে বাতিল করাতে হবে পরে নতুন টিকেট নেবেন। তবে ওই পাশের কাউন্টার থেকে বুকিং নেবেন।' আমানউল্লা যন্ত্রচালিতের মত আমার সাথেই ঘুরছে। পাশের বুথে সব ট্রেনেরই বুকিং চলছে। বেশ লম্বা লাইন। ট্রেনের সূচিতে দেখলাম বেলা দেড়টায় 'শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস' স্টেশন ছাড়বে আর কলকাতা পৌঁছবে বিকেল সাড়ে চারটায়। আমরা সন্ধ্যার পরিবর্তে দুপুরের পরের ট্রেনে যাব বলে মত পাল্টালাম। ভুল তারিখের টিকেট পাল্টিয়ে ফেরত যাবার টিকেট কেনাই এখন আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে হল।

বুকিং-এ বেশ লম্বা লাইন। বুথের প্রায় কাছাকাছি এসে শুনলাম বুকিং করতে হলে একটা আলাদা ফরম পূরণ করতে হয়। আর ওই ফরম পাশের কেন্দ্র মানে ইনফরমেশন কেন্দ্র হতে সংগ্রহ করে পূরণ করে টিকেট বাবুকে দিলে তবেই তিনি প্রীত হবেন। মনে মনে ভাবলাম এ কথাটা ওই মহিলা আগেই জানাতে পারতেন কিন্তু সেই থেকে দেখছি একবার ফোনে কথা বলতে থাকলে সহজেই ছাড়তে চান না। তিনি তখনও ফোনে ব্যস্ত। ব্যস্ততা কমলে দু'টো ফরম চাইলাম। প্রয়োজনীয় তথ্য লিখলাম। এতক্ষণে

www.pathagar.com

আমানউল্লাও লাইন ছেড়ে দিয়েছিল। ফরম পূরণ করে পুনরায় ওই মহিলার শরণাপন্ন হলে তিনি বললেন, 'একটা ফরমে লিখুন বাতিল বা ক্যানসেল মানে যে টিকিটটি ক্যানসেল করবেন ওই ডিটেল লিখে ক্যানসেল শব্দটা জুড়ে দেবেন' বলে আরেকটি ফরম এগিয়ে দিলেন। এবার আমার ক্রোধের মাত্রা বাড়ল তবুও দম বন্ধ করে হজম করলাম। বিদেশ বিভুঁই। কেন এই মহিলা একবারে বলতে পারলেন না। তাকে আমাদের বিড়ম্বনার কথাতো আগেই বলেছিলাম। অগত্যা তার নির্দেশ মত কাজ শেষ করলে তিনি এবার দয়াপরবশ হয়ে বললেন আপনি এ সব কাগজ নিয়ে ওই বুথে গিয়ে বললে তিনি আপনাদের নতুন বুকিং দেবেন।' একটু ভিতরে ঝুঁকে দেখলাম দু'জন প্রায় পাশাপাশি বসা কিন্তু বাইরে দু'টি বুথ।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে আমানউল্লাকে নিয়ে পুনরায় লাইনে দাঁড়ালে সামনের এক ব্যক্তি বললেন, 'আপনি সামনে যে জায়গা ছেড়েছিলেন সেখানেই দাঁড়াতে পারতেন।' আমি তার সৌজন্যমূলক আচরণে বেশ সন্তুষ্ট হয়ে বললাম, 'না ঠিক আছে কয় মিনিটের আর ব্যাপার।' এবার আমানউল্লা মৌনতা ভঙ্গ করে বলল, 'আমি হোটেলের ম্যানেজারকে ফোন করে কিছু কথা শুনিয়ে দেই; বলে ফোন করলে হোটেল ম্যানেজার শফিউদ্দিন অপরপ্রান্ত থেকে উত্তর দিলেন। আমি আমানের হাত থেকে মোবাইল নিয়ে আমাদের এই গলদঘর্ম হবার বিষয়টির সংক্ষিপ্ত ভার্সন বয়ান করলে তিনি খুব লজ্জিত হয়ে বললেন যে আমরা ফিরে আসলে তিনি এর একটা বিহিত করবেন। আর কি বিহিত করবেন। যা ভোগান্তি তা তো হলোই।

অগত্যা লাইনে দাঁড়িয়ে স্টেশনের পিএ সিস্টেমের অনবরত বাজতে থাকা রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতে থাকলাম।

শান্তি নিকেতন স্টেশনটির অভ্যন্তরের সাজসজ্জা একটু আলাদা। কয়েকটি মুরালে রবীন্দ্রনাথের গীতি নাট্যের দৃশ্য আর দৃষ্টিনন্দন রং করা। অনবরত বেজে চলেছে রবীন্দ্র সঙ্গীত। পরিবেশটা কিছুটা কাব্যিক। ছোট স্টেশন তবে বিশ্বভারতীর কারণে একটু ব্যতিক্রমধর্মী এবং গুরুত্বপূর্ণ।

লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষার সময় শেষ হল। আমি টিকেট বাবুকে বুঝিয়ে বললাম সেই সাথে শান্তি নিকেতন এক্সপ্রেসে ফিরবার কথাও বললাম। তিনি রিজারভেশন ফরম চাইলে পাশের মহিলাকে দেখিয়ে বললাম যে ফরম ওখানে আছে। এবার ভদ্রমহিলা ফরম দুটো এগিয়ে দিলেন। ফরম দুটো দেখে তিনি মুখ খুলে বললেন, 'মাফ করবেন হামি বাংলা পড়তে পারি না। আপনি ট্রেনের নাম আর নিজেদের নাম ইংরেজিতে লিখে দেবেন।' ফরমের অপরপিঠে ইংরেজিতে লিখবার প্রয়োজন হতো। যে পৃষ্ঠায় বাংলায় লেখা ছিল আমি বাংলায় সে পিঠেই আমার অজান্তেই লিখেছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম আমি ভারতে রয়েছি যেখানে অন্যান্য ভাষার লোকেরাও চাকরি করেন। বোধহয় শান্তি

www.pathagar.com

নিকেতনের প্রভাব পড়েছিল। অগ্যতা ইংরেজিতে লিখে দিলে আগের টিকেট বাতিল করে শান্তি নিকেতন এক্সপ্রেসের টিকেট দিলেন। বাতিলের মাশুল হিসাবে কিছু বাড়তি টাকা দিতে হল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক টিকেটের বিভ্রাটের জন্যে ঝকমারি পোহাবার পর স্টেশন থেকে বের হয়ে খাবার দোকান খুঁজছিলাম। কারণ, অত সকালে নাস্তা জুটেনি। সাধারণত রেলওয়ে স্টেশনের ধারে কাছে মোটামুটি ধরনের রেস্তোরাঁ থাকার কথা কিন্তু তেমন কিছু দেখতে পেলাম না। পরিবর্তিত সূচিতে আমাদের হাতে সময় প্রায় তিন ঘণ্টা। আমার মনে হল এতটা সময়ই যথেষ্ট হবে একটি অনন্য বিদ্যাপীঠ দেখবার জন্য। আমার বহু দিনের ইচ্ছা ছিল এত বহুল চর্চিত বিশ্ববিদ্যালয়টি দেখবার। আমানউল্লার প্রথম দিকে উৎসাহ থাকলেও এক পর্যায়ে ভাটা পড়েছিল তবে তার মিসেসের তাগিদে আমার সঙ্গ ছাড়েনি।

স্টেশন থেকে বের হতেই রিক্সা আর প্রাইভেট ট্যাক্সিচালকরা ছেকে বসলে প্রথমে রিক্সা নিতে চাইলেও ট্যাক্সিই নিলাম। ট্যাক্সিচালক আমাদেরকে শান্তি নিকেতন ঘুরে দেখাবে এবং সময়মত স্টেশনে পৌঁছে দেবে। বিশ্বভারতী যাবার পথে আমাদের নাস্তার জন্যে কোথাও থামতে বললাম।

খুবই ছোট শহর। পথে একটা বাজার মাত্র। কোথাও বসবার জায়গা চোখে পড়ল না। আরও পরে একটা যেনতেন হোটেলের তথাকথিত রেস্তোরাঁয় বসে নাস্তা খেয়ে আমরা বিশ্বভারতীর পথে রওয়ানা হলাম। এবার চালক কোন কোন জায়গা দেখবার আছে আমাদেরকে বললেন, 'স্যার কলাভবনই ঘুরে দেখতে পারেন জাদুঘরসহ অন্যান্য সব আজ বন্ধ। বিশ্বভারতী বুধবারে বন্ধ থাকে।' বুধবারে বিশ্বভারতীতে ছুটি! এটাতো আমাদের জানবার কথা ছিল না। বুধবারই বা কেন ছুটি, আর আমরা এখানে আসলামও বুধবারে, জানবার আগ্রহ থেকে গেল। অবশ্য পরে এর কারণ জেনেছিলাম।

আমরা বিশ্বভারতীর সীমানায় প্রবেশ করলাম। চারিদিকে গাছপালা আর সবুজে ভরা। হাতের বাঁয়ে, মানে পশ্চিম দিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলো আর পূর্বে জাদুঘর অডিটরিয়াম প্রশাসনিক ভবন। পশ্চিম পাশে প্রচুর গাছ। গাছগুলোর বেশ বয়স হয়েছে তা চোখেই দেখা যায়। কিছু দূর যেতেই রাস্তার পাশে দাঁড়ানো দু'জন ইশারায় থামতে বললেন। ট্যাক্সি থামাতেই বললেন, 'স্যার আমরা স্থানীয় গাইড সমিতির সদস্য। একজন গাইড নিলে আপনাদের বিশ্বভারতীর অতি গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো দেখতে এবং এর ইতিহাস পেতে সুবিধা হবে। না হলে স্যার বিশ্বভারতীয় আর দশটা জায়গার মত মনে হবে।' ভদ্রলোক কাব্যিক বটে। আমরা তাকেই সাথে নিতে সম্মত হলাম। তিনি ট্যাক্সির কো-ড্রাইভার সিটে বসলেন।

গাইড মশাইয়ের নাম জিজ্ঞাসা করাতে বললেন 'স্যার আমার নাম সত্য নারায়ণ

www.pathagar.com

বোস। এখানেই থাকি। এখানে পৌষের মেলা, কনভোকেশন, রবীন্দ্রজয়ন্তী ছাড়া শীতের সময় দেশি-বিদেশি বহু পর্যটক আসেন। এ মৌসুমে খুব কম লোক আসেন আর আজকে তো ছুটির দিন। খুবই কম দর্শনার্থীর সমাগম হবে।'

'আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি। বুধবার ছুটি কেন বোস বাবু বলবেন কি?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম। 'স্যার বিশ্বভারতীর সূচনা করেন রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য ছিলেন। আর ব্রাহ্ম সমাজ গঠনের মাধ্যমে বেঙ্গলি রেনেসাঁর সূত্রপাত। বেঙ্গলি রেনাসাঁ আর ব্রাহ্ম সমাজের সূত্রপাতকারী রাজার রাম মোহন রায় আগস্ট ২০, ১৮২৮ সালে ব্রাহ্ম সমাজের ঘোষণা দেন। সেদিন ছিল বুধবার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বুধবারকেই 'পবিত্র বুধবার' হিসাবে ছুটি ঘোষণা করেন। বোস বাবু আবার বললেন, 'স্যার এখানে ব্রাহ্ম সমাজের প্রথায় প্রার্থনা হয়। কোন বিশেষ ধর্মের কোন প্রার্থনার জায়গা নেই। এখানে কোন মন্দির বা মসজিদ নেই। যা আছে একটি বাড়ি যার নাম শান্তি নিকেতনের বাড়ি। এই বাড়িকে কেন্দ্র করেই অন্যসব প্রতিষ্ঠান। এর পাশে যে স্থাপনাটি দেখছেন সেটি ছাতিমতলা। আর একটু সামনে যা দেখছেন ওটাকে মন্দির বলুন আর যাই বলুন এসবকে কেন্দ্র করেই এই বিশ্বভারতী।'

আমরা বোসের সাথে মন্দিরের সামনে নেমে দাঁড়ালাম। অনেকটা কাচের ঘরের মত। এর চৌহদ্দিতে যেতে হলে অনুমতি নিতে হয়। পাশে বাংলা সাহিত্যে বহু উল্লেখিত, ছাতিমতলা। দক্ষিণপ্রান্তে এর মূল ফটক এখান থেকেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ছাতিম গাছের নিচে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। এর এ জায়গা তিনি স্থানীয় জমিদারের নিকট হতে মৌরুসী পাট্টা নেন। বোস জানালেন যে, প্রতি বছর ৭ই পৌষ সকাল ৭-৩০ মিনিটে এখানে উপাসনা হয়। উপাসনা শেষে গান গেয়ে এই বেদি প্রদক্ষিণ করে শিক্ষার্থীরা। এখানে যে ছাতিম গাছ ছিল তা মারা গিয়েছে বহু পূর্বে। তার জায়গায় আরও দু'টি ছাতিম গাছ লাগানো হয়েছে। এখানে সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ। ফটকের সামনে লেখা 'তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ আত্মার শান্তি।' এটাই শান্তি নিকেতনের তীর্থস্থান।

'শান্তি নিকেতন বাড়ি'। অনেকটা জোড়াসাঁকোর বাড়ির অনুরূপে তৈরি। ১৮৬৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বর উপাসনার জন্যে এ বাড়িটি তৈরি করান। এখানেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪০ বছর বয়সে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করেন। বাড়িটি বর্তমানে হেরিটেজ বিল্ডিং। বাড়ির সামনে ভাস্কর রামকিঙ্করের বেইজ-এর এ বিশাল শিল্প কীর্তি। আমি রামকিঙ্করের নাম-এর আগে শুনিনি, তবে গাইড বোস আমাদেরকে কলাভবন অংশে এই শিল্পীর বহু ভাস্কর্য দেখিয়ে বলেছিলেন, 'রামকিঙ্করের কোন প্রচলিত বিদ্যা ছিল না তারপরেও এখানকার সব কাজ তারই কীর্তি।'

www.pathagar.com

বোস বাবু আমাদেরকে কলাভবনের চৌহদ্দিতে নিয়ে যাবার উদ্যোগ নিলে আমানউল্লা বলল, 'এখানে অমর্ত্য সেনের নানা বাড়ি আছে না?' বোস বললেন, 'আজ্ঞে ঠিকই বলেছেন, তবে এখানে সামান্য সামনে হাতের বাঁয়ে যে বাড়িটি এখনও পাবেন সেটি বানিয়েছিলেন তাঁর পিতা এটি সেন। অমর্ত্য সেনদের আদি বাড়ি তো মানিকগঞ্জ। ঢাকায় তো তাঁদের বাড়ি রয়েছে। আমি বললাম, 'রয়েছে না ছিল। এখন দু'এক হাতঘুরে এই সাহেবের কাছে হস্তান্তর হয়েছে। আমি সে বাড়িটি দেখেছি বলেই বলতে পারলাম। বাড়ি বর্তমানে খরিদ সূত্রে আমানউল্লার সম্পত্তি। 'অমর্ত্য সেন প্রথমবার যখন ঢাকায় আসেন তখন বাড়িটি দেখতে এসেছিলেন।' আমানউল্লার উক্তি। আমরা কিছুক্ষণের জন্য মূল রাস্তা সংলগ্ন এটি সেনের বাড়ির সামনে দাঁড়ালাম। গেটের সামনে তাঁর নাম ফলকটি এখনও আছে।

আমরা গাড়ি ছেড়ে বিশ্বভারতীর মূল অংশ কলা বিভাগের দিকে হেঁটে রওয়ানা হলাম। বোস আমাদেরকে যে কয়টি জায়গা দেখাবেন সে সব জায়গা হেঁটেই দেখতে হয়। আশেপাশে যত স্থাপনা রয়েছে সেগুলো ছোট ছোট দোতলা ঘর। বেশির ভাগই ছাত্রাবাস। ছাত্রীদের জন্যে আলাদা নিবাস আর কিছু ক্লাসরুম রয়েছে। বিশ্বভারতী এখন পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। এখন ললিতকলা ছাড়াও বিভিন্ন ভাষা এবং বিজ্ঞানের ফ্যাকাল্টি যুক্ত হয়েছে। তবে বিশ্ব পরিচিতি ললিতকলার বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে বেশি পরিচিত। এখানের প্রায় গাছের নিচে ক্লাস চালাবার জন্য জায়গা করা আছে। তবে বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির সময় ধারে কাছের ছোট ছোট ভবনগুলোতে ক্লাস হয়। বাইরে গাছের নিচে ক্লাসগুলো হয় ভোরে এবং বেশ ভোরেই বাইরের ক্লাসগুলো শেষ হয়। দেখলাম কিছু কিছু গাছের নিচে চলছে আড্ডা আর কোথাও কোথাও অলসভাবে শিক্ষার্থীরা বসা। এক গাছের নিচে দুই বাংলাদেশি ছাত্রী পেলাম। একজন সঙ্গীতের আর একজন ফাইন আর্টসের ছাত্রী। কথোপকথনে জানতে পারলাম যে তাদের খেতে হয় ক্যান্টিনে অথবা নিজেরা রান্না করে। অবশ্য তাদের শরীরের গড়ন দেখে আমার তেমনই অনুমান হয়েছিল।

আশপাশের ঘরের দেয়ালগুলোতে ফাইন আর্টসের ছাত্র-ছাত্রীর তৈরি ম্যুরাল। ম্যুরালের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে গ্রাম্য চিত্র আর রবীন্দ্র গীতিনাট্যগুলোর বিশেষ দৃশ্য। আমরা হাঁটতে হাঁটতে ছাতিমতলার দক্ষিণে আসলাম বোস বাবু দক্ষিণে একটি বকুল গাছ আর তার নিচে বসবার জায়গা, যেগুলো ক্লাস রুমের জন্যে বানানো, দেখিয়ে বললেন, 'এই সেই বকুলতলা যার প্রভাব রবীন্দ্র রচনাবলিতে খুঁজে পাবেন।'

আরও এগিয়ে উপাসনা মন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণে তালগাছকে কেন্দ্র করে গোলাকৃতি খড়ের ঘর দেখিয়ে বোস বললেন, 'এটি তালধ্বজ বাড়ি। এখানে এক সময়

www.pathagar.com

উপাচার্য থাকতেন, এখন এটি সংঘের মহিলা কার্যালয়।' বাড়ি ছাড়িয়ে কাচ মন্দিরের পূর্ব দিকে বিশাল এক বটগাছ। বয়স প্রায় দেড়শত বছর হবে। গাইড আমাদেরকে জানালেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে বসে সূর্যোদয় দেখতেন আর রবীন্দ্রনাথ বারো বছর বয়সে একটি বটগাছ লাগিয়ে পাথর দিয়ে ঘিরেছিলেন। যেটা পরবর্তীতে তিন পাহাড়ে পরিণত হয়। জায়গাটির নামই তিন পাহাড়।

শান্তি নিকেতন বাড়ির সামনে দিয়ে গাইড আমাদের দক্ষিণে নিয়ে আসলেন। বেশ কিছু বড় বড় আমগাছের ফাঁকে একটি বেদি দেখিয়ে বললেন, 'এই সেই বিখ্যাত আম্রকুঞ্জের বেদি। বেদির আশেপাশের গাছের নিচে কংকর বিছানো এখানে ক্লাসগুলো হয়। এই বেদিটি বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবের নির্দিষ্ট স্থান। ১৯১৩ সালে ১৩ নভেম্বর কবি গুরুর নোবেল বিজয়ের পর এখানেই সম্বর্ধনা দেয়া হয়। আমানউল্লা এতক্ষণ চুপ ছিল, নোবেল প্রাইজ শুনার সাথে সাথে বলে উঠল, 'আমাদের নবেল লরিয়েটের তো খবরই নেই।' বোস বাবু বুঝে উঠবার আগেই আমি বললাম, 'না আপনি আপনার বয়ান জারি রাখুন।'

বোস আমাদেরকে জানালেন যে, কবিগুরু নিজে বাংলার সর্বজনবিদিত শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সুভাষ চন্দ্র বোসকে এখানে সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন। আমি জানতাম শরৎ চন্দ্র নিজেও ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের সদস্য। ব্রাহ্ম দর্শন শরৎ চন্দ্রের বহু উপন্যাসে উপস্থিত।

আম্রকুঞ্জের পাশের ছোট বাড়িটি রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর নামে শিশু-কিশোরদের জন্য শিক্ষার ভিত তৈরি করতে বর্তমানে পাঠশালা। তাঁর স্মরণেই নাম রাখা। এ বাড়িটি রবীন্দ্রনাথের জীবনকালেই তৈরি হয়েছিল। এ বাড়ির উল্টোদিকে দেয়াল ঘেরা বাড়িটি মৃণালিনী ছাত্রী নিবাস। এই দুইয়ের মাঝে দিয়ে পূর্ব পশ্চিমে কাকর বিছানো পায়ে চলা পথ। দু'পাশে শাল গাছ দিয়ে সজ্জিত এরই নাম 'শালবীথি'। বোস জানালেন যে এ রাস্তাটি ছিল রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় জায়গা। এখানে তিনি সকাল বিকেলে হাঁটতেন আর হাঁটতেই হাঁটতেই তাঁর বিখ্যাত সব কবিতা আর গীতের জন্ম দিয়েছিলেন। লক্ষ্য করে দেখুন বীরভূমের মাটি লাল এখানে বৃষ্টিতে পানি জমে না। আশপাশের গ্রামের লালমাটির পথ দেখতে দেখতে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন 'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙ্গামাটির পথ'। বোস আরও বললেন, 'এখানে বহুবার নেতাজী সুভাষ বোস এসেছিলেন কবিগুরুর সাথে দেখা করতে।'

আমাদেরকে বের হবার পথে এনে বোস বাবু বললেন, 'আজ ছুটি না হলে বিকেলে আপনারা কলা ভবনের সঙ্গীত বিভাগে চর্চা দেখতে ও শুনতে পেতেন।' এই হল মোটামুটি শান্তি নিকেতনের কেন্দ্র। বাকি সব স্থাপনা কবির তিরোধানের পরে

www.pathagar.com

সংযোজন হয়েছে।

এবার আমাদের ফিরবার পালা। চারিদিকে আবার দেখলাম। গাছ-গাছালিতে ভরা শ্যামল ছায়াপূর্ণ এলাকা যা বাংলার প্রান্তরের একাংশ। তবে তফাতটা হল বিশ্বভারতী নামের উন্মাদনা এ উন্মাদনা রয়েছে আমাদের অনেকের মধ্যে। বোসকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন যে, আসলে বিশ্বভারতী তৈরির পেছনে রবীন্দ্রনাথ নয় তার পিতা এবং অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান সবচাইতে বেশি। রবীন্দ্রনাথ তার নাম দিয়েছেন, আরও ব্যাপ্তি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কারণে এখানে মহাত্মা গান্ধী হতে বিশ্বের বহু নেতা সাহিত্যিক আর কবিদের সমাগম হয়, পরিচিতি পায় বিশ্বব্যাপী। বোস বললেন, 'স্যার রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলা রেনেসাঁর শেষ খুঁটি। মূলত এ জায়গাই এখনও ব্রাহ্মবাদের ধারক বাহক।'

আমরা সত্য নারায়ণ বোসকে ধন্যবাদ আর তার পাওনা একশত রুপি দিয়ে স্টেশনে চলে আসলাম। ঠিক সময়েই শান্তি নিকেতন এক্সপ্রেস কোলকাতার উদ্দেশে রওয়ানা হল। পৌছবে সাড়ে চারটার দিকে। আমানউল্লা কফি হাউসে যেতে চেয়েছিল। সময় থাকলে নিয়ে যাব বলেছিলাম। কাল সকালেই আমানউল্লা ঢাকায় চলে যাবে আর আমি আরও একদিন কলকাতায় থেকে শনিবার মৈত্রী ট্রেনে ঢাকায় ফিরব।

ট্রেন বেশ স্পিড ধরল। ইলেকট্রিক ট্রেন স্পিড ধরবেই না কেন। আমি জানালার ধারে বসতে ভালবাসি। সেখানে বসলাম, বাইরের দৃশ্য দেখছিলাম। সবুজ মাঠ দূরে দূরে বহু তাল আর খেজুর গাছ। এ ধারটায় গ্রাম আর জনবসতি একটু কম।

বাইরে তাকিয়ে শান্তি নিকেতনের সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ নিয়ে চিন্তা করছিলাম। শান্তি নিকেতন শুধু রবীন্দ্রনাথের কারণেই এত উঁচুতে। ওই সময়ে এ ধরনের পাঠদান পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ নতুন। তবে পরে এই পদ্ধতিই একটি মডেলে পরিণত হয়।

রবীন্দ্রনাথ উত্তরাধিকার সূত্রে শান্তিনিকেতন পেয়েছিলেন আর বাবার পথে হেঁটেছেন তবে তিনি নিজে ব্রাহ্ম সমাজের কত বড় সদস্য ছিলেন তা আমার জানা নাই। তবে তার মরদেহ হিন্দুশাস্ত্র মতে দাহ করা হয়েছিল। রাজা রাম মোহন রায় এবং রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল ব্রাহ্মন সমাজের রীতি মতে।

সত্যনারায়ণ বোস ঠিকই বলেছিলেন 'বেঙ্গলি রেনেসাঁ'র শেষ সৈনিক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ যার শুরু করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। এগিয়ে নিয়েছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রমুখ।

আমার এ জায়গা দেখার ইচ্ছা ছিল অনেক দিনের। বহু জায়গায় গিয়েছি বহু ঐতিহাসিক জায়গা দেখেছি, এমনকি গত ডিসেম্বরে জোড়াসাঁকোতেও গিয়েছি কিন্তু

www.pathagar.com

এখানেই আসিনি। তখন প্রায়ই মনে পড়তো এই শান্তি নিকেতনে বসে পৌষের কোন সময় কবিগুরুর লিখা কবিতার কয়েক চরণ।

বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।

এবার সেই শিশির বিন্দুর দেখা পেলাম এই শান্তি নিকেতনে।

আমরা কলকাতায় হোটেলে পৌঁছে সেখান থেকে সন্ধ্যায় আমানউল্লাকে নিয়ে কফি হাউসে গিয়ে কিছু হালকা নাস্তা করলাম। পরিচয় হল দুই তরুণ কবির সাথে। একজন তার রচিত লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত কবিতার সংকলন দিলেন। এঁরা লিটল ম্যাগাজিনের সাথে জড়িত। আমানউল্লা বলেছিল, 'কৈ আপনাদের সেই দুই দাদাকে দেখতে পেলাম না।'

বললাম, তাদের তো আজ দেখছি না। হয়ত আরও পরে আসবেন অথবা কলকাতার বাইরে কোথাও গিয়ে থাকতে পারে।' আমানউল্লা সত্যেন বোস এবং অরবিন্দ সরকারের কথা বলছিল।

পরের দিন সকালে আমানউল্লা জিএমজিতে ঢাকার যাবার উদ্দেশ্যে হোটেল ত্যাগ করবে আর আমি আরও একদিন কলকাতায় থেকে দেশে ফিরে যাব।

আমানউল্লার ঢাকায় যাবার পথের বিড়ম্বনার বিষয়টি সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ না করলেই নয়। সেপ্টেম্বর ৮, ২০১১ সাল। সকাল প্রায় পাঁচটায় আমানউল্লা আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রমেশের ট্যাক্সিতে সাড়ে সাতটার জি এম জি ফ্লাইটে ঢাকা যাবার উদ্দেশ্যে দমদমের দিকে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল। আমি নাস্তা করে পার্ক স্ট্রিট ধরে প্রথমে সাউথ পার্ক স্ট্রিট সেমিটারি হয়ে এশিয়াটিক সোসাইটিতে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এর মধ্যে আমানউল্লা ফোনে জানালো যে, সে হোটেলে ফিরছে কারণ ফ্লাইট বিলম্বিত হয়ে দুপুর দেড়টার আগে ছাড়ছে না। আমি তাকে বিমান বন্দরে বসে না থেকে সময় মত পুনরায় ফিরে যেতে অনুরোধ করলে সে রাজি হলে এসে নাস্তা করে আবার দমদমে ফিরে যাবার জন্য রওয়ানা হয়েছিল। আমাকে হোটেলে তার জন্য অপেক্ষা করতে হল। পুনরায় হোটেলে ফিরে আমানউল্লা নাস্তা সেরে সকাল প্রায় দশটায় রমেশকে নিয়ে বের হলে আমি সাউথ পার্ক স্ট্রিট সেমিটারিতে নেমে যাব বলে

www.pathagar.com

তার সাথে ট্যাক্সিতে চাপলাম। বেশ কিছু পথ ঘুরে রমেশ আমাকে সেমিটারির পূর্বদিকে এক গলিতে নামিয়ে বললেন, 'স্যার, এদিক দিয়ে এই সময়ে ওয়ানওয়ে হয়ে যাওয়াতে আপনাকে প্রধান ফটকে নামাতে পারলাম না। সামনের গলি দিয়ে গেলেই পার্কস্ট্রিটের উপরে প্রধান ফটক পাবেন।' আমি নেমে গেলাম। আমানউল্লা দ্বিতীয়বার বিদায় নিল ঠিকই কিন্তু সেদিন জিএমজিতে তার আর যাওয়া হল না। জিএমজি-এর বিমানটি রানওয়ের উপরেই বিকল হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যায় বহু কষ্টে বিমান বাংলাদেশের সহযোগিতায় তাকে ঢাকা পাঠাতে পেরেছিলাম। সে এক উপাখ্যান। বাংলাদেশি বিমান সংস্থাগুলো, কি সরকারি কি প্রাইভেট, প্রায় একই চরিত্রের। সর্বক্ষেত্রে যাত্রীদের বিড়ম্বনা।

যাই হোক রমেশের গাড়ি থেকে নেমে বেশ কিছুদূর হেঁটে আমি সাউথ পার্কস্ট্রিট সেমিটারি বা খ্রিস্টান সমাধি ক্ষেত্র (গোরস্থান)-এর প্রধান ফটকের সামনে পৌঁছলাম। ফটকের বাঁয়ে একটি লিপিতে লেখা রয়েছে যে, এই গোরস্থান ১৭৬৭ সালে খোলা হয়েছিল। ওই সময়ে খোলা হলেও সবচাইতে পুরাতন সমাধি সৌধে লেখা রয়েছে ১৭৬৮ সাল। তার মানে প্রথম ব্যক্তি এখানে সমাধিস্থ হয়েছিল এক বছর পর। গোরস্থানটি বন্ধ করে দেয়া হয় ১৭৯০ সালে। তবে ওই সময়ে বন্ধ হলেও এর পরেও এখানে অনেককে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

তথ্য লিপি পড়বার পর একটু সামনে এগিয়ে প্রধান ফটকে প্রবেশ করলে নিরাপত্তা রক্ষীরা আমার ব্যাগের তল্লাশি শেষ করে সেখানে রক্ষিত দর্শনার্থীদের জন্য নির্ধারিত রেজিস্ট্রার বের করে দিলে আমি আমার নামসহ বিস্তারিত লিখে দস্তখত করে সমাধি ক্ষেত্রের মাঝ বরাবর তৈরি পায়ে চলা রাস্তা ধরলাম। তবে ফটকে ছাড়বার পূর্বে রক্ষীদের কাছ থেকে বিভিন্ন সমাধির কিছু তথ্য জেনে নিয়েছিলাম। আগেরবারের ভ্রমণের সময় বহুল আলোচিত ও পঠিত এই ঐতিহাসিক 'ওল্ড ব্যারিয়াল গ্রাউন্ড' নামে পরিচিত সমাধি ক্ষেত্রটি বিশদভাবে আমার দেখা হয় নাই। বাহির হতে দেখেছিলাম যার যৎসামান্য বিবরণ আমি পূর্বে দিয়েছিলাম। এবার বিস্তারিতভাবে দেখব বলেই আমার সফরসূচিতে এ সেমিটারিটি রেখেছিলাম।

আমি গোরস্থানের প্রধান ফটক ছেড়ে হাঁটা পথ ধরে ভিতরে প্রবেশ করলাম। হাঁটা পথের দু'পাশে দেখে মনে হল আমি সিমেন্ট আর ইটের তৈরি সমাধি সৌধের মনুমেন্টের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটছি। প্রায় গায়ে গায়ে লাগানো সব সৌধ।

প্রচুর নাম না জানা গাছপালায় ছাওয়া এই মহাসমাধি ক্ষেত্র। গাছপালার জন্য দিনের বেলাতেও এক ভুতুড়ে পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কলকাতার গোড়াপত্তনের সময়কার ইউরোপীয়দের শেষ ঠিকানা এই সেমিটারি যদিও দু-একজন এঙ্গলোর সমাধিও রয়েছে। কলকাতা নগরীর পত্তনকালে এই গোরস্থানই ছিল শহরের এক প্রান্তের শেষ

www.pathagar.com

সীমানা। বর্তমানের পার্ক স্ট্রিটের ওই সময়কার নাম ছিল 'ব্যারিয়াল গ্রাউন্ড স্ট্রিট' আর গোরস্থানের নাম ছিল 'ব্যারিয়াল গ্রাউন্ড'।

চারদিকের পরিবেশে কেমন একটা নিস্তব্ধতা। মাঝে মধ্যে ডাল পালাগুলো থেকে পাখির দাপাদাপির আওয়াজে আঁৎকে উঠার মত। সব মিলিয়ে গা ছুম ছুম করবার মত পরিস্থিতি ছিল। গা ছুম ছুম করছিল। ডানে বাঁয়ে অগণিত সমাধি আর এ সময়ে আমি ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলাম না। প্রায় আড়াইশত বছর পুরাতন এই সমাধিক্ষেত্র। এখানে শেষ ব্যক্তির দাফন হয়েছিল ১৮৯৫ সালে। একশত বছরের উপর হতে পরিত্যক্ত এ গোরস্থান। বিশাল এই গোরস্থান কয়েক একরের উপর জঙ্গলাকীর্ণ উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। এখানে প্রবেশ করলে মনেই হয় না যে এ জায়গাটি কলকাতার সবচাইতে বনেদি বাণিজ্য কেন্দ্র আর বংশ পরম্পরায় সমাজের উচ্চবিত্তদের বাসস্থানের মধ্যে। গোরস্থানের চারিদিকে তাকিয়ে মনে হল এ যেন এক মৃতের শহর। এখানের প্রতিটি সমাধি সৌধ ভিন্ন ভিন্ন নক্সায় তৈরি। কোনটার সাথে কোনটার সামঞ্জস্য বা মিল নেই।

আমি এই মহাশ্মশানে মাঝখানের শেওলা পরা হাঁটা পথ দিয়ে অতি সন্তর্পণে হাঁটছিলাম। আমার দু'পাশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ব্রিটিশ রাজের প্রথম দিকের উচ্চপর্যায়ের এবং ওই সময়ের ইউরোপীয় সমাজের প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিবর্গের সমাধি। যদিও এ সমাধিক্ষেত্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 'ব্রিটিশ এসোসিয়েশন অব সেমিটারিজ ইন সাউথ এশিয়া' নামক সংগঠনটি বেশ কিছু লোক নিয়োগ করেছে, তবুও মনে হল অযত্নে থাকাতে ভুতুড়ে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। গাছপালায় ছেয়ে গেছে সমস্ত সমাধিক্ষেত্র আর বৃষ্টির পানিতে শেওলা জমেছে সৌধগুলোর গায়ে। এমনকি শেওলা জমাতে পায়ে চলা পথগুলোও বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে।

এই সমাধিক্ষেত্রের বৃহৎ আর বিভিন্ন আকারের সৌধ দেখে রুডিয়ার্ড কিপলিং ১৮৯১ সালে লিখেছিলেন 'সিটি অব ড্রেডফুল নাইট' (city of dreadful night)। তিনি যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন ঠিক তেমনই এখনও দৃশ্যমান। তিনি এক পর্যায়ে এ ধরনের সৌধ দেখে লিখেছিলেন, 'মৃতদের বুকের উপর বন্ধুরা ইট পাথরের তৈরি সৌধ এমনভাবে বানিয়েছেন তাতে মনে হয় মৃত ব্যক্তির বন্ধুবান্ধবরা নিশ্চিত করেছিলেন যাতে এ সব মৃতরা হঠাৎ সমাধি থেকে উঠে এসে তাদের জায়গা কোনভাবেই দখল করতে না পারে।'

আমি দু'পাশ দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে হাঁটছিলাম। গা ছুম ছুম তখনও করছিল। কারণ গেটগুলোতে ছাড়া সমস্ত সমাধিক্ষেত্রে এ সময়ে আমি একাই দর্শনার্থী। প্রায় প্রতিটি গাছে প্রচুর বাদুড় স্বভাবজাত ভঙ্গিমায় লটকিয়ে আছে। মাঝে মধ্যে পাখা ঝাপটা দিয়ে উঠে। হঠাৎ ওই ধরনের শব্দে আঁৎকে উঠতে হয়েছে একাধিক বার।

www.pathagar.com

হাঁটতে হাঁটতে দু'পাশের সমাধি সৌধের গায়ে দেখলাম বহু ইতিহাস প্রসিদ্ধ বা ইতিহাসে উল্লেখিত ব্রিটিশ রাজ তথা কোম্পানির কর্মকর্তা কর্মচারীদের নাম। এ সব প্রসিদ্ধ নামের দু'একজন ছাড়া সবই ইউরোপিয়ান সদস্য। এরা অনেকেই এই নগরীর গোড়াপত্তনের সাথে জড়িত ছিলেন। আবার অনেকে নিজ গুণে মহান্বিত হয়েছেন। এমনই একজন হলেন উপমহাদেশে বোটানিক্যাল গার্ডেনের জন্মদাতা কর্নেল রবার্ট কেড। এখানে আরও অনেকের মধ্যে শায়িত রয়েছেন স্যার জন রয়েড, যার নামে কলকাতায় এখনও রাস্তা রয়েছে। এখান হতে বেশি দূরে নয়, আমরা যে হোটেলে থাকছি, সেই গুলশান হোটেলেও রয়েড রোডের উপরে।

আরও একটু এগিয়ে দেখলাম প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু এক মনুমেন্ট আকারের সমাধি সৌধ। স্যার উইলিয়াম জোন্স-এর সমাধি। উইলিয়াম জোন্স্ উপমহাদেশের এশিয়াটিক সোসাইটির জনক। তিনি ১৭৮৩ সালে ভারতে আসেন সুপ্রিমকোর্টের বিচারক হিসাবে। বহু গুণের অধিকারী ছিলেন এই ব্যক্তি। ছিলেন বহু ভাষাবিদ। তাঁর মৃত্যু হয় মাত্র ৪৮ বছর বয়সে এপ্রিল ২৭, ১৭৯৪ সালে। তিনি ওই সময়ের এই উপমহাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর প্রচুর লেখালেখি করেন। ওই সময়ের ভারতের বহু সাহিত্য কর্ম ইংরেজিতে ভাষান্তর করেন।

আস্তে আস্তে পায়ে চলা পথ দিয়ে হেঁটে সামনের দিকে এগুলাম। পশ্চিম দিকে দূরে একটি গেট তার কাছেই কয়েকজন মহিলা ঘাস কাটছেন। ওদের দেখে গায়ের ছমছমানি ভাবটা কিছুটা কমল।

দূরের গেটটি দেখলাম ঠিকই কিন্তু আমি সেখানে যাবার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কারণ, আমি যে রাস্তায় হাঁটছিলাম সে পথ শেষের দিকে উত্তর দক্ষিণমুখী রাস্তার সাথে যুক্ত হয়। মাঝ পথ দিয়ে সামনে এগুবার আর উপায় ছিল না। আমি মহিলাদের জিজ্ঞাসা করলাম যে ওই গেটে পৌছাতে সহজ পথ কোনটি। কারণ, সামনে সবুজ চত্বর আর সেখানেও প্রচুর সমাধি প্রায় গায়ে গায়ে লাগানো। মহিলাদের একজন দাঁড়িয়ে অদ্ভুত এক হাসি দিয়ে বললেন, 'কেন এই কবরগুলোর পাশ দিয়ে চলে যাও, আর না হয় ঘুরে যেতে হবে।'

আমি ওই ভৌতিক পরিবেশে সমাধিগুলোর উপর দিয়ে যাব কি যাব না ভাবতে ভাবতে সামনে পা বাড়ালাম। কিছু দূরে যেতে আমার কানে আসল তাদেরই কয়েকজনের হাসি আর সেই সাথে মন্তব্যে, 'ওই মানুষটি বোধ হয় ভয় পেয়েছে'। ভয় নয় তবে গা ছম ছম করেনি তেমনও নয়। একশত বছরের পরিত্যক্ত এই সমাধি এক অদ্ভুত পরিবেশ। এমন জায়গায় আমি ইতোপূর্বে কখনই আসিনি এত সময় কাটানো তো দূরের কথা।

আমি সামনে গেটের দিকে হাঁটতে লাগলাম। পেছনে ঘাস কাটারত মহিলাদের

www.pathagar.com

আওয়াজ আর পাইনি। ফেরবার পথে তাদের আর দেখাও পাইনি। পরে খোঁজ নিতে গেলে প্রধান ফটকের রক্ষীরা বললেন তারা কাউকে দেখেনি তবে মাঝে মধ্যে ঘাস কাটতে আশে পাশের মহিলারা আসে। তবে সে দিন আসছিল কিনা সঠিক বলতে পারে না। হয়ত অন্য কোন গেট দিয়ে এসে থাকতে পারে। সমগ্র বিষয়টি আমার কাছে রহস্যজনক মনে হল।

আমি এ সমাধিক্ষেত্রে এসেছিলাম কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তিদের সমাধির খোঁজে। যাদের নিয়ে লেখা হয়েছে বহু উপন্যাস আর গল্প। বহু সাড়া জাগানো বাংলা উপন্যাসে এদের নামোল্লেখ রয়েছে। আমি এখানে এসেছিলাম এমন কয়েকজনের সমাধির খোঁজে। এমন দু'জনের নাম আগেই বলেছি। তাদের মধ্যে একজন মেজর জেনারেল চার্লস্ 'হিন্দু' স্টুয়ার্ট, আরেকজন রোজ এলমার, যিনি ১৭ বছর বয়সে ভারতে পৌঁছবার এক বছর পর মারা গিয়েছিলেন। আর যে দু'জনের কথা পূর্বে উল্লেখ করিনি তারা হলেন এলিজাবেথ স্যান্ডারসন এবং হেনরি ভিভিয়ান লুইস দেরোজিও (Henry Vivian Louis Derozio)। আমি এই দু'জনার কথায় পরে আসছি।

আমি ধীর পদে ডানে আর বাঁয়ের সমাধি স্তম্ভগুলোর নাম পড়তে পড়তে পশ্চিম দিকের গেটের কাছে একটি সমাধি সৌধের সামনের গাছের নিচে উপবিষ্ট একজন নিরাপত্তা কর্মীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। শীর্ণকায় ষাটোর্ধ্ব ভদ্রলোক। গায়ে নিরাপত্তা কোম্পানির ইউনিফরম। চোখে চশমা। গাছের নিচে বসে একটি বাংলা ম্যাগাজিন পড়ছিলেন। 'সুপ্রভাত মশাই' আমার আওয়াজ শুনে চমশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে সুপ্রভাত। বলুন স্যার আপনার জন্য কি করতে পারি'।

আমি আমার আগমনের হেতু আর পরিচয় দিলে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমরা খুলনা অঞ্চল থেকে ১৯৫৯ সালে এখানে কলকাতায় চলে এসেছি। আমার নাম সুশান্ত অধিকারী। এরপর তিনি তাঁর ইতিহাস বলতে শুরু করলেন। বললেন যে তিনি কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ে ছোটখাটো চাকরি করতেন। সেখান থেকে অবসর গ্রহণের পর প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে তিনি 'ব্রিটিশ এসোসিয়েশন অব সেমিটারিজ ইন সাউথ এশিয়া' নামক সংস্থার নিরাপত্তা কর্মকর্তা হিসাবে যোগদান করেছেন। এখানেই তিনি কর্মরত। জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই সমাধিক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কাদের উপর ন্যস্ত। অধিকারী জানালেন যে এর সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব ওই সংস্থার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার অথবা কলকাতা পৌরসভার কোন হাত নেই। এ জায়গাটিও ওই সংস্থার নামে বরাদ্দ করা। অধিকারী আরও জানালেন যে পার্কস্ট্রিটের মহামূল্যবান এ জায়গাটি কলকাতা পৌরসভা অধিগ্রহণ চাইলে ব্রিটিশ সরকার হস্তক্ষেপ করলে সে যাত্রা রক্ষা পায়। বর্তমানে এটি হেরিটেজ সাইট। 'এখানে হিন্দু স্টুয়ার্টের সমাধি কোনটি? 'এই যে আমাদের সামনেই জেনারেল উইলিয়াম 'হিন্দু' স্টুয়ার্টের

www.pathagar.com

সমাধি'। অধিকারী উত্তর দিতেই তাকিয়ে দেখলাম, তাইতো। আমি এই অদ্ভুত সমাধি সৌধের সামনেই দাঁড়ানো। সমাধি সৌধটি একটি হিন্দু মন্দিরের আদলে তৈরি। আমি অধিকারীকে সামনে রেখে কয়েকটি ছবি নিলাম। হিন্দু স্টুয়ার্টের পরিচয় আমি আগেই দিয়েছি, তাই পুনরাবৃত্তি করলাম না। অদ্ভুত মানুষ ছিলেন এই জেনারেল। তিনি হিন্দু দেব দেবীর মূর্তি সংগ্রহ করতেন আর পূজাও করতেন। তাকে ওই সব দেব দেবীসহ এখানে দাফন করা হয়েছিল।

'রোজ এলমার; এলিজাবেথ, স্যান্ডারসন আর দেরোজিও-এর সমাধিগুলো কোন দিকে?' জিজ্ঞাসা করলে অধিকারী পশ্চিম দিক দেখিয়ে বললেন, 'আপনি ওই পথেই বের হবেন। তবে সোজা পশ্চিম দিক ঘুরে গেলে এদের সমাধিতো পাবেনই আরও বহু ব্যক্তির সমাধি দেখবেন। তবে কি স্যার এরা সবাই এ শহর আর তৎকালীন কলকাতা গড়তে কোন না কোনভাবে জড়িত ছিলেন।'

'এখানে এখনও কি বহু লোক দেখতে আসে?'

অধিকারী বললেন, 'শীতের সময়ে বহু ইউরোপীয় ট্যুরিস্টরা আসেন তবে সন্দ্বিপ রায় এখানে শুটিং করে 'গোরস্থানে সাবধান' ছবি বানাবার পর হাজার হাজার স্থানীয় দর্শনার্থী শীত মৌসুমে এখানে ভিড় জমান।'

আবহাওয়া গুমোট হয়ে উঠছিল। আমি অধিকারীর নিকট হতে বিদায় নিয়ে পায়ে চলা পথ ধরে পূর্ব দিকে রওয়ানা হলাম হিন্দু স্টুয়ার্টের সমাধি থেকে প্রায় বিশ গজের মত এগুতেই দেখলাম 'বেঙ্গলি রেনেসাঁ-এর' দ্বিতীয় প্রজন্মের অন্যতম পথিকৃৎ হেনরি ভিভিয়ান লুইস দেরোজিও-এর সমাধি। এই দেরোজিও-এর প্রভাবেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান হয়েছিলেন আর ইংরেজিতে সনেট লিখবার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। শুধু মাইকেল মধুসূদন দত্তই নয়, অনেক তরুণ ইয়ং বেঙ্গল মুভম্যান্টে জড়িত হয়ে সমাজচ্যুত হলে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন।

দেরোজিও ফ্রেঞ্চ রেভ্যুলিউশনে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলার তরুণদের মধ্যে বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি, সামাজিক এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে বের হবার মন্ত্র দিতে থাকেন। উনিশ শতকে ইয়ং বেঙ্গলি মুভম্যান্টের সূচনা করেন।

দেরোজিও রাজারাম মোহন রায়ের পথ ধরে সে পথকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি ২১ বছর বয়সে হিন্দু কলেজ (পরবর্তীতে প্রেসিডেন্সি কলেজ)-এর সাহিত্যের প্রভাষক হবার সুবাদে ওই সময়কার ছাত্রদের মধ্যে বেঙ্গলি রেনেসাঁ-এর তত্ত্ব প্রচারের সাথে সাথে বাঙালি যুবকদের ইংলিসাইজড করতে সক্ষম হন। দেরোজিও নিজে একজন এঙ্গলো-ইন্ডিয়ান কবি ছিলেন। তাঁরই কবিতার প্রভাব দেখা যায় বাংলার পরবর্তী কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে বিশেষ করে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যে।

www.pathagar.com

দেরোজিও ছিলেন পর্তুগিজ আর ভারতীয় মিশ্রণের ব্যক্তি। কথিত এই এঙ্গলো ইন্ডিয়ান ব্যক্তি যে পথ এ স্বল্প সময়ে দেখিয়েছেন তা খুব ভাল চোখে দেখেনি গোঁড়াপন্থী হিন্দু আর খ্রিস্টান সমাজপতিরা। গোঁড়াপন্থীরা তাকে শুধু সমাজচ্যুতই করেননি বিতাড়িত করেছিলেন হিন্দু কলেজ থেকেও। দেরোজিও ১৮০৯ সালে কলকাতাতেই জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩১ সালে মাত্র ২২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সমাধির উপরে; 'টু ইন্ডিয়া মাই ন্যাটিভ ল্যান্ড' নামক কাব্য গ্রন্থের একটি ছোট কবিতা খোদাই করা রয়েছে :

My country is the days of Glory Past
A Beauti our circle round they brow
And worshiped as deity thou wast
Where is that glory, where is that reverence now?

রাজা রামমোহন রায়ের পথে হেঁটেছেন দেরোজিও আর সাথে নিয়েছেন তাঁর তরুণ ছাত্রদের যাদের মধ্যে অনেকেই বাংলা সাহিত্য আর ব্রাহ্ম সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করবার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। এদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি সমাজচ্যুত হয়ে খ্রিস্টান হয়ে যান, রামতানু লাহেরী ধর্মত্যাগ করে ব্রাহ্ম সমাজে দীক্ষিত হন। তাঁর অন্যতম ছাত্র প্যারীচাঁদ মিত্র বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস লেখেন। সমাজচ্যুত আর চাকরি হারাবার পরেও থেমে থাকেনি দেরোজিও-এর বেঙ্গলি রেনেসাঁর যাত্রা। অবশেষে ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে ডিসেম্বর ২৬,১৮৩১ সালে কলেরায় মৃত্যুবরণ করলে তাঁকে এখানেই সমাধিস্থ করা হয়। দেরোজিও-এর একটি অবক্ষ মূর্তি আজও এসপ্লানেডের সবুজ চত্বরের মাঝে সংরক্ষিত রয়েছে।

আমি দেরোজিও-এর সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে শিলালিপিগুলো পড়লাম। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান ভাণ্ডারে যুক্ত করলাম আর একটি নাম হেনরি ভিভিয়ান লুইস দেরোজিও। এক পর্তুগিজের পুত্র নাম লেখালেন বেঙ্গলি রেনেসাঁর ইতিহাসের পাতায় ইয়ং বেঙ্গল মুভম্যান্ট-এর পথিকৃৎ হিসাবে।

আমি দেরোজিও-এর সমাধি ছেড়ে আরও পূর্ব দিকে এগিয়ে গেলাম। সামনে উত্তর-দক্ষিণের প্রধান পায়ে চলা পথ যেখানে পূর্ব-পশ্চিমের পথের সাথে বেশ বড় দু'টি গাছের নিচে দেখা পেলাম এলিজাবেথ স্যান্ডারসন-এর পিরামিড নক্সার সমাধি। এই মহিলা তৎকালীন ব্রিটিশ রাজের প্রথম দিকের এক সুন্দরী রোমান্টিক জীবনের কাব্যিক কাহিনীর জন্মদাতা। ১৭৫৭ সালের পর হতে যখন ইংল্যান্ড থেকে সম্ভাব্য স্বামীর খোঁজে জাহাজ ভর্তি ইউরোপিয়ান তরুণীরা কলকাতার হুগলী নদীরঘাট গুলোতে নোঙ্গর ফেলেছিলেন তার মধ্যে কলকাতার মাটিতে পা রাখেন ওই সময়কার কলকাতা নগরীর সবচাইতে সুন্দরী মহিলা হিসাবে খ্যাত এলিজাবেথ স্যান্ডারসন। বহু রূপকল্পের জন্ম দিয়েছিলেন এই সুন্দরী রমণী। অবশেষে বিয়ে করলেন রিচার্ড বারওয়েল নামক এক

www.pathagar.com

মদ্যপ, নারী ভোগী, লম্পট বলে পরিচিত কলকাতার সবচাইতে কুখ্যাত ব্যক্তিকে। এলিজাবেথের জীবন সুখের হয়নি। পরে সন্তান প্রসবের সময়ে মাত্র ২৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করলে তাঁকে এখানে সমাধিস্থ করা হয়। বেশ কিছু উপন্যাসের নায়িকা এই এলিজাবেথ বারওয়েল।

আমি বের হবার পথে রোজ এলমারের সমাধির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। এই তরুণী আত্মীয়ের সাথে বেড়াতে এসেছিলেন ভারতে। রোজ এলমার ছিলেন ব্রিটিশ কবি স্যাভেজল্যান্ডার এর বাগদত্তা কিন্তু এক বছরের মাথায় কলেরায় মারা যান। তার মৃত্যু সংবাদে ভেঙ্গে পড়েন ল্যান্ডার। রোজের মৃত্যুতে ল্যান্ডার যে কবিতা লিখেছিলেন সেই বিখ্যাত কবিতা এই সমাধির উপরে খোদিত রয়েছে। বিবর্ণ হয়ে যাওয়াতে পাঠোদ্ধার করতে পারিনি। রোজ আর ল্যান্ডারের এ উপাখ্যান উল্লেখিত হয়েছে প্রমথনাথ বিশীর কালজয়ী উপন্যাস 'কেরী সাহেবের মুন্সী'-তে। ওই উপন্যাস পড়বার পর হতে আমি রোজ এলমার সম্বন্ধে কিছু বিশদ জানতে গিয়ে এখানকার এই ঐতিহাসিক সমাধিক্ষেত্রের সন্ধান পেয়েছিলাম।

আমি ধীর পদে দু'পাশের বিভিন্ন উচ্চতা আর নক্সার সমাধিগুলোর মধ্য দিয়ে বের হবার জন্য পার্কস্ট্রিটের দিকের প্রধান ফটকের পথ ধরলাম। এ পথ দিয়েই প্রবেশ করেছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে কিপলিং-এর বিবরণ মনে পড়ছিল। কিপলিং লিখেছেন 'সমাধিগুলো যেন মৃতদের বাড়ি। এত উঁচু আর এত মজবুত, মনে হয় যেন কোনো প্রেতপুরীর শহরের মাঝের রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছি।'

'সমাধি সৌধগুলোর মাঝখান দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমারও তেমন মনে হল। যে বিষয়টি এখানে লক্ষণীয় তা ছিল এই সব মৃত ব্যক্তিদের জন্ম ও মৃত্যুর সময়কাল। বেশির ভাগই অত্যন্ত অল্প বয়সে ভারতে আসেন ভাগ্যের অন্বেষায়। এখানকার আবহাওয়া আর রোগে আক্রান্ত হয়ে অতি অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন বেশিরভাগ সদস্য। এখানে মৃত ব্যক্তিদের গড়পড়তা বয়স ২৫ এর উপর হবে না। এ বিষয়ে উইলিয়াম ডালরিম্পল তার ইতিহাস ভিত্তিক বই 'হোয়াইট মোগল'-এ লিখেছিলেন যে ওই সময় ভারতে ইউরোপীয়রা দুই থেকে তিন ঋতুই দেখতে পেতেন। হয় ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর অথবা পেটের পীড়াতেই বেশির ভাগ সদস্য মৃত্যুবরণ করতেন। তারপরেও এরা ভারতে এসেছেন। এসেছেন অনেকে কোম্পানির কর্মকর্তা, সেনা কর্মকর্তা অথবা বেসামরিক প্রশাসক হিসাবে। যদিও উপনিবেশিক শক্তির ধারক বাহক ছিলেন এসব কর্মকর্তারা। তবুও স্বীকার করতেই হবে যে, এরা সাথে এনেছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁ আর শিল্প বিপ্লবের অভিজ্ঞতা। এসব অভিজ্ঞতা স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে মিশ্রণের ফলে ভারতে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন হয়েছিল। তবে তার পরিবর্তে দু'শত বছরের গোলামী সহ্য করতে হয়েছে। যদিও গোলামীর শিকল ছিঁড়বার প্রয়াস হয়েছিল বহুবার

www.pathagar.com

তথাপি নিজেদের মধ্যে বিভাজনের জন্যে যে সব প্রয়াস সফল হয়নি।

আমি লক্ষ্য করলাম এ সমাধি ক্ষেত্রে অগণিত শিশুর সমাধি রয়েছে। অল্প বয়সেই এদের মৃত্যু হয়েছে। বেশির ভাগই আবহাওয়া আর বিভিন্ন মহামারীর কারণে। যাই হোক, এসব ভাবতে ভাবতেই সমাধি ক্ষেত্র অতিক্রম করে কখন প্রধান ফটকের কাছে এসে পৌঁছে গেলাম টের পাইনি। ফটকের কাছে চেয়ারে বসা নিরাপত্তারক্ষী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'স্যার খুঁজে পেলেন যেগুলো দেখতে এসেছিলেন?' বললাম, 'জ্বি-আপনাকে ধন্যবাদ'। আবার বলেন, 'সাহেব আরেকটা গোরস্থান আছে পার্ক-স্ট্রিট পার হয়ে সামনে কিছুদূর গেলেই পাবেন। সেখানে মাইকেল মধুসূদনসহ অনেকের সমাধি রয়েছে। ওখানে এখনও দাফন হয়।' আমি বললাম, 'দেখি সময় পেলে যাব।' আর যাওয়া হয়নি।

আমি গেট পার হয়ে পার্কস্ট্রিটে উঠে ফুটপাত ধরে পূর্ব দিকে হাঁটা শুরু করলাম। এতক্ষণের ভ্যাপসা গরমে ঘেমে একাকার। প্রায় দশ মিনিট হাঁটার পর ১ নম্বর পার্কস্ট্রিটে এশিয়াটিক সোসাইটিতে পৌঁছে ওখানকার লাইব্রেরিতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় কাটিয়ে দুপুরের খাবার খেতে বের হলাম। কাছেই এক রেস্তোরাঁতে দুপুরের খাবার খেতে খেতে বিকেল প্রায় চারটা বেজে গিয়েছিল। রেস্তোরাঁ থেকে বের হয়ে অনেকটা যন্ত্রচালিতের মত হেঁটেই আউটরাম স্ট্রিট ধরে গঙ্গার (হুগলী) তীরে আউটরাম ঘাটে এসে পৌঁছলাম। দুপুরের খাবারের পর এতখানি পথ হেঁটে গলধগর্ম হয়ে ক্লান্তবোধ করছিলাম। তখনও বেশ রোদ। এধারটায় তেমন লোকজন নেই। পাশে বেশ পুরাতন বটগাছের নিচে পাকা বেঞ্চে বসে বয়ে চলা হুগলী নদী দেখছিলাম। এই সেই হুগলী বা গঙ্গা নদী যা এক সময় ছিল উন্মত্ত। এখন অনেকটা নিয়ন্ত্রিত। এখন সেই দিন নেই যখন বড় বড় স্টিমার এসব ঘাটে ভিড়তো। বসে রোমন্থন করছিলাম এ প্রান্তের ইতিহাস। সিরাজের পতনের পরের ইতিহাস। ক্ষমতার পালাবদল। একদল ইংরেজ চাটুকার জমিদার, রাজা আর মহারাজাদের উত্থান এই কলকাতা নগরে।

এদের মত কত শোষকদের হাতে নিগৃহীত হয়েছে সাধারণ মানুষ যারা আজও ক্ষমতাবদলের সাথে সাথে নব্য চাটুকার আর নব্য জমিদারদের হাতে অব্যাহতভাবে নিগৃহীত হয়ে আসছে।

জব চার্নকের কলকাতার কত বিবর্তন। এ নগরীর কত ইতিহাস। পরিবর্তনের আর কালের সাক্ষী এই হুগলী নদী। আজ কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়েও বইছে। তবুও হুগলী বইছে যেমন বইছিল তখনও যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম হুগলী পাড়ে নোঙ্গর ফেলেছিল। প্রথম পা ফেলেছিল ইংরেজ বেনিয়ারা বাংলা বিহার প্রান্তরে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

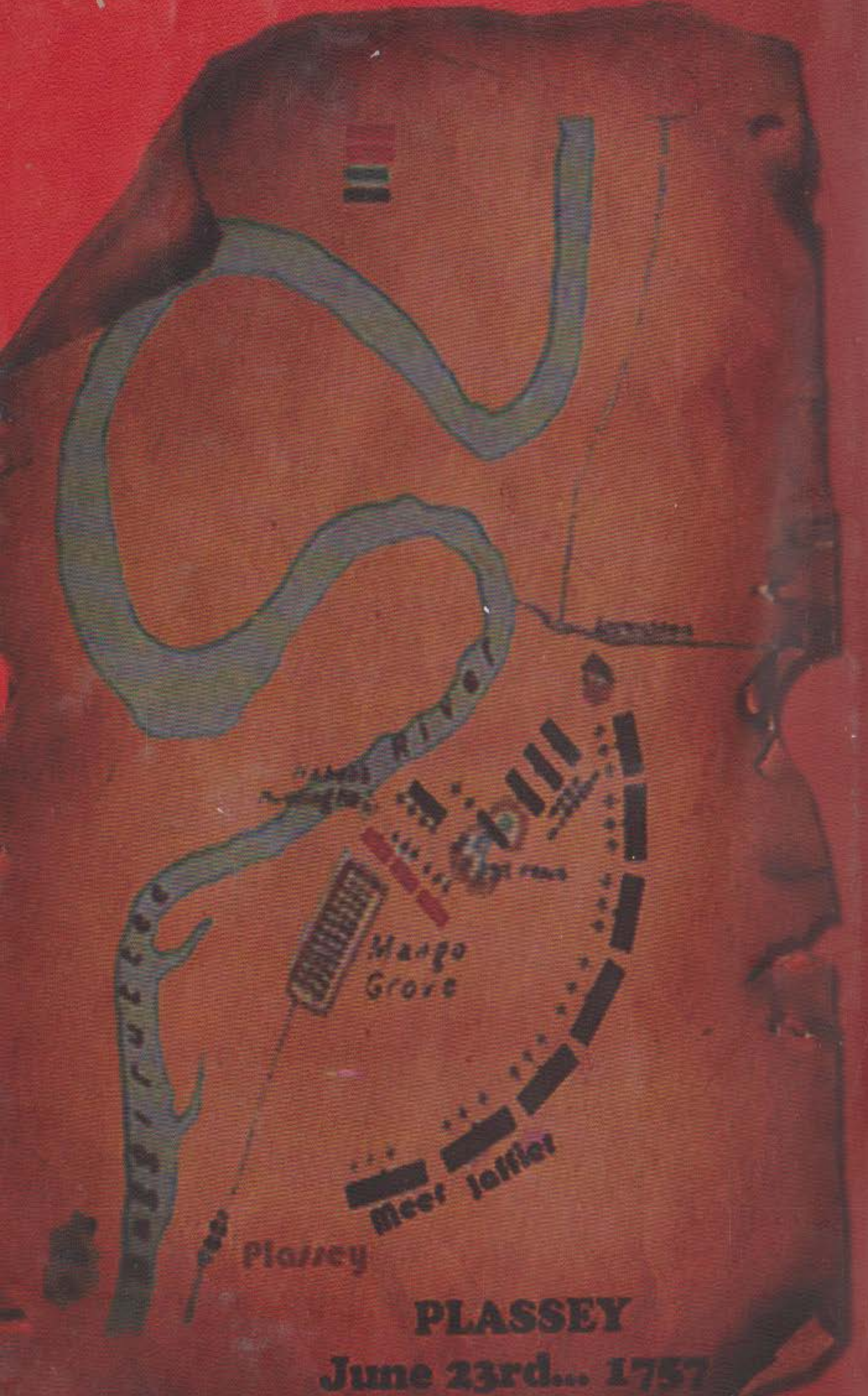
River
Mango
Grove
Meer Jaffier
Plassey
PLASSEY
June 23rd... 1757